পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ১৯৭৪ সাল হইতে প্রবর্তিত নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত।

ব্যাকরণ ও রচনা প্রবেশ

[নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য]

[ব্যাকরণ, রচনা, ভাব-সম্প্রসারণ, ভাবার্থ ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত]

অজিতকুমার ঘোষ, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট্.,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের
প্রধান এবং কলা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ
ও
গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়, এম. এ.
বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক

সারস্বত সংসদ
পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সারস্বত-সংসদ-এর পক্ষে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ভক্ত কর্তৃক প্রকাশিত।
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর ১৯৫৯

মুদ্রাকর :

শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
ভগবতী প্রেস
১৬।১ ছিদাম মুদী লেন,
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য লিখিত ব্যাকরণ ও রচনা-প্রবেশ প্রকাশিত হইল। চার মাস আগে পর্ষৎ-এর নূতন পাঠ্যক্রম প্রকাশিত হইয়াছিল। চার মাসের মধ্যে এরূপ একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করা খুবই আয়াসসাধ্য ব্যাপার। তবে আমাদের আন্তরিক চেষ্টা ও প্রকাশকদের পূর্ণ সহযোগিতা ছিল বলিয়াই এ-গ্রন্থ যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হইল। এ-গ্রন্থখানা যদি শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সন্তোষ বিধান করিতে পারে তবেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। আধুনিক ছাত্রছাত্রীদের ব্যাকরণ সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক ভীতি রহিয়াছে। সেই ভীতি দূর করিয়া ব্যাকরণ সম্পর্কে আগ্রহ ও অনুরাগ জাগাইবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই গ্রন্থের ব্যাকরণ-অংশ লিখিত হইয়াছে। ব্যাকরণের সূত্র ও সংজ্ঞা-গুলি যথাসম্ভব সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং প্রচুর উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ব্যাকরণের প্রত্যেকটি নিয়ম বাক্যে প্রয়োগ করিয়া বুঝান হইয়াছে। বাক্যগুলি ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় ও পরিচিত জগতের বিষয় অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। বিষয় অনুসারে বাক্যগুলিতে কোথাও সাধু, কোথাও বা চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

রচনা-অংশও ছাত্রছাত্রীদের ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান বর্ধনে যাহাতে যথার্থ সহায়ক হয় সে-বিষয়ে সর্বপ্রকার যত্ন লওয়া হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি বিশেষ চিন্তা করিয়া নির্বাচন করা হইয়াছে এবং তথ্য-সন্নিবেশ ও সাহিত্যিক রচনাভঙ্গী উভয় দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদ, ভাবার্থ ও ভাব-সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিষয়েও ছাত্রছাত্রীদের যথার্থ জ্ঞানের অনুশীলন যাহাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

সারস্বত সংসদের শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ভক্ত ও শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্ত এই দুর্মূল্যতার বাজারেও কাগজ, বাঁধাই ও মুদ্রণ-পারিপাট্যের দিকে সযত্ন দৃষ্টি দিয়াছেন। তাঁহাদের অকৃপণ ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অভিনন্দনযোগ্য।

অজিতকুমার ঘোষ
গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

নবম শ্রেণীর পাঠ্য

দশম শ্রেণীর পাঠ্য

প্রবন্ধ ও রচনা

ব্যাকরণ ও রচনা প্রবেশ

ভাষা

মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে সব অর্থবান্‌ ধ্বনি-সমষ্টি উচ্চারিত হয় তাহাকে **ভাষা** বলে।

ভৌগোলিক সীমানা অনুযায়ী ভাষার যেমন পার্থক্য দেখা যায়, তেমনি সময়ের বিবর্তন অনুযায়ী ভাষারূপেরও অনেক বিবর্তন ঘটে। আবার একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা আঞ্চলিক ভাষা অথবা উপভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে। জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, অন্য ভাষাগোষ্ঠী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি অথবা শ্রেণীর প্রভাবেও ভাষার অনেক পরিবর্তন ঘটে। আদি অবস্থায় ভাষার রূপ থাকে সরল এবং নিয়মের জটিলতা এবং শব্দের বহুলত্ব হইতে তাহা অনেকটা মুক্ত থাকে। কিন্তু কালক্রমে সমাজের জটিলতা বৃদ্ধি এবং ভাষার ক্ষেত্র প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার মধ্যেও অনেক প্রকার জটিলতা আসিয়া থাকে।

ব্যাকরণ

মানুষের প্রয়োজনে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই ভাষাকে একটি স্থায়ী, নিয়মবদ্ধ ও সংস্কৃত রূপ দানের জন্য একটি শাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। সেই শাস্ত্রই হইল **ব্যাকরণ**। ব্যাকরণ ভাষার খেয়ালী, অনিয়ন্ত্রিত ও বেনিয়মী বিকাশকে লক্ষ করে এবং কঠোর শাসনের দ্বারা বাঁধিয়া তাহার গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিল। ভাষা যতদিন মানুষের মুখে সীমাবদ্ধ থাকে ততদিন ব্যাকরণ না হইলেও চলে, কিন্তু যখন ভাষা লেখ্য রূপ গ্রহণ করে তখন তাহার একটি সর্বজনস্বীকৃত স্থায়ী আদর্শ থাকা প্রয়োজন। সেই আদর্শই উদ্ভাবন ও রক্ষা করে ব্যাকরণ। সেইজন্য ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষা সম্ভব নয়।

ধ্বনি ও বর্ণ

মনের ভাব কিংবা ইচ্ছা অপরের কাছে প্রকাশ করিতে হইলে মানুষ কণ্ঠ-জিহ্বা-দন্ত-ওষ্ঠ প্রভৃতির সাহায্যে অর্থজ্ঞাপক **ধ্বনি** সৃষ্টি করে। ফুসফুস

হইতে উত্থিত নিশ্বাস-বায়ু শ্বাসনালীর মধ্য দিয়া কণ্ঠনালীতে আসে এব সেখান হইতে কণ্ঠ ও মুখবিবর অথবা কণ্ঠ ও নাসিকাপথে বহির্গত হয় নির্গমনের পথে এই নিশ্বাসবায়ু যদি ইচ্ছাকৃত পেশী সঞ্চালনের ফলে মুখ বিবরের কোনো স্থানে বাধা পায় তাহা হইলে বাধার স্থান ও প্রকারভেদে ধ্বনি প্রকারভেদ ঘটে।

ধ্বনিপ্রকাশক চিহ্নের নাম **বর্ণ**। মুখের উচ্চারিত ধ্বনির লিখিত প্রতিনি হইল বর্ণ। কোনো একটি ভাষার বর্ণগুলি নির্দিষ্ট অথবা ক্রম অনুসারে সাজা হইলে তাহাকে বলা হয় **বর্ণমালা**।

বর্ণের শ্রেণীবিভাগ

স্বরবর্ণ

যে সকল বর্ণ অন্যবর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হয় তাহাদিগকে ব **স্বরবর্ণ**। স্বরবর্ণ মোট বারোটি, যথা, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ ও, ঔ।

স্বর দ্বিবিধ **হ্রস্ব** ও **দীর্ঘ**। যে সকল স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে অল্প সময় লাগে তাহাদিগকে **হ্রস্বস্বর** বলে। হ্রস্বস্বর পাঁচটি—অ, ই, উ, ঋ, ঌ। যে সক স্বর উচ্চারণ করিতে বেশি সময় লাগে তাহাদিগকে **দীর্ঘস্বর** বলে। দীর্ঘস্ব সাতটি। যথা, আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

ঌ বাংলা বর্ণমালায় থাকিলেও বাংলা ভাষায় ইহার ব্যবহার নাই। সুতরা প্রকৃতভাবে বলিতে গেলে বাংলা স্বরবর্ণের সংখ্যা **এগারোটি**।

ই (ঈ), এ, অ্যা এগুলির উচ্চারণের সময় জিহ্বা সম্মুখ দিকে প্রসৃত হয় বলিয়া এগুলিকে **সম্মুখস্থ স্বরবর্ণ** বলে। উ (ঊ), ও, অ এগুলির উচ্চারণ কালে জিহ্বা পশ্চাদ্দিকে আকৃষ্ট হয় বলিয়া ইহাদিগকে **পশ্চাদবস্থিত স্বরবর্ণ** বলা হয়। আ কারের উচ্চারণ কালে জিহ্বা শোওয়া অবস্থায় থাকে বলিয়া ইহাকে **নিম্নাবস্থিত স্বরবর্ণ** বলে। এই বর্ণ উচ্চারণের সময় মুখ বিবৃত থাকে বলিয়া ইহাকে **বিবৃত স্বর**ও বলে।

ই-উ এই দুইটি বর্ণের উচ্চারণে মুখবিবর সংকুচিত অথবা সংবৃত থাকে বলিয়া ইহাদিগকে **সংবৃত স্বর** বলে।

এ-ও এই দুইটি বর্ণের উচ্চারণ কালে মুখবিবর অর্ধেক সংবৃত থাকে বলিয়া ইহাদিগকে **অর্ধসংবৃত স্বর** বলে।

অ-অ্যা এই দুইটি বর্ণের উচ্চারণে মুখবিবর অর্ধেক বিবৃত থাকে বলিয়া ইহাদিগকে **অর্ধবিবৃত স্বর** বলে।

যৌগিক স্বর—দুইটি স্বরবর্ণ একসঙ্গে উচ্চারিত হইলে তাহাকে **যৌগিক স্বর** বলে। বাংলায় খাঁটি যৌগিক স্বরবর্ণ মাত্র দুইটি, যথা, **ঐ (অই), ঔ (অউ)**। তবে আধুনিক বাংলায় নানা প্রকার যুক্ত স্বরের সৃষ্টি হইতেছে। যথা, খাই (আই), পাইয়ে (ইয়ে), খাওয়া (ওয়া), পড়ুয়া (উয়া), ঘেরাও (আও) ইত্যাদি।

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ

অ-আ—কণ্ঠস্থানে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **কণ্ঠ্যবর্ণ** বলে।

ই ঈ—তালুতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **তালব্যবর্ণ** বলে।

ঋ—উচ্চারণ স্থান মূর্ধা বলিয়া **মূর্ধন্য বর্ণ**।

উ-ঊ—উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ বলিয়া **ওষ্ঠ্য বর্ণ**।

এ-ঐ—উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও তালু বলিয়া **কণ্ঠতালব্য বর্ণ**।

ও-ঔ—উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ বলিয়া **কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ**।

ব্যঞ্জনবর্ণ

যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হইতে পারে না তাহাদিগকে **ব্যঞ্জনবর্ণ** বলে। ব্যঞ্জনবর্ণ মোট তেত্রিশটি। যথা, ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্; প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্, য্, র্, ল্, ব্, শ্, ষ্, স্, হ্।

ড়, ঢ়, য় ঃ—বাংলায় এই বর্ণগুলির ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু ইহারা শব্দের আদিতে বসে না।

শুদ্ধ ব্যঞ্জনবর্ণ ত্ বুঝাইবার জন্য বাংলায় খণ্ড ত অথবা ৎ-চিহ্নের ব্যবহার হয়।

স্পর্শবর্ণ—ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণকে **স্পর্শবর্ণ** বলে। এই বর্ণগুলির উচ্চারণ কালে জিহ্বা, কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা বা দন্ত স্পর্শ করে, কিংবা ওষ্ঠ ও অধরের স্পর্শ হয়। এজন্য এই বর্ণগুলিকে স্পর্শবর্ণ বলে। স্পর্শবর্ণগুলি পাঁচভাগে বিভক্ত, প্রত্যেকটি ভাগকে এক একটি **বর্গ** বলে। বর্গের অন্তর্গত বর্ণ বলিয়া ইহাদিগকে **বর্গীয় বর্ণও** বলে।

বর্গবিভাগ

ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্—**ক-বর্গ** বা **কণ্ঠ বর্ণ**

চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্—**চ-বর্গ** বা **তালব্য বর্ণ**

ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্—**ট বর্গ** বা **মূর্ধন্য বর্ণ**

ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্—**ত-বর্গ** বা **দন্ত্য বর্ণ**

প্, ফ্, ব্, ভ্, ম—**প-বর্গ** বা **ওষ্ঠ্য বর্ণ**

নাসিক্য বর্ণ—ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্ এই বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় মুখের বায়ু নাসিকার ভিতর দিয়াও বহির্গত হয়। সেজন্য ইহাদিগকে **নাসিক্য বর্ণ** বলে।

অন্তঃস্থ বর্ণ—য্, র্, ল্, ব্, হ্ স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাদিগকে **অন্তঃস্থবর্ণ** বলা হয়। ইহাদের মধ্যে য্ ও ব্ কে **অর্ধস্বর (Semi-vowel)** ও র্ ও ল্ কে **তরল স্বর (Liquid)** বলে।

উষ্মবর্ণ—শ্, ষ্, স্, হ্ এগুলির উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর আধিক্য থাকে বলিয়া ইহাদিগকে **উষ্মবর্ণ** বলে।

অঘোষ বর্ণ—বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণে গাম্ভীর্য অথবা ঘোষ নাই বলিয়া ইহাদিগকে **অঘোষ বর্ণ** অথবা **শ্বাস বর্ণ** বলা হয়। **শ্, ষ্** ও **স্**-কেও অঘোষ বর্ণ বলা হয়।

ঘোষবৎ বর্ণ—বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং **য্, র্, ল্, ব্, হ্**-কে নাদ বা **ঘোষবর্ণ** বলা হয়।

অল্পপ্রাণ বর্ণ—বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণের সময় প্রাণ বা বায়ু **থাকে না** বলিয়া ইহাদিগকে **অল্পপ্রাণ বর্ণ** বলে। যথা, **ক, গ ; চ, জ ; ট, ড ; ত, দ ; প, ব।**

মহাপ্রাণ বর্ণ—বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণের সময় প্রাণ অথবা বায়ু **প্রবল** থাকে বলিয়া ঐ বর্ণগুলিকে বলে **মহাপ্রাণ বর্ণ**। যথা, **খ, ঘ ; ছ, ঝ ; ঠ, ঢ ; থ, ধ ; ফ, ভ।**

অযোগবাহ বর্ণ—অনুস্বার (ং) ও বিসর্গ (ঃ) এই বর্ণ দুইটিকে **অযোগবাহ বর্ণ** বলে।

সংযুক্ত বর্ণ—দুই বা বহু বর্ণ একসঙ্গে মিলিত হইলে তাহাদিগকে **সংযুক্ত বর্ণ** বলে। যথা, **ক্ষ (ক্+ষ), জ্ঞ (জ+ঞ), ক্ত (ক্+ত্)** ।

হলন্ত শব্দ—স্বরবর্ণহীন ব্যঞ্জনবর্ণকে **হলন্ত বর্ণ** বলে। স্বরবর্ণ না থাকিলে ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে (্) এই হসন্ত চিহ্ন দিতে হয়। হসন্ত চিহ্নযুক্ত ব্যঞ্জনের নাম হল্। যে শব্দের অন্তে হল্ থাকে তাহাকে **হলন্ত শব্দ** বলে।

অনুশীলনী

১। ভাষার ধ্বনির সৃষ্টি কিভাবে হয়? ধ্বনি কখন বর্ণে পরিণত হয়? বাংলা ভাষার বর্ণগুলির মূল বিভাগ কি কি এবং মোট কয়টি বর্ণ রহিয়াছে?

২। বাংলা ভাষার বর্ণগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর। যৌগিকস্বর কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৩। ব্যঞ্জনবর্ণগুলির বর্গবিভাগ কর। বর্গের বাহিরে যে যে বর্ণ রহিয়াছে তাহার পরিচয় দাও।

৪। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর:

স্পর্শবর্ণ, উষ্মবর্ণ, নাসিক্য বর্ণ, অঘোষ বর্ণ, মহাপ্রাণ বর্ণ, অযোগবাহ বর্ণ, সংযুক্ত বর্ণ।

৫। নিম্নলিখিত বর্ণগুলি বর্ণমালার কোন্ কোন্ শ্রেণীতে পড়ে তাহা নির্দেশ কর।

ঋ, ঔ, অ্যা, য, ব, হ, ষ, ধ, ঃ, ক্ত, ক্ষ।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য

স্বরবর্ণের উচ্চারণ

অ

১। সহজ ও স্বাভাবিক উচ্চারণ—ইংরাজী hall, raw প্রভৃতি শব্দের a-র মত। যথা, জল (জ্ অল্), বর (ব্ অর), শরং (শ্ অর্অং), পড়া (প্ অড়া), চমক (চ্ অম্অক) ইত্যাদি।

২। ও-কারের মত উচ্চারণ—পরে ই, উ, য-ফলা, জ্ঞ, ক্ষ থাকিলে অ ও-কারের মত উচ্চারিত হয়। যথা, রবীন্দ্র (রোবীন্দ্র), মধু (মোধু), সত্য (সোত্য), যজ্ঞ (যোগগোঁ), লক্ষ (লোক্‌খো)।

৩। না-অর্থে শব্দের আদিতে অ বা অন্ থাকিলে পরে ই, উ থাকা সত্ত্বেও অ ও-কারের মত উচ্চারিত হয় না। যথা, অসীম, অস্থির, অকূল, অবুঝ ইত্যাদি।

তবে ব্যক্তিনামের বেলায় অ ও-র মত উচ্চারিত হয়। যথা, অবিনাশ (ওবিনাশ) অতুল (ওতুল)।

৪। আধুনিক বাংলায় শব্দের শেষে অ প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। শেষ বর্ণটি হসন্তরূপ উচ্চারিত হয়। যথা, হাত (হাত্), কান (কান্), বসন (বসন্), আজ (আজ্), দোষ (দোষ্) ইত্যাদি।

৫। কতকগুলি বাংলা বিশেষণ পদে অন্ত্য অ ও-র মত উচ্চারিত হয়। যেমন, ভাল (ভালো), বড (বড়ো), ছোট (ছোটো) ইত্যাদি।

৬। ক্রিয়াপদে অন্ত্য অ ও-র মত উচ্চারিত হয়। যথা, করল (কবলো), করব (করবো), করেছিল (করেছিলো), করত (করতো)।

৭। অনেক শব্দের অন্ত্য অ যদি উচ্চারিত না হয় তবে এক অর্থ হয়, আর যদি ও-র মত উচ্চারিত হয়, তবে অন্য অর্থ হয়। যথা, বার (বার্), বাব (বাবো); কাল (কাল্), কাল (কালো); বট (বট্), বট (বট্ অ), চালান (চালান্), চালান (চালানো)।

৮। ত, ইত প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ পদ হলে অন্ত্য অ বজায় থাকে, কিন্তু বিশেষ্য পদে অন্ত্য অ লুপ্ত হয়। যথা, বিশেষণ পদ—গীত. পালিত, রক্ষিত; বিশেষ্য পদ—গীত্, পালিত্, রক্ষিত্।

৯। সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য অ বাংলায় প্রায়ই লুপ্ত হইয়া যায়। যথা, বিশাল্, নর্, রাম্, শিব্, অসুর্।

আ

সংস্কৃত আ-কারের উচ্চাবণ দীর্ঘ, কিন্তু বাংলায় সাধারণত হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হয়। তবে কবিতায় ছন্দের অনুরোধে অনেক সময় দীর্ঘ বর্ণ টানিয়া পডিতে হয়। 'আ-কারের পরে হলন্ত বর্ণ থাকিলে উচ্চারণ কিছুটা দীর্ঘ। যথা, ধান, ভাত, হাত ইত্যাদি। কিন্তু পরে অন্য স্বরবর্ণ আসিলে পূর্বের আ-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব হয়; যথা, ভাতা, হাতা, মারা ইত্যাদি।

ই, ঈ

ই-র পরে যদি কোনো স্বরবর্ণ না থাকে তবে ই-র উচ্চারণ একটু দীর্ঘ হয়। যথা, দিন, অসিত, অখিল। পরে স্বরবর্ণ থাকিলে ই-র উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। যথা, বিরস, বিবেক, মিতালী ইত্যাদি।

সংস্কৃতে ঈ-র উচ্চারণ দীর্ঘ, কিন্তু বাংলায় উচ্চারণ সাধারণত হ্রস্ব। যথা, নীতি গীতিকা, জীবন। তবে পরে স্বরবর্ণ না থাকিলে দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। যথা, অধীর, অসীম। তবে কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ **কি**-এর উপরে যখন জোর দিতে চাহিয়াছেন তখন বানান হইয়াছে **কী**। দুইটি বাক্যে কি-এর ব্যবহারে পার্থক্য লক্ষণীয়।

তুমি **কি** ভাত খাচ্ছ?

তুমি **কী** খাচ্ছ?

উ, ঊ

ই, ঈ-এর মত উ, ঊ-এর পরে যদি হলন্ত বর্ণ থাকে তবে উচ্চারণ একটু দীর্ঘ হয়। যথা, সুখ, রূপ। পরে স্বরবর্ণ থাকিলে উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। যথা, উতলা, উমা, ঊষা। কবিতার ক্ষেত্রে ঊ-এর উচ্চারণ দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঋ

সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে ঋ বাংলা বর্ণমালায় গৃহীত হইয়াছে। ঋ-এর যথার্থ উচ্চারণ বাংলায় হয় না। বাংলায় ঋ-এর উচ্চারণ হইল রি। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেই শুধু ঋ-এর ব্যবহার প্রচলিত আছে। যথা, ঋণ, ঋষি, ঋষভ, ভ্রাতৃগণ ইত্যাদি।

এ

১। এ-র স্বাভাবিক ও সংস্কৃত উচ্চারণ, যথা, বেদ, শেষ, দেশ, রেবা।

২। এ-র বিবৃত অথবা অ্যা-র মত উচ্চারণ, যথা, এক (অ্যাক), দেখ (দ্যাখ), জেঠা (জ্যাঠা) ইত্যাদি।

৩। পূর্ববঙ্গে এ অনেক সময় অ্যা উচ্চারিত হয়। যথা, দেশ (দ্যাশ), শেষ (শ্যাষ), বেতন (ব্যাতন)।

৪। পরে ই-কার বা উ-কার থাকিলে এ-র উচ্চারণ সংবৃত হয়। যথা, দেখি, বেটী, কেতু, মেজুর, বেচুক।

৫। পরে অ-কার বা আ-কার থাকিলে এ-র উচ্চারণ বিবৃত হয়, যথা, ঢেলা (ঢ্যালা), চেলা (চ্যালা), দেখা (দ্যাখা), বেটা (ব্যাটা)।

তবে তৎসম শব্দে এ-র উচ্চারণ সংবৃত হয়। যথা, মেঘ, মেধা, বেশ, দেহ।

৬। তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রেও এ-র পরে যুক্তবর্ণ থাকিলে এ-র উচ্চারণ সংবৃত হয়। যথা, তেষ্টা কেচ্ছা।

বাংলায় ঐ-এর উচ্চারণ ওই-এর ন্যায়। যথা, দৈন্য (দোইন্য), ধৈর্য (ধোইর্য), ঐক্য (ওইক্য)।

চলিত ভাষায় ঐ-র স্থানে অনেক সময় অই লেখা হয়। যথা, কৈ—কই, বৈ—বই, দৈ—দই।

ও

ইংরেজী bold, roll প্রভৃতি শব্দের o-র মত বাংলা ও-র উচ্চারণ। ও-র পরে যদি স্বরবর্ণ না থাকে তা হলে ও-র উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। যথা, রোগ (রোগ্), বোল (বোল্), হোক (হোক্)। ও-র পরে যদি স্বরবর্ণ থাকে তবে ও র উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। যথা, রোগা, রোদন, ভোলা, ধোপা, তোমার।

ঔ

বাংলায় ঔ-র উচ্চারণ ওউ-র ন্যায়। যথা, ঔষধ (ওউষধ), গৌরব (গোউরব), গৌরী (গোউরী), ধৌত (ধোউত)।

চলিত ভাষায় ঔ-র স্থানে অনেক সময় অউ লেখা হয়। যথা, বৌ—বউ, মৌ—মউ।

সন্ধি-স্বর

দুইটি ভিন্ন স্বরধ্বনির সংযোগে **সন্ধি স্বর** বা **সন্ধ্যক্ষরের** উৎপত্তি হয়। বাংলা বর্ণমালায় মাত্র দুইটি সন্ধ্যক্ষর আছে। যথা, ঐ (ও+ই), ঔ (ও+উ)।

চলিত ভাষায় অনেকগুলি সন্ধ্যক্ষর আছে, যথা, আই (খাই, রাই), আউ (ঝাউ), আও (যাও), ইয়ে (খাইয়ে), ইউ (মিউ), এই (নেই, ধেই-ধেই), উয়া (মহুয়া) ইত্যাদি।

তিনটি স্বরধ্বনির সংযোগও (Tripthong) বাংলায় বহু আছে। যথা, খাওয়া, বেয়াই, জানাইয়া, হইয়া। তিনটি স্বরধ্বনির বেশি, যথা, চার, পাঁচ, ছয় স্বরধ্বনির সংযোগও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, করাইয়াও, নোয়াইয়া, খাওয়াইয়া।

অনুনাসিক স্বর

চন্দ্রবিন্দু (ঁ) ও অনুস্বার (ং) উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস বায়ু নাসিকার ভিতর দিয়া নির্গত হয় বলিয়া ইহাদিগকে **অনুনাসিক স্বর** বলে। যথা, চাঁদ, কাঁটা, বংশ, রং।

শব্দের সঙ্গে অনুনাসিকের ব্যবহার হইলে অনেক সময় শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যায়। যথা, গোড়া—গোঁড়া, চাই—চাঁই, কাদা—কাঁদা, বাধা—বাঁধা।

কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

ঙ

ঙ-র উচ্চারণ অনুস্বারের ন্যায়। যথা, শঙ্খ—শংখ, কঙ্কণ—কংকণ, বঙ্গ—বংগ, সঙ্ঘ—সংঘ।

ঙ্গ-র পরিবর্তে বর্তমানে অনেক স্থলে শুধু মাত্র ঙ ব্যবহৃত হয়। যথা, বাঙ্গালী—বাঙালী, রাঙ্গা—রাঙা, ব্যাঙ্গ—ব্যাঙ, চোঙ্গা—চোঙা।

চ, ছ, জ, ঝ

চ বর্গের উচ্চারণে জিহ্বা তালু স্পর্শ করে এজন্য ইহাদিগকে **তালব্য বর্ণ** বলা হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এই বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা দন্তমূল স্পর্শ করে এজন্য পূর্ববঙ্গে বর্ণগুলির দন্তমূলীয় উচ্চারণ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের চলতি ভাষায় শব্দের শেষে ছ চ তে পরিণত হয়। যথা, হচ্ছে—হচ্চে, দেখছি—দেখচি, করছে—করচে।

ঞ

ঞ-র উচ্চারণ য় অথবা হ্যঁ-র মত। চ বর্গের আগে থাকিলে ইহার উচ্চারণ ন্-র মত হয়। যথা, অঞ্চল—অনচল, বাঞ্ছা—বান্‌ছা, পঞ্জর—পন্‌জর, ঝঞ্ঝা—ঝনঝা।

ঞ জ-এর পরে থাকিলে জ ও ঞ মিলিয়া গ্‌গঁ এই রকম উচ্চারিত হয়। যথা, অজ্ঞ—অগ্‌গঁ, বিজ্ঞান—বিগ্‌গাঁন, রাজ্ঞী—রাগ্‌গীঁ।

ড, ঢ

ড ও ঢ যদি শব্দের মাঝে বা শেষে বসে তাহা হইলে তলায় একটি ফুটকি বা বিন্দু বসাইতে হয়। যথা, বড়, রূঢ়, আষাঢ়। শব্দের আদিতে ড ও ঢ-এর উচ্চারণ স্বাভাবিক থাকে। যথা, ডোম, ঢোল।

ড় ও ঢ় উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্রের নিম্নভাগ দ্বারা দন্তমূলে তাড়ন বা আঘাত করা হয়। এজন্য ইহাদিগকে **তাড়নজাত ধ্বনি** বলে।

ণ, ন

বাংলায় ণ ও ন-র উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় ণ-র কোনো স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই। শুধু কেবল তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ণ বজায় রহিয়াছে।

য

বাংলায় য-র উচ্চারণ বর্গীয় জ-এর অনুরূপ। ইহার সংস্কৃত উচ্চারণ হইতেছে-ইঅ। শব্দের মাঝে ও শেষে বসিলে ইহার তলায় একটি বিন্দু দিতে হয়, তখন ইহার উচ্চারণ অ-র মত হয়। যথা, বয়ান, সময়, নিয়ম। তখন ইহার অর্ধস্বর উচ্চারণ হইয়া থাকে।

এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র কম্পিত হইয়া দন্তমূলে আঘাত করে। এজন্য এই ধ্বনিকে **কম্পনজাত ধ্বনি** বলে। বর্ণের মাথায় বসিলে র-কে রেফ (´) বলে। যথা, তর্ক, কর্জ, ফর্দ, কর্ম। বর্ণের তলায় ব্যবহৃত হইলে ইহাকে র-ফলা (্র) বলে। যথা, বক্র, বিক্রম, নম্র ইত্যাদি। র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইয়া থাকে। যথা, সুব্রত—সুব্ব্রত। নম্র—নম্ম্র, তীব্র—তীব্ব্র।

ল

জিহ্বাগ্র দ্বারা দন্তমূল স্পর্শ করিয়া জিহ্বার দুই পার্শ্ব দিয়া বায়ু বাহির করিয়া এই বর্ণের উচ্চারণ করা হয়। এজন্য ইহাকে **পার্শ্বিক বর্ণ** বলা হয়। ল-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণেরও দ্বিত্ব হইয়া থাকে। যথা, শুক্ল—শুক্ক্ল। অম্ল—অম্ম্ল।

ব

বর্গীয় ব্ এবং অন্তঃস্থ ব্ (উঅ=w) বাংলায় আকৃতিতে ও উচ্চারণে এক। সংস্কৃত ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় এই দুই ব-এর আকৃতি ও উচ্চারণে পার্থক্য

শ, ষ, স

এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণ বাংলায় একই ধরনের—ইংরেজীর sh-এর মত। বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলের কথ্য ভাষায় শ, ষ, স-এর উচ্চারণ ইংরেজী -এর মত। কিন্তু এই উচ্চারণ শিষ্ট উচ্চারণ নহে।

শ, ষ, স-এর উচ্চারণ শিশ্ দেওয়ার ধ্বনির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলিয়া ইহাদিগকে **শিশ্ ধ্বনিও** বলা হয়। শ এবং স-এর সঙ্গে ত, থ, ন, র, ল যুক্ত হইলে শ এবং স-এর উচ্চারণ ইংরেজী s-এর মত হয়। যথা, সমস্ত, স্বাস্থ্য, স্নান, শ্রী, শ্লীল।

হ

য-ফলার সহিত যুক্ত হইলে এই বর্ণ জ্ঝ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, সহ্য—সজ্ ঝ, বাহ্য—বাজ্ ঝ।

ক্ষ

শব্দের আদিতে বসিলে ইহার উচ্চারণ শুধু খ-এর মত হয়। যথা, ক্ষয়, ক্ষতি। কিন্তু অন্যস্থানে বসিলে ইহার উচ্চারণ ক্‌খ-এর ন্যায় হয়। যথা, লক্ষণ, কপোতাক্ষ।

বিসর্গ (ঃ)

ইহা একপ্রকার হ-এর ধ্বনি। কিন্তু বাংলার এই হ-ধ্বনি উচ্চারিত হয় না। বাংলায় বিস্ময়সূচক অব্যয়ে বিসর্গ যুক্ত হয়। যথা, ওঃ, বাঃ, উঃ। পদের মধ্যে থাকিলে বিসর্গ পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব সাধন করে। যথা, দুঃখ—দুক্‌খ, দুঃসহ—দুস্‌সহ। পদের শেষে বসিলে বিসর্গের উচ্চারণ প্রায়ই হয় না। যথা, বশতঃ—বশত, বিশেষতঃ—বিশেষত।

একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি

অ

১। সহজ ও স্বাভাবিক উচ্চারণ: দশ, চলা, অসীম, অতনু।

২। ও-কারের মত উচ্চারণ: অতি (ওতি), রবীন্দ্র (রোবীন্দ্র), ভাল (ভালো), করব (করবো), কাব্য (কাব্‌বো)।

আ

১। হ্রস্ব উচ্চারণ—রাতা, বাধা, হাতা।

২। দীর্ঘ উচ্চারণ—ভাত, রাত, ধান।

৩। কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ—'শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা উৎসর্জন করি'।

ঈ

১। হ্রস্ব উচ্চারণ: গীতি, রীতি, সীমা।

২। দীর্ঘ উচ্চারণ: গীত, অধীর, দীর্ন।

৩। কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ : 'শিয় শীর্ণ জীবনের'।

৪। যখন জোর দেওয়া হয় তখন দীর্ঘ উচ্চারণ : তুমি কী খেয়েছ ?

উ

১। হ্রস্ব উচ্চারণ : উষা, রূঢ়।

২। দীর্ঘ উচ্চারণ : কূল, মূল।

৩। কবিতায় দীর্ঘ উচ্চারণ : 'রূপে ভরল দিঠি'।

এ

১। স্বাভাবিক উচ্চারণ : বেদ, মেষ, দেশ, বেলা।

২। বিবৃত অথবা অ্যা-র মত উচ্চারণ : দেখা (দ্যাখা), একা (অ্যাকা), জেঠা (জ্যাঠা)।

ঋ

১। রি উচ্চারণ : ঋণ, ঋষি, ঋতু।

২। আশ্রিত ধ্বনির দ্বিত্ব (ভুল উচ্চারণে) : অমৃত (অম্‌মৃত), আবৃত্তি (আব্‌বৃত্তি)।

ঙ

১। ং উচ্চারণ : শঙ্খ (শংখ), কঙ্কণ (কংকণ)।

২। ঙ্গ-র পরিবর্তে ব্যবহার : বাঙ্গালী (বাঙালী), রাঙ্গা (রাঙা), রঙ্গীন (রঙীন)।

ঞ

১। চ-বর্গের আগে উচ্চারণ ন্‌-এর মত : অঞ্চল (অন্‌চল), বঞ্চনা (বন্‌চনা), লাঞ্ছনা (লান্‌ছনা)।

২। জ-এর সঙ্গে পরে যুক্ত হইলে উচ্চারণ গ্‌ গঁ : আজ্ঞা (আগগাঁ), রাজ্ঞী (রাগ্‌গী), বিজ্ঞান (বিগ্‌গাঁন্)।

য

১। জ-র মত উচ্চারণ : যান, যথা, যেমন, যদি।

২। অ-র মত উচ্চারণ : নিয়ম, সময়, কতিপয়।

৩। অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া এ-র মত উচ্চারণ : ব্যক্তি (বেক্তি), ব্যতীত (বেতিত)।

৪। অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অ্যা-র মত উচ্চারণ : ব্যক্ত (ব্যাক্ত), ব্যথা (ব্যাথা)।

ক্ষ

১। খ-র মত উচ্চারণ : ক্ষতি (খতি), ক্ষমা (খমা), ক্ষণিক (খণিক)।

২। উচ্চারণ ক্‌খ-র মত : লক্ষ্মী (লক্‌খী), রক্ষা (রক্‌খা), ভিক্ষা (ভিক্‌খা)।

বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি

ও

অ—বলুক (বোলুক্), রবীন্দ্র (রোবীন্দ্র), লক্ষ্মণ (লোক্‌খোন)।

ও—ওল, রোগ, ভোলা।

য়ো—দিয়ো (দিও), করিয়ো (করিও)।

ঐ

অই : কই, বই, দই।

ঔ

অউ : বউ, মউ।

ন

ন : নৌকা, নয়ন, নাম।

ণ : ণিজন্ত, প্রণাম, রামায়ণ।

শ

শ : শ্যালক, শত, শরীর।

ষ : ষাঁড়, ষড়যন্ত্র, ষষ্ঠী।

স : সমান, সম্বন্ধ, সম্প্রীতি।

স (S)

শ : শৃগাল, শ্লীল, শ্রীমান্।

ষ : ষ্টীমার, ষ্টীল, ষ্টেশন।

স : স্বর, স্ত্রৈণ, স্তোত্র, স্থল।

ঙ—বাঙলা (বাংলা), ব্যাঙ (ব্যাং)।

ঙ্গ—বাঙ্গলা (বাংলা), ব্যাঙ্গ (ব্যাং)।

য-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা যোগে বর্ণের দ্বিত্ব

বিদ্যা (বিদ্‌দা), বিদ্বান (বিদ্‌দান), আত্মা (আত্‌তা), আস্য (আস্‌স), সরস্বতী (সরস্‌সতী), মহাত্মা (মহাত্‌তা), আদিত্য (আদিত্‌ত), দ্বিত্ব (দিত্‌ত)।

অনুশীলনী

১। অ, এ, র, শ, হ, ঃ প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ স্থান নির্দেশ কর।

২। আ, ই, উ—এই বর্ণগুলির উচ্চারণ কোথায় হ্রস্ব এবং কোথায় বা দীর্ঘ তাহা আলোচনা কর।

৩। নিম্নলিখিত বর্ণগুলির উচ্চারণ নির্দেশ কর :—জেঠা (এ), মেঘ (এ), খাইয়ে (ইয়ে), বেয়াই (এয়াই), পঞ্জর (ঞ্জ), তীব্র (ব্র), শৃগাল (শৃ), সহ্য (হ্য), লক্ষ্মণ (ক্ষ্ম)।

বিদেশী শব্দের বাংলা বর্ণীকরণ

কতকগুলি বিদেশী বর্ণের বাংলা রূপ নাই। যথা, V, W, Z, Zh ইত্যাদি। বিন্দু বা অপর কোন চিহ্নযুক্ত বর্ণ উদ্ভাবন করিয়া বাংলায় ঐ বর্ণগুলির উচ্চারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। যথা, W = ব়, V = ভ়, Z = জ়, Zh = ঝ়।

রোমান অক্ষরে লেখা বর্ণগুলি বাংলায় কিভাবে উচ্চারিত হয় তাহা নিম্নে আলোচিত হইল :

A, a—সাধারণ আ এই উচ্চারণই গ্রহণ করা উচিত। ইংরেজী a বাংলায় অ, আ, এ, অ্যা রূপে উচ্চারিত হয়। যথা, ball, bar, base, bag। æ = এ, যথা—Mæterlinck। æ = ঈ, যথা, Cæsar। æ = অ্যা, যথা, Aelfred.

B, b—প্রায় সর্বত্রই ব উচ্চারণ। গ্রীস ও স্পেনের ভাষায় b অনেক স্থলে b = ভ-এর মত উচ্চারিত হয়। bj স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষায় ব্য, যথা, Bjornson = ব্যার্ন্‌সন্।

C, c—হিব্রু, গ্রীক এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রাচীন ভাষায় ক-এর মত উচ্চারিত হয়। যথা, Cicero = কিকেরো, Cædmon—ক্যাডমন। ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় c যদি e, i, y-এর পূর্বে থাকে তবে উচ্চারণ হয় s-এর মত। যথা, cell, cigar। অন্যত্র c-এর উচ্চারণ ক-এর মত। যথা, call, cat।

D, d—ইংরেজীতে উচ্চারণ ড-এর মত। ফরাসী ও দক্ষিণ ইউরোপের ভাষাগুলিতে উচ্চারণ দ-এর ন্যায়।

E, e—উচ্চারণ কোথাও এ, যথা, Pen। আবার কোথাও বা ই, যথা, genius। আবার কোথাও বা অ, যথা, germ.

F, f—উচ্চারণ ফ্। ইংরেজী পদের শেষে থাকিলে উচ্চারণ ভ, যথা, of। ফ ধ্বনি ff-এর দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যথা, off।

G, g—উচ্চারণ গ। কোন কোন স্থানে উচ্চারণ জ, যথা, gentle, gymnasium।

H, h—উচ্চারণ হ। ফরাসী, ইতালিয়ান প্রভৃতি কয়েকটি ভাষায় h অনুচ্চারিত, যথা, Hugo = য়ুগো।

I, i—উচ্চারণ ই বা ঈ। ia = ইআ, ie = ইয়ে।

J, j উচ্চারণ জ। ইতালিয়ান, জার্মান, স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষায় উচ্চারণ য়, যথা, Julius = য়ুলিউস।

K, k—উচ্চারণ ক। গ্রীক k লাতিন ভাষায় c রূপে এবং kh ch রূপে লিখিত হয়। যথা, Cimon, Achilles।

L, l—উচ্চারণ ল। ফরাসীতে উচ্চারণ য়্য। যথা, Marseilles = মার্সেয়্য।

M, m—উচ্চারণ ম। ফরাসীতে পদান্তস্থিত m-এর উচ্চারণ ँ।

N, n—উচ্চারণ ন। স্পেনীয় ও পোলীয় উচ্চারণে ঞ। n ভারতীয় বর্ণমালায় ণ।

O, o—উচ্চারণ ও। oo = উ, যথা, brood, জার্মান, ডাচ প্রভৃতি ভাষায় ও, যথা, Joost = য়োস্ট্।

P, p—উচ্চারণ প। Ph = ফ, যথা, photo।

Q, q—উচ্চারণ ক।

R, r—উচ্চারণ র, ইংরেজীতে একটু ড়-কার ঘেঁষা। rh = র্হ, ঽ, হ্র।

S, s—উচ্চারণ স। জার্মাণে উচ্চারণ জ। Sh = শ, Shakespeare = শেক্সপিয়র। St = স্ত, স্ট্, যথা, Station। S, s = সংস্কৃত শ, ষ।

T, t—ত ও ট-এর মাঝামাঝি দন্তমূলীয় ধ্বনি। উত্তর য়ুরোপের ভাষায় ট; ফরাসী, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষায় ত। Tch = চ, যথা, tchick। Th = থ, জার্মান ভাষায় ত কিংবা ট। ts = দন্তমূলীয় চ-এর উচ্চারণ, tz জার্মান টস।

U, u—উচ্চারণ উ বা ঊ। কোথাও আ, যথা, ugly। কোথাও ইউ, যথা, unity। ফরাসী U-র উচ্চারণ ই ও উ-র মাঝামাঝি; যথা, Hugo।

V, v—উচ্চারণ ভ। জার্মান ও ডাচের উচ্চারণ ফ। ভারতীয় নামে v থাকিলে ব দিয়া লেখা উচিত, যথা, Vidyasagar।

W, w—উচ্চারণ ব। জার্মানে ভ্, যথা, weber=ভে্বর, wh=হ্ব।

X, x—উচ্চারণ ক্স্। ফরাসী ভাষায় অনেক স্থানে ss রূপে উচ্চারিত হয়। যথা, Bruxelles=Brussels—ব্র্যুসল।

Y, y—ইহা মূলে গ্রীক অক্ষর। সাধারণত য়ুরোপীয় ভাষাগুলিতে ইহার উচ্চারণ ই অথবা য়-র মত। ইংরেজীতে উচ্চারণ আই, যথা, by, my, ভারতীয় ভাষায় উচ্চারণ ইঅ।

Z, z—উচ্চারণ জ, যথা, Zoo। জার্মানে উচ্চারণ ts=ৎস,—যথা, Leipzig—লাইপৎসিক।

বহু ইংরেজী শব্দ বাংলায় আসিয়া বাংলা উচ্চারণের প্রবণতা অনুযায়ী কিছুটা রূপান্তরিত হইয়া খাঁটি বাংলা রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এইসব শব্দের বাংলা বানানই বজায় রাখা উচিত। অন্যান্য যে সব বিদেশী শব্দ ইংরেজী ভাষার মারফত বাংলায় আসিয়াছে তাহাদের বেলাতেও বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা উচিত। বাংলায় আগত কিছুটা রূপান্তরিত বিদেশী শব্দের দৃষ্টান্ত :

ইস্কুল (school), বেঞ্চি (bench), টেবিল (table), গেলাস (glass), গারদ (guard), লাট (lord), আপিস (office), বাক্স (box), লণ্ঠন (lantern), কেটলি (kettle) ইত্যাদি।

ইংরেজী স্বরবর্ণের উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলায় ইংরেজী শব্দের বানান লেখা উচিত। ইংরেজীর 'i' ও 'u' যথাক্রমে বাংলা বানানে হবে-ই ও-উ; যথা, সিট (sit), মিল (mill), হিট (hit), ফুল (full), রুল (rule) ইত্যাদি। কিন্তু ইংরেজী 'ee' ও 'ea' বাংলায় হবে-ঈ এবং 'oo' হবে-ঊ; যথা, ফীল (feel), সীট (seat), মীল (meal), ফূল (fool), হূট (hoot)। ইংরেজী 'ai' বাংলায় শুধু-এ; যথা, মেল (mail), ট্রেন (train), ফেল (fail)। but, cut, hut, nut ইত্যাদি শব্দে 'u' বাংলায় য-ফলা দিয়ে লেখা উচিত; যথা, ব্যাট, ক্যাট, হ্যট, ন্যট ইত্যাদি। bird, girl ইত্যাদি শব্দের 'i' বাংলায় য-ফলা দিয়ে লেখা সঙ্গত; যথা, ব্যর্ড, গ্যর্ল ইত্যাদি।

ইংরেজী যুক্ত বর্ণ বাংলায় যুক্ত বর্ণ রূপে লেখা উচিত, যুক্ত বর্ণ বিশ্লিষ্ট করিলে হস্-চিহ্ন অবশ্যই দিতে হইবে; যথা, Park—পার্ক্ অথবা পার্ক্, (পারক নহে), board—বোর্ড্ অথবা বোর্ড্ (বোরড নহে), form—ফর্ম্ অথবা ফর্ম্ (ফরম নহে), report—রিপোর্ট অথবা রিপোর্ট্ (রিপোরট নহে), first—ফার্স্ট্ অথবা ফার্স্ট্ (ফারসট নহে)।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত শব্দগুলির বাংলা বর্ণীকরণ লেখ।

Achilles, Aesop, Algiers (ফ:), Aristotle (গ্রী:), Bastille (ফ:), Beethoven (জা:)। Cicero, Cowper, Jason (গ্রী:)। Jules (এ:), Monsieur (ফ:), Rousseau (ফ:), Shakespeare।

ধ্বনি-বিলোপ

১। তদ্ভব শব্দে অন্ত্য স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়। যথা, কর্ম>কম্ম>কাম্। সপ্ত>সত্ত>সাত্, চন্দ্র>চন্দ>চান্দ>চাঁদ্।

২। প্রাকৃতে শব্দের শেষে যে ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তাহা বাংলায় লুপ্ত হইয়া যায়। যথা, পাদ>পাঅ>পা, ঘৃত>ঘিঅ>ঘি।

৩। সংস্কৃত স্বরধ্বনি বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে লুপ্ত হইয়া যায়।

যথা, আ—

বল্গা>বগ্গা>বগ্গ>বাগ্। সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ্

ই, ঈ—

অগ্নি>অগ্নি>আগি>আগ্। তন্ত্রী>তন্তী>তাঁতি>তাঁত্

উ, ঊ—

ইক্ষু>ইক্খু>আউখ>আখ্

ফল্গু>ফগ্গু>ফাগু>ফাউগ>ফাগ্

৪। পদস্থিত কোনো অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়িলে শ্বাসাঘাতহীন অক্ষরের স্বরধ্বনি অনেক সময় ক্ষীণ হইয়া আসিয়া লুপ্ত হইয়া যায়।

যথা, আদি স্বরধ্বনির বিলোপ:

অলাবু>লাবু>লাবু>লাউ। উদ্ধার>উধার>ধা

মধ্য স্বরধ্বনির বিলোপ :

গামোছা > গাম্ছা। রাঁধনা > রাঁধ্না > রান্না।

অন্ত্য স্বরধ্বনির বিলোপ :

জল > জল্, আজি > আজ্

৫। র-এর লোপ :

রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের রেফ অনেক স্থলে লুপ্ত হয়, কিন্তু পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয়। যথা, ধর্ম > ধম্ম, কর্ম > কম্ম।

অনেক সময় পদমধ্যস্থিত র লুপ্ত হয়। যথা, করছি > কচ্ছি। মারছে > মাচ্ছে, করলাম > কল্লাম।

৬। হ-এর লোপ :

শিয়ালদহ > শিয়ালদঅ > শিয়ালদা, বধূ > বহূ > বউ, বউ, চাহে > চাএ > চায়, কহিবে > কইবে, ক'বে।

সাধু ও চলিত ভাষা

যে ভাষায় দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার দুইটি রূপ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। একটি হইল তাহার **শিষ্ট** অথবা **সাহিত্যিক রূপ**, আর একটি হইল তাহার **চলিত** বা **কথ্য রূপ**। সাহিত্যিক ভাষার রূপ এক ও অভিন্ন কিন্তু চলিত বা কথ্য ভাষা অঞ্চল ভেদে নানারূপ গ্রহণ করে। এইভাবে কথ্য ভাষার মধ্যে নানা উপভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তবে সংস্কৃতিসম্পন্ন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানের কথ্য ভাষাই বহু ক্ষেত্রে আদর্শরূপে গৃহীত হয়।

বাংলা ভাষাতেও **সাধু** বা **সাহিত্যিক** এবং **মৌখিক** বা **চলিত** এই দুই রূপ বর্তমান। সাধু ভাষাতে শব্দ ও ধ্বনিগুলির প্রাচীনতর রূপ রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু চলিত ভাষাতে নানারূপ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে শব্দ ও ক্রিয়ার নানা রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। যথা, করিয়া > কইরিয়া > কইরা, কইর‍্যা > ক'রে। তবে সাধুভাষার মধ্যে ভাষার প্রাচীনতর রূপ বজায় থাকিলেও তাহা কালের ব্যবধান এবং অঞ্চলের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটি অপরিবর্তিত ও সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ-ভাষারীতিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া ইহার শক্তি ও সৌন্দর্য অসামান্যরূপে বৃদ্ধি করিয়াছেন। সংস্কৃতশব্দবহুল হওয়াতে এই ভাষার মধ্যে একটা স্বাভাবিক গুরুত্ব ও

গাম্ভীর্য আসিয়াছে। ক্রিয়াপদগুলি দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে ইহাতে ওজস্বিতা ও বিলম্বিত লয়ের ধ্বনিবিস্তার ঘটিয়া থাকে। সাধুভাষা প্রধানত ক্রিয়াপদের সাধুরূপের মধ্য দিয়াই নির্দেশিত হয়। সাধুভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলি কোথাও সংস্কৃতাশ্রয়ী, আবার কোথাও বা সচল তদ্ভব শব্দবহুল। কোথাও তাহার বাক্য-বিন্যাসরীতি ধ্রুপদী ও গম্ভীর আবার কোথাও বা সরল ও সাবলীল বাক্যবিন্যাস-রীতিতে তাহা সুগম ও স্বচ্ছন্দ।

নিম্নে সাধু ভাষায় বিভিন্ন রূপের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে:

১। 'সীতা চিত্রপটের আর এক অংশে দৃষ্টি যোজনা করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্বতে কুসুমিত কদম্ব তরুর শাখায় ময়ুর ময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্যপুত্র তরুতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রুনয়নে উঁহারে ধরিয়া রহিয়াছে, উহার নাম কি? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে! ঐ পর্বতের নাম মাল্যবান; মাল্যবান বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন, নবজলধরমণ্ডলের সংযোগে শিখরদেশে কি অনির্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়া পূর্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও; আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না; শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্যবেগে উথলিয়া উঠিতেছে। জানকীর বিরহ পুনরায় নবীভাব অবলম্বন করিতেছে।'

সীতার বনবাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[উপরি-উদ্ধৃত গদ্যাংশে ক্রিয়াপদগুলি ছাড়া বাক্যের অন্তর্গত সমস্ত পদই সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত। সংস্কৃত শব্দের লালিত্য ও চিত্রসৌন্দর্য ইহাতে লক্ষণীয়। সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষা দুর্বোধ্য হয় নাই।]

২। 'এস, ভাই সকল। আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস. অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে। যেষক ছাগকে

হাড়িকাঠে ফেলিয়া সংকীর্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত সুম্রাপ্তকার ঢাকী ঢাক ঘাড়ে করিয়া রঙ্গে বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়া নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। এক সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে 'কত নাচ গো'।—বড় পূজার ধুম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গ পূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশীবিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামী দিবে—কত দীনদুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে। কত নর্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা! মা! মা!—'

কমলাকান্ত—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[উপরি-উদ্ধৃত গদ্যাংশে তৎসম ও তদ্ভব শব্দগুলি পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে। চলিত ভাষার কিছু কিছু ক্রিয়াপদও ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বাক্যগুলি ছোট ছোট, সেজন্য বাক্যগুলির মধ্যে সচলতা আসিয়াছে। ঘনিষ্ঠ কথোপকথনের রীতিতে রচিত বলিয়া এই গদ্যাংশের ভাষায় একটা প্রত্যক্ষতা ও আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়।]

৩। 'সন্ধ্যা হইয়াছে; মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পুকুর ভরতি হইয়া গিয়াছে। বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্বফুলের মতো রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাস্টার মহাশয়ের আসিবার সময় দু'চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনো বলা যায় না। রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। 'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানং' যাকে বলে। এক সময় বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়া 'হাহতোস্মি' করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবদুর্যোগে অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা গিয়াছে, হইতে পারে আর কেহ। না, হইতেই পারে না। ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টার মহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।'

জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[উপরি-উদ্ধৃত গদ্যাংশ সরস ও উপভোগ্য সাধুভাষার দৃষ্টান্ত। ভাব ও রসের অনুযায়ী শব্দগুলি কোথাও তৎসম ও কোথাও বা তদ্ভব। সাধুভাষায় কিরূপ রসসৃষ্টি হইতে পারে এই গদ্যাংশে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।]

৪। 'তা ছাড়া মস্ত মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি! গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড় পর্বতকে পাহাড় পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ। কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কাহারো মুখ টুখ ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।'

শ্রীকান্ত (১ম)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[উপরি-উদ্ধৃত গদ্যাংশের ক্রিয়াপদগুলি শুধু সাধুভাষার ক্রিয়াপদ। সেইজন্য ইহাকে সাধুভাষার দৃষ্টান্ত বলা যায়। আসলে এই ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রভেদ খুবই সামান্য—চলিতভাষার মেজাজ, চলমানতা, প্রত্যক্ষতা সবই ইহাতে বর্তমান। অথচ সাধুভাষার ছন্দ ও বিস্তার থাকার জন্য ইহা রসসৃষ্টির ভাষা হইয়া উঠিয়াছে।]

চলিত ভাষা মৌখিক ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মৌখিক ভাষা আলাদা আলাদা। কিন্তু চলিত ভাষা যাহা ভদ্র ও সংস্কৃতিমান লোকেদের আলাপ-আলোচনায়, বক্তৃতায় ও সাহিত্যিক রচনায় ব্যবহৃত হয় তাহার একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। তাহা কলিকাতা অঞ্চলের এবং ভাগীরথী নদীতীরবর্তী লোকেদের ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সাধুভাষা যেমন তৎসমশব্দবহুল ভাষা, চলিত ভাষাও তেমনি তদ্ভবশব্দবহুল ভাষা। তবে চলিত ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামপদগুলি ধ্বনিবিবর্তনের ফলে সংক্ষিপ্ত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। যথা, যাহা>যা, যাহাদের>যাদের, উহাদের>ওদের ইত্যাদি। চলিত ভাষার ক্রিয়াপদে অভিশ্রুতির ফলে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটিয়াছে। যথা, করিয়া> কইরিআ>কইরা>কইর‍্যা>ক'রে, করিতে>কইরিতে>কইরতে করতে ইত্যাদি। স্বর-সঙ্গতির ফলে চলিত ভাষার শব্দেও ধ্বনি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যথা, ইংরাজী>ইংরেজী>ইংরিজি, বিলাতী>বিলিতি, দেশী>দিশি, লিখা>লেখা

ইত্যাদি। চলিত ভাষা মুখের ভাষাকে অনুসরণ করে বলিয়া ইহার বাগ্‌বিন্যাস-রীতির মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য আসিয়াছে। চলিত ভাষা সাধারণত তদ্ভবশব্দবহুল বটে, কিন্তু বর্তমানে এমন চলিত ভাষার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় যে-সব স্থানে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলি শুধু মাত্র চলিত ভাষার, বিশেষ্য ও বিশেষণ পদগুলি সবই তৎসম পদ। আধুনিককালে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য অনেক কমিয়া আসিয়াছে।

বর্তমানে চলিত ভাষা সাধুভাষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা চলিত ভাষার পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, মুখের ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত। প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছিলেন, 'আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোনো প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। এক দিকে স্বরের সাহায্যে, অপর দিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়।' আধুনিককালের গল্প উপন্যাসের ভাষা একমাত্র চলিত ভাষা, সাধুভাষার স্থান সেখানে আর নাই। প্রবন্ধ ও সমালোচনার ভাষা আগে ছিল সাধুভাষা, এখন সেখানেও চলিত ভাষার প্রাধান্য ঘটিতেছে। সংবাদপত্রগুলি চলিত ভাষাই গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং, সাধুভাষা বর্তমানে সব ক্ষেত্রে খুবই সঙ্কুচিত। তবে অনেকেই মনে করিতেছেন যে, সাধুভাষার প্রয়োজন একেবারে ফুরাইয়া যায় নাই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাধুভাষার উপযোগিতা ক্রমশ উপলব্ধ হইতেছে। সাধুভাষার মধ্যে যে বিস্তার, গাম্ভীর্য ও গভীরতা রহিয়াছে চলিত ভাষায় সে সব আনা কখনই সম্ভব নহে। সরস রচনার পক্ষেও সাধুভাষা চলিতভাষা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী।

চলিত ভাষার নিদর্শন

১। 'এদিকে দুইয়ের নম্বরের বাড়ীতে অনেকে এসে জমাতে লাগ্‌লেন। অনেকে সকলের অনুরোধে ভিজে চ্যাপচ্যাপে হ'য়ে এলেন। চারজেলে দেয়াল-গিরিতে বাতী জলছে—মজলিস জক জক কচ্ছে—পান, কলাপাতার এঁটো নল ও থেলো হুঁকোর কুরুক্ষেত্তর! মুখুজ্যেদের ছোটবাবু লোকের খাতির কচ্চেন—'ওরে' 'ওরে' ক'রে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। তেলী, ঢাকাই, কামার ও চাষা-খোপা দোহারেরা এক পেট ফিনি মেটো, ঘণ্টো, ও আটা-নেবড়ান লুসে, ফরসা

ধুতিচাদরে ফিট হ'য়ে ব'সে আছেন—অনেকের চক্ষু বুজে এসেছে—বাতীর আলো জোনাকী পোকার মত দেখ্‌ছেন ও একবার ঝিমকিনি ভাঙ্‌লে মনে কচ্চেন, যেন উড়চি। ঘরটি লোকারণ্য—সকলেই খাতায় খাতায় ঘিরে বসে আচেন—থেকে থেকে ফুকুরি টপ্পাটা চলচে,—অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতো জোড়াটি হয় পকেটে, নয় নীচে রেখে চেপে বসেচেন—জুতো এমনি জিনিস যে দোহারদলের পরস্পরেও বিশ্বাস নাই।'

হুতোম পেঁচার নক্সা—কালীপ্রসন্ন সিংহ

[এটি চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত। শব্দগুলি যেন মুখ হইতে আনিয়া বসান হইয়াছে। চলিত ভাষার বাস্তবতা ও গতিশীলতা ইহাতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।]

২। 'তর্কসিদ্ধান্ত বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণীকে থামাইবার জন্য লাঠি ধরিয়া সুড় সুড় করিয়া উঠিতেছেন এমন সময়ে মানগোবিন্দ ধরে বসিল—ওগো তর্কসিদ্ধান্ত খুড়! আমরা সব সৌদাগরি করিতে যাব একটা ভাল দিন দেখে দেও। তর্কসিদ্ধান্ত মুখ বিকট সিকট করিয়া গুমরে উঠিলেন—কচুপোড়া খাও—উঠছি আর অমনি পিছু ডাকছ আর কি সময় পাওনি? সৌদাগরি করতে যাবে! তোর বাপের ভিটে নাশ হউক—তোদের আবার দিনক্ষণ কিরে? বালাই বেরুলে সকলে হাঁপ ছেড়ে গঙ্গাস্নান করবে—যা বল্‌গে যা যে দিন তোরা এখান থেকে যাবি সেই দিনই শুভ।'

আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র

[এই গদ্যাংশ চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত হইলেও ইহাতে সাধুভাষার কিছু কিছু ক্রিয়াপদও রহিয়াছে। সেজন্য এই ভাষারীতিকে মিশ্র ভাষারীতি বলা যায়।]

৩। 'কিছুদিন থেকে বারে বারে মনে হচ্ছে আমার দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে সন্দীপের এই প্রলয়রূপ ভয়ঙ্কর। আর এক বুদ্ধি বলছে এইতো মধুর! জাহাজ যখন ডোবে তখন চার দিকে যারা সাঁতার দেয় তাদের টেনে নেয়, সন্দীপ যেন সেই মরণের মূর্তি, ভয় করবার আগেই ওর প্রচণ্ড টান এসে ধরে—সমস্ত আলো, সমস্ত কল্যাণ থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে চিরদিনের সঞ্চয় থেকে, প্রতিদিনের ভাবনা থেকে, চোখের পলকে একটা নিবিড় সর্বনাশের মধ্যে একেবারে লোপ করে দিতে চায়। কোন্ মহামারীর দূত হ'য়ে ও এসেছে, অশিবমন্ত্র পড়তে পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর ছুটে আসছে সব বালকরা, সব যুবকরা।'

ঘরে বাইরে—রবীন্দ্রনাথ

[এই গদ্যাংশে চলিত ভাষার ব্যবহার হইয়াছে বটে। কিন্তু ক্রিয়াপদগুলি ছাড়া ইহাতে সাধুভাষার শব্দসম্পদই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাষায় চলিত ভাষার গতি ও সাধুভাষার ঐশ্বর্য একত্রে মিলিত হইয়াছে।]

৪। 'একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয় তাহলে সে জিনিসের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হলেও চলে, কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই। লেখকরা এই সত্যটি মনে রাখলে গল্প স্বল্প হয়ে আসবে। শোক শ্লোকরূপ ধারণ করবে, বিজ্ঞান বামনরূপ ধারণ করেও ত্রিলোক অধিকার করে থাকবে এবং দর্শন নখদর্পণে পরিণত হবে। যাঁরা মানসিক আরামের চর্চা না করে ব্যায়ামের চর্চা করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, যে সাহিত্যে দম নেই তাতে অন্তত কষ (grip) থাকা আবশ্যক।' —প্রমথ চৌধুরী

[বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ চলিত ভাষার দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হইল।]

অনুশীলনী

১। সাধুভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। বিভিন্ন ধরনের সাধুভাষার উদাহরণ দাও।

২। চলিত ভাষা কিভাবে উদ্ভূত হইয়াছে? ইহার জনপ্রিয়তার কারণ কি? বিভিন্ন ধরনের চলিত ভাষার উদাহরণ দাও।

৩। সাধু ও চলিত ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া উভয় ভাষার কোথায় কতখানি উপযোগিতা রহিয়াছে তাহা উল্লেখ কর।

ক্রিয়া

যে পদের দ্বারা কোন প্রকার করা, হওয়া, যাওয়া, থাকা, ঘটা ইত্যাদি বুঝায় তাহাকে **ক্রিয়া** বলে। ধাতুর উত্তর ধাতুবিভক্তি দ্বারা ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

রাম কাজ **করিতেছে**। তুমি বড় **হইবে**। আমি বাড়ি **গেলাম**। সে স্কুলে **থাকিবে**। সংসারে প্রতিদিন কত কি না **ঘটিতেছে**।

উপরের বাক্যগুলি স্থূলাক্ষরবিশিষ্ট পদগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি ক্রিয়াপদ।

ধাতু

ক্রিয়াপদের মূল অংশকে **ধাতু** বলে। ভূ, কৃ, দৃশ্ ইত্যাদি যেমন সংস্কৃত ধাতু, কর্, দেখ্, চল্ তেমনি বাংলা ধাতু। ধাতুর উত্তর যাহা যুক্ত হইলে ক্রিয়া পদ হয় তাহাকে বলা হয় **ক্রিয়াবিভক্তি**। ক্রিয়াবিভক্তি সাধু ও চলিত এই দুই রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ক্রিয়াটি কোন্ পুরুষের, কোন্ কালের, কোন্ বাচ্যের তাহা ক্রিয়াবিভক্তি দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর ধাতু

বাংলা ধাতুগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

১। মৌলিক ধাতু, ২। সাধিত ধাতু এবং ৩। সংযোগমূলক ধাতু।

১। মৌলিক ধাতু

যে ধাতুকে বিশ্লেষ করা যায় না তাহাকে মৌলিক ধাতু বলে। যথা, কর্, দেখ্, বল্, খা, চল্ ইত্যাদি।

২। সাধিত ধাতু

যে ধাতুকে বিশ্লেষ করিলে অন্য কোন ধাতু ও প্রত্যয় পাওয়া যায় তাহাকে সাধিত ধাতু বলে। সাধিত ধাতুগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীভুক্ত করা যায়। **(ক) প্রযোজক ধাতু (খ) ধ্বন্যাত্মক ধাতু** এবং **(গ) নাম ধাতু**।

(ক) প্রযোজক ধাতু

মৌলিক ধাতুতে আ যোগ করিয়া **প্রযোজক ধাতু** গঠিত হয়। যথা, পড়্—পড়া, কর্—করা, দেখ্—দেখা ইত্যাদি।

মৌলিক ধাতু স্বরান্ত হইলে য়া = ওয়া যুক্ত করিয়া প্রযোজক ধাতু গঠিত হয়। যথা, খা—খাওয়া, দে—দেওয়া, হ—হওয়া।

(খ) ধ্বন্যাত্মক ধাতু

অনুকার শব্দ ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে **ধ্বন্যাত্মক ধাতু** বলে। যথা, হাঁক ('সে জোর গলায় হাঁকল'), ধুঁক ('না খেয়ে কেবল ধুঁকছে), ফুঁস ('সাপ রাগে ফুঁসছে')।

দ্বিরুক্ত অনুকার শব্দে আ যোগ করিয়া ধ্বন্যাত্মক ধাতু গঠিত হয়। যথা, কন্‌কন্ + আ ('দাঁত কনকনাচ্ছে'), টন্‌টন্ + আ ('ব্যথাটা টনটনাচ্ছে'), চকচক + আ = চকচকা)।

(গ) নাম ধাতু

১। বিশেষ্য বা বিশেষণ পদে ক্রিয়ার বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত করিয়া ক্রিয়াপদের মত ব্যবহার করিলে তাহাকে **নাম ধাতু** বলে। যথা, প্রভাতিল, প্রকাশিল, দানিল, নীরবিল, উলঙ্গিয়া ইত্যাদি।

২। সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণপদের সঙ্গে আ যোগ করিয়া; যথা, ঘুম—ঘুমা (ঘুমাইতেছে), বিষ—বিষা (যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু), চমক—চমকা (বিদ্যুৎ চমকায়), কম—কমা ('খাওয়া কমাচ্ছ কেন?') চড়—চড়া ('ঠাস ঠাস করে চড়াচ্ছে')।

৩। আ-কারান্ত শব্দ প্রত্যয় বিনাই ধাতু রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা, জুতা (জুতাল), বুড়া (বুড়িয়ে যাচ্ছ), মোটা (খুব মুটিয়েছে)।

৪। কতকগুলি আ প্রত্যয়ান্ত ধাতু আছে যাহাদের মূল অজ্ঞাত; যথা, গজা (গাছটা গজিয়েছে), গুঁড়া, লেলা (কুকুর লেলিয়ে দিল), বিলা (অকাতরে টাকা বিলিয়েছে)।

৩। সংযোগমূলক ধাতু

কর্, হ, দে, যা, খা, পা প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে নানা বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করিয়া **সংযোগমূলক ধাতু** গঠিত হয়।

(ক) কর্ ধাতু যোগে—ইচ্ছা করা, ভ্রমণ করা, রক্ষা করা, প্রণাম করা, শ্রবণ করা, দর্শন করা ইত্যাদি।

(খ) হ্ ধাতু যোগে—রাজি হওয়া, উদিত হওয়া, ধাবিত হওয়া, সম্মত হওয়া ইত্যাদি।

(গ) দে ধাতু যোগে—শিক্ষা দেওয়া, অন্ন দেওয়া, লাফ দেওয়া, শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি।

(ঘ) যা ধাতু যোগে—মূর্ছা যাওয়া, অস্ত যাওয়া।

(ঙ) পা ধাতু যোগে—দুঃখ পাওয়া, লজ্জা পাওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, কূল পাওয়া ইত্যাদি।

(চ) খা ধাতু যোগে—চোট খাওয়া, ধাক্কা খাওয়া, বিষম খাওয়া, ঘোল খাওয়া ইত্যাদি।

অকর্মক-সকর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার কোন কর্ম নাই তাহাকে **অকর্মক ক্রিয়া** বলে। যথা, শিশু **হাসিতেছে**। আমি **দাঁড়াইব**। বালক বালিকারা বিদ্যালয়ে **যাইতেছে**। রমেশ ঘরে আসিয়া **বসিল**।

যে ক্রিয়ার কোন কর্ম থাকে তাহাকে বলে **সকর্মক ক্রিয়া**। যদি কোন ক্রিয়া সম্পর্কে **কি** বা **কাহাকে** এইরূপ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় তবেই তাহাকে সকর্মক ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। ছেলেটি খাইতেছে—এই বাক্যে খাইতেছে ক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাইতে পারে—কি খাইতেছে? উত্তর পাওয়া যাইবে ভাত কিংবা অন্য কিছু খাইতেছে। সুতরাং খাইতেছে ক্রিয়াটি সকর্মক। মা মারিতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে—কাহাকে মারিতেছেন। উত্তর হইতে পারে, সন্তানকে মারিতেছেন। সুতরাং বুঝা গেল, মারিতেছেন ক্রিয়াটি সকর্মক।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া

কয়েকটি ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে, তাহাদিগকে বলে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া**। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মটি **মুখ্য কর্ম** এবং ব্যক্তিবাচক ক্রিয়াটি হইল **গৌণ কর্ম**। কি এই প্রশ্নের উত্তর যে কর্মের দ্বারা পাওয়া যায়, তাহা হইল মুখ্য কর্ম এবং কাহাকে এই প্রশ্নের উত্তর যে কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় তাহা গৌণ কর্ম। অসিত লিখিতেছে। কি লিখিতেছে? না, চিঠি লিখিতেছে। সুতরাং চিঠি মুখ্য কর্ম। কাহাকে লিখিতেছে? না, বন্ধুকে লিখিতেছে। সুতরাং বন্ধু গৌণ কর্ম। দেওয়া, বলা ইত্যাদি দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মকত্ব ও অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মকত্ব

কোন কোন স্থানে সকর্মক ক্রিয়ার কোন কর্ম থাকে না, তখন সকর্মক ক্রিয়া অকর্মক ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা, আমরা চোখ দিয়া দেখি। কান দিয়া শুনি।

কোন কোন স্থানে আবার অকর্মক ক্রিয়া সকর্মক ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা, আমাকে লজ্জা করিবে কেন?

কোন কোন ক্রিয়া অকর্মক ও সকর্মক উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। যথা,

আমি কখনও ডরাই না। (অকর্মক)

আমি কাহাকেও ডরাই না। (সকর্মক)

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় তাহাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যথা, অসীম কাজ **করিতেছে**। রমেন কাল **আসিয়াছিল**। অমলা বাড়ি **আসিবে**।

যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় না তাহাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যথা, তুমি ভাত **খাইয়া** স্কুলে যাইবে। কাহারও কাছে কিছু **চাহিতে** আমার লজ্জা হয়। কাহাকেও কিছু দান **করিলে** তাহা নিষ্ফল হয় না।

উপরের বাক্যগুলির খাইয়া, চাহিতে, করিলে ক্রিয়াগুলি দ্বারা বাক্যগুলির অর্থ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইতেছে না, সেজন্য ঐগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া।

মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া

একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য একটি সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হইয়া যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। যৌগিক ক্রিয়ায় প্রথম ক্রিয়া, অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থই মুখ্য থাকে। এই প্রথম ক্রিয়াটিকে বলা হয় **মুখ্য** অথবা **মৌলিক ক্রিয়া** এবং দ্বিতীয় গৌণ ক্রিয়াটিকে বলা হয় **সহকারী** অথবা **যৌগিক ক্রিয়া**। সে মাটিতে **বসিয়া পড়িল**। এই বাক্যে 'বসিয়া পড়িল' যৌগিক ক্রিয়া। 'বসিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থই বাক্যের মধ্যে প্রধান। 'পড়িল' সহকারী ক্রিয়া। যৌগিক ক্রিয়ায় সহকারী ক্রিয়াতেই প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হয়, মুখ্য ক্রিয়াটি অপরিবর্তিত থাকে। উপরি-উক্ত বাক্যটির যৌগিক ক্রিয়া বিভিন্ন কালে এভাবে ব্যবহৃত হইবে—সে মাটিতে বসিয়া পড়িতেছে। সে মাটিতে বসিয়া পড়িবে ইত্যাদি। এই বাক্যগুলিতে 'বসিয়া' এই মুখ্য ক্রিয়াটি অপরিবর্তিত। পড়্ এই ধাতুটির সঙ্গেই নানা বিভক্তি-প্রত্যয় যুক্ত হইতেছে।

যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ :

(ক) ইয়া প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার যোগে : করিয়া যাও, খাইয়া ফেল, ভাসাইয়া দিল, শুনিয়া যাও, গড়িয়া তুলিব ইত্যাদি।

(খ) ইতে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকার যোগে : করিতে থাকিব, যাইতে লাগিল, শুনিতে পাই।

ক্রিয়ার ভাব

ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার (Mood) নানা ভাবে ব্যক্ত হইতে পারে।

সে কাজ করে।

সে কাজ করুক।

যদি সে কাজ করে তবে আমিও কাজ করিব।

সে কাজ করিলে আমিও কাজ করিতাম।

এই বাক্যগুলিতে কাজ করা ক্রিয়াটি নানাভাবে ব্যক্ত হইতেছে। প্রথম বাক্যে ক্রিয়াটি শুধু মাত্র উল্লিখিত হইল। দ্বিতীয় বাক্যে ইচ্ছা বা অনুমোদনের ভাবটি ব্যক্ত হইতেছে। তৃতীয় বাক্যে একটি অনিশ্চয়তার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। চতুর্থ বাক্যে ক্রিয়ার সম্ভাব্যতা সূচিত হইতেছে।

ক্রিয়ার ভাব তিন প্রকার :

ক। **নির্দেশক ভাব** (Indicative Mood)

যথা, সুশীলা দেখিতেছে।

খ। **অনুজ্ঞা** বা **নিয়োজক ভাব** (Imperative Mood)

যথা, সুশীলা দেখুক।

গ। **ঘটনান্তরাপেক্ষিত** বা **সংযোজক ভাব** (Subjunctive Mood)

যথা, যদি সুশীলা দেখে, তবে
আমিও দেখিব।

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়া ঘটার সময়কে **কাল** বলে। কাল তিনপ্রকার—**বর্তমান, অতীত** ও **ভবিষ্যৎ**।

যে ক্রিয়া ঘটে বা ঘটিতেছে তাহার কালকে **বর্তমান কাল** বলে। যথা, আমি যাই। সে পড়িতেছে।

যে ক্রিয়া পূর্বে ঘটিতেছিল, ঘটিত কিংবা ঘটিয়াছিল তাহার কালকে **অতীত**

কাল বলে। যথা, আমি গেলাম। সে পড়িতেছিল। যাদব কাজ করিত। কমলা দেখিয়াছিল।

যে ক্রিয়া পরে ঘটিবে বা ঘটিতে থাকিবে তাহার কালকে **ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যথা, আমি যাইব। সে পড়িতে থাকিবে।

মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল

মূল ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে সব কালরূপ গঠিত হয় তাহাদিগকে বলা হয় **মৌলিক কালরূপ** বা **সরল কালরূপ**। ক্রিয়ার মূল ধাতুতে কাল বাচক প্রত্যয় ও পুরুষ বাচক বিভক্তি যোগ করিয়া বিভিন্ন কালরূপ গঠিত হয়। বর্তমান কালরূপের সঙ্গে কোন কাল বাচক প্রত্যয় যুক্ত হয় না, শুধুমাত্র পুরুষ বাচক বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা, আমি চলি, তুমি চল, সে চলে ইত্যাদি। অন্যান্য মৌলিক কালের সঙ্গে কালবাচক প্রত্যয় ও পুরুষবাচক বিভক্তি উভয়ই ব্যবহৃত হয়। যথা,

(ক) **সাধারণ অতীত কাল :** আমি চলিলাম, তুমি চলিলে, সে চলিল, ইত্যাদি। (ওখানে অতীত কালের ইল প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে)।

(খ) **নিত্যবৃত্ত অতীতকাল**—আমি চলিতাম, তুমি চলিতে, সে চলিত (এখানে অতীত কালের ইত প্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে)।

(গ) **সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল**—আমি চলিব, তুমি চলিবে, সে চলিবে (এখানে ভবিষ্যৎ কালবাচক ইব প্রত্যয়ের সঙ্গে বিভিন্ন পুরুষের বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে)।

মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয় যুক্ত করিয়া আছ ধাতুর যোগে যে সব কালরূপ গঠিত হয় তাহাদিগকে **যৌগিক কালরূপ** বলা হয়। যথা, চলিতেছে, চলিয়াছে, চলিতেছিল, চলিয়াছিল ইত্যাদি।

যৌগিক কালরূপ বাংলায় দশটি, যথা,

১। ঘটমান বর্তমান, ২। পুরাঘটিত বর্তমান, ৩। নিত্যবৃত্ত বর্তমান, ৪। নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান, ৫। ঘটমান অতীত, ৬। পুরাঘটিত অতীত, ৭। পুরাঘটিত সম্ভাব্য অতীত, ৮। ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত, ৯। পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত, ১০। ঘটমান ভবিষ্যৎ।

বিভিন্ন কালরূপের প্রয়োগ

১। বর্তমান কাল :

(ক) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান :

যে ক্রিয়া সাধারণত নিয়মিত বা সব সময়ে ঘটে তাহার কালকে **সাধারণ বা নিত্য বর্তমান** বলে। যথা, আমি কাজ করি। সে স্কুলে যায়। বৃষ্টি পড়ে। শিশু হাসে।

(খ) ঘটমান বর্তমান :

যে ক্রিয়া চলিতেছে, এখনও যাহার শেষ হয় নাই তাহার কালকে **ঘটমান বর্তমান** বলে। যথা, শিক্ষক মহাশয় পড়াইতেছেন। ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। তাহারা বাড়ি ফিরিতেছে। আমরা মাঠে খেলছি।

(গ) পুরাঘটিত বর্তমান :

যে ক্রিয়া কিছুকাল পূর্বে ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার ফল বা প্রভাব এখনও বর্তমান তাহার কালকে **পুরাঘটিত বর্তমান** বলে। যথা, মনীষা কাজটি করিয়াছে। স্কুল বন্ধ হয়েছে। তুমি কি কখনও পুরী গিয়েছ? আমরা খেলায় জিতিয়াছি।

(ঘ) বর্তমান অনুজ্ঞা :

আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ ও প্রার্থনা বুঝাইতে সমাপিকা ক্রিয়ার যে রূপ হয় তাহাকেই বলে **অনুজ্ঞা**। বর্তমান কাল বুঝাইলে বর্তমান অনুজ্ঞা হয়। যথা, বাজার থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এসো। আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন। অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

২। অতীত কাল :

(ক) সাধারণ নিত্য অতীত :

যে ক্রিয়া সাধারণভাবে অনির্দিষ্ট অতীত কালে ঘটিয়াছে তাহার কালকে **সাধারণ** বা **নিত্য অতীত** বলে। যথা, যতীন সেখানে গেল। আমি ভাবিয়া কোন কূলকিনারা পাইলাম না। প্রধান অতিথি মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করিলেন। চোর যথাসর্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেল।

(খ) নিত্যবৃত্ত অতীত :

অতীতে কোন ক্রিয়া নিয়মিতভাবে ঘটিত এই ভাব বুঝাইবার জন্য **নিত্যবৃত্ত অতীতের** ব্যবহার হয়। যথা, তিনি রোজ গঙ্গাস্নানে যাইতেন। অবনী শিক্ষক

মহাশয়ের কাছে পড়িতে যাইত। দার্জিলিঙে খুব বেড়াতেন। ছাত্রটি পড়া মুখস্থ করত।

(গ) ঘটমান অতীত :

অতীতে যে ক্রিয়া ঘটিতেছিল তাহার কাল **ঘটমান অতীত**। যথা, আমরা খেলা দেখিতেছিলাম। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বক্তৃতা করিতেছিলেন। সে খেলছিল। নবীন বেড়াচ্ছিল।

(ঘ) পুরাঘটিত অতীত :

যে ক্রিয়া অন্য কোন ক্রিয়ার পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহার কালকে **পুরাঘটিত অতীত** বলে। যথা, আমার খাওয়া শেষ হবার আগেই সে এসেছিল। তোমরা গিয়া সেখানে কি দেখিয়াছিলে? রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্বেই বিশ্বখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এখানে আসবার আগে বাড়ি গিয়েছিলেন।

(ঙ) ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত :

পিতৃশোকে তাহাব গণ্ডদেশ অশ্রুতে প্লাবিত হইতে থাকত। সে অনবরত আমাকে বিরক্ত করতে থাকত। কুকুরটি রাগে ঘেউ ঘেউ করতে থাকত।

(চ) পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত :

কবি আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। ভিক্ষুকটি ঘরের সম্মুখে বসিয়া থাকিত। চিঠিব আশায় সে রোজ পথে দাঁড়িয়ে থাকত।

৩। ভবিষ্যৎ কাল :

(ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ :

যে ক্রিয়া সাধারণভাবে ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহার কালকে **সাধারণ ভবিষ্যৎ** বলে। যথা, মহেশ মেলায যাইবে। আজ রাতে আমি ভাত খাব না। কাশ্মীরে অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাবে।

(খ) ঘটমান ভবিষ্যৎ :

যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটিতে থাকিবে তাহার কালকে **ঘটমান ভবিষ্যৎ** বলে। যথা, অনেকদিন ধরিয়া এই ছবি চলিতে থাকিবে। তিনি চিরকাল তোমার উপকার করতে থাকবেন। স্বর্গের দেবতারা ত্যাগী মানুষকে আশীর্বাদ জানাতে থাকেন।

(গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ :

অতীতকালে ঘটিত ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কালের রূপ। যথা, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে মনে করিয়া থাকিবে। আমি তাকে কোথাও দেখে থাকব। আপনি হয়তো কথাটি শুনে থাকবেন।

(ঘ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা :

ভবিষ্যৎ কালে অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইলে ক্রিয়ার কালকে **ভবিষ্যৎ** বলা হয়। যথা, সত্য কথা বলিবে। কাল ঠিক সময় আসবে। অনুগ্রহ ক'রে আমার জন্য এ কাজটি করবেন।

ক্রিয়া-বিভক্তি

কালবাচক প্রত্যয় এবং পুরুষবাচক বিভক্তি একসঙ্গে **ক্রিয়া বিভক্তি রূপে** কথিত হয়। কালবাচক প্রত্যয় বলিতে ইল, ইব, ইত ইত্যাদি বুঝায়; যথা, করিল, করিব, করিত। আবার আছ্ ধাতুর সঙ্গে ইতে ও ইয়া অসমাপিকা ক্রিয়া যোগ করিয়া নানা যৌগিক কালরূপ গঠন করা হয়। যথা, করিতেছে, করিয়াছে, করিতেছিল, করিয়াছিল ইত্যাদি। মূল ধাতুর সঙ্গে ইয়া ও ইতে যোগ করিয়া থাক্ ধাতু যোগেও যৌগিক কালরূপ গঠন করা হয়। যথা, করিতে থাকিব, করিয়া থাকিব।

উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তিরূপ ব্যবহৃত হয়। যথা, আমি করিতেছি। তুমি করিতেছ। সে করিতেছে। আমি করিতাম। তুমি করিতে। সে করিত।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, বাংলায় এক বচন ও বহুবচনের ক্রিয়ারূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যথা, আমি করি, আমরা করি। তুমি করিবে, তোমরা করিবে।

বাংলায় সাধুভাষা ও চলিত ভাষার ক্রিয়াবিভক্তির মধ্যে রূপগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যথা, আমি করিলাম, আমি করলুম, করলেম অথবা করলাম। সে করিল, সে করল অথবা করলে। তাহারা দিতেছে, তারা দিচ্ছে।

পর পৃষ্ঠায় কয়েকটি ক্রিয়ার বিভিন্ন কালের সাধু ও চলিত রূপ দেওয়া হইল।

হ ধাতু—সাধুরূপ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ—গুরু	মধ্যম পুরুষ—সামান্য	মধ্যম পুরুষ—তুচ্ছ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ বর্তমান	হই	হউন	হও	হইস	হয়
ঘটমান ,,	হইতেছি	হইতেছেন	হইতেছ	হইতেছিস্	হইতেছে
পুরাঘটিত ,,	হইয়াছি	হইয়াছেন	হইযাছে	হইয়াছিস	হইযাছে
বর্তমান অনুজ্ঞা	হই	হউন	হও	হইস	হউক
সাধারণ অতীত	হইলাম	হইলেন	হইলে	হইলি	হইল
ঘটমান ,,	হইতেছিলাম	হইতেছিলেন	হইতেছিলে	হইতে ছি লি	হইতে ছিল
পুরাঘটিত ,,	হইযা ছিলাম	হইয়া ছিলেন	হইযা ছিলে	হইয়াছিলি	হইয়াছিল
নিত বৃত্ত ,,	হই তাম	হইতেন	হইতে	হইতিস	হইত
ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত	হইতে থাকিতাম	হইতে থাকিতেন	হইতে থাকিতে	হইতে থাকিতিস	হইতে থাকিত
পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত	হইয়া থাকিতাম	হইয়া থাকিতেন	হইয়া থা কতে	হইয়া থাকিতিস	হইয়া থাকিত
সাধারণ ভবিষ্যৎ	হইব	হইবেন	হইবে	হইবি	হইবে
ঘটমান ,,	হইতে থাকিব	হইতে থাকিবেন	হইতে থাকিবে	হইতে থাকি বি	হইতে থাকিবে
পুরাঘটিত ,,	হইয়া থা কব	হইয়া থাকিবেন	হইযা থাকিবে	হইয়া থাকিবি	হইয়া থাকিবে
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	হইব	হইবেন	হইবে	হই বি	হইবে

হ্ ধাতু—চলিত রূপ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ—গুরু	মধ্যম পুরুষ—সামান্য	মধ্যম পুরুষ—তুচ্ছ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ বর্তমান	হই	হ'ন (হোন)	হও	হ'স (হোস)	হয়
ঘটমান ,,	হচ্ছি	হচ্ছেন	হচ্ছ	হচ্ছিস	হচ্ছে
পুরাঘটিত ,,	হয়েছি	হয়েছেন	হয়েছ	হয়েছিস	হয়েছে
বর্তমান অনুজ্ঞা	হই	হ'ন (হোন)	হও	হ'স (হোস)	হ'ক (হোক)
সাধারণ অতীত	হ'লাম, হলেম, হলুম	হ'লেন	হ'লে	হ'লি	হ'ল
ঘটমান ,,	হচ্ছিলাম	হচ্ছিলেন	হচ্ছিলে	হচ্ছিলি	হচ্ছিল
পুরাঘটিত ,,	হয়েছিলাম	হয়েছিলেন	হয়েছিলে	হয়েছিলি	হয়েছিল
নিত বৃত্ত ,,	হ'তাম, হতেম, হতুম	হ'তেন	হ'তে	হ'তিস	হ'ত
ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত	হ'তে থাকতাম	হ'তে থাকতে	হ'তে থাকতে	হ'তে থাকতিস	হ'তে থাকত
পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত	হ'য়ে থাকতাম	হ'য়ে থাকতে	হ'য়ে থাকতে	হ'য়ে থাকতিস	হ'য়ে থাকত
সাধারণ ভবিষ্যৎ	হ'ব	হ'বেন	হ'বে	হ'বি	হ'বে
ঘটমান ,,	হ'তে থাকব	হ'তে থাকবেন	হ'তে থাকবে	হ'তে থাকবি	হ'তে থাকবে
পুরাঘটিত ,,	হ'য়ে থাকব	হ'য়ে থাকবেন	হ'য়ে থাকবে	হ'য়ে থাকবি	হ'য়ে থাকবে
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	হ'ব	হবেন	হ'বে	হ'বি	হ'বে

যা ধাতু—সাধুরূপ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ—গুরু	মধ্যম পুরুষ—সামান্য	মধ্যম পুরুষ—তুচ্ছ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ বর্তমান	যাই	যান	যাও	যা	যায়
ঘটমান ,,	যাইতেছি	যাইতেছেন	যাইতেছ	যাইতেছিস্	যাইতেছে
পুরাঘটিত ,,	গিয়াছি	গিয়াছেন	গিয়াছ	গিয়াছিস	গিয়াছে
বর্তমান অনুজ্ঞা	যাই	যান	যাও	যা	যাক
সাধারণ অতীত	গেলাম	গেলেন	গেলে	গেলি	গেল
ঘটমান ,,	যাইতেছিলাম	যাইতেছিলেন	যাইতেছিলে	যাইতেছিলি	যাইতেছিল
পুরাঘটিত ,,	গিয়াছিলাম	গিয়াছিলেন	গিয়াছিলে	গিয়াছিলি	গিয়াছিল
নিত্যবৃত্ত ,,	যাইতাম	যাইতেন	যাইতে	যাইতিস	যাইত
ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত	যাইতে থাকিতাম	যাইতে থাকিতেন	যাইতে থাকিতে	যাইতে থাকিতিস	যাইতে থাকিত
পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত	গিয়া থাকিতাম	গিয়া থাকিতেন	গিয়া থাকিতে	গিয়া থাকিতিস	গিয়া থাকিত
সাধারণ ভবিষ্যৎ	যাইব	যাইবেন	যাইবে	যাইবি	যাইবে
ঘটমান ,,	যাইতে থাকিব	যাইতে থাকিবেন	যাইতে থাকিবে	যাইতে থাকিবি	যাইতে থাকিবে
পুরাঘটিত ,,	যাইয়া থাকিব	যাইয়া থাকিবেন	যাইয়া থাকিবে	যাইয়া থাকিবি	যাইয়া থাকিবে
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	যাইব	যাইবেন	যাইবে	যাইবি	যাইবে

যা ধাতু—চলিত রূপ

	উত্তমপুরুষ	মধ্যম পুরুষ—গুরু	মধ্যম পুরুষ—সামান্য	মধ্যম পুরুষ—তুচ্ছ	প্রথম পুরুষ
সাধারণ বর্তমান	যাই	যান	যাও	যা	যায়
ঘটমান ,,	যাচ্ছি	যাচ্ছেন	যাচ্ছ	যাচ্ছিস	যাচ্ছে
পুরাঘটিত ,,	গিয়েছি, গেছি	গিয়েছেন, গেছেন	গিয়েছ, গেছ	গিয়েছিস, গেছিস	গিয়েছে, গেছে
বর্তমান অনুজ্ঞা	যাই	যান	যাও	যা	যাক
সাধারণ অতীত	গেলাম, গেলেম, গেলুম	গেলেন	গেলে	গেলি	গেল
ঘটমান ,,	যাচ্ছিলাম, যাচ্ছিলুম	যাচ্ছিলেন	যাচ্ছিলে	যাচ্ছিলি	যাচ্ছিল
পুরাঘটিত ,,	গিয়েছিলাম, গিয়েছিলুম	গিয়েছিলেন	গিয়েছিলে	গিয়েছিলি	গিয়েছিল
নিত্যবৃত্ত ,,	যেতাম, যেতুম	যেতেন	যেতে	যেতিস	যেত
ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত	যেতে থাকতাম	যেতে থাকতেন	যেতে থাকতে	যেতে থাকতিস	যেতে থাকত
পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত	গিয়ে থাকতাম	গিয়ে থাকতেন	গিয়ে থাকতে	গিয়ে থাকতিস	গিয়ে থাকত
সাধারণ ভবিষ্যৎ	যাব	যাবেন	যাবে	যাবি	যাবে
ঘটমান ,,	যেতে থাকব	যেতে থাকবেন	যেতে থাকবে	যেতে থাকবি	যেতে থাকবে
পুরাঘটিত ,,	গিয়ে থাকব	গিয়ে থাকবেন	গিয়ে থাকবে	গিয়ে থাকবি	গিয়ে থাকবে
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	যাব	যাবেন	যাবেন	যাবি	যাবে

শু-ধাতু—সাধু ও চলিত রূপ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ—গুরু	মধ্যম পুরুষ—সামান্য	মধ্যম পুরুষ—তুচ্ছ	প্রথম পুরুষ
	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত
সাধারণ বর্তমান	শুই/শুই	শোন্/শোন্	শোও/শোও	শো/শো	শোয়
ঘটমান ,,	শুইতেছি/শুচ্ছি	শুইতেছেন/শুচ্ছেন	শুইতেছ/শুচ্ছ	শুইতেছিস/শুচ্ছিস্	শুইতেছে/শুচ্ছে
পুরাঘটিত ,,	শুইয়াছি/শুয়েছি	শুইয়াছেন/শুয়েছেন	শুইয়াছ/শুয়েছ	শুইয়াছিস/শুয়েছিস্	শুইয়াছে/শুয়েছে
বর্তমান অনুজ্ঞা	শুই	শোন্/শোন্	শোও/শোও	শো/শো	শুক/শুক
সাধারণ অতীত	শুইলাম/শুলাম	শুইলেন/শুলেন	শুইলে/শুলে	শুইলি/শুলি	শুইল/শুল
ঘটমান ,,	শুইতেছিলাম/ শুচ্ছিলাম	শুইতেছিলেন/ শুচ্ছিলেন	শুইতেছিলে/শুচ্ছিলে	শুইতেছিলি/শুচ্ছিলি	শুইতেছিল/শুচ্ছিল
পুরাঘটিত ,,	শুইয়াছিলাম/ শুয়েছিলাম	শুইয়াছিলেন/ শুয়েছিলেন	শুইয়াছিলে/শুয়েছিলে	শুইয়াছিলি/শুয়েছিলি	শুইয়াছিল/শুয়েছিল
নিত্যবৃত্ত ,,	শুইতাম/শুতাম	শুইতেন/শুতেন	শুইতে/শুতে	শুইতিস/শুতিস	শুইত/শুত
ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত	শুইতে থাকিতাম/ শুতে থাকতাম	শুইতে থাকিতেন/ শুতে থাকতেন	শুইতে থাকিতে/শুতে থাকতে	শুইতে থাকিতিস/ শুতে থাকতিস	শুইতে থাকিত/ শুতে থাকত
পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত	শুইয়া থাকিতাম শুয়ে থাকতাম	শুইয়া থাকিতেন/ শুয়ে থাকতেন	শুইয়া থাকিতে/ শুয়ে থাকতে	শুইয়া থাকিতিস/ শুয়ে থাকিস	শুইয়া থাকিত/ শুয়ে থাকত
সাধারণ ভবিষ্যৎ	শুইব/শোব	শুইবেন/শোবেন	শুইবে/শোবে	শুইবি/শুবি	শুইবে/শোবে
ঘটমান ,,	শুইতে থাকিব/ শুতে থাকব	শুইতে থাকিবেন/ শুতে থাকবেন	শুইতে থাকিবে/ শুতে থাকবে	শুইতে থাকিবি/ শুতে থাকবি	শুইতে থাকিবে/ শুতে থাকবে
পুরাঘটিত ,,	শুইয়া থাকিব/ শুয়ে থাকব	শুইয়া থাকিবেন/ শুয়ে থাকবেন	শুইয়া থাকিবে/ শুয়ে থাকবে	শুইয়া থাকিবি/ শুয়ে থাকবি	শুইয়া থাকিবে/ শুয়ে থাকবে
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	শুইব/শোব	শুইবেন/শোবেন	শুইবে/শোবে	শুইবি/শুবি	শুইবে/শোবে

আস্‌-ধাতু—সাধু ও চলিত রূপ

	উত্তম পুরুষ সাধু / চলিত	মধ্যম পুরুষ—গুরু সাধু / চলিত	মধ্যম পুরুষ—সামান্য সাধু / চলিত	মধ্যম পুরুষ—তুচ্ছ সাধু / চলিত	প্রথম পুরুষ সাধু / চলিত
াধারণ বর্তমান	আসি/আসি	আসেন/আসেন	আস/আস	আসিস/আসিস	আসে/আসে
টমান ,,	আসিতেছি/আসছি	আসিতেছেন/আসছেন	আসিতেছ/আসছ	আসিতেছিস/আসছিস	আসিতেছে/আসছে
ুরাঘটিত ,,	আসিয়াছি/এসেছি	আসিয়াছেন/এসেছেন	আসিয়াছ/এসেছ	আসিয়াছিস/এসেছিস	আসিয়াছে/এসেছে
র্তমান অনুজ্ঞা	আসি/আসি	আসুন/আসুন	আইস/এসো	আয়/আয়	আসুক/আসুক
াধারণ অতীত	আসিলাম আসলাম, এলাম, এলেম, এলুম	আসিলেন/আসলেন, এলেন	আসিলে/আসলে, এলে	আসিলি/আসলি, এলি	আসিল/আসল, এল
ঘটমান ,,	আসিতেছিলাম/আসছিলাম, আসছিলুম	আসিতেছিলেন/আসছিলেন	আসিতেছিলে/আসছিলে	আসিতেছিলি/আসছিলি	আসিতেছিল/আসছিল
পুরাঘটিত ,,	আসিয়াছিলাম/এসেছিলাম, এসেছিলুম	আসিয়াছিলেন/এসেছিলেন	আসিয়াছিলে/এসেছিলে	আসিয়াছিলি/এসেছিলি	আসিয়াছিল/এসেছিল
নিত্যবৃত্ত ,,	আসিতাম, আসতাম	আসিতেন/আসতেন	আসিতে/আসতে	আসিতিস/আসতিস	আসিত/আসত
ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত	আসিতে থাকিতাম/আসতে থাকতাম	আসিতে থাকিতেন/আসতে থাকতেন	আসিতে থাকিতে/আসতে থাকতে	আসিতে থাকিতিস/আসতে থাকতিস	আসিতে থাকিত/আসতে থাকত
পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত	আসিয়া থাকিতাম/এসে থাকতাম	আসিয়া থাকিতেন/এসে থাকতেন	আসিয়া থাকিতে/এসে থাকতে	আসিয়া থাকিতিস/এসে থাকতিস	আসিয়া থাকিত/এসে থাক
সাধারণ ভবিষ্যৎ	আসিব/আসব	আসিবেন/আসবেন	আসিবে/আসবে	আসিবি/আসবি	আসিবে/আসবে
ঘটমান ,,	আসিতে থাকিত/আসতে থাকত	আসিতে থাকিবেন/আসতে থাকবেন	আসিতে থাকিবে/আসতে থাকবে	আসিতে থাকিবি/আসতে থাকবি	আসিতে থাকিবে/আসতে থাক
পুরাঘটিত ,,	আসিয়া থাকিব/এসে থাকব	আসিয়া থাকিবেন/এসে থাকবেন	আসিয়া থাকিবে/এসে থাকবে	আসিয়া থাকিবি/এসে থাকবি	আসিয়া থাকিবে/এসে থাক
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	আসিব/আসব	আসিবেন/আসবেন	আসিবে/আসবে	আসিবি/আসবি	আসিবে/আসবে

কহ্-ধাতু—সাধু ও চলিত রূপ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ—গুরু	মধ্যম পুরুষ—সামান্য	মধ্যম পুরুষ—তুচ্ছ	প্রথম পুরুষ
	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত
সাধারণ বর্তমান	কহি/কই	কহেন/ক'ন	কহ/কও	কহিস/কোস্	কহে/কয়
ঘটমান ,,	কহিতেছি/কইছি	কহিতেছেন/কইছেন	কহিতেছ/কইছ	কহিতেছিস্/কইছিস্	কহিতেছে/কইছে
পুরাঘটিত ,,	কহিয়াছি/কয়েছি	কহিয়াছেন/কয়েছেন	কহিয়াছ/কয়েছ	কহিয়াছিস্/কয়েছিস্	কহিয়াছে/কয়েছে
বর্তমান অনুজ্ঞা	কহি/কই	কহুন/ক'ন	কহ/কও	কহ্/ক	কহুক/ক'ক (কোক)
সাধারণ অতীত	কহিলাম/কইলাম	কহিলেন/কইলেন	কহিলে/কইলে	কহিলি/ক'লি	কহিল/কইল
ঘটমান ,,	কহিতেছিলাম/ কইছিলাম	কহিতেছিলেন/ কইছিলেন	কহিতেছিলে/কইছিলে	কহিতেছিলি/ কইছিলি	কহিতেছিল/কইছিল
পুরাঘটিত ,,	কহিয়াছিলাম/ কইছিলাম	কহিয়াছিলেন/ কয়েছিলেন	কহিয়াছিলে/কয়েছিলে	কহিয়াছিলি/ কয়েছিলি	কহিয়াছিল/কয়েছিল
নিত্যবৃত্ত ,,	কহিতাম/কইতাম	কহিতেন/কইতেন	কহিতে/কইতে	কহিতিস্/কইতিস্	কহিত/কইত
ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত	কহিতে থাকিতাম/ কইতে থাকতাম	কহিতে থাকিতেন/ কইতে থাকতেন	কহিতে থাকিতে/ কইতে থাকতে	কহিতে থাকিতিস্/ কইতে থাকতিস	কহিতে থাকিত/ কইতে থাকত
পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত	কহিয়া থাকিতাম/ ক'য়ে থাকতাম	কহিয়া থাকিতেন/ ক'য়ে থাকতেন	কহিয়া থাকিতে/ ক'য়ে থাকতে	কহিয়া থাকিতিস্/ ক'য়ে থাকতিস	কহিয়া থাকিত/ ক'য়ে থাকত
সাধারণ ভবিষ্যৎ	কহিব/কইব	কহিবেন/কইবেন	কহিবে/কইবে	কহিবি/কইবি	কহিবে/কইবে
ঘটমান ,,	কহিতে থাকিব/ কইতে থাকব	কহিতে থাকিবেন/ কইতে থাকবেন	কহিতে থাকবে/ কইতে থাকবে	কহিতে থাকিবি/ কইতে থাকবি	কহিতে থাকবে/ কইতে থাকবে
পুরাঘটিত ,,	কহিয়া থাকিব/ ক'য়ে থাকব	কহিয়া থাকিবেন/ ক'য়ে থাকবেন	কহিয়া থাকিবে/ ক'য়ে থাকবে	কহিয়া থাকিবি/ ক'য়ে থাকবি	কহিয়া থাকিবে/ ক'য়ে থাকবে
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	কহিব/কইব	কহিবেন/কইবেন	কহিবে/কইবে	কহিবি/কইবি	কহিবে/কইবে

দি-ধাতু—সাধু ও চলিত রূপ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ—গুরু	মধ্যম পুরুষ—সামান্য	মধ্যম পুরুষ—তুচ্ছ	প্রথম পুরুষ
	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত	সাধু / চলিত
সাধারণ বর্তমান	দিই/দিই	দেন/দেন	দাও/দাও	দে/দে	দেয়/
ঘটমান ,,	দিতেছি/দিচ্ছি	দিতেছেন/দিচ্ছেন	দিতেছ/দিচ্ছ	দিতেছিস/দিচ্ছিস	দিতেছে/দিচ্ছে
পুরাঘটিত ,,	দিয়াছি/দিয়েছি, দিইছি	দিয়াছেন/দিয়েছেন	দিয়াছ/দিয়েছ	দিয়াছিস/দিয়েছিস	দিয়াছে/দিয়েছে
বর্তমান অনুজ্ঞা	দিই/দিই	দিন/দিন	দাও, দেও	দে, দিস	দিক/দিক
সাধারণ অতীত	দিলাম, দিলেম, দিলুম	দিলেন	দিলে	দিলি	দিল, দিলে
ঘটমান ,,	দিতেছিলাম/দিচ্ছিলাম	দিতেছিলেন/দিচ্ছিলেন	দিতেছিলে/দিচ্ছিলে	দিতেছিলি/দিচ্ছিলি	দিতেছিল/দিচ্ছিল
পুরাঘটিত ,,	দিয়াছিলাম/ দিয়েছিলাম	দিয়াছিলেন/ দিয়েছিলেন	দিয়াছিলে/দিয়েছিলে	দিয়াছিলি/দিয়েছিলি	দিয়াছিল/দিয়েছিল
নিত্যবৃত্ত ,,	দিতাম	দিতেন	দিতে	দিতিস	দিত
ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত	দিতে থাকিতাম দিতে থাকতাম	দিতে থাকিতেন/ দিতে থাকতেন	দিতে থাকিতে/ দিতে থাকতে	দিতে থাকিতিস/ দিতে থাকতিস	দিতে থাকিত/দিতে থাকত
পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত	দিয়া থাকিতাম/ দিয়ে থাকতাম	দিয়া থাকিতেন/ দিয়ে থাকতেন	দিয়া থাকিতে দিয়ে থাকতে	দিয়া থাকিতিস/ দিয়ে থাকতিস	দিয়া থাকিত/ দিয়ে থাকত
সাধারণ ভবিষ্যৎ	দিব/দেব	দিবেন/দেবেন	দিবে/দেবে	দিবি/দিবি	দিবে/দেবে
ঘটমান ,,	দিতে থাকিব/ দিতে থাকব	দিতে থাকিবেন/ দিতে থাকবেন	দিতে থাকিবে/ দিতে থাকবে	দিতে থাকিবি দিতে থাকবি	দিতে থাকিবে/ দিতে থাকবে
পুরাঘটিত ,,	দিয়া থাকিব/ দিয়ে থাকব	দিয়া থাকিবেন/ দিয়ে থাকবেন	দিয়া থাকিবে/ দিয়ে থাকবে	দিয়া থাকিবি/ দিয়ে থাকবি	দিয়া থাকিবে/ দিয়ে থাকবে
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	দেব	দিবেন/দেবেন	দিবে/দেবে	দিবি	দিবে/দেবে

অনুশীলনী

১। ক্রিয়ার প্রত্যয় ও বিভক্তি লইয়া আলোচনা কর। বিভিন্ন শ্রেণীর ধাতুর পরিচয় দাও।

২। উদাহরণসহ অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়ার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও—অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মক রূপে ব্যবহার ও সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপে ব্যবহার।

৩। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির কোন্‌টি সকর্মক এবং কোন্‌টি অকর্মক তাহা নির্দেশ কর :

চল্, গাহ্, শু, হাস্, কর্, হ, মর্, মার্, বল্, পড়্, নাচ্, লিখ্, আস্।

৪। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। কর্, খা, যা, চাহ্, শুন্—এই ধাতুগুলিকে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া রূপে বাক্যে প্রয়োগ কর।

৫। যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কালের পার্থক্য বিশদরূপে উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৬। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে কোথায় ক্রিয়ার কি ভাব (Mood) প্রকাশ পাইয়াছে তাহা উল্লেখ কর :

(ক) যদি তুমি এ-কাজ কর তবে তোমাকে পুরস্কার দেব।

(খ) সূর্য অস্ত যাইতেছে।

(গ) তুমি আমার জন্য একটু চেষ্টা করিও।

(ঘ) সে এলে আমিও যাব।

(ঙ) মন দিয়া লেখা পড়া করিবে।

(চ) অমর ভাত খাচ্ছে।

৭। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির সাধু ও চলিত ক্রিয়ারূপ লেখ—চাহ্, লিখ, উঠ, দ্র, কাঁদ্, বহ।

অব্যয়

যে সব শব্দের লিঙ্গ, বচন বা বিভক্তি যোগে কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না তাহাদিগকে **অব্যয়** বলে। অব্যয় শব্দগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যথা, ১। **পদান্বয়ী অব্যয়**। ২। **সমুচ্চয়ী** বা **সংযোগবাচক অব্যয়**। ৩। **অনন্বয়ী অব্যয়**।

১। পদান্বয়ী অব্যয়

বাক্যের অন্তর্গত বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে কতকগুলি অব্যয়ের অন্বয় হয়। সেই অব্যয়গুলিকে **পদান্বয়ী অব্যয়** বলে। ইংরেজীতে Preposition অন্বিত পদের পূর্বে বসে, কিন্তু পদান্বয়ী অব্যয় পরে বসে। সেজন্য পদান্বয়ী অব্যয়কে অনুসর্গও বলা হয়। অপেক্ষা, অবধি, পর্যন্ত জন্য, প্রতি, বিনা, মত, সঙ্গে, ন্যায়, ছাড়া, বাবদ, হইতে, থেকে, মারফৎ, প্রায়, ব্যতীত ইত্যাদি।

দৃষ্টান্ত:

১। প্রসন্ন গোয়ালিনীর **সঙ্গে** আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি।
—বঙ্কিমচন্দ্র

২। সংস্কৃত কলেজ **থেকে** দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও সংস্কৃত কলেজের ছোকরা হ'য়ে পড়লেম।
—কালীপ্রসন্ন সিংহ

৩। শিশুদিগের **প্রতি** এমন নিয়ম করিতে হইবে যে, তাহারা খেলাও করিবে পড়াশুনাও করিবে।
—প্যারীচাঁদ মিত্র

৪। সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার **মতো** বহিয়া চলিয়াছে।
—রবীন্দ্রনাথ

৫। কিন্তু আপনার অনুপস্থিতির **জন্য** আমরা অনাহারে মারা পড়িতেছি।
—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২। সমুচ্চয়ী বা সংযোগবাচক প্রত্যয়

কয়েকটি অব্যয় দুইটি পদ বা বাক্যকে একত্রিত করে বলিয়া উহাদিগকে **সমুচ্চয়ী অব্যয়** বলে। সমুচ্চয়ী বা সংযোগবাচক অব্যয়গুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে **বিভক্ত করা যায়**।

(এক) সহযোগী সমুচ্চয়ী অব্যয়

(ক) সংযোজক অব্যয়

যে সকল অব্যয় বিভিন্ন পদ বা বাক্যের মধ্যে সংযোগ সাধন করে তাহাদিগকে **সংযোজক অব্যয়** বলে।

এবং, ও, আর, অতএব, সুতরাং, এজন্য, কাজেই, তবে, তাহা হইলে, তথা, প্রভৃতিকে সংযোজক অব্যয় বলে।

যথা,

১। এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, **এইজন্য** তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। —রবীন্দ্রনাথ

২। ঘরখানির এমনি অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না—সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি। —বঙ্কিমচন্দ্র

(খ) বিয়োজক অব্যয়ঃ

যে সকল অব্যয় বিভিন্ন পদ বা বাক্যকে বিযুক্ত অথবা পৃথক করে তাহাদিগকে বিয়োজক অব্যয় বলে।

বা, কিংবা, অথবা, বিনা, নতুবা, নহিলে, অন্যথা, না হয়, নচেৎ প্রভৃতি বিয়োজক অব্যয়।

যথা,

১। সংস্কৃত **বা** ইংরাজি গ্রন্থের সার সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গলা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। —বঙ্কিমচন্দ্র

২। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই, তা **নহিলে** কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। —বঙ্কিমচন্দ্র

(গ) সংকোচক বা প্রতিষেধক অব্যয়ঃ

যে সকল অব্যয় অর্থের সংকোচ বিধান করে তাহাদিগকে **সংকোচক** বা **প্রতিষেধক অব্যয়** বলে।

কিন্তু, পরন্তু, বরং, বরঞ্চ, উপরন্তু, অধিকন্তু, তবু, তবুও, তথাপি, তো, নয় তো প্রভৃতি সংকোচক বা প্রতিষেধক অব্যয়।

যথা :

১। আজও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, **কিন্তু** সে আমার বুকের রক্ত নেঙড়ানো অশ্রু নয়, আমার আনন্দের উপচে ওঠা ঝরনার ধারা। —শরৎচন্দ্র

২। বরং মানুষে চিরকাল এই বিশ্বাস করে এসেছে যে, মনের স্পিরিচুয়াল খোরাক মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধন করে।

—প্রমথ চৌধুরী

(দুই) অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয়

এগুলি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

যথা,

১। **পরিণাম ফল অর্থে:**

জিজ্ঞাসা করিলেই যে কি বলতাম জানি না, কিন্তু মনে মনে লজ্জা পাইতাম। —শরৎচন্দ্র

২। **সাপেক্ষতা অর্থে:**

যদি মৃত্যু অপেক্ষা কোনও অধিকতর দুর্ঘটনা থাকে তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল। —বিদ্যাসাগর

৩। **পরিমাণ অর্থে:**

যত গর্জায় তত বর্ষায় না।

৪। **বৈপরীত্য অর্থে:**

যদিও সে চেষ্টার ত্রুটি করে যাই, তথাপি সে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই।

(তিন) নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়

অনেক সময় দুইটি সমুচ্চয়ী অব্যয় একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়, একটি ভিন্ন অপরটি ব্যবহৃত হয় না। ঐ অব্যয়গুলিকে **নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়** বলে।

১। বরং মৃত্যু বরণ করিব, তবুও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করিব না।

২। যদিচ আজ ভাদ্রমাসের মধ্যাহ্নের অসহ্য গরম তবু শরৎকালের মাধুর্য অজস্র। —রবীন্দ্রনাথ

৩। যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে, সে কারণ যা হয় বস্তুহীন নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়। —প্রমথ চৌধুরী

৪। হয় তুই বাড়ি থেকে বেরো, না হয় আমি বেরোই, দুটোর একটা না করে আমি জলস্পর্শ করব না। —শরৎচন্দ্র

৫। **যেমন** কর্ম **তেমনি** ফল।

৬। **যখন** সে ঘর হইতে বাহির হইল **তখন** পূর্বাকাশে ভোরের রাগিণী বাজিতে শুরু করিয়াছে।

৭। **যেখানে** এত নীচতা ও মনুষ্যত্বহীনতা **সেখানে** মুক্তির কোন আশা নাই।

অনন্বয়ী অব্যয়

অনন্বয়ী অব্যয়কে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা, (ক) **ভাববোধক বা মনোভাববাচক অব্যয়**, (খ) **প্রশ্নবোধক অব্যয়** (গ) **সম্বোধনসূচক অব্যয়**, (ঘ) **বাক্যালঙ্কার অব্যয়।**

(ক) ভাববোধক বা মনোভাববাচক অব্যয়

১। **সম্মতিসূচক**—হাঁ, হ্যাঁ, হুঁ, আহ, বটে, আজ্ঞে, যে আজ্ঞে, যথা আজ্ঞে, যা বলেন, তা বটে ইত্যাদি।

যথা,

(ক) বলিলাম, **হাঁ** তুলসীদাস, ভালো আছি। তুমি ভালো আছ ?

—শরৎচন্দ্র

(খ) **আচ্ছা, আচ্ছা,** আপনি যাহা বলিলেন তাহাই করা হইবে।

(গ) **যে আজ্ঞে,** আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হইবে।

(ঘ) **তা বটে,** কিন্তু আমাদিগের যেমন কপাল তেমনি ভাই পেয়েছ।

—প্যারীচাঁদ মিত্র

২। **অসম্মতিসূচক**—না, না তো, আদৌ না, মোটেই না, কখনো না ইত্যাদি।

(ক) **না,** তুমি বললেও আমি অন্যায় কাজ করতে পারব না।

(খ) **মোটেই না,** আমি কিছু মনে করিনি।

৩। **অনুমোদন বা প্রশংসাসূচক :**

ধন্য ধন্য, সাধু সাধু, বলিহারি, সাবাস, বাহবা, বহুত আচ্ছা, বাঃ বাঃ, বেড়ে, চমৎকার ইত্যাদি।

(ক) **বহুত আচ্ছা,** গান যা গেয়েছ তার তুলনা নেই।

(খ) লোকটি **বেড়ে** খেলা দেখায় বটে।

(গ) **বাহবা,** সার্কাসের ক্লাউনটির রঙতামাসা সত্যই উপভোগ্য।

৪। **ঘৃণা বা বিরক্তিব্যঞ্জক :**

ছি ছি, দুর দুর, থু থু, রামঃ রামঃ, কি আপদ, কি বিভ্রাট, কি মুশকিল, কি জ্বালা ইত্যাদি।

(ক) **ছি ছি,** এধরনের নীচ কাজ যে সে করতে পারে তা ভাবতেও পারি নি।

(খ) **কি আপদ,** সে যে সব সময়ে আমার পিছনে লেগে রয়েছে, কখনো তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না।

(গ) জন কতক লোক মিলে একটা ঘরকে উচ্ছন্ন দিলে, **দুঁর দুঁর।**

—প্যারীচাঁদ মিত্র

(ঘ) **কি জ্বালা,** এই সংকট থেকে এখন উদ্ধার পাই কি করে তা কে জানে।

৫। **খেদ, যন্ত্রণা বা কষ্টসূচক :**

ইঃ, উঃ, ওঁ, মা-মাগো, বাপ্পা রে বাবা, গেলাম রে, মরে গেলুম, উহু, হায় হায়, হায়রে, আহা, হা ইত্যাদি।

যথা,

(ক) হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! আমি যাই মা, আমি যাই।

—মধুসূদন

(খ) হায়! হায়! হায়! মৃত্যু কি আমাকে ভুলে আছেন —মধুসূদন

(গ) মরি গ্যালাম, মা রে মলাম রে··· —দীনবন্ধু মিত্র

৬। **ভয় ও আতঙ্কসূচক :**

বাপ্, বাপ্‌রে্ মাগো, একি, ওমা, ও বাবা, ওরে বাবা ও বাবা, বাপরে বাপ ইত্যাদি।

যথা,

(ক) **বাপ রে!** বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। —শরৎচন্দ্র

(খ) **ওরে বাবা!** একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে। —শরৎচন্দ্র

(গ) **মাগো, কি ভয়ানক দৃশ্য, শরীর শিউরে ওঠে!**

৭। **হর্ষ ও বিস্ময় সূচক :**

মরি মরি, আ মরি, বাঃ, বলিহারি, ওমা বলে কি, ও মা কোথা যাবো, তাই তো, হরি হরি।

যথা,

(ক) **মরি! মরি!** এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! —শরৎচন্দ্র

(খ) আ মরি বাংলা ভাষা!

(গ) **বলিহারি** তোমাকে, আজ তোমার জন্যই আমাদের স্কুল এই খেলায়

৮। **করুণাদ্যোতক :**

হায় হায়, আহা, আহা রে, হারে, মরে যাই, বাছা আমার, বাপ আমার ইত্যাদি।

(ক) **আহা হা!** মার মোর কি রূপ কি হয়েছে··· —দীনবন্ধু মিত্র

(খ) **হা বিধাতঃ!** এমন লোককেও নিপাত করিলে! —দীনবন্ধু মিত্র

(গ) মরি মরি **বাবা আমার,** সোনার বিন্দুমাধব আমার, আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি। —দীনবন্ধু মিত্র

(দুই) প্রশ্নবোধক অব্যয়

প্রশ্ন করিবার সময় কতকগুলি অনন্বয়ী অব্যয়ের ব্যবহার হয়—যথা, কি, তো, নাকি, না, কেন।

(ক) তোমার বাপের নাম **কি?** —বঙ্কিমচন্দ্র

(খ) জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে **না কি!** —বঙ্কিমচন্দ্র

(গ) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, চক্রবর্তী মহাশয়, চোরকে গোরু ছাড়িয়ে দিবে **কেন?** —বঙ্কিমচন্দ্র

(ঘ) ভালো আছ **তো?**

(তিন) সম্বোধনসূচক অব্যয়

কতকগুলি অনন্বয়ী অব্যয় সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়। তাহাদিগকে সম্বোধনসূচক অব্যয় বলে। যথা, অয়ি, অরে, ও, ওরে, রে, ওগো, ওহে, হেরে গো, লো, ওলো, তো, হ্যাগো, হ্যাগা, হারে, রে, আরে আয়।

যথা,

(ক) হা ধিক, **ওহে** জলদলপতি ! —মধুসূদন

(খ) **হে** বারীন্দ্র, তবে পদে এ মম মিনতি —মধুসূদন

(গ) কি কারণে হেথা আজি, কহ **লো** মুরলে, গতি তব ? —মধুসূদন

(ঘ) 'এতক্ষণে, **রে** লক্ষ্মণ—কহিলা সরোষে রাবণ —মধুসূদন

(ঙ) মুই বলতাম, **হ্যাদে ওয়ো** শোনচো —দীনবন্ধু

(চ) **অরে রে** দে দক্ষ **দেরে** সতীরে। —ভারতচন্দ্র

(ছ) হেদে **গো** নন্দরাণী —রবীন্দ্রনাথ

(চার) বাক্যালঙ্কার অব্যয়

কতকগুলি অব্যয়ের বিশেষ কোন অর্থ নাই তবে বাক্যে ব্যবহৃত হইলে ইহারা বাক্যের শোভা বর্ধন করে এবং বাক্যের অর্থে বিশিষ্টতা দান করে। ইহাদিগকে **বাক্যালঙ্কার অব্যয়** বলে। যথা :

ত, তা, বা, যেন, মেনে, যে, কি, না, বলি, বুঝি, রে, আর ইত্যাদি

(ক) **যেন** খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার —রবীন্দ্রনাথ

(খ) ফুলদল দিয়া কাটিলা **কি** বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ? —মধুসূদন

(গ) এও **যে** রক্তের মত রাঙা দুটি জবা ফুল

(ঘ) পড়ি **কি** ভূতলে শশী যায় গড়াগড়ি ধূলায় ? —মধুসূদন

(ঙ) **বলি** আর কতদিন এভাবে চলবে ? এবার কাজকর্মে মন দাও।

বিবিধ প্রকার অব্যয়

১। বিশেষণ অব্যয় :

কতকগুলি অব্যয় ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, অত্যন্ত, অতীব, প্রায়, কেবল, সহসা, হঠাৎ, অবশ্য, নিতান্ত, বারবার, হদ্দ, বেহদ্দ ইত্যাদি।

(ক) **কেবল** ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।

(খ) **বার বার** বলা সত্বেও তার স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি।

(গ) বাঘটি **সহসা** অসতর্ক লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

২। ধ্বন্যাত্মক অব্যয় :

ঝপ ঝপ, ঝাঁ ঝাঁ, টিপ টিপ, হুম হুম, দুম দুম, গুড় গুড়, টন টন, গুণ গুণ ইত্যাদি।

(ক) রৌদ্র **ঝাঁ ঝাঁ** করিতেছে।

(খ) **টিপ টিপ** ক'রে অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে।

(গ) ব্যথাটা **টন টন** করছে।

৩। **উপসর্গ অব্যয় :**

প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ—এইগুলি ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে উপসর্গ বলে। এগুলিও অব্যয়।

সংস্কৃত অব্যয়

১। সংস্কৃত হইতে কতকগুলি অব্যয় বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। যথা, বরং, অতএব, এবং, যদি, তথা, নতুবা, তথাপি, যদ্যপি, পরন্তু, পুনশ্চ, বরঞ্চ ইত্যাদি।

(ক) **নতুবা** যথার্থই আমি শকুন্তলা লাভে অভিলাষী হইয়াছি, এরূপ ভাবিও না। —বিদ্যাসাগর

(খ) **অধিকন্তু**, উহাদের কলেবরে আমার অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। —বিদ্যাসাগর

২। সংস্কৃত তস্-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি অব্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, আপাততঃ, কার্যতঃ, লোকতঃ, ধর্মতঃ, ন্যায়তঃ, বস্তুতঃ, স্বভাবতঃ, বিশেষতঃ ইত্যাদি।

(ক) **ন্যায়তঃ ধর্মতঃ** শরণাগতকে রক্ষা করা সকলের কর্তব্য।

(খ) **বস্তুতঃ** তাহার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নাই, অনর্থক লোকে নানা কথা বলিতেছে।

(গ) **আপাততঃ** এ-পর্যন্ত থাক, কাল গল্পটি পুরাপুরি শুনিব।

৩। কতকগুলি সংস্কৃত কারক পদ বাংলায় অব্যয়ের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা, প্রসাদাৎ, আদৌ, যেন তেন প্রকারেণ, দৈবাৎ।

(ক) **যেন তেন প্রকারেণ** নিজের সুবিধা আদায় করবার উদ্দেশ্যই তার মধ্যে দেখা যায়।

(খ) **দৈবাৎ**-এর কথা বলা যায় না, সাবধান হ'য়ে চলা ফেরা করাই উচিত।

কয়েকটি বাংলা অব্যয়ের প্রয়োগ

কয়েকটি অব্যয় বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন অর্থ ও ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাদের প্রয়োগবৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

আর—(এবং অর্থে)—কাগজ **আর** কলম নিয়ে বোসো। (কিংবা অর্থে) —বাঁচি **আর** মরি, শক্ত ক'রে জীবনতরীর হাল ধরে থাকব। (পুনরায় কিংবা অধিকতর পরিমাণ অর্থে)—**আর** তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। **আর** কত খাবে? (অব্যবহিত পরে)—আমি যাব **আর** আসব। (পরবর্তী অর্থে)—**আর** শনিবারে আমাদের স্কুল ছুটি আছে। (পূর্ববর্তী অর্থে)—**আর** বছরে এমনি সময় তোমাদের বাড়িতে কত ধুমধাম হয়েছিল। (অসম্ভব অর্থে)—আমড়া গাছে কি **আর** আম হয়? (শ্লেষাত্মক ভঙ্গি)—মাইরি **আর** কি, যা নয় তা বললেই হ'ল!

ও—(এবং অর্থে)—মৃদুলা **ও** মঞ্জুলা যাবে। (সম্ভাবনা অর্থে)—সে আসতে পারে আর না**ও** আসতে পারে। (সত্ত্বেও অর্থে)—ছেলে থাকতে**ও** বাপের এত কষ্ট! (বিস্ময়ের ভাবে)—তুমি**ও** শেষ পর্যন্ত ওদের দলে ভিড়লে? (সম্বোধনে)—**ও** শ্যামল, এদিকে একটু শুনে যাও। (একটুও এই অর্থে)—এত বড় ব্যাপার ঘটে গেল, জানতে**ও** পারলাম না! (শ্লেষাত্মক ভঙ্গি)—তোমার**ও** খেয়ে খেয়ে কাজ নেই, কেবল তার পিছনে পিছনে ঘুরছ।

না—(নঞ অর্থে বা নিষেধ অর্থে)—আমি যাই **না**। এ-কাজ আর কখনো কোরো **না**। (অথবা অর্থে)—তুমি খেলবে, **না** সে খেলবে? (হাঁ অর্থে)—তুমি একবার যাও **না** (যাও এই অর্থে)। (সংশয়-সম্ভাবনা অর্থে)—তুমি **না** বলেছিলে একবার আসবে? সে **না** বড় গলা ক'রে বলেছিল পরীক্ষায় পাস করবেই। (বিশেষ্য রূপে)—উকিল নানা রকমের জেরা ক'রে সাক্ষীর **না**-কে হাঁ-তে পরিণত করলেন। (বিশেষণ রূপে)—**না**-ভাত, **না**-রুটি—কোন-টাতেই রুচি নেই। এমন আম এনেছ যা **না**-টক **না**-মিষ্টি।

না-**কি**-এর সঙ্গে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। **না** কখনও কি-এর আগে বসে, কখনও পরে বসে।

না-কি—রমেশ **না-কি** হঠাৎ অনেক টাকা পেয়েছে? অন্ধকারে কে যাও, পঞ্চানন **না-কি**? তাই **নাকি**, এ সব কথা তোমার বন্ধু বলেছে?

কি-না—যাবে **কিনা** সত্যি ক'রে বল। আমি **কি না** জানি। তাকে কতটুকু থেকে দেখছি, সে **কি না** মুখে মুখে তর্ক করে!

ই—(নিশ্চয় অর্থে)—একটি বাক্যের বিভিন্ন পদের সঙ্গে **ই** যুক্ত হ'তে পারে। যে পদের সঙ্গে **ই** যুক্ত হয় বাক্যের মধ্যে সেই পদের অর্থ ই গুরুত্ব পায়। আমি সেখানে কাল যাব—এই বাক্যটির বিভিন্ন পদের সঙ্গে **ই** যুক্ত হইলে সেই পদের অর্থ ই কিরূপ গুরুত্ব পায় তাহা দেখান হইতেছে। আমি**ই** সেখানে কাল যাব (আর কেউ নয়)। আমি সেখানে**ই** কাল যাব (অন্য কোথাও নয়)। আমি সেখানে কাল**ই** যাব (অন্য দিনে নয়)। আমি সেখানে কাল যাব**ই** (যাওয়ার ব্যাপারে অন্যথা হবে না)। (শ্লেষ বা বক্রোক্তিতে)—তুমি**ই** না বড়াই ক'রে বলেছিলে, সে কখনো এ-ধরনের কাজ করতে পারে না। কি কাণ্ডটা**ই** না ঘটল! হাতে কালি, মুখে কালি, কি ছিরি**ই** না হয়েছে! (অবিচ্ছিন্নতার অর্থে)—একভাবে কাজ ক'রে**ই** তো চলেছি।

(তাৎক্ষণিকতার অর্থে)—তুমি সেখানে গেলে**ই** তিনি তোমার সঙ্গে চ'লে আসবেন। এসে**ই** দেখি, বাড়িতে এই বিভ্রাট।

তো—(প্রশ্নে)—'হে বন্ধু আছ **তো** ভালো'? (আদেশ অনুরোধ ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য)—সেখানে যা **তো**, দেখে আয় সে কেমন আছে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন **তো**। (তিরস্কার, বিস্ময় ইত্যাদি অর্থে)—ফের মুখ খারাপ করবে **তো** আচ্ছা শাস্তি পাবে। তিনি **তো** মানুষ নন, দেবতা! তুমি **তো** আচ্ছা লোক, তোমার জন্যে কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি, আর তোমার পাত্তাই নেই! (বাক্যালঙ্কারে)—ঐ দেবীমূর্তি দেখে **তো** ভক্তিতে অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। (যদি অর্থে) ভাত না খাও **তো** অন্তত দুটো মিষ্টি গালে দাও।

যে—যে সর্বনাম-শব্দ, কিন্তু অনেক বাক্যে অব্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়। (প্রশ্নে)—হরি **যে** গেল না? তুমি **যে** আবার এলে? (বিস্ময়ের ভাব)—অতুল **যে** পাস করবে তা ভাবতেও পারি নি। তুমি **যে** আমাকে মনে রেখেছ এ আমি আশা করতে পারি নি। (দুই বাক্যাংশের সংযোজক)—রেবা বলল **যে**, সে স্কুলে যেতে পারবে না। (বাক্যালঙ্কার)—'ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি **যে** হেলাফেলার ছেলে মানুষ।' —রবীন্দ্রনাথ।

কি—(প্রশ্নে)—তুমি আমার কথা শুনবে কি ? (এবং অর্থে) কি ধনী, কি দরিদ্র আজ সকলেই উৎসবে যোগ দিয়েছে। (অথবা অর্থে)—ভাত কি রুটি, যা আছে দাও। (অনিশ্চয়তা অর্থে)—আমার ঠিক মনে নেই, তিন মাস কি চার মাস আগে সে এসেছিল। (দুঃখ, খেদ, রাগ, ঘৃণা প্রভৃতি ভাব প্রকাশে) কি অদৃষ্ট ! এত দুঃখও সইতে হল ! কি আস্পর্ধা তার, এতবড় কথা তোমার মুখের উপরে বলতে পারল ! (পার্থক্য জ্ঞাপনে)—আগে তাকে কি দেখেছি আর এখনও বা কি দেখলাম ! (প্রশংসা বা বিস্ময়ে) কি অপরূপ রূপই না দেখলাম ! 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ !'— মধুসূদন।

অনুশীলনী

১। অব্যয় কাহাকে বলে ? উদাহরণসহ বিভিন্ন শ্রেণীর অব্যয়ের পরিচয় দাও !

২। সমুচ্চয়ী অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ কর। উদাহরণ সহ প্রত্যেকটি শ্রেণীর অলোচনা কর।

৩। অনন্বয়ী অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ কর। উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

৪। সংজ্ঞা নির্দেশ কর ও উদাহরণ দাও :

বাক্যালঙ্কার অব্যয়, সম্বোধনসূচক অব্যয়, ধ্বন্যাত্মক অব্যয়, প্রশ্নবোধক অব্যয়, নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়।

৫। নিম্নলিখিত অব্যয়গুলি কোন্ কোন্ শ্রেণীর অব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত তাহা উল্লেখ কর এবং প্রত্যেকটি অব্যয় এক একটি বাক্যে প্রয়োগ কর :

এবং, কিন্তু, বা, নহিলে, যদি, যেহেতু, তথাপি, যে আজ্ঞে, বাহবা, সাধু সাধু, ছি ছি, হায় হায়, হা, বাপ রে বাপ, মরি মরি, বলিহারি, রে, হেদে, বুঝি, যেন, টনটন, বলি, বস্তুতঃ, আদৌ।

৬। নিম্নলিখিত অব্যয়গুলিকে বিভিন্ন অর্থে বাক্যে প্রয়োগ কর :

তো, কি, ও, ই, না, আর।

প্রত্যয়

যাহা ধাতুর পরে যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ বা নূতন ধাতু গঠন করে কিংবা শব্দের পরে যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ গঠন করে তাহাকে **প্রত্যয়** বলে।

প্রত্যয় দুই শ্রেণীর—১। যে প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয় তাহাকে বলে **কৃৎপ্রত্যয়**। ২। যে প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহাকে বলে **তদ্ধিত প্রত্যয়**।

কৃৎপ্রত্যয়ের যোগে সাধিত শব্দকে বলে **কৃদন্ত শব্দ** এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে সাধিত শব্দকে বলা হয় **তদ্ধিতান্ত** শব্দ। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ সংস্কৃত প্রত্যয়ের দ্বারা সাধিত এবং বাংলা শব্দ বাংলার নিজস্ব প্রত্যয়ের দ্বারা সাধিত।

কৃৎপ্রত্যয়

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়

শতৃ (অৎ)—সংস্কৃতে পরস্মৈপদী ধাতুর সঙ্গে বর্তমানকালে এই প্রত্যয়ের যোগে বিশেষণ শব্দ গঠিত হয়। পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে অৎ হয় অন্; যথা, ধাবৎ—ধাবন্। স্ত্রীলিঙ্গে অন্তী অথবা অতী; যথা, মহতী, ভবতী, চলন্তী। ক্লীবলিঙ্গে অৎ; যথা, চলৎ। √অস—সন্ (পুং), সতী (স্ত্রী), সৎ (ক্লী)। বাংলায় শতৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অনেক স্থলে সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, চলৎ+চিত্র=চলচ্চিত্র, চলৎ+শক্তি=চলচ্ছক্তি, জীবৎ+দশা=জীবদ্দশা, জাগ্রৎ+অবস্থা=জাগ্রদবস্থা, গলৎ+অশ্রু=গলদশ্রু।

শানচ্—(আন, ঈন, মান) সংস্কৃতে আত্মনেপদী ধাতুতে বর্তমানকালে এই প্রত্যয়ের যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ শব্দ গঠিত হয়। শানচ্ স্থানে আন, ঈন অথবা মান হয়।

(ক) আন—√শী—শয়ান (যে শয়ন করিয়া আছে), অধি√ই—অধীয়ান।

(খ) ঈন—√আস—আসীন।

(গ) মান—√বৃৎ—বর্তমান, √বৃধ্—বর্ধমান, বি√বদ—বিবদমান, √মৃ—ম্রিয়মাণ, √সেব—সেবমান, √বিদ্—বিদ্যমান, প্রতি—√ইক্ষ—প্রতীক্ষমাণ, √ভাস—ভাসমান।

(ঘ) কর্মবাচ্যে ধাতুর পরে য আসে। যথা, √সেব—সেব্যমান, √দৃশ—দৃশ্যমান, √কৃ—ক্রিয়মাণ, √বচ—উচ্যমান।

(ঙ) সংস্কৃত পরস্মৈপদী ধাতুও বাংলায় অনেক স্থলে শানচ্-এর মান-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যথা, √চল—চলমান। এরূপ আরও শব্দ—গর্জমান, ধাবমান ইত্যাদি।

ণক (অক)—যে পাঠ করে, এই অর্থে—√পঠ—পাঠক। যে পাক করে—√পচ—পাচক, যে গ্রহণ করে—√গ্রহ—গ্রাহক। যে গান করে—√গৈ—গায়ক। যে বিধান করে—বি—√ধা—বিধায়ক। যে নৃত্য করে—√নৃৎ—নর্তক। যে সেবা করে—√সেব—সেবক। যে দান করে—√দা—দায়ক। যে শোষণ করে—√শুষ—শোষক। যে কর্ষণ করে—√কৃষ—কর্ষক বা কৃষক। যে ধারণ করে—√ধৃ—ধারক। যে পবিত্র করে—√পূ—পাবক।

তৃচ্ (তা)—করে যে, এই অর্থে তৃচ্ বা তৃন্ প্রত্যয় হয়। রূপ হয় তৃ (চ্ ও ন্ ইৎ)। প্রথমার একবচনে হয় তা। স্ত্রীলিঙ্গে হয় ত্রী। ক্লীবলিঙ্গে ও সমাসের পূর্বপদে তৃ থাকে। যথা, √শ্রু+তৃ=শ্রোতা (পুং), শ্রোত্রী (স্ত্রী), শ্রোতৃমণ্ডলী (সমাসের পূর্ব পদ)। লইয়া যায় যে—√নী—নেতা। √কৃ—কর্তৃ (কর্তা)। যে ভরণ করে—√ভৃ ভর্তৃ (ভর্তা)। দেখে যে—√দৃশ—দ্রষ্টৃ (দ্রষ্টা)। সৃষ্টি করে যে—√সৃজ—স্রষ্টৃ (স্রষ্টা)। হত্যা করে যে—√হন—হন্তৃ (হন্তা)। গ্রহণ করে যে—√গ্রহ—গ্রহীতৃ (গ্রহীতা)। জানে যে—√জ্ঞা—জ্ঞাতৃ (জ্ঞাতা)। যুদ্ধ করে যে—√যুধ্—যোদ্ধৃ (যোদ্ধা)। পালন করে যে—√পালি—পালয়িতৃ (পালয়িতা)। রচনা করে যে—√রচি—রচয়িতৃ (রচয়িতা)। শাসন করে যে—√শাস—শাস্তৃ (শাস্তা)।

তৃ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি শব্দ রূপ পুংলিঙ্গ হইলেও প্রয়োগে স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, মাতৃ—মাতা। দুহিতৃ—দুহিতা। স্বসৃ—স্বসা।

ইষ্ণু—শীলার্থে এই প্রত্যয় হয়। সহিতে শীল (স্বভাব) যাহার—√সহ—সহিষ্ণু। বর্ধিত হইতে শীল যাহার—√বৃধ্—বর্ধিষ্ণু। চলিতে শীল যাহার—√চল—চলিষ্ণু। জয় করিতে শীল যাহার—জি—জিষ্ণু। করিতে শীল যাহার—√কৃ—করিষ্ণু।

ইষ্ণু প্রত্যয়ান্ত সাধিত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

আলু—শীলার্থে এই প্রত্যয় হয়। দয়াশীল (স্বভাব) যাহার—√দয়—দয়ালু। নিদ্রা শীল যাহার—নি—√দ্রা—নিদ্রালু। কৃপা শীল যাহার—√কৃপ—কৃপালু।

অন্যান্য সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়

ইন্—√পা—পায়িন্ (পাপী)।—√বদ—বাদিন্ (বাদী)। স্থা—স্থায়িন্ (স্থায়ী)।

অন্—√তপ—তপন। √সহ্—সহন। √নন্দি—নন্দন।

অ (অচ্, অন্—চ্, ন্ ইৎ)—√সৃপ—সর্প। √হৃ—হর। জল—√ধৃ—জলধর।

অ—(যণ্—য্ ণ্ ইৎ)—কুম্ভ—√কৃ—কুম্ভকার। সূত্র—√ধৃ—সূত্রধার। মালা—√কৃ—মালাকার।

অ—(ট—ট্ ইৎ)—দিবা—√কৃ—দিবাকর। অগ্র—√সৃ—অগ্রসর। প্রভা—√কৃ—প্রভাকর।

অ—(টক্—ট্ ক্ ইৎ)—শত্রু—√হন্—শত্রুঘ্ন। গো—√হন্—গোঘ্ন।

অ—(ড—ড্ ইৎ)—পঙ্ক—√জন্—পঙ্কজ। জল—√দা—জলদ। পাদ—√পা—পাদপ।

অ—(খচ্, খশ্—খ্ চ্ শ্ ইৎ) প্রিয়—√বদ—প্রিয়ংবদ। বিশ্ব—√ভৃ—বিশ্বম্ভর। স্বয়ং—√বৃ—স্বয়ংবর+আ=স্বয়ংবরা।

ক্বিপ—(সমস্ত বর্ণ ইৎ)—শাস্ত্র—√বিদ্—শাস্ত্রবিদ্। ইন্দ্র—√জি—ইন্দ্রজিৎ। √গম্—জগৎ।

ক্তবতু—তবৎ (ক্ উ ইৎ)—√গম্+ক্তবতু—গতবৎ (গতবান্)। √জ্ঞা—জ্ঞাতবৎ (জ্ঞাতবান্)। √ক্রী—ক্রীতবৎ (ক্রীতবান্)

ক্ত—ত (ক্ ইৎ)—√গম—গত, √ধৃ—ধৃত। √কৃ—কৃত।

তব্য—√কৃ—কর্তব্য। √দৃশ্—দ্রষ্টব্য। √দা—দাতব্য।

অনীয়—√কৃ—করণীয়। √দৃশ—দর্শনীয়। √গম—গমনীয়

য—√গম—গম্য। √দা—দেয়। √ভূ—ভব্য।

য (ঘ্যণ্—ঘণ্ ইৎ)—√কৃ—কার্য। √বুধ—বোধ্য। √ভুজ—ভোগ্য।

য (ক্যপ্—ক্প্ ইৎ)—√দৃশ—দৃশ্য, √শাস্—শিষ্য। √বিদ্—বিদ্য+আ=বিদ্যা।

ঘঞ্(ঘ্ ঞ্ ইৎ)—√শুচ্—শোক। √পচ্—পাক। √হন্—ঘাত।
অল্—(ল্ ইৎ)—√জি—জয়। √স্তু—স্তব। √লুভ্—লোভ।
অনট্—(ট্ ইৎ)—√গম্—গমন। √দৃশ্—দর্শন। √শী—শয়ন।
ক্তি—তি (ক্ ইৎ) √কৃ—কৃতি। √দৃশ্—দৃষ্টি। √গম—গতি।
ত্র—√নী—নেত্র। √অস্—অস্ত্র। √স্তু—স্তোত্র। √পা—পাত্র।

বাংলা কৃৎপ্রত্যয়

অ

(ক) ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠিত হয়। প্রাগাধুনিক ভাষায় এই অ বিদ্যমান ছিল। আধুনিক ভাষায় ইহা লুপ্ত হইয়াছে। চল্+অ=চল (উচ্চারণে চল্)। যথা, এখন এই জামার চল্ হয়েছে। ডাক্+অ—ডাক। যথা, 'যদি তোর ডাক্ শুনে কেউ না আসে।' বাঁধ্+অ—বাঁধ। যথা, বাঁধ ভেঙ্গে দাও।

বাড়্+অ=বাড়। জিত্+অ=জিত। ছাড়্+অ=ছাড়।

(খ) কোন কোন জায়গায় এই প্রত্যয়ের যোগে ধাতুর স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয়। ঝুঁক+অ=ঝোঁক। যথা, যার যেদিকে ঝোঁক তাকে সেদিকেই পড়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। চল্+অ=চাল। যথা, চালচলন দেখলেই বোঝা যায় কে কিরূপ ঘর থেকে এসেছে।

√ঘির+অ=ঘের। চর+অ=চার। বুল্+অ=বোল্।

(গ) সম্ভাব্যতা, আসন্নতা, ঈষৎভাব প্রভৃতি বুঝাইতে অ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। অ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের দ্বিত্ব হয়। যথা, কাঁদ্+অ=কাঁদ-কাঁদ—বালিকাটি কাঁদ-কাঁদ মুখে বাড়ি ফিরছিল। মর্+অ=মর-মর—বুড়ো লোকটি মর-মর হয়েছে। পড়্+অ=পড়-পড়—পুরোনো বাড়িটি পড়-পড় হয়েছে।

অন—ভাববাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর অন হয়। উচ্চারণ বিকৃতিতে অন কোথাও ওন হয়। অন যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠিত হয়। চল্+অন=চলন—'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'। গড়্+অন=গড়ন, ভাঙ্+অন=ভাঙন; ভাঙন গড়নের মধ্য দিয়েই তো সংসারটা চলছে। ফল্+অন=ফলন—লিচুর ফলন এবার ভালোই হয়েছে। দেখ্+অন=দেখন। যা+অন্=যাওন, হ+অন্=হওন।

অন প্রত্যয়ান্ত শব্দ কোথাও কোথাও বস্তুবাচক বিশেষ্য শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, মাজ্ + অন = মাজন—দাঁতের মাজন ফুরিয়ে গেছে। ঝাড়্ + অন = ঝাড়ন—চাকরটি ঝাড়ন দিয়ে ঘর পরিষ্কার করছে।

আও—ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয়। যথা, ঘির—ঘের + আও = ঘেরাও—কারখানায় শ্রমিকরা মালিককে ঘেরাও করে রেখেছে। ঢাল্ + আও—ঢালাও—ঢালাও কারবারে তারা প্রচুর পয়সা পেয়েছে। চড়্ + আও—চড়াও তুমি কি বাড়ি চড়াও হয়ে অপমান করতে এসেছ?

উ—আসন্নতা, ঈষৎ ভাব প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য ধাতুর উত্তর অ কিংবা ও-র স্থলে উ হয়। উ প্রত্যয়ান্ত শব্দেরও দ্বিত্ব হয়। যথা, উড়্ + উ = উড়ু উড়ু। —তোমার মন এত উড়ু উড়ু কেন? ডুব্ + উ = ডুবু ডুবু—শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়। নিব্ + উ = নিবু নিবু—প্রদীপটি নিবু নিবু হ'য়ে এসেছে।

উনি:

(ক) ধাতুর উত্তর উনি প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক বিশেষ্য শব্দ গঠিত হয়। যথা, কাঁপ্ + উনি = কাঁপুনি—কাঁপুনি দিয়ে আবার জ্বর এসেছে। বাঁধ্ + উনি = বাঁধুনি।—বয়স অল্প হ'লে কি হয়, কথার বাঁধুনি লক্ষ্য করবার মত। ঝাঁক্ + উনি = ঝাঁকুনি।—জম্মু থেকে শ্রীনগর যাবার সময় বাস-এর ঝাঁকুনিতে গা-গতর সব ব্যথা হ'য়ে গেছে।

(খ) উনি প্রত্যয় যোগে কোথাও কোথাও ব্যক্তিবাচক বা বস্তুবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠিত হয়। যথা, চাল্ + উনি = চালুনি। —চিঁড়ে মুড়ি চালুনিতে চেলে না নিলে খাওয়া যায় না। ছা + উনি = ছাউনি।—যারা শিক্ষণের জন্য এসেছে তারা ছাউনির মধ্যে রয়েছে। রাঁধ + উনি = রাঁধুনি।—রাঁধুনি আসে নি তাই বাড়ির গিন্নিকে রাঁধতে হচ্ছে। চির্ + উনি = চিরুনি।—যশোহরের চিরুনি বিখ্যাত।

ত (অত, অতা):

কর্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে এই প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়। যথা, ফির্ + অত = ফিরত—ফেরত।—বিলাতফেরত ডাক্তারটি পোশাক-পরিচ্ছদে খাঁটি বাঙালী। পার + অত = পারত।—পারতপক্ষে সে কখনও কারো কাছে হাত পাতে নি। বহ্ + তা = বহতা।—বহতা নদীর মধ্যে কোনো শ্যাওলা জন্মাতে পারে না। মান্ + অত = মানত।—মহিলাটি ছেলের কল্যাণের জন্য কালীঘাটে

মানত করেছেন।—জান+তা=জান্‌তা। সে নিজেকে সর্বদা সবজান্‌তা রূপে প্রচার করে।

তি (অতি)—এই প্রত্যয়গুলিও কর্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এই প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, ফির্‌+তি =ফির্‌তি।—ফিরতি ডাকেই চিঠির উত্তর পেয়ে গেলাম। চল্‌+তি=চল্‌তি—চল্‌তি মাসের মাঝামাঝি স্কুল খুলবে। উঠ+তি=উঠ্‌তি। উঠতি বয়সের ছেলেদের শাসনে রাখাই আজকাল সমস্যা হয়ে উঠেছে। বাড়্‌+তি=বাড়্‌তি—বাড়্‌তি টাকা যা পাও তা' দিয়ে আগে দেনা শোধ করো।

কোন কোন জায়গায় এই প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, গুণ্‌+তি=গুণ্‌তি।—যে টাকা এনেছ গুণ্‌তিতে তার মধ্যে একটি টাকা কম পাওয়া গেল। কম্‌+তি=কম্‌তি।—এতদিন চাকরী করলাম, কিন্তু কাজের কোনো কমতি নেই। কাট্‌+তি=কাট্‌তি। বাজারে এখন এই বইয়ের খুব কাট্‌তি।

না—ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠিত হয়। কাঁদ্‌+না=কাঁদ্‌না—কান্না। রাঁধ্‌+না=রাঁধ্‌না—রান্না। দে+না=দেনা পা+না=পাওনা। কর্‌+না=কর্‌না—কন্না।—লীলা বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তার ঘরকন্না নিয়েই ব্যস্ত। ধর্‌+না=ধর্‌না—ধন্না।—জমিদারের বাড়ির সামনে প্রজারা ধন্না দিয়ে পড়ে আছে।

কোন কোন জায়গায় না প্রত্যয় যোগে বস্তুবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠিত হয়। যথা, ঢাক্‌+না=ঢাকনা।—কৌটোর ঢাকনা এখনো খোলা হয় নি। বাজ্‌+না= বাজনা।—ঢোলের বাজনা শুনলেই পুরোনো দিনের উৎসবের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। ঝর্‌+না=ঝর্‌না। দার্জিলিং যেতে অনেক ঝর্‌না দেখতে পাওয়া যায়। দুল+না=দুলনা—দোলনা—শিশুটি দোলনায় শুয়ে হাসছে।

রি (আরি, উরি)—কর্মে দক্ষ এই অর্থে ধাতুর উত্তর রি (আরি, উরি) প্রত্যয় হয়। ডুব্‌+আরি=ডুবারি; ডুব্‌+উরি=ডুবুরি (ডুবিতে দক্ষ)। ডুবুরিয়া গভীর জলের তলদেশে অনেকক্ষণ থাকিতে সক্ষম। ধুন+আরি= ধুনারি; ধুন্‌+উরি=ধুনুরি (তুলা ধুনিতে দক্ষ)।—শীত পড়িলেই ধুনুরিরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়া লেপ তৈরী করে। কাট্‌+আরি=কাটারি।—কাটারি দিয়ে ডাবটি কেটে দাও।

অন্যান্য বাংলা কৃৎপ্রত্যয়

আ—চল্+আ=চলা। দেখ্+আ=দেখা। কর্+আ=করা।

আই—লড়্+আই=লড়াই। বাছ্+আই=বাছাই। বাঁধ্+আই=বাঁধাই।

অন্ত—চল্+অন্ত=চলন্ত। জল্+অন্ত=জলন্ত। বাড়্+অন্ত=বাড়ন্ত।

ই—ফির্+ই=ফিরি—ফেরি। বেড়্+ই=বেড়ি। হাস্+ই=হাসি।

ইয়ে—নাচ্+ইয়ে=নাচিয়ে। বল্+ইয়ে=বলিয়ে। বাজ্+ইয়ে=বাজিয়ে।

উয়া, ও—পড়্+উয়া=পড়ুয়া—পোড়ো। খা+উয়া=খাউয়া—খেয়ো।

অক, ক—মূড়+অক=মোড়ক। চড়্+অক=চড়ক। ঝল্+অক=ঝলক।

উক—মিশ্+উক=মিশুক। নিন্দ্+উক=নিন্দুক।

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

কতকগুলি সংস্কৃত প্রত্যয় অপত্যার্থে প্রয়োগ করা হয়। অপত্য অর্থে শুধু পুত্র নহে, পৌত্র-প্রপৌত্রও বুঝাইতে পারে।

ষ্ণি (ই) অপত্য অর্থে :

রাবণ+ষ্ণি=রাবণি।—লক্ষ্মণ রাবণিকে (মেঘনাদ) নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিহত করিয়াছিলেন। দশরথ+ষ্ণি=দাশরথি।—'আশীষিলা দশরথ—দাশরথি (রাম) শূরে (মধুসূদন)। সুমিত্রা+ষ্ণি=সৌমিত্রি। 'উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী' (মধুসূদন)।

ষ্ণেয় (এয়) অপত্য অর্থে :

গঙ্গা+ষ্ণেয়=গাঙ্গেয় (ভীষ্ম) তাঁহার অটল প্রতিজ্ঞার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। কুন্তী+ষ্ণেয়=কৌন্তেয়।—'এ কৌন্তেয় (কুন্তীপুত্র অর্জুন) যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে বিশ্বসুখ' (মধুসূদন)। কৃত্তিকা+ষ্ণেয়=কার্তিকেয়। দেব সেনাপতি কার্তিকেয় তারকাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন। বিমাতৃ+ষ্ণেয়=বৈমাত্রেয়। অত্রি+ষ্ণেয়=আত্রেয়।

ষ্ণায়ন (আয়ন)—অপত্য অর্থে :

নর+ষ্ণায়ণ=নারায়ণ। দক্ষ+ষ্ণায়ণ=দাক্ষায়ণ+ঈ (স্ত্রী)=দাক্ষায়ণী

(সতী)—পতির নিন্দা শুনিয়া দাক্ষায়ণী প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাত্য+ ষ্ণায়ণ=কাত্যায়ন। দ্বীপ+ষ্ণায়ণ=দ্বৈপায়ন।

ষ্ণীয় (ঈয়) অপত্য অর্থে:

স্বস্থ+ষ্ণীয়=স্বস্ত্রীয়।

ষ্ণিক (ইক)—তাহা জানে কিংবা তৎসম্বন্ধীয় এই অর্থে:

বিজ্ঞান+ষ্ণিক=বৈজ্ঞানিক।—আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিকগণ অসাধ্য সাধন করিতেছেন। অলঙ্কার+ষ্ণিক=আলঙ্কারিক।—প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ কাব্যের অলঙ্কার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন। বেদ +ষ্ণিক=বৈদিক।—বৈদিক সংস্কৃত হইতে ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির উদ্ভব হইয়াছে। পুরাণ+ষ্ণিক=পৌরাণিক।—গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি বাংলা রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হইয়াছিল।

(খ) কোন বিশেষ স্থান ও কাল সম্পর্কীয়:

হেমন্ত+ষ্ণিক=হৈমন্তিক।—হৈমন্তিক ধানে বাংলার ক্ষেত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমুদ্র+ষ্ণিক=সামুদ্রিক।—অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীটি দেখিবার জন্য সমুদ্রের ধারে বহুলোকের ভিড় হইল। পরলোক+ষ্ণিক=পারলৌকিক। —ভারতীয় দৃষ্টিতে ঐহিক সুখ অপেক্ষা পারলৌকিক মুক্তিই অধিকতর কাম্য।

(গ) তাহাতে নিযুক্ত কিংবা তৎসম্পর্কীয় এই অর্থে:

সমাজ+ষ্ণিক=সামাজিক।—সামাজিক মানুষকে সমাজের অনেক নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হয়। সর্বজন+ষ্ণিক=সার্বজনিক।—মহাত্মা গান্ধী সার্বজনিক কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিমান+ষ্ণিক=বৈমানিক।—যুদ্ধে ভারতীয় বৈমানিকগণ বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন।

(ঘ) তাহার দ্বারা সাধিত বা লব্ধ কিংবা তৎসম্বন্ধীয় এই অর্থে:

অঙ্গ+ষ্ণিক=আঙ্গিক। প্রাচীন ভারতের চার রকম অভিনয়ের অন্যতম হইল আঙ্গিক অভিনয়। দেহ+ষ্ণিক=দৈহিক।—দৈহিক সুস্থতা না থাকিলে লেখাপড়াতেও মনোযোগ আসে না। প্রবন্ধ+ষ্ণিক=প্রাবন্ধিক।—ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রাবন্ধিক রূপে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাহিত্য+ষ্ণিক=সাহিত্যিক। অর্থনীতি+ষ্ণিক=আর্থনীতিক। সংবাদ+ষ্ণিক =সাংবাদিক। ভূগোল+ষ্ণিক=ভৌগোলিক। অধ্যাত্ম+ষ্ণিক=আধ্যাত্মিক।

(ঙ) সেই স্থান হইতে বা তাহার নিকট হইতে আগত কিংবা তৎসম্বন্ধীয় এই অর্থে:

পরিপার্শ্ব + ষ্ণিক—পারিপার্শ্বিক।—পারিপার্শ্বিক অবস্থা এখন এমন হইয়াছে যে, ছেলেমেয়ে মানুষ করাই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশ + ষ্ণিক = বৈদেশিক। পিতৃ + ষ্ণিক = পৈতৃক। নীতি + ষ্ণিক = নৈতিক।

(চ) সময়, ব্যবসায়, আচরণ, শীল প্রভৃতি বুঝাইতে—বর্ষ + ষ্ণিক = বার্ষিক। দিন + ষ্ণিক = দৈনিক। নৌ + ষ্ণিক = নাবিক।—প্রবল ঝড়ে সমুদ্রের মধ্যে নাবিকরা দিক নির্ণয় করিতে পারে নাই। জাল + ষ্ণিক = জালিক।—জালিক (জেলে) জাল দিয়া মাছ ধরিতেছে। ধর্ম + ষ্ণিক = ধার্মিক।—ধার্মিক ব্যক্তি ধর্ম আচরণ করিয়া থাকেন।

(ছ) আধুনিক কালে বিদেশী শব্দের সঙ্গেও ষ্ণিক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা, শহর + ষ্ণিক—শাহরিক। —শাহরিক লোকেরা গ্রাম্য লোকেদের মত সরল নহে। চীন + ষ্ণিক = চৈনিক—চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ং চুয়াং ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পারস্য + ষ্ণিক = পারস্যিক—পারসিক।—পারসিক সম্প্রদায়ের লোকেরা পারস্য হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন।

ইত (ইতচ)—জাত অর্থে এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণ হয়। যথা, দুঃখ + ইত—দুঃখিত। লজ্জা + ইত = লজ্জিত। পুষ্প + ইত = পুষ্পিত।—পুষ্পিত বকুল বৃক্ষশাখায় কোকিল ডাকিতেছে। কণ্টক + ইত = কণ্টকিত।—ভূতের গল্প শুনিতে শুনিতে শিশুরা ভয়ে কণ্টকিত হইত। পিপাসা + ইত = পিপাসিত। ক্ষুধা + ইত = ক্ষুধিত।

ইল—আছে এই অর্থে:

যথা, ফেন + ইল = ফেনিল।—সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গগুলি তীরে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে। পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল।—পঙ্কিল জলাশয়ের জল পান করিলে অসুখ অনিবার্য। জটা + ইল = জটিল।—তিনি সহজেই অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। সর্প + ইল = সর্পিল।—সরীসৃপটি সর্পিল ভঙ্গিতে মাঠের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

ইন্—আছে এই অর্থে ইন্ প্রত্যয় হয়।

পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে ইন্ স্থলে ঈ হয়। স্ত্রীলিঙ্গে ইনী। সমাসে পূর্বপদ রূপে ব্যবহৃত অন্ত্য ন্ লুপ্ত হয়। যথা, পক্ষ + ইন্ = পক্ষিন্—পক্ষী। সমাসে পক্ষিসমূহ। রোগ + ইন্ = রোগিন্—রোগী। হস্ত + ইন্ = হস্তিন্—হস্তী। রথ + ইন্ = রথিন্—রথী। প্রবাহ + ইন্ = প্রবাহিন্—স্ত্রীলিঙ্গে

প্রবাহিণী। মৃণাল+ইন্=মৃণালিন্—স্ত্রীলিঙ্গে মৃণালিনী। প্রতিযোগ+ইন্=প্রতিযোগিন্—স্ত্রীলিঙ্গে প্রতিযোগিনী।

ঈন—তাহাতে জাত, তৎ সম্পর্কীয়, তাহাতে ব্যাপ্ত এইসব অর্থে ঈন প্রত্যয় হয়। যথা, কুল+ঈন কুলীন (কুলে জাত)।—আগে কুলীন ব্রাহ্মণরা কুলের গর্ব বড় বেশি করিতেন। সম্মুখ+ঈন=সম্মুখীন (সম্মুখীন)।—নির্ভয়ে বিপদের সম্মুখীন হও। সর্বাঙ্গ+ঈন=সর্বাঙ্গীণ (সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া)।—তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। গ্রাম+ঈন=গ্রামীণ (গ্রাম সম্পর্কীয়)। গ্রামীণ মানুষের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে গ্রামে যাইতে হইবে। সর্বজন+ঈন=সর্বজনীন। অভ্যন্তর+ঈন্=অভ্যন্তরীণ।

বিন্—আছে এই অর্থে বিন্ প্রত্যয় হয়। পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে বী হয়। স্ত্রীলিঙ্গে বিনী হয়। সমাসে পূর্বপদ হইলে ন্ লুপ্ত হয়। যথা, মেধা+বিন্=মেধাবিন্—মেধাবী। (স্ত্রীলিঙ্গে মেধাবিন্+ঈ=মেধাবিনী)। নবীনের মত মেধাবী ছেলে খুব কমই দেখা যায়। যশস্+বিন্=যশস্বিন্—যশস্বী।—তারাশঙ্কর বর্তমান কালের যশস্বী ঔপন্যাসিক। তপস্+বিন্=তপস্বিন্—তপস্বী। হিমালয়ের গুহায় গুহায় বহু তপস্বী বাস করেন। তেজস্+বিন্=তেজস্বিন্—তেজস্বী।—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত তেজস্বী নেতা কোন দিন কোন বাধা গ্রাহ্য করেন নাই।

ময় (ময়ট)—বিকারে, ব্যাপ্তি প্রভৃতি অর্থে এই প্রত্যয় হয়। যথা; জল+ময়=জলময়।—সামান্য বৃষ্টি হইলেই কলিকাতা জলে জলময় হইয়া যায়। শূন্য+ময়=শূন্যময়।—পুত্রের মৃত্যুতে মাতা চতুর্দিকে শূন্যময় দেখিতেছেন। মৃৎ+ময়=মৃন্ময়।—চিন্ময়ী দেবী মৃন্ময় রূপে ঘরে ঘরে পূজিত হন। চিৎ+ময়=চিন্ময়। বাক্+ময়=বাঙ্ময়। গো+ময়=গোময়।

বতুপ (বৎ-বান্), মতুপ (মৎ-মান্)—যে সকল শব্দের অন্তে অ, আ বা ম আছে তাহাদের উত্তর বৎ প্রত্যয় হয়। অন্যত্র মৎ প্রত্যয় হয়। আছে এই অর্থে বৎ ও মৎ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা, বল+বৎ=বলবৎ—বলবান্।—বলবান্ ব্যক্তি নির্ভীক হয়। ধন+বৎ=ধনবৎ—ধনবান্।—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ধনবান্ ছিলেন বটে, কিন্তু দেশের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিদ্যা+বৎ=বিদ্যাবৎ—বিদ্যাবান্।—বিদ্যাবান্ ব্যক্তি সর্বত্র সম্মান পাইয়া থাকেন। বুদ্ধি+মৎ=বুদ্ধিমান্।—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সব দিক বিচার করিয়া চলিতে পারেন। আয়ুস্+মৎ=আয়ুষ্মৎ—আয়ুষ্মান্।—

আশীর্বাদ করি, চির-আয়ুষ্মান্ হও। বসু+মৎ=বসুমৎ (স্ত্রীলিঙ্গে বসুমতী)।—বসুমতী সর্বংসহা বলিয়াই সকল পাপ সহ্য করিতে পারে।

তন—কালবাচক অব্যয় এবং অন্য কোন্ কোন শব্দের উত্তর তন প্রত্যয় হয়।

যথা, অদ্য+তন=অদ্যতন। পুরা+তন=পুরাতন।—পুরাতন কাল হইতে অদ্যতন কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ভাঙ্গাগড়ার কত ইতিহাসই না রচিত হইয়াছে। ঊর্ধ্ব+তন=ঊর্ধ্বতন। অধঃ+তন=অধস্তন।—ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে অধস্তন কর্মীপর্যন্ত সকলেরই বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। নব+তন=নবতন—নোতুন।

ইম—(ইমা)—ভাবার্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। নীল+ইমা=নীলিমা। —আকাশের নীলিমায় হংসবলাকা শাদা মালার মত দুলিতেছে। রক্ত+ইমা=রক্তিমা।—কালো মেঘের উপরে অস্তায়মান সূর্যের রক্তিমা অপূর্ব শোভা সৃষ্টি করিয়াছে। মহৎ+ইমা=মহিমা।—মহামায়ার মহিমা কে বর্ণনা করিতে পারে! জড়+ইমা=জড়িমা। লঘু+ইমা=লঘিমা। গুরু+ইমা=গরিমা। অণু+ইমা=অণিমা।

র—আছে এই অর্থে **র** প্রত্যয় হয়।

মধু+র=মধুর। মুখ+র=মুখর।—প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখিয়া, চিরনীরব ব্যক্তিও মুখর হইয়া উঠেন। পাণ্ডু+র=পাণ্ডুর।—পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকে সব কিছুই স্বপ্নময় মনে হইতেছে। ঊষ (লোনা মাটি)+র=ঊষর।—ঊষর বালুকারাশি ধু ধু করিতেছে।

ল—আছে এই অর্থে।

মাংস+ল=মাংসল।—লোকটি তাহার মাংসল দেহটি লইয়া দ্রুত চলাফেরা করিতে পারে না। শ্যাম+ল=শ্যামল।—বনরাজির শ্যামল শোভা সকলেরই মন হরণ করে। পাংশু+ল=পাংশুল। —ভয়ে বালিকাটির মুখ পাংশুল বর্ণ ধারণ করিল। শীত+ল=শীতল। মঞ্জু+ল=মঞ্জুল। পিঙ্গ+ল=পিঙ্গল।

অন্যান্য সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

অ—(অণ্, অঞ্, ণ)—কুরু+অ=কৌরব। বুদ্ধ+অ=বৌদ্ধ। পতঞ্জল+অ=পাতঞ্জল। তিল+অ=তৈল। পৃথিবী+অ=পার্থিব।

তা, ত্ব—মূঢ়+তা=মূঢ়তা। সৎ+তা=সত্তা। সৎ+ত্ব=সত্ত্ব। স্ব+ত্ব=স্বত্ব। মহৎ+ত্ব=মহত্ত্ব।

য (ষ্যৎ)—নাসিকা+য=নাসিক্য। দন্ত+য=দন্ত্য। তালু+য=তালব্য। আদি+য=আদ্য।

বৎ—পিতৃ+বৎ=পিতৃবৎ। মিত্র+বৎ=মিত্রবৎ। বিষ+বৎ=বিষবৎ।

শ—লোম+শ=লোমশ। গিরি+শ=গিরিশ। কপি+শ=কপিশ।

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

আমি (মি)—ভাব, কর্ম বা অনুকরণ অর্থে এই প্রত্যয় হয়:

যথা, ছেলে+মি=ছেলেমি।—বয়স্ক লোকের ছেলেমি অনেক সময় দৃষ্টিকটু লাগে। ডেপো+মি=ডেপোমি।—ছেলেটি অল্পবয়সেই বড় ডেপোমি শুরু করেছে। কুঁড়ে+মি=কুঁড়েমি।—আজ আর কোনো কাজ করতে ইচ্ছা হচ্ছে না, শুধু কুঁড়েমি করতে ইচ্ছা হচ্ছে। বোকা+মি=বোকামি। ভাঁড়+আমি=ভাঁড়ামি।

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গেও আমি, মি প্রত্যয় যুক্ত হয়।

যথা, আর্য+আমি=আর্যামি। মূর্খ+আমি=মূর্খামি। নষ্ট+আমি=নষ্টামি। দুষ্ট+আমি=দুষ্টামি।

আর—১। (সংস্কৃত কার হইতে)—ব্যবসায়, বৃত্তি, পেশা ইত্যাদি অর্থে।

যথা, কাম+আর=কামার। চাম+আর=চামার।—সে একেবারে চামার, নিজের মার জন্যেও এক পয়সা খরচ করতে চায় না। দোহা+আর=দোহার।—মূল গায়েন যা গায় দোহার তাহার পুনরাবৃত্তি করে।

২। (সংস্কৃত আকার হইতে)—সংযোগ বা হ্রস্বতা বুঝাইতে। মাঝ+আর=মাঝার+ই=মাঝারি।

৩। (সংস্কৃত আগার হইতে)—ভাঁড়+আর=ভাঁড়ার। কাণ্ড+আর=কাণ্ডার।

আরি—১। (সংস্কৃত কার হইতে)—ব্যবসায়, বৃত্তি, পেশা ইত্যাদি অর্থে—শাঁখা+আরি=শাঁখারি, শাঁখারী।—ঢাকার শাঁখারীরা প্রসিদ্ধ। কাঁসা+আরি=কাঁসারি, কাঁসারী।—কাঁসারীরা কাঁসার দ্রব্যাদি নির্মাণ করে।

২। সংযোগ বা দ্বন্দ্বতা অর্থে:

মার+আরি=মারামারি। ঝি+আরি=ঝিআরি, ঝিয়ারী। 'ঝিআরি বলিয়া ডাক করিল সম্ভাষণ'—শূন্যপুরাণ।

আরু—(সংস্কৃত রূপ হইতে)—স্বার্থে। সাদৃশ্যার্থে এই প্রত্যয় হয়। শশ+আরু=শশারু। সেঁজা+আরু=সেঁজারু। বোমা+আরু=বোমারু।—বোমারু বিমানগুলি শত্রুপক্ষের শিবিরে বোমা ফেলিয়া আসিল। বাক্+আরু=বাগারু।—বাগারু ছেলেটি শুধু বড় বড় কথা বলে, কাজের মধ্যে অষ্টরম্ভা।

ই, ঈ—ভাব, কার্য, বৃত্তি, ব্যবসায়, জাতি, সম্বন্ধ প্রভৃতি বুঝাইতে এই প্রত্যয় হয়। জমিদার+ই=জমিদারি।—জমিদারদের জমিদারি আর এখন নেই। চালাক+ই=চালাকি।—চালাকি দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না। ঢাকা+ই=ঢাকাই।—ঢাকাই মসলিনের এককালে খুব কদর ছিল। সেলাম+ই=সেলামি।—আজকাল সেলামি না দিয়ে কোনো ঘরই পাওয়া যায় না। কাল+ই=কালি। ডাকাত+ই=ডাকাতি। ভাটিয়াল+ই=ভাটিয়ালি। বাদাম+ই=বাদামি।

ঢাক+ঈ=ঢাকী।—পূজার সময় ঢাকীদের ঢাকের বাজনা শুনতে বড়ই ভাল লাগে। বাঙ্গাল+ঈ=বাঙ্গালী।—উনিশ শতকে বাঙ্গালী সকল বিষয়ে পথ দেখিয়েছে। দরদ+ঈ=দরদী।—শরৎচন্দ্রের মত দরদী সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে খুব কমই এসেছেন। বেনারস+ঈ=বেনারসী।—বেনারসী শাড়ি আভিজাত্যের দিক দিয়ে এখনো শ্রেষ্ঠ। রাগ+ঈ=রাগী। দাম+ঈ=দামী। নাক+ঈ=নাকী। ভার+ঈ=ভারী। পাহাড়+ঈ=পাহাড়ী। দেশ+ঈ=দেশী। রাঢ়+ঈ=রাঢ়ী।

ছোট এই অর্থে অনেক স্থানে ই প্রত্যয় হয়। যথা, ছোরা—ছুরি। কাঠ—কাঠি। ঝোলা—ঝুলি। গুঁড়া—গুঁড়ি। যাঁতা—যাঁতি, জাঁতি।

ইয়া (এ)—কোন স্থানে উৎপন্ন কিংবা কোন স্থান হইতে আগত, তারিখ, উপজীবিকা, স্বভাব, কোন বস্তু হইতে নির্মিত বা তৎসম্পর্কিত ইত্যাদি বুঝাইতে এই প্রত্যয় হয়।

যথা, (ক) কোন স্থানে উৎপন্ন কিংবা কোন স্থান হইতে আগত: পাড়া-গাঁ+ইয়া=পাড়াগাঁইয়া—পাড়াগেঁয়ে।—পাড়াগেঁয়ে মানুষ সাধারণত একটু সরল হয়। শান্তিপুর+ইয়া=শান্তিপুরিয়া—শান্তিপুরে।—শান্তিপুরে

ও শাড়ির আদর এখনো যথেষ্ট রয়েছে। বর্ধমান+ইয়া=বর্ধমানিয়া—বর্ধমেনে।—বর্ধমেনে সীতাভোগ ও মিহিদানা খুবই মুখরোচক খাবার।

(খ) তারিখ: একুশ+ইয়া (এ)=একুশে। পঁচিশ+ইয়া (এ)=পঁচিশে। একত্রিশ+ইয়া (এ)=একত্রিশে।

(গ) উপজীবিকা: মোট+ইয়া=মোটিয়া—মুটিয়া (মুটে)। জাল+ইয়া জালিয়া—জেলে। 'জেলে ফেলে জাল'—রবীন্দ্রনাথ। কীর্তন+ইয়া=কীর্তনিয়া—কীর্তনিয়ার মধুর পালাকীর্তন গানে শ্রোতারা মুগ্ধ হ'ল।

(ঘ) কোন বস্তু হইতে নির্মিত বা তৎ সম্পর্কিত: মাটি+ইয়া=মাটিয়া—মেটে।—কৃষ্ণনগরের মেটে পুতুল দেখতে খুব সুন্দর। পাথর+ইয়া=পাথরিয়া—পাথরে (পাথুরে)।—পাথুরে রাস্তা, তাই গাড়ি জোরে চালান যায় না। বালি+ইয়া=বালিয়া—বেলে।

(ঙ) স্বভাব:

গোলমাল+ইয়া=গোলমালিয়া—গোলমেলে।—সে গোলমেলে লোক, তার সঙ্গে সাবধানে টাকাকড়ি নিয়ে লেনদেন করা উচিত। কাঁদন+ইয়া=কাঁদনিয়া>কাঁদুনে।—ছেলেটি বড় কাঁদুনে, দিন রাত কেঁদেই চলেছে। কোন্দল+ইয়া=কোন্দলিয়া—কুঁদুলে।—মেয়েটি কুঁদুলে, সকলের সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া করে। আমোদ+ইয়া=আমোদিয়া—আমুদে।—আমুদে লোককে সকলেই পছন্দ করে। রগড়+ ইয়া=রগড়িয়া—রগুড়ে। পোড়াকপাল+ইয়া=পোড়াকপালিয়া—পোড়াকপালে।

তুচ্ছার্থে ও আদরার্থে ব্যক্তি নামের সঙ্গে ইয়া (এ) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা, গোপালিয়া>গোপাইল্যা>গোপালে। রাখালিয়া>রাখাইল্যা>রাখালে। মানিক+ইয়া=মানিকিয়া>মাইনক্যা>মানকে।

উ—আদরে কিংবা ছোট এই অর্থে—কৃষ্ণ>কণ্‌হ>কান্‌হ>কান>কানু। বাপ+উ=বাপু। শিব+উ=শিবু। রাজ+উ=রাজু। রাম+উ=রামু।

উয়া>ও—তাহা হইতে উৎপন্ন অথবা তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই অর্থে: মাঠ+উয়া=মাঠুয়া—মেঠো।—কৃষকরা মেঠো ধান ঘরে নিয়ে আসছে। জল+উয়া=জলুয়া—জলো।—আজকালকার জলো দুধ খেয়ে শরীরের কোন পুষ্টি হয় না। বাত+উয়া=বাতুয়া—বেতো।—তিনি বেতো রোগী, চলাফেরা করতে তাঁর কষ্ট হয়। ভাত+উয়া=ভাতুয়া—ভেতো।—ভেতো বাঙালী বলে

বাঙালীদের একটা বদনাম আছে। দাঁত+উয়া=দাঁতুয়া>দেঁতো।—গৃহকর্তা দেঁতো হাসি হেসে সকলকে সম্বর্ধনা জানালেন।

তুচ্ছার্থে নামের উত্তর এই প্রত্যয় হয়। যথা, রাম+উয়া—রামুয়া—রেমো। যত্ন+উয়া=যত্নুয়া—যেদো।

উক—এই প্রত্যয় যুক্ত করিয়া বিশেষণ শব্দ গঠন করা হয়। যথা: পেট+উক=পেটুক।—পেটুক লোকে নেমন্তন্ন পেলে আনন্দে আটখানা হয়। মিথ্যা+উক=মিথ্যুক।—মিথ্যুক কোথাকার, আমি কখনো এ কথা তোমাকে বলিনি। লাজ+উক=লাজুক।—লাজুক মেয়েটি লোকের সামনে আসতেই লজ্জা পায়।

টিয়া (টে)—সাদৃশ্য বুঝাইতে সাধারণত এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ভাড়া+টিয়া—ভাড়াটিয়া—ভাড়াটে।—বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটের গোলমাল লেগেই আছে। পাগলা+টিয়া=পাগলাটিয়া—পাগলাটে।—পাগলাটে লোকটি এখানে এসে প্রায়ই আবোল তাবোল ব'কে যায়। ঘোলা+টিয়া=ঘোলাটিয়া—ঘোলাটে। তামা+টিযা=তামাটিয়া—তামাটে।—রোদে রোদে ঘুরে তোমার চেহারা তামাটে হয়ে গেছে। ক্ষ্যাপা+টিয়া=ক্ষ্যাপাটিয়া—ক্ষ্যাপাটে। বখা+টিয়া=বখাটিয়া—বখাটে।—ছেলেটি একেবারে বখাটে হয়ে গেছে।

পারা, পানা—সাদৃশ্যার্থে:

যথা: চাঁদ+পারা=চাঁদপারা।—মা ছেলের চাঁদপারা মুখ দেখে সব দুঃখ ভুলে যান। পাগল+পারা=পাগলপারা।—তোমাকে অনেকদিন না দেখে আমি পাগলপারা হয়ে গেছি। হাঁড়ী+পারা=হাঁড়ীপারা।—কাজের কথা বললে সে মুখখানা হাঁড়ীপারা করে ফেলে।

রোগা+পানা=রোগাপানা।—রোগাপানা চেহারার লোকটি কাল এসেছিল। ফরসা+পানা=ফরসাপানা।—ফরসাপানা ছেলেটি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। চাঁদ+পানা=চাঁদপানা। লম্বা+পানা=লম্বাপানা। বেঁটে+পানা=বেঁটেপানা। লাল+পানা=লালপানা।

বন্ত, মন্ত—আছে এই অর্থে:

যথা: ভাগ্য+বন্ত—ভাগ্যবন্ত।—ভাগ্যবন্ত ব্যক্তি যে কাজ করে তাতেই সাফল্য লাভ করে। ফল+বন্ত=ফলবন্ত।—ফলবন্ত বৃক্ষ ফলের ভারে সব সময়ে নত হ'য়ে থাকে। গুণ+বন্ত=গুণবন্ত।—প্রকৃত গুণবন্ত মানুষ নিজের

গর্ব কখনো করেন না। শ্রী+মন্ত=শ্রীমন্ত।—ছেলেটি যথার্থই শ্রীমন্ত, সকলেই তাকে ভালবাসে। পয়+মন্ত=পয়মন্ত।—রামবাবুর পুত্রটি বেশ পয়মন্ত, জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করেছেন। বুদ্ধি+মন্ত= বুদ্ধিমন্ত।—শিক্ষক মহাশয় বুদ্ধিমন্ত বালকটির খুব প্রশংসা করলেন।

অন্যান্য বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

অট (ট)—দাপ+অট=দাপট। ঝাপ+অট=ঝাপট। ভরা+ট= ভরাট।

আ—বাঘ+আ=বাঘা। চাঁদ+আ=চাঁদা। রোগ+আ=রোগা। জল+আ=জলা।

আই—চোর+আই=চোরাই। মোগল+আই=মোগলাই।

আউয়া—ঘা+উয়া=ঘাউয়া—ঘেয়ো। গাঁ+উয়া=গাঁউয়া—গেঁয়ো।

আল—দাঁত+আল=দাঁতাল। শাঁস+আল=শাঁসাল। ছুঁচ+আল =ছুঁচাল।

আলা, ওয়ালা—সিঁধ+আল=সিঁধাল—সিঁধেল। ঘোষ+আল= ঘোষাল। বাড়ি+ওয়ালা=বাড়িওয়ালা। বাসন+ওয়ালা=বাসন-ওয়ালা। পাহারা+ওয়ালা=পাহারাওয়ালা।

আলি—নাগর+আলি=নাগরালি। মিতা+আলি=মিতালি। ঠাকুর +আলি=ঠাকুরালি। সোনা+আলি=সোনালি।

ক, কা, কি—ঢোল+ক=ঢোলক। দম+কা=দমকা, বড়+কী= বড়কী।

ড়, ড়া, ড়ি—ভাদ+ড়=ভাদড় চাম+ড়া=চামড়া। আঁক+ড়ি= আঁকড়ি

ড়িয়া, ড়ে—চাষা+ড়িয়া=চাষাড়িয়া—চাষাড়ে। সাপ+ড়িয়া=সাপড়িয়া— সাপুড়ে। বাসা+ড়িয়া=বাসাড়ে।

ত, তা, তি, তো—মামা+ত=মামাত। জেঠা+ত=জেঠাত। পিস +তুতো=পিসতুতো।

পনা—গিন্নি+পনা=গিন্নিপনা। সতী+পনা=সতীপনা। দুরন্ত+পনা =দুরন্তপনা।

স, সা, সী, ছা, চা, ছিয়া, চিয়া—মুখ+স=মুখস। ঝাপ+সা= ঝাপসা। লাল+চে=লালচে।

বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়

আনা—অভ্যাস বা স্বভাব বুঝাইবার জন্য এই প্রত্যয় হয় :

সাহেবী+আনা=সাহেবীয়ানা।—ভারত স্বাধীন হ'লেও অনেকের ঘরে সাহেবীয়ানা পুরোপুরি বজায় রয়েছে। মুন্‌শি+আনা=মুন্‌শিয়ানা।—তার লেখায় বেশ মুনশিয়ানা আছে। বাবু+আনা=বাবুয়ানা।—বাপের অনেক পয়সা আছে, সেজন্য ছেলেটি খুব বাবুয়ানা করে বেড়াচ্ছে। বিবি+আনা=বিবিয়ানা। হিন্দু+আনা=হিন্দুয়ানা।

আনি—আনা প্রত্যয় যে-অর্থে ব্যবহৃত হয় আনি প্রত্যয়ও সেই অর্থেই প্রয়োগ করা হয়।

যথা, হিন্দু+আনি=হিন্দুয়ানি।—বিদেশ থেকে এসেও তিনি হিন্দুয়ানি বজায় রেখেছেন। বাবু+আনি=বাবুয়ানি।

ওয়ালা—হিন্দী ওয়ালা প্রত্যয় এখন বাংলা আলা প্রত্যয়ের স্থানে ব্যবহৃত হইতেছে। কোন বিশেষ স্থানের সঙ্গে সম্বন্ধ, পেশা, ব্যবসায় প্রভৃতি বুঝাইতে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। আগরা+ওয়ালা=আগরাওয়ালা—আগরওয়ালা।—কলকাতায় আগরওয়ালা উপাধিধারী অনেক ধনী ব্যবসায়ী আছেন। গাড়ি+ওয়ালা=গাড়িওয়ালা।—গাড়িওয়ালা তার গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। ঘোড়া+ওয়ালা=ঘোড়াওয়ালা।—ঘোড়াওয়ালা তার ঘোড়াটি বিক্রী করবার জন্য নিয়ে এসেছে।

ওয়ান (আন)—আছে কিংবা পেশা অর্থে এই প্রত্যয় হয় :

যথা, গাড়ি+ওয়ান=গাড়িওয়ান—গাড়োয়ান।—গাড়োয়ান গান গাইতে গাইতে তার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। দ্বার+ওয়ান=দ্বারোয়ান—দরওয়ান।—দরওয়ানটি রাতে দোকানে পাহারা দেয়।

খানা—আগার বা দোকান অর্থে :

যথা, চিড়িয়া+খানা=চিড়িয়াখানা।—চিড়িয়াখানায় হরেক রকমের পাখী ও জীবজন্তু রয়েছে। ডাক্তার+খানা=ডাক্তারখানা।—অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে সে ডাক্তারখানায় গেল। ছাপা+খানা=ছাপাখানা।—ছাপাখানায় এখন দিনরাত কাজ চলছে। মুসাফির+খানা=মুসাফিরখানা। পিল+খানা=পিলখানা। বৈঠক+খানা=বৈঠকখানা। শুঁড়ি+খানা=শুঁড়িখানা।

খোর—আসক্ত অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় :

যথা, আফিং+খোর=আফিংখোর।—আফিংখোর কমলাকান্তের মুখে

দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লঘুভাবে প্রকাশ করেছেন। গাঁজা+খোর=গাঁজাখোর।—গাঁজাখোর লোকটি গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে। ঘুষ+খোর=ঘুষখোর।—ঘুষখোর লোক সমাজের কলঙ্ক। গুলি+খোর=গুলিখোর। তামাক+খোর=তামাকখোর। চশম+খোর=চশমখোর।

গর—যে করে বা গড়ে এই অর্থে :

যথা, কারি+গর=কারিগর।—কারিগরটি সুন্দর সুন্দর খেলনা তৈরী করতে পারে। বাজী+গর=বাজীগর।—বাজীগর নানা রকম খেলনা তৈরী করছে। সওদা+গর=সওদাগর।—চাঁদ সওদাগরের কাহিনী 'মনসামঙ্গলে'র মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

চি—আধার অর্থে :

ধূনা+চি=ধূনাচি—ধূনোচি। ডেক+চি=ডেকচি।—নিমন্ত্রণের রান্নার জন্য অনেক ডেকচি আনা হয়েছে।

ব্যবসায়ী অর্থে :

মশাল+চি=মশালচি।—বিসর্জনের শোভাযাত্রায় অনেক মশালচি মশাল নিয়ে যায়। তবলা+চি=তবলাচি—তবলচি।—বড় ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গত করতে হলে ভাল তবলচি না হলে চলে না। কলম+চি=কলমচি।

দান, দানি—আধার অর্থে :

দোয়াত+দান=দোয়াতদান। কলম+দান=কলমদান। নস্য+দান=নস্যদান। বাতি+দান=বাতিদান। ফুল+দানি=ফুলদানি। পা+দানি=পাদানি। ধূপ+দানি=ধূপদানি।

দার—(ক) আছে এই অর্থে :

দোকান+দার=দোকানদার।—দোকানদারটি সৎ বলে তার দোকানে এসে ক্রেতারা ভিড় করে। জমি+দার=জমিদার।—আগেকার জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ প্রজাপীড়ক ছিলেন বটে কিন্তু গ্রামের অনেক ভালো কাজও তাঁরা করতেন। ভাগী+দার=ভাগীদার।—পিতার সম্পত্তির আর কোনো ভাগীদার না থাকাতে অমল পিতার মৃত্যুর পর অনেক টাকার মালিক হয়েছে। জোত+দার=জোতদার। তালুক+দার=তালুকদার।

(খ) বৃত্তি বা পেশা বুঝাইবার জন্য :

বাজন+দার=বাজনদার।—বাজনদার এমন ভালো বাজনা বাজাতে লাগল যে শ্রোতারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। চৌকি+দার=চৌকিদার।—চৌকিদার

হাঁক দিয়ে গ্রামের পথে পাহারা দিচ্ছে। ছড়ি+দার=ছড়িদার।—ছড়িদার তীর্থযাত্রীদের পথ দেখিয়ে তীর্থস্থানে নিয়ে যাচ্ছে।

গিরি—ভাব, বৃত্তি, স্বভাব, আচরণ প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য এই প্রত্যয় হয়। যথা, বাবু+গিরি=বাবুগিরি।—নোতুন পয়সার মুখ দেখে সে খুব বাবুগিরি করছে। গুরু+গিরি=গুরুগিরি।—পাণ্ডিত্যে, চরিত্রবত্তায় সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারলেই গুরুগিরি করা চলে। নেতা+গিরি=নেতাগিরি।—আজকাল কেউ কাউকে মানতে চায় না, সকলেই নেতাগিরি করতে চায়। পাণ্ডা+গিরি= পাণ্ডাগিরি। কেরাণী+গিরি=কেরাণীগিরি। সাধু+গিরি=সাধুগিরি। গুণ্ডা+গিরি=গুণ্ডাগিরি।

নবিশ—পটু বা অভিজ্ঞ এই অর্থে:

নকল+নবিশ=নকলনবিশ।—ভালো ভাবে পড়াশুনা না করে শুধু নকলনবিশ হয়েই আজকাল অনেক ছেলেমেয়ে পরীক্ষা পাস করতে চায়। হিসাব+নবিশ= হিসাবনবিশ।—হিসাবনবিশ রূপে মাধববাবুর নাম আছে, সেজন্য অনেকেই তাঁকে হিসাব পরীক্ষা করবার জন্য আহ্বান করেন। শিক্ষা+নবিশ=শিক্ষানবিশ। পত্র +নবিশ=পত্রনবিশ।

বাজ—স্বভাব, অভ্যাস প্রভৃতি অর্থে:

যথা, চাল+বাজ=চালবাজ।—তার মত চালবাজ লোক খুব কমই দেখা যায়, তার কথার কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা তা বোঝাই মুশকিল। দাঙ্গা +বাজ=দাঙ্গাবাজ।—আজকাল দাঙ্গাবাজ লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফুর্তি+বাজ=ফুর্তিবাজ।—শ্রীধরবাবু বেশ ফুর্তিবাজ লোক, তার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। ফাঁকি+বাজ=ফাঁকিবাজ। ধাপ্পা+বাজ=ধাপ্পাবাজ। ধোঁকা+বাজ=ধোঁকাবাজ। গুল+বাজ=গুলবাজ। ফন্দি+বাজ= ফন্দিবাজ।

অনুশীলনী

১। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। বাংলা ও সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও।

২। নিম্নলিখিত বাংলা কৃৎপ্রত্যয়গুলি কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটি প্রত্যয় লইয়া শব্দ গঠন কর: অন, আরি, উনি, ত, তি।

৩। প্রত্যয় নির্ণয় কর: বর্তমান, সৎ, বর্ধিষ্ণু, জামাতা, নায়ক, চলৎ, ম্রীয়মান।

৪। কৃদন্ত শব্দটি গঠন কর :

যচ্+শানচ (কর্মবাচ্যে), অপ-সৃ+শানচ, চর+ইষ্ণু,জনি+ণক, হন+ণক, বৃধ্+ইষ্ণু, কৃ+তৃ, বুধ+তৃ।

৫। অশুদ্ধি সংশোধন কর : অভিনেতাগণ, মৃয়মাণ, জলদগ্নি, গৃহীতা, শোসক।

৬। অপত্য অর্থে কোন্ কোন্ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, উল্লেখ কর। ঐ প্রত্যয়গুলি দ্বারা শব্দ গঠন কর।

৭। প্রত্যয় নির্ণয় কর :

বাৎস্যায়ন, দ্বৈপায়ন, সামুদ্রিক, ঐহিক, দ্রৌণি, আর্জুনি, লজ্জিত, রোমাঞ্চিত, সুখী, গুণী, চিন্ময়, ধনবান, শ্রীমতী, ভাগিনেয়, আতিথেয়, পয়স্বিনী, মায়াবী।

৮। অশুদ্ধি সংশোধন কর : গুণীগণ, তেজস্বীনী, শ্রীমতি, সম্মুখিন, কুলিন, নিলীমা, সংস্কৃতিবান, মধুবান, আয়ুষ্মতি, সৌমিত্রী, পারলৌকিক।

৯। নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির অর্থ উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটি লইয়া শব্দ গঠন কর :

আমি, টিয়া, পারা, আরু, ঈ, আনা, খানা, খোর, দানি, দার, নবিশ, গিরি।

১০। প্রত্যয় নির্ণয় কর।

কবিয়াল, আড়াল, ছাওয়াল, ধূর্তামি, ভাতুরে, একপেশে, ছোঁয়াচে, মেয়েলিপনা, মেঘলা, হিংসুক, দপ্তরখানা ভাঙখোর, কর্তাগিরি, কলমচি, শিক্ষানবিশ, ধাপ্পাবাজ, জমাদার, পিলখানা, কলমদানি।

১১। এক শব্দে প্রকাশ কর :

গাঁজা খায় যে, দাঙ্গা বাধাইতে যে পটু, ধী আছে যাহার, বক্রতার ভাব, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া, পঙ্ক আছে যাহার, লঘুতার ভাব, অলঙ্কারশাস্ত্র জানেন যিনি, সর্বজনের হিতকর, প্রাতঃকালে ঘটিত, শক্তি আছে যাহার, কুন্তীর পুত্র, ঘুষ ভাঙ্গায় যে, আষাঢ় সম্পর্কীয়, বোকার ভাব, গুণ্ডার ভাব, সহ্য করা যাহার স্বভাব, যাহা সৃষ্টি করা হইতেছে, যাহা উড়িতেছে, যাহা লইয়া যাওয়া হইতেছে, যে শোষণ করে, যাহা চলিতেছে, গায় যে, যাহা উঠিতেছে, যাহা চলে, ডুবিতে দক্ষ, মেশা যাহার স্বভাব।

১২। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বাক্যে প্রয়োগ কর :

যাওন, চলন্ত, দীপ্যমান, অপেক্ষমাণ, গমিষ্ণু, অধিষ্ঠাতা, জেগোমি, নষ্টামি, দোহার, ঢালী, আঁদুরে, রায়বেঁশে, পোড়াকপালে, বারমেসে, বেহায়াপনা, ফরসাপানা, আণবিক, মাধ্যমিক, মৃণালিনী, মানী, উর্বর, আয়ুষ্মতী।

উপসর্গ

কতকগুলি অব্যয় ধাতুর পূর্বে বসিয়া ধাতুর অর্থ পরিবর্তন করে এবং নূতন শব্দ গঠন করে। ঐ অব্যয়গুলিকে উপসর্গ বলে। সংস্কৃতে মোট কুড়িটি উপসর্গ আছে; যথা, প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ।

প্র

প্রণাম, প্রহার, প্রদান, প্রচার, প্রণয়, প্রচলন, প্রবেশ, প্রলাপ, প্রলয়, প্রকাশ, প্রভাস, প্রদর্শন, প্রস্থান ইত্যাদি। যথা,

১। **প্রলয়** নাচন নাচলে যখন। —রবীন্দ্রনাথ

২। পুত্রের সাফল্যে মাতার আনন্দ শুধু কেবল বিগলিত অশ্রুধারার মধ্যে **প্রকাশ** পাইল।

পরা

পরাভব, পরাজয়, পরাক্রম পরাগতি। যথা,

১। যুদ্ধে জয় **পরাজয়** আছেই, পরাজয়ে ভগ্নোদ্যম না হইয়া নির্ভীক সৈনিক চূড়ান্ত জয়ের জন্য সংগ্রাম করে।

২। আলেকজাণ্ডার পুরুর **পরাক্রমে** চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

অপ

অপকার, অপলাপ, অপবাদ, অপহরণ, অপমান, অপচয়, অপকর্ষ ইত্যাদি। যথা,

১। **অপমানে** হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান। —রবীন্দ্রনাথ

২। এই দুর্মূল্যের দিনে জিনিসপত্রের **অপচয়** করা উচিত নহে।

সম্

সংলাপ, সংবর্ত, সঙ্গম্, সংগ্রহ, সংহার সঞ্চয়, সঞ্চালন, সম্ভাষণ ইত্যাদি। যথা,

১। **সংলাপের** মধ্য দিয়া নাটকের কাহিনী উপস্থাপিত হয়।

২। ত্রিবেণী **সঙ্গমে** স্নান করিবার জন্য বহু পুণ্যার্থীর সমাগম হয়।

নি

নিগম, নিগ্রহ, নিদান, নিপাত, নিবাস, নিবর্তন, নিলয়, নিরোধ, নিয়োগ ইত্যাদি। যথা,

১। বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে **নিয়োগ** করা হইয়াছিল।

২। আপনার **নিবাস** কোথায়?

অব

অবসাদ, অবকাশ, অবজ্ঞা, অবধান, অবলোপ, অবতরণ, অবগাহন, অবসর ইত্যাদি। যথা,

১। পূজার **অবকাশে** এবার দার্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

২। দেবতারা মাঝে মাঝে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে **অবতরণ** করেন।

অনু

অনুগমন, অনুসরণ, অনুভব, অনুবাদ, অনুশোচনা, অনুনয়, অনুমান, অনুবর্তন, অনুরোধ। যথা,

১। এখন আর **অনুশোচনা** করিয়া লাভ নাই, এ সম্পর্কে পূর্বেই সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

২। সীতা বনবাসে রামচন্দ্রের **অনুগমন** করিয়াছিলেন।

নির্

নির্গম, নিঃসরণ, নির্দেশ, নির্ণয়, নিরসন। যথা,

১। শিক্ষক মহাশয়ের **নির্দেশ** অনুযায়ী ছাত্রগণ পড়াশুনা করিতেছে।

২। নাবিকরা ঘন কুয়াসার জন্য দিক **নির্ণয়** করিতে পারিল না।

দুর্

দুর্গম, দুষ্কর, দুর্দম, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, দুর্লক্ষ্য, দুস্তর, দুরদৃষ্ট, দুর্ঘটনা, দুষ্পাচ্য, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি। যথা,

১। **দুর্গম** গিরি কান্তার মরু-দুস্তর পারাবার। —নজরুল

২। হে **দুর্দম**, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন —রবীন্দ্রনাথ

বি

বিকার, বিহার, বিগ্রহ, বিধান, বিরস, বিনয়, বিবাদ, বিবর্তন, বিজয়, বিলাপ, বিরোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি। যথা,

১। **বিজয়মালা** এনো আমার লাগি —রবীন্দ্রনাথ

২। পুত্রহারা জননীর কাতর বিলাপে পাষাণ পর্যন্ত **বিগলিত** হয়।

অধি

অধিকার, অধিবাস, অধিবেশন, অধিষ্ঠান, অধিরোহণ ইত্যাদি। যথা,

১। আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে। —ছেলে ভুলানো ছড়া

২। আমরা আজকাল অধিকারবোধে যতখানি সচেতন, দায়িত্ববোধে ততখানি সচেতন নই।

সু

সুগম, সুলভ, সুসহ, সুধীর, সুপ্রাপ্য, সুশীল, সুনিবিড়, সুস্থির ইত্যাদি। যথা,

১। আজকাল কোন জিনিসই সুলভ নহে।

২। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।—রবীন্দ্রনাথ

উৎ

উন্নত, উত্তাপ, উৎপাত, উৎক্ষেপ, উত্থান, উদ্ধার, উদ্বাহ, উদ্বন্ধন, উল্লম্ফন ইত্যাদি। যথা,

১। বল বীর, বল উন্নত মম শির —নজরুল

২। জয় নব উত্থান —নজরুল

পরি

পরিহার, পরিবর্তন, পরিধান, পরিণয়, পরিতোষ, পরিবেশ, পরিতাপ, পরীক্ষা, পরিপাক। যথা,

১। দুর্জনের সংসর্গ সর্বদা পরিহার করা উচিত।

২। মানুষের স্বভাব পরিবেশের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবান্বিত হয়।

প্রতি

প্রতীক্ষা, প্রতিদান, প্রত্যর্পণ, প্রতিজ্ঞা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিকার, প্রতিযোগিতা। যথা,

১। শবরী দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

২। আঘাতের পর আঘাত খাইয়া আমাদের প্রতিরোধ শক্তি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

অভি

অভিযান, অভিসার, অভিজ্ঞান, অভিনয়, অভিধান, অভিমান, অভীপ্সা, অভিভাষণ, অভিযোগ ইত্যাদি। যথা,

১। নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদমত্তা —রবীন্দ্রনাথ

২। শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযানের বর্ণনা বিশেষ চমকপ্রদ।

অতি

অতিক্রম, অতিসার, অত্যুক্তি, অতিবৃষ্টি, অতীন্দ্রিয় ইত্যাদি। যথা,

১। পরীক্ষায় অভিজিতকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই।

২। আমাদের দেশে কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো বা অতিবৃষ্টি লাগিয়াই আছে।

অপি

অপিধান, অপিনদ্ধ।

উপহার, উপরোধ, উপবাস, উপনয়ন, উপদেশ, উপগ্রহ, উপক্রম, উপকার, উপেক্ষা ইত্যাদি। যথা,

১। কথায় বলে না, উপরোধে ঢেঁকিও গেলে।

২। চোরটি পলাইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু সে ধরা পড়িয়া গেল।

আ

আহার, আগমন, আকার, আকাশ, আক্রমণ, আক্ষেপ, আগ্রহ, আজ্ঞা, আদান, আবাস, আবেশ, আশ্বাস, আবর্তন, আলয়, আদেশ ইত্যাদি। যথা,

১। আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল। —রবীন্দ্রনাথ

২। এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেশ হিল্লোলে পুষ্পদল চুমি।

—রবীন্দ্রনাথ

উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থান্তর সাধন ও নূতন শব্দ গঠন

√ঈক্ষ—(প্র-) প্রেক্ষা, (সম্-) সমীক্ষা, (অপ-) অপেক্ষা, (প্রতি-) প্রতীক্ষা, (নির-) নিরীক্ষা, (উপ-) উপেক্ষা।

√কৃ—(প্র-) প্রকার, (আ-) আকার, (বি-) বিকার, (উপ-) উপকার, (অধি-) অধিকার, (অপ-) অপকার, (সম্-) সংস্কার, (প্রতি-) প্রতিকার।

√ক্ষিপ—(আ-) আক্ষেপ, (প্র-) প্রক্ষেপ, (সম্-) সংক্ষেপ, (নি-) নিক্ষেপ, (বি-) বিক্ষেপ, (উৎ-) উৎক্ষেপ।

√গম্—(আ-) আগমন, (নির্-) নির্গমন, (অনু-) অনুগমন।

√চর্—(আ-) আচার, (বি-) বিচার, (প্র-) প্রচার, (সম্-) সঞ্চার, (অভি-) অভিচার, (উপ-) উপচার।

√গ্রহ—(আ-) আগ্রহ, (সম্-) সংগ্রহ, (নি-) নিগ্রহ, (অনু-) অনুগ্রহ, (বি-) বিগ্রহ, (উপ-) উপগ্রহ।

√দা—(আ-) আদান, (প্র-) প্রদান, (নি-) নিদান, (অব-) অবদান, (অনু-) অনুদান, (প্রতি-) প্রতিদান।

√নী—(প্র-) প্রণয়, (অনু-) অনুনয়, (নির্-) নির্ণয়, (বি-) বিনয়, (পরি-) পরিণয়, (অভি-) অভিনয়।

√বৃৎ—(আ-) আবর্তন, (প্র-) প্রবর্তন, (সম্-) সংবর্তন, (নি-) নিবর্তন, (অনু-) অনুবর্তন, (বি-) বিবর্তন, (পরি-) পরিবর্তন।

√ভূ—(পরা-) পরাভব, (সম্-) সম্ভব, (অনু-) অনুভব. (বি-) বিভব, (উৎ-) উদ্ভব।

√যুজ্—(প্র-) প্রয়োগ, (সম্-) সংযোগ, (নি-) নিয়োগ, (অনু-) অনুযোগ, (বি-) বিয়োগ, (সু-) সুযোগ, (উৎ-) উদ্‌যোগ, (অভি-) অভিযোগ, (উপ-) উপযোগ।

√সৃ—(আ-) আসার, (প্র-) প্রসার, (অভি-) অভিসার, (অনু) অনুসার।

√হৃ—(আ-) আহার, (প্র-) প্রহার, (বি-) বিহার, (উপ-) উপহার, (সম্-) সংহার।

বাংলা উপসর্গ

বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত বহু অসংস্কৃত শব্দে কতকগুলি অব্যয় বা অব্যয়রূপী শব্দকে সাধিত শব্দের পূর্বে দেখা যায়। ইহাদিগকে বাংলা উপসর্গ বলে। যথা,

অ—(না বা মন্দ অর্থে)—অবুঝ, অ-বলা, অদিন, অকাল, অকাজ, অকুলান, অগুণতি, অচেল, অবেলা, অঘটন।

১। অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আঙিনা পরে। —রবীন্দ্রনাথ

২। অকাজের কাজ যত, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। —রবীন্দ্রনাথ

আ—(না বা মন্দ অর্থে)—আগাছা, আলুনি, আপাকা, আকাড়া, আকাঠ, আধোয়া।

১। আগাছা দূর করলে ক্ষেতে ভাল শস্য হয়।

২। আপাকা ফলটি খুবই টক লাগল।

অনা—(না বা মন্দ অর্থে) অনামুখ, অনাছিষ্টি।

১। এ-সব অনাছিষ্টির ব্যাপার শুনলে অবাক হতে হ

২। ওই অনামুখটি দেখলেই সারাদিন আমার খারাপ যায়।

কু—(খারাপ অর্থে)—কুকাজ, কুদিন, কুকথা, কুসংবাদ।

১। কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ —ভারতচন্দ্র

২। আজ কুদিন, আজ রওনা হওয়া উচিত হবে না।

না—(না অর্থে)—না-টক, না-মিষ্টি, না-বলা, না-মঞ্জুর, না-হক, না-পাওয়া, না-দেখা, না-করা।

১। অফিসের বড় সাহেব দরিদ্র কেরাণীর আবেদন **না-মঞ্জুর** ক'রে দিলেন।

২। ফলটি **না**-টক, না-মিষ্টি।

দর—(ঈষৎ অর্থে)—দরকাঁচা, দরপাকা, দরবিগলিত।

১। তাহার গণ্ডদিয়া **দরবিগলিত** ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল।

ভর—ভরপেট, ভরসন্ধ্যা, ভরদিন।

১। **ভরপেট** খাওয়ার পর আর নাড়াচড়া করতে পারছি না।

২। এই **ভরসন্ধ্যায়** বাগানের মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না।

হা—(অভাব অর্থে)—হাভাতে, হাপুত, হাঘরে।

১। এমন **হাভাতে** লোকও দেখি নি, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পাত পেতে বসে পড়বে।

২। **হাপুতির** পুত্র যেন দরিদ্রের কড়ি —কাশীরাম দাসের মহাভারত

স—(সহিত অর্থে)—সজোর, সঠিক ইত্যাদি

বিদেশী উপসর্গ

আরবী, ফারসী ও ইংরেজী ভাষা হইতে আগত অনেক শব্দ বাংলা উপসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা,

খাস—(নিজস্ব)—খাস মহল, খাস কামরা, খাসজমি।

১। আগেকার বাদশাহদের অন্দরমহলকে **খাসমহল** বলা হত।

২। সরকারের অনেক **খাসজমি** জনসাধারণের মধ্যে এখন বিলি করা হচ্ছে।

গর—(না বা বিপরীত অর্থে)—গরহাজির, গরমিল, গররাজি, গরপছন্দ।

১। আজকাল অনেকেই অফিসে ঠিক সময়ে **গরহাজির** থাকে।

২। হিসাবের **গরমিল** হচ্ছে, কিছুতেই মিলছে না।

নিম—(অর্ধ, অল্প ইত্যাদি অর্থে)—নিমরাজি, নিমখুন, নিমহাকিম।

১। অনেক অনুরোধ করার পর সে আমার সঙ্গে আসতে **নিমরাজি** হয়েছে।

২। অনেক **নিমহাকিমের** হাতে প'ড়ে রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

ব—(সহিত অর্থে)—বকলম, বমাল, বনাম।

১। **বমাল** ধরা প'ড়ে গেছি, এখন যা করহ হরি। —রজনীকান্ত সেন

বি, বে—(না অর্থে)—বিজোড়, বিভুঁই, বেবন্দোবস্ত, বেহিসাব, বেহাত, বে-সামাল।

১। বিদেশ **বিভুঁই**-এ সব সময়ে সতর্ক থাকতে হয়।

২। মাতালটি মদ খেয়ে **বেসামাল** হয়ে পড়েছিল।

পাতি—(ছোট অর্থে)—পাতিলেবু, পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিকাক, পাতিভাঁড়।

ফি—(প্রত্যেক)—ফি বছর, ফি রোজ, ফি দিন, ফি সন।

১। নৌকা **ফি** সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

২। তোমার বন্ধু **ফি** রোজ এসে এসে ফিরে যাচ্ছে, তোমার দেখা পাচ্ছে না।

বদ—(খারাপ অর্থে)—বদলোক, বদ মতলব, বদ হজম, বদ নাম, বদ রাগী, বদমেজাজ।

১। সমাজবিরোধী লোকটির নিশ্চয়ই কোনো **বদমতলব** আছে, সেজন্যে আশে পাশে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াচ্ছে।

২। ভদ্রলোকের সব ভালো, তবে একটু **বদরাগী**।

হর—(প্রত্যেক)—হররোজ, হরবোলা, হরেক, হরমাল, হরঘড়ি।

১। পাখীটি **হরবোলা**, সব রকম কথা বলতে পারে।

ফুল—(Full)—ফুলবাবু, ফুলহাতা, ফুলটিকিট।

১। বাপের প্রচুর টাকা হাতে পেয়ে চঞ্চল এখন **ফুলবাবু** হয়ে চলাফেরা করে।

হেড—(Head)—হেড পণ্ডিত, হেড-অপিস, হেডমিস্ত্রী, হেডকেরাণী।

হাফ—হাফ হাতা, হাফ আখড়াই, হাফ টিকিট।

অনুসর্গ

কতকগুলি অব্যয় বিভক্তির পরিবর্তে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে বসিয়া বিভক্তির কাজ চালায়। এই জাতীয় অব্যয়কে অনুসর্গ বলা হয়।

অপেক্ষা—অনন্ত **অপেক্ষা** বসন্ত বয়সে বড়।

চাইতে—ইউরোপে ফরাসী ভাষার **চাইতে** এখন ইংরেজী ভাষার প্রচলন বেশি।

চেয়ে—ইহার **চেয়ে** হতেম যদি আরব বেদুইন। —রবীন্দ্রনাথ

থেকে—এ বিপদ **থেকে** রক্ষা পাবার জন্য আর্টের চর্চা আবশ্যক।

—প্রমথ চৌধুরী

কারণে—পরের **কারণে** স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন মন সকলই দাও।

—কামিনী রায়

জন্য—অসুখের **জন্য** স্কুলে যেতে পারি নি।

হেতু—অসুস্থতা **হেতু** আমি বিবাহে উপস্থিত হইতে পারি নাই।

তরে—তোমা **তরে** সখী, বলো করিব কী? —রবীন্দ্রনাথ

লাগি—কি **লাগি** কাঁদিছ? —রবীন্দ্রনাথ

ছাড়া—কানু **ছাড়া** গীত নাই।

বই—তোমা **বই** আর জানি না।

বিনা—**বিনা** স্বদেশের ভাষা পুরে কি আশা?

উপর, উপরে—১। বোঝার **উপর** শাকের আঁটি।

২। মাথার **উপরে** যিনি বসে রয়েছেন তিনি সব দেখছেন।

নিকট, নিকটে—আমার **নিকটে** আর একটি পয়সাও নেই যে তোমাকে ধার দেব।

নীচে—নীচে, সবার **নীচে** যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন।

—রবীন্দ্রনাথ

ভিতর, ভিতরে—আঁতকে উঠে দেখলাম, ঘরের **ভিতরে** প্রকাণ্ড একটি সাপ।

মাঝে—সীমার **মাঝে** অসীম তুমি বাজাও আপন সুর। —রবীন্দ্রনাথ

মধ্যে—ঘরের **মধ্যে** ঘর,

তারই **মধ্যে** বসে আছে পরমেশ্বর।

কাছে—তোমার **কাছে** আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা। —রবীন্দ্রনাথ

পাশে—দুর্দিনে যে **পাশে** থাকে সেই প্রকৃত বন্ধু।

সঙ্গে—মন্দ ছেলের **সঙ্গে** কখনো মেশা উচিত নয়।

সাথে—কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের **সাথে**। —রবীন্দ্রনাথ

মত, মতন—তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের **মত**। —রবীন্দ্রনাথ

বলিয়া (বলে)—১। কৃপণ **বলিয়া** তার অখ্যাতি আছে।

২। তুমি আমার বন্ধু **বলে** খাতির করব না।

দ্বারা—কুঠারের **দ্বারা** গাছ কাটা হইতেছে।

দিয়া, দিয়ে—তোমাকে **দিয়ে** এ-কাজ কখনই হবে না।

করিয়া, ক'রে—আগে পালকিতে **ক'রে** যাতায়াত হত।

হইতে, হ'তে—মেঘ **হ'তে** বৃষ্টি হয়।

অনুশীলনী

১। সংস্কৃত উপসর্গগুলির নাম কর এবং প্রত্যেকটিকে এক একটি শব্দে প্রয়োগ কর।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির আগে বিভিন্ন উপসর্গ প্রয়োগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক শব্দ গঠন কর:
নত, রাগ, রত, স্থিত, সরণ, করণ, হার।

৩। উপসর্গ যোগ করিয়া বিপরীতার্থক শব্দ গঠন কর:
দান, গত, যোগ, চয়, গ্রহ, সন্ন, রক্ত, লাপ।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে কি কি উপসর্গ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় কর:
প্রত্যাগমন, প্রত্যাদেশ, প্রত্যাখ্যাত, অবরোহণ, সম্প্রদান, উদ্বাস্তু, সমাবেশ, সঞ্চালন, সমাপ্তি, প্রাঙ্গণ, অধ্যাত্ম, ব্যাকরণ।

৫। নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি কি কি অর্থে প্রয়োগ করা হয় তাহা উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটি লইয়া এক একটি শব্দ গঠন কর:
আ, অনা, দর, ভর, হা, স, গর, নিম, পাতি, বে, হর।

৬। উপসর্গ ব্যবহার করিয়া এক কথায় প্রকাশ কর: যাহা জানা নয়, যাহা চেনা নয়, মেজাজ যাহার ভাল নয়, যাহার ঘরের অভাব, যে রাজী নয়, আরামের অভাব, যে জাগিয়া আছে, যাহা নড়ে না, যাহার খুঁত নাই, যাহা মঞ্জুর নয়, যাহাতে লুন (নুন) নাই।

৭। নিম্নলিখিত অনুসর্গগুলি বাক্যে প্রয়োগ কর:
থেকে, দ্বারা, দিয়া, সাথে, মত, কাছে, উপর, নীচে, চেয়ে।

বিভিন্নার্থে বিশেষ্য-পদের প্রয়োগ

অনেক সময় একই বিশেষ্য পদ বিভিন্ন প্রকার বাক্যে ব্যবহৃত হইয়া ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এ-ধরনের কয়েকটি বিশেষ্য-পদের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

চোখ

চোখ ওঠা—(রোগবিশেষ)—তাহার চোখ উঠেছে বলে কয়েক দিনের জন্য ছুটি নিয়েছে।

চোখ রাঙান অথবা পাকান—আমি যা ভাল বুঝি তাই করি, কারো চোখ রাঙান গ্রাহ্য করি না।

চোখ রাখা—অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের উপর মা-বাবার সর্বদাই চোখ রাখা উচিত।

চোখ ফোটা—(সচেতন হওয়া) এতদিন পরে আমার চোখ ফুটেছে, ওই বদ ছেলেটির সঙ্গে আর কোনদিন মিশব না।

চোখ টাটান—(ঈর্ষান্বিত হওয়া) এমন অনেক লোক আছে পরের ভাল দেখলেই যাদের চোখ টাটায়।

চোখের মাথা খাওয়া—(দেখতে না পাওয়া) চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ, বইখানা তোমার সামনে রয়েছে তবুও দেখতে পাচ্ছ না?

চোখ টেপা বা ঠারা—(ইঙ্গিত করা) ছেলেটি তার বন্ধুকে চোখ টিপে সেখানে যেতে নিষেধ করল।

চোখ খোলা—(জ্ঞানের উদয় হওয়া) এতদিন পরে আমার চোখ খুলেছে, আর ওই বদ লোকটির সঙ্গে মিশছি না।

চোখে মুখে কথা বলা—(বাক্‌চাতুর্য) ছেলেটি যেন চোখে মুখে কথা বলে, সবাই অবাক হ'য়ে তার কথা শুনছিল।

চোখে ধুলা দেওয়া—(ফাঁকি দেওয়া) পকেটমারটি সকলের চোখে ধূলা দিয়ে মণিব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে গেল।

চোখের পলক—(নিমেষ) চোখের পলকের মধ্যে ছেলেটি উধাও হয়ে গেল।

চোখের বালি—(অপ্রিয়) বিধবা মেয়েটি যেন সংসারের সকলের চোখের বালি, কেউ তার সঙ্গে ভাল ভাবে কথা বলে না।

চোখের চামড়া, পর্দা—(লজ্জা) ছেলেটির চোখের চামড়া নেই, বার বার শাস্তি পাওয়া সত্ত্বেও তার স্বভাবের পরিবর্তন হইল না।

চোখে আঙুল দিয়া দেখান—(বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া) নেতাজী সুভাষচন্দ্র সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেলেন যে, বাঙালী ভীরু, দুর্বল জাতি নয়।

মাথা

মাথা খাওয়া—(শপথ, ক্ষতি করা) মাথা খাও, তুমি আমার জন্য এ-কাজটি কোরো। অত্যধিক আদর দিয়ে ভুবনবাবু তার ছেলের মাথাটি খেয়েছেন।

মাথার দিব্য—(শপথ) আমার মাথার দিব্য, তুমি আমার নাম প্রকাশ কোরো না।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলা—(কষ্ট করা) মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করতে হয়।

মাথায় ওঠা বা চড়া—(প্রশ্রয় পাওয়া) কিছু বলি না বলে একেবারে মাথায় উঠেছে।

মাথা কাটা যাওয়া—(বিব্রত হওয়া) আমার ছোট ভাইয়ের কাণ্ড কারখানায় লজ্জায় আমার মাথা কেটে গেছে।

মাথা উঁচু করা—(গৌরবান্বিত করা) শ্যামল বৃত্তি পেয়ে তার মা-বাবার মাথা উঁচু করেছে।

মাথায় করে রাখা—(সম্মানে রাখা) যারা পরের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করে, সমাজ তাদের মাথায় করে রাখে।

মাথা হেঁট হওয়া—(অগৌরব হওয়া) কোন ছাত্রের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে তার বিদ্যালয়ের মাথা হেঁট হয়।

মাথা খাটান—(বুদ্ধি খাটান) অনেক মাথা খাটিয়ে সে একটি উপায় বার করল।

মাথা দেওয়া—(দায়িত্ব নেওয়া) পঞ্চাননবাবু যাতে মাথা দেবেন তা সফল করে তুলবেনই।

মাথা ঠাণ্ডা করা—(অস্থির বা উত্তেজিত না হওয়া) অত উত্তেজিত না হয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটি খুলে বল দেখি।

মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা—(ঠকান) পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে কেউ কেউ নিজের কাজ সিদ্ধ করে থাকেন।

মাথা—(শীর্ষস্থানীয়) হরিবাবু গ্রামের মাথা। ছেলেটি ক্লাসের মাথা। হাবলু পাড়ার মস্তানদের মাথা।

হাত

হাত—(প্রভাব) ওই অফিসে তার হাত আছে, তাকে ধরলেই তোমার চাকরী হবে।

„ (দক্ষতা) বন্দুকে তার হাত খুব ভাল।

„ (জব্দ করা, প্রতিশোধ নেওয়া) তাকে পেলে তার পরে এক হাত আমি নেব।

হাত আসা—(অভ্যস্ত হওয়া) অনেক চেষ্টা করার পর রাইফেল চালানোতে তার হাত এসেছে।

হাত পাকান—(দক্ষ হওয়া) প্রেসের কাজে তার হাত পেকেছে।

হাত টান—(চুরির অভ্যাস) মেয়েটির একটু হাত টান আছে, সে কাছে আসতেই সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

হাত পাতা—(চাওয়া) আমি না খেয়ে থাকব, তবুও কারো কাছে হাত পাতব না।

হাত গুটান—(বন্ধ করা, বিরত হওয়া) বাজারের অবস্থা খুব খারাপ বলে তিনি ব্যবসা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন।

হাত চালান—(দ্রুত কাজ করা) রাজমিস্ত্রিকে তিনি হাত চালিয়ে দেওয়ালটি গেঁথে তুলতে বললেন।

হাত দেওয়া—(আরম্ভ করা) তুমি যে কাজে হাত দিয়েছ তাই পণ্ড করেছ।

হাত জোড় করা—(নমস্কার করা) গৃহকর্তা নিমন্ত্রিতদের হাত জোড় করে অভ্যর্থনা জানালেন।

হাত জোড়া থাকা—গিন্নির হাত জোড়া রয়েছে বলে তাঁর পক্ষে এখন ভিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

হাতে পাওয়া—(আয়ত্তে পাওয়া) এখন আর ওঁর ধারে কাছে যেয়ো না, তোমাকে হাতে পেলে উনি আর আস্ত রাখবেন না।

হাতে হাতে—(সদ্য সদ্য) জ্যোতিষী বললেন যে মাদুলীটি ধারণ করলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যাবে।

মুখ

মুখ—(আশা) বড় মুখ ক'রে তোমার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু বড় নিরাশ হলাম।

„ (বাচালতা, চোপা) বড় মুখ হয়েছে দেখছি, গুরুজনদের গ্রাহ্য কর না।

মুখ করা—মা মেয়েকে দিনরাত মুখ করেন।

মুখ তুলে চাওয়া—(প্রসন্ন হওয়া) বড় সাহেব একটু মুখ তুলে চাইলেই গরীব শ্রমিকরা খেয়ে প'রে বাঁচতে পারে।

মুখ নাড়া—(তিরস্কার) বৌটি শ্বশুরবাড়িতে সকলেরই মুখ নাড়া সহ্য করে।

মুখ ভার—(অপ্রসন্ন) সকাল থেকেই মুখ ভার ক'রে আছ, বার বার ডেকেও কোনো সাড়া পাইনি।

মুখ সামলান—(সংযত হওয়া) মুখ সামলে কথা বল, তোমার অনেক বকুনি সয়েছি, আর সহ্য করতে পারব না।

মুখ রাখা—সুধীর পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে মাষ্টার মশাইদের মুখ রেখেছে।

মুখে আগুন—(মৃত্যুকামনা) ক্ষ্যান্তমণি ঝগড়ার সময় দিগম্বরীকে বললেন, তোমার মুখে আগুন, তুমি মরলে আমি শান্তি পাই।

মুখ চুন হওয়া—(জব্দ হওয়া) তার ফাঁকি ধরা পড়াতে তার মুখ চুন হয়ে গেল।

মুখ ফুটে বলা—(অসঙ্কোচে প্রকাশ করা) পরের বাড়িতে থাকবার সময় গরীব ছেলেটি অনেক কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু মুখ ফুটে কোনো দিন কিছু বলেনি।

মুখে ফুলচন্দন পড়া—(শুভ ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করা) তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে তোমাকে আচ্ছা ক'রে খাইয়ে দেব।

মুখ চাওয়া—(খাতির করা) তোমার মুখ চেয়ে আমি কোনো প্রতিবাদ করলাম না, নীরবে সব অপমান সহ্য করলাম।

যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা—(ধৃষ্টতা প্রকাশ করা) তোমার যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! আমাকে প্রকাশ্য ভাবে অপমান করতে তোমার বাধে না!

বিভিন্নার্থে বিশেষণ পদের প্রয়োগ

কাঁচা

কাঁচা—(পাকা নয়) কাঁচা ফল।

(সিদ্ধ নয়) কাঁচা মাংস।

(অদক্ষ) ছেলেটি অঙ্কে বড় কাঁচা।

কাঁচা বুদ্ধি—(অপরিণত বুদ্ধি) এরকম কাঁচা বুদ্ধি নিয়ে সে এতবড় কাজের দায়িত্ব নিল, এটাই আশ্চর্য!

কাঁচা কাজ—তুমি রসিদ না নিয়ে ওই ধড়িবাজ লোকটিকে টাকা দিলে, এমন কাঁচা কাজ করলে!

কাঁচা ঘুম—(যে ঘুম দীর্ঘস্থায়ী হয় নি) কাঁচা ঘুমে শিশুটি জেগে উঠে কান্নাকাটি শুরু ক'রে দিল।

কাঁচা টাকা—(নগদ টাকা) ব্যবসায়ী লোকটির ছেলে কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে খুব কাপ্তেনী করছে।

কাঁচা হাত—(অনিপুণ) সাহিত্যে এখনও তাঁর কাঁচা হাত, উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি এখনও তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় নি।

কাঁচা মাল—(উৎপাদনের আগে উৎপাদনের সামগ্রী) ইংরেজরা আমাদের দেশ থেকে কাঁচা মাল নিয়ে শিল্প উৎপাদন করত।

কাঁচা বয়স—(অল্প বয়স) কাঁচা বয়সে প্রলোভনে পড়বার সম্ভাবনা খুব বেশি।

পাকা

পাকা মাথা—(প্রবীণ) পাকা মাথার কাছ থেকে সবসময়ে উপদেশ নেওয়া উচিত।

পাকা দেখা—(বিবাহ চূড়ান্তভাবে স্থির করা) পাকা দেখার দিন বরপক্ষের লোক কন্যাকে আশীর্বাদ করলেন।

পাকা কাজ—(নিখুঁত) তিনি সব সময়ে পাকা কাজ করেন, সেজন্য তিনি ঠকেন না।

পাকা কথা—(চূড়ান্ত সম্মতি) প্রকাশককে পাকা কথা দিয়েছি, এখন আর কথার নড়চড় করতে পারব না।

পাকা বাড়ি—(ইটের বাড়ি) গ্রামের মধ্যে কুঁড়ে ঘরেরই সংখ্যা বেশি, পাকা বাড়ি কম।

পাকা হাড়—(পরিণত বয়সেও শক্ত শরীর) সত্তর বছর বয়সের লোকটি পাকা হাড় নিয়ে যে রকম পরিশ্রম করতে পারেন, পঁচিশ বৎসরের যুবা তা পারে না।

পাকা হাত—(নিপুণ) তার পাকা হাতের কাজে কোনো খুঁত পাওয়া যায় না।

বিশিষ্টার্থে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ

√ধর

১। পুলিস চোরটিকে ধরেছে। ২। ওষুধটি বেশ ধরেছে (ক্রিয়া হয়েছে)। ৩। আম গাছে এবার অনেক ফল ধরেছে (জন্মেছে) ৪। সিনেমা দেখলেই আমার মাথা ধরে। ৫। গলা ধরেছে (বসে গিয়েছে) ব'লে গায়ক গান গাইলেন না। ৬। ব'সে ব'সে কোমর ধরে গেল (ব্যথা হ'ল)। ৭। চাকরী পেতে গেলে আজকাল কোন প্রভাবশীল ব্যক্তিকে ধরতে হবে (শরণাপন্ন হ'তে হবে)। ৮। ট্রেন ধরতে গেলে (উঠতে গেলে) ঠিক সময়ে বাড়ি থেকে রওনা হওয়া দরকার। ৯। বৃষ্টি এখনো ধরে নি (থামেনি) এখন বাইরে যাওয়া উচিত নয়। ১০। ভদ্রলোকের চুলে পাক ধরেছে (শুরু হয়েছে)। ১১। আগেকার বৌরা ভাসুরের নাম ধরত না (উচ্চারণ করত না)। ১২। নোনা ধরার জন্য বাড়িটির দেওয়াল নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে।

√লাগ

১। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমার পিছনে লাগতে চেষ্টা কোরো না (বিরক্ত করা, ক্ষতি করা)। ২। কোথায় লেগেছে বল তো, ডেটল লাগিয়ে দিচ্ছি। ৩। এই কাজে মনপ্রাণ দিয়ে লেগে গিয়েছি (শুরু করেছি)। ৪। কিছুতেই মন লাগে না (ভালো লাগে না)। ৫। নৌকা ঘাটে লেগেছে, এখন উঠলেই হয়। ৬। আবার দুই প্রতিবেশিনীর মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। ৭। পরীক্ষার ফি দিতে এখন অনেক টাকা লাগবে (প্রয়োজন হবে)।

√উঠ

১। সূর্য উঠেছে (উদিত হয়েছে)। ২। এবার সে নবম শ্রেণীতে উঠেছে। ৩। চুল একবার উঠতে থাকলে কোনো কিছুতেই আর রোধ করা যায় না (পড়া অর্থে)। ৪। দোকানটি কয়েক মাস হ'ল উঠে গিয়েছে (বন্ধ হয়েছে)। ৫। রোগীর জ্বর ১০৪° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠেছে (বেড়েছে)। ৬। খোসামোদ ক'রে ক'রে আজ সে কোথায় উঠেছে (উন্নীত হয়েছে)। ৭। বাজারে আজ অনেক মাছ উঠেছিল (আমদানী হয়েছিল)। ৮। এত জিনিসপত্র দিলাম কিছুতেই তোমার মন ওঠে না (সন্তুষ্ট হয় না)। ৯। আমি বসন্তের টীকা নিয়েছিলাম, কিন্তু টীকা ওঠেনি। ১০। কয়েকদিন হ'ল তার চোখ উঠেছে।

√কাট

১। শিক্ষক মহাশয়ের কথা ছাত্রদের মনে গভীর ভাবে আঁচড় কেটেছিল (প্রভাব বিস্তার করেছিল)। ২। দিদিমা মুখে মুখে অনেক ছড়া কাটতে পারতেন (আবৃত্তি করতে)। ৩। নির্জন জায়গায় পোস্টমাস্টারের দিন আর কাটতে চায় না (অতিবাহিত হওয়া)। ৪। যে পড়াশুনা করে না বড় হ'লে তাকে ঘাস কাটতে হয় (হীন অবস্থায় পড়তে)। ৫। এমন নাককাটা কানকাটা (বেহায়া) অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায় কোনো অপমানেই তাদের চৈতন্য হয় না। ৬। বাজারে এই ফ্যাসানের শাড়ি আজকাল খুব কাটছে (বিক্রী হচ্ছে)। ৭। এমন অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা নিজের নাক কেটে (ক্ষতি করে) পরের যাত্রা ভঙ্গ করে। ৮। সে সাঁতার কাটতে পারে না, তাই জলে তার এত ভয়। ৯। ছেলেটির এখনো তুমি প্রশংসা করছ, তোমার মোহ কাটেনি (দূর হয়নি) দেখছি। ১০। এমন লোকও দেখতে পাওয়া যায় যারা ফোঁটা তিলক কাটে (রচনা করে) কিন্তু মন তাদের নির্মল নয়।

√বস

১। তোমার জন্যে কতক্ষণ থেকে বসে আছি (অপেক্ষা করে আছি)। ২। ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে তার বাবা একেবারে ব'সে পড়লেন (হতাশ হ'লেন)। ৩। তিনি চাকরীতে পাকা পোক্ত হ'য়ে বসেছেন (বহাল হয়েছেন)। ৪। এবার আমি আর পরীক্ষায় বসব না (দেব না)। ৫। সুযোগ পেয়ে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে একেবারে বসিয়ে দিয়েছেন (সমূহ ক্ষতি করেছেন)।

একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ

অঙ্ক

১। চিহ্ন : জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর **মৃগাঙ্কশেখর** দিগম্বর—
—অন্নদামঙ্গল।

২। গণিত : **অঙ্কে** কাঁচা হ'লে বিজ্ঞান প'ড়ে লাভ নেই।

৩। রেখা : মাতার কাতর ক্রন্দন নিষ্ঠুর খুনী লোকটির অন্তরে **অঙ্কপাত** করল না।

৪। সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্ন : তিন হাজার পাঁচশ একুশ **অঙ্কে** লেখ।

৫। কোল : মাতৃ **অঙ্কে** স্তন্যপানরত শিশু দেখতে খুব সুন্দর।

৬। নাট্যকাহিনীর অংশ বিশেষ : শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক **পঞ্চাঙ্কে** বিভক্ত।

অর্থ

১। টাকাকড়ি : ব্যবসা ক'রে তিনি প্রচুর **অর্থ** উপার্জন করেছেন।

২। তাৎপর্য : শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদিগকে কবিতাটির **অর্থ** জিজ্ঞাসা করিলেন।

৩। উদ্দেশ্য : তোমার এই নীরবতার **অর্থ** খুঁজে পাচ্ছি না।

৪। প্রয়োজন : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর **পরার্থে** জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

৫। গূঢ় অভিসন্ধি : দুর্বৃত্তদের হঠাৎ চলে যাওয়ার কোন গূঢ় **অর্থ** আছে ব'লে মনে হয়।

কড়া

১। কপর্দক : একটি **কড়াও** আমার হাতে নেই।

২। কঠোর : খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে ভৃত্য ব্রজেশ্বরের **কড়া** নজর ছিল।

৩। পাত্র : নেমন্তন্ন বাড়িতে রান্নার জন্য বড় বড় **কড়া** আনা হয়েছে।

৪। আংটা : তিনি সজোরে **কড়া** নেড়ে দরজা খোলার কথা বললেন।

৫। (স্ফীত শক্ত চর্ম) : জুতো প'রে প'রে পায়ে **কড়া** প'ড়ে গেছে।

৬। তীব্র, তেজাল : খুব **কড়া** ওষুধ হওয়া চাই, একদিনেই যাতে কাজ হয়। —রবীন্দ্রনাথ

কর

১। কিরণ : আজি এ-প্রভাতে রবির **কর** কেমনে পশিল প্রাণের পর
—রবীন্দ্রনাথ

২। হাত : বিষভাণ্ড লয়ে বাম **করে** —রবীন্দ্রনাথ

৩। শুল্ক : সরকার নানা পণ্যদ্রব্য থেকে **কর** আদায় করে থাকেন।

৪। পদবী বিশেষ : গ্রামের **কর** পরিবার বিশেষ ধনশালী।

৫। হস্তিশুণ্ড : মদমত্ত করী **করের** দ্বারা ডালপালা ভেঙ্গে চলেছে।

গুণ

১। স্বাভাবিক ধর্ম : এই গাছের **গুণ** এই যে, এর পাতার রস নানা রোগ ভালো করে।

২। দড়ি : নৌকার মাঝিরা **গুণ** টেনে নোকাটিকে নিয়ে যাচ্ছে।

৩। স্বভাবের উৎকর্ষ : কোন **গুণ** নাই তার কপালে আগুন।

—ভারতচন্দ্র

৪। ধনুকের ছিলা : রামায়ণের যুদ্ধ বর্ণনায় দেখা যায় যে, একজন আর একজনের ধনুকের **গুণ** কেটে ফেলেছেন।

৫। পূরণ : তোমার **গুণ**ফল শুদ্ধ হয় নি।

৬। বশীভূত করা : মা দুঃখ ক'রে বলে থাকেন যে, তাঁর ছেলেকে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা **গুণ** করে রেখেছে।

৭। কাব্যরসের অন্যতম লক্ষণ : আলোচ্য কাব্যে প্রসাদ**গুণ** রয়েছে, সেজন্য সকলেই এ কাব্য পড়ে বুঝতে পারে।

তারা

১। নক্ষত্র : **তারায়** ভরা চৈত্র মাসের রাতে —রবীন্দ্রনাথ

২। চোখের মণি : মেয়েটি মায়ের যেন চোখের **তারা**, এক দণ্ড তাকে না দেখলে মা দিশাহারা হয়ে পড়েন।

৩। শক্তি দেবী : রামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ী **তারার** সাধক ছিলেন।

৪। বৃহস্পতির স্ত্রী : বীরাঙ্গনা কাব্যে সোমের প্রতি **তারা** নামে একটি কবিতা আছে।

৫। বালিরাজার স্ত্রী : বালির মৃত্যুর পর সুগ্রীব **তারাকে** বিবাহ করেছিল।

দণ্ড

১। লাঠি : স্বামী বিবেকানন্দ **দণ্ড** হাতে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন।

২। শাস্তি : দণ্ডিতের সাথে **দণ্ড**দাতা কাঁদে যবে
সমান আঘাতে, সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার —রবীন্দ্রনাথ

৩। সময়ের পরিমাণ: জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি **দণ্ডে দণ্ডে** ক্ষয়

—রবীন্দ্রনাথ

৪। জরিমানা: আদালতের বিচারে তাকে পাঁচ টাকা **দণ্ড** দিতে হ'ল।

পদ

১। পা: **পদ**পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত —গোবিন্দদাস

২। স্থান, কার্য: এই **পদে** লোক নিয়োগ করা হবে।

৩। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ: এই বাক্যে কি কি **পদ** রয়েছে তা নির্ণয় কর।

৪। শ্লোকের চরণ: পয়ারের প্রতি **পদে** চৌদ্দটি অক্ষর আছে।

রাগ

১। ক্রোধ: তুমি কাল থেকে আমার 'পরে **রাগ** করে আছ, আমার সঙ্গে মোটে কথাই বলছ না।

২। প্রেম: চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের পূর্ব**রাগ** সম্পর্কে অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন।

৩। সঙ্গীত শাস্ত্রে ছয় প্রকার **রাগ** এবং ছত্রিশ প্রকার রাগিণী কল্পিত হইয়াছে। (মার্গ সঙ্গীতের রীতি)

৪। রক্তবর্ণ, রক্তিমা: তাম্বূলের **রাগ** তথি নাসাগ্রে মাণিক মনোহারী

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

রস

১। নির্যাস: গাঁদা পাতার **রস** লাগালে ক্ষতস্থান ভালো হ'য়ে যাবে।

২। স্বাদ: ফলটিতে কোনো **রস** নেই।

৩। কাব্যের আত্মা: কাব্যশাস্ত্রে নয় প্রকার **রস** কল্পিত হইয়াছে।

৪। রঙ্গ বা কৌতুক: জামাইয়ের সঙ্গে শালা শালীদের অনেক **রসের** কথা হচ্ছে।

৫। শ্লেষ্মাবৃদ্ধি: বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমার শরীর **রসস্থ** হয়েছে।

লোক

১। মানুষ: **লোকে** তো কত কথাই বলে, সব শুনলে তো চলে না।

২। জগৎ, ভুবন: স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই তিন **লোক**।

৩। বর্ণ, জাতি: তারা কি **লোক** জেনেছ কি?

৪। জন্ম: মনুষ্য**লোকে** সৎ কাজ করিলেই স্মরণীয় হওয়া যায়।

একই অর্থে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ

অগ্নি—বহ্নি, পাবক, হুতাশন, অনল, বিভাবসু, বৈশ্বানর, সর্বভুক্‌।

আকাশ—অম্বর, নভঃ, গগন, অভ্র, খ, ব্যোম, আসমান।

।—অভিলাষ, বাসনা, বাঞ্ছা, স্পৃহা, ঈহা, মনোরথ, আকাঙ্ক্ষা, ঈপ্সা, সাধ।

চন্দ্র—শশধর, মৃগাঙ্ক, বিধু, ইন্দু, হিমাংশু, সিতাংশু, ওষধিপতি, নক্ষত্রেশ, রজনীকর, নিশাকর, কুমুদবান্ধব, হিমকর, শশাঙ্ক, রজনীকান্ত, দ্বিজরাজ, সুধাকর, শশী, সোম, চন্দ্রমা।

চুল—কেশ, অলক, কুন্তল, কচ, শিরোরুহ।

চোখ—চক্ষু, অক্ষি, নয়ন, লোচন, নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয়।

জল—অম্বু, বারি, সলিল, পয়ঃ, তোয়, উদক, অপ, নীর, পানীয়।

পদ্ম—কমল, উৎপল, অরবিন্দ, তামরস, সরোজ, সরসিজ, জলজ, কঞ্জ, সরোরুহ, রাজীব, শতদল, পঙ্কজ, কোকনদ, পুণ্ডরীক, কুবলয়।

পর্বত—গিরি, শৈল, অদ্রি, পাহাড়, অচল, গোত্র, ভূধর, নগ।

পুত্র—অপত্য, আত্মজ, নন্দন, সুত, তনয়।

বিদ্যুৎ—বিজলী, তড়িৎ, সৌদামিনী, চঞ্চলা, চপলা, ক্ষণপ্রভা।

ভূষণ—অলঙ্কার, গহনা, আভরণ।

ভ্রমর—অলি, ষট্‌পদ, ভৃঙ্গ, মধুকর।

মুখ—আনন, আস্য, বদন, তুণ্ড।

মেঘ—অম্বুবাহ, জলধর, জলদ, বারিদ, জীমূত, নীরদ, অম্বুদ, ঘন, কাদম্বিনী।

রাজা—নরেন্দ্র, ভূপতি, ভূপ, নৃপতি, মহীপতি, নরপতি, নৃপ, ভূপাল।

রাত্রি—রজনী, যামিনী, নিশা, ক্ষণদা, প্রভাবরী, বিভাবরী নিশীথিনী, ত্রিযামা।

শিব—শঙ্কর, মহাদেব, দিগম্বর, ঈশান, শূলপাণি, উমাপতি, হর, ভবেশ, ত্র্যম্বক, বিরূপাক্ষ, ত্রিপুরারি, চন্দ্রশেখর, মহেশ, মহেশ্বর, গঙ্গাধর, ভূতনাথ, চন্দ্রমৌলি, চন্দ্রচূড়, পঞ্চানন, নীলকণ্ঠ, ভব, ত্রিলোচন, কৈলাসনাথ।

সমুদ্র—সাগর, অর্ণব, তোয়াধার, জলনিধি, জলধি, বারিধি, রত্নাকর, সিন্ধু, যাদঃপতি, পারাবার, পাথার, পয়োধি।

সরস্বতী—বাণী, ভারতী, বীণাপাণি, বাগ্‌দেবী, বাগীশ্বরী, শ্বেতপদ্মাসনা, বিদ্যাদেবী।

সাপ—সর্প, অহি, ভুজঙ্গ, বিষধর, কাকোদর, ফণী, আশীবিষ, উরগ।

সূর্য—অর্ক, আদিত্য, তপন, রবি, দিনেশ, দিনমণি, দিবাকর, প্রভাকর, দিনকর, ভাস্কর, মরীচিমালী, অংশুমালী, সহস্রাংশু, ত্বিষাম্পতি, সবিতা, ভানু, মার্তণ্ড, মিহির।

স্ত্রী—রমণী, বামা, বনিতা, ললনা, কামিনী, মহিলা, নারী, অঙ্গনা, রামা, প্রমদা।

হস্তী—বারণ, গজ, মাতঙ্গ, করী, দ্বিরদ, দ্বিপ।

ভিন্নার্থক সদৃশ শব্দ

আচার—লোক-ব্যবহার : 'যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি'।

—রবীন্দ্রনাথ

আচার—বিভিন্ন রসের উপাদানে তৈরী খাদ্যবস্তু : আমের আচার আমার খুবই প্রিয়।

আটা—গোধূমচূর্ণ : চালের অভাবে এখন প্রত্যেক বাঙালী ঘরেই আটার রুটি খেতে হয়।

আটা—গঁদ, ময়দা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত কাগজ জোড়া দিবার বস্তু : আটা লাগিয়ে চিঠির মুখ বন্ধ ক'রে ডাকবাক্সে ফেলে দেবে।

আড়—অন্তরাল : সতীশ তার অপরাধী বন্ধু মহেশকে আড় করে দাঁড়াল যাতে শিক্ষক মহাশয় তাকে দেখতে না পান।

আড়—বক্র : 'আড় নয়নে ঈষত হাসিয়া বিকল করল মোরে'।

—চণ্ডীদাস

আড়—মাছ বিশেষ : পুকুরটিতে বড় বড় আড় মাছ আছে।

আনা—আনয়ন করা : 'আনা দরে আনা যায় কত আনারস'।

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

আনা—টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ : 'এক আনা এক আনা একা নায় কর পার'। —গোবিন্দ অধিকারী

আম—সাধারণ : মোগল বাদশাহরা আমদরবারে গিয়ে সর্বসাধারণের কাছে দেখা দিতেন।

আম—ফলবিশেষ : এবার বাজারে আম আমদানী হয়েছে খুব।

কচুরি—ময়দার তৈরী খাবার বিশেষ : গরম গরম কচুরি চায়ের সঙ্গে বেশ ভালোই লাগে।

কচুরি—পানা : কচুরিতে নদী ভর্তি হয়ে গেছে, নৌকা চালিয়ে যাবার সাধ্য নেই।

কড়া—কপর্দক : কড়াক্রান্তি সব হিসেব বুঝিয়ে তবে সে নিস্তার পেল।

কড়া—কড়াই (কটাহ) : বিয়েবাড়িতে বড়বড় কড়াতে নানা ব্যঞ্জন-রান্না হচ্ছে।

কড়া—লৌহ বলয় : চুরি করার ফলে তার হাতে কড়া পড়ল।

কড়া—কঠিন : শ্যামবাবু কড়া অভিভাবক, ছেলের দিকে সব সময় তাঁর সতর্ক দৃষ্টি।

কলা—চন্দ্রের ষোল কলার এক ভাগ : 'চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাসবৃদ্ধি তার'। —ভারতচন্দ্র

কলা—শিল্প : ভারতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যকলার বিস্তৃত পরিচয় আছে।

কলা—কদলী : মর্তমান কলা খেতে খুব সুস্বাদু।

কুল—বংশ : 'ক্ষত্রকুলে জন্ম মম রক্ষঃকুলপতি, নাহি ডরি যমে আমি'। —মেঘনাদবধ

কুল—ফলবিশেষ : সরস্বতী পূজোর আগে অনেক ছাত্র কুল খায় না।

কুল—সমূহ : পক্ষিকুলের মধুর কূজনে কানন মুখরিত হল।

গড়—প্রণাম : 'গড় করি গৌরীর নন্দন গণনাথে'। —শিবায়ন

গড়—মাঝামাঝি গণনা : এই স্কুল থেকে কোনোবার বেশি, কোনোবার কম পাশ করে, তবে গড়ে পঁচিশ জন ছাত্র প্রতি বছর এখান থেকে উত্তীর্ণ হয়।

গড়—পরিখা : প্রায় প্রতি দুর্গের চারপাশে গড় থাকে।

গুণ—মনের ধর্ম : 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন'। —ভারতচন্দ্র

গুণ—রজ্জু : 'অন্য একটা নৌকা গুণ টানিয়া যাইতেছিল'।

—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চড়া—আরোহণ করা : দার্জিলিঙে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়েনি এমন লোক কমই আছে।

চড়া—তেজাল : আজকাল সব জিনিসপত্রেরই দাম চড়া, কিছু কেনার উপায় নেই।

চড়া—নদীগর্ভস্থ শুষ্ক ভূমি : 'সুরধুনী আধমরা বুকেতে পড়েছে চড়া'।

—ঈশ্বর গুপ্ত

চাল—চাউল : পূজোর কাজে আতপ চালেরই ব্যবহার হয়।

চাল—গৃহের আচ্ছাদন : গ্রামের গরীব লোকেরা খোলার চালের ঘরে বাস করে।

চাল—রীতি, আচার : মহিমবাবুর বাইরের চাল দেখলে মনে হয় বড়লোক কিন্তু ঘরে তাঁর দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না।

ছড়া—ছন্দে গাঁথা গ্রাম্য কবিতা : রবীন্দ্রনাথ অনেক ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন।

ছড়া—গুচ্ছ : 'ছড়া ছড়া পরিপক্ক তাজা মর্তমান' —হেমচন্দ্র

ছড়া—গোময়াদি মিশ্রিত জল যা ছিটান যায় : আগেকার গ্রাম্য গৃহস্থবধূ ভোরে গৃহপ্রাঙ্গণে ছড়া দিতেন।

ডাক—আহ্বান : 'ডাক দিয়েছে কোন্ সকালে কেউ তা' জানে না'।

ডাক—চিঠিপত্র : প্রবাসী পুত্রের খবর পাবার জন্য মা রোজ ডাকপিওনের আসার পথে তাকিয়ে থাকেন।

ডাক—শোলার উপর রাঙতা ও জরি বসান প্রতিমার অলঙ্কার : আজকাল আবার প্রতিমার ডাকের সাজ ফিরে এসেছে।

ডাল—বৃক্ষশাখা : কালিদাস গাছের ডালে বসে সেই ডালেরই গোড়া কাটবার চেষ্টা করেছিলেন।

ডাল—ডাইল বা দাইল : 'দাদখানি চাল মুসুরের ডাল চিনিপাতা দই'।

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

তাড়া—ব্যস্ততা : আজ আমার তাড়া আছে, আজ আর বলতে পারব না।

তাড়া—ধমক : 'মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া' —ভারতচন্দ্র

তাড়া—গোছা : কালবাজারে গোপনে তাড়া তাড়া নোটের কারবার চলে।

তার—ধাতুনির্মিত রজ্জু : বৈদ্যুতিক তার চুরি যাওয়ার ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল।

তার—আস্বাদ : 'একবার রসনায় যে পেয়েছে তার'। —ঈশ্বর গুপ্ত

তার——ত্রাণ কর : 'তনয়ে তার তারিণী'।

তার—উচ্চ : মাঠে চাষ করবার সময় চাষী তারস্বরে গান গেয়ে চলেছে।

তাল—ফল বিশেষ : বৃহৎ প্রান্তরের মধ্যে তাল গাছের সারি বেশ সুন্দর দেখায়।

তাল—স্তূপ : পাশ্চাত্ত্য দেশে তাল তাল সোনা সঞ্চিত হচ্ছে, কিন্তু তাতে মানুষের সুখ কোথায় ?

তাল—গীতবাদ্যনৃত্যে কালক্রিয়ার পরিমাণ : 'রুদ্রতালে তাল দেয় বেতাল ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া। —ভারতচন্দ্র

তাল—শিবানুচর : তাল বেতাল দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করতে শুরু করে দিল।

ধার—তীক্ষ্ণতা : 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার'। —ভারতচন্দ্র

ধার—ঋণ : সুধীর বাবুর চাকরী নেই, ধার করে এখন সংসার চালাচ্ছেন।

ধার—কিনারা : সকাল-বিকেলে গঙ্গার ধারে বেড়ালে শরীর মন ভালো থাকে।

পড়া—পতিত হওয়া : গাছ থেকে পড়ে ছেলেটি তার হাত ভেঙ্গে ফেলেছে।

পড়া—পাঠ করা : ভালো করে পড়াশুনা না করলে পরীক্ষায় পাশ করবার সম্ভাবনা নেই।

পাচন—পরিপাককারী ঔষধ : নিয়মিত পাচন খাবার ফলে রোগীর অসুখ ভালো হয়ে গেল।

পাচন—গোরু তাড়াবার লাঠি : 'গরু তাড়াতে পাচন হাতে রাখাল গেয়ে যায়'। —দীনবন্ধু মিত্র

পাতা—পত্র : 'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির'—মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

পাতা—স্থাপন করা : মেঝেতে পাতা মাদুরে গিয়ে সকলে বসল।

বাটা—পেষণ করা : 'হুইবি গিন্নি ব্যঞ্জন বাটিবি ছুঁইবি হাড়ী'।

—চণ্ডীদাস

বাটা—ভাগ করা : তাস বেটে দেওয়ার পরে খেলা শুরু হল।

বাটা—পাত্র : 'বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো'।

বাটা—আশীর্বাদী ফল, বস্ত্র, মিষ্টান্নাদি : শাশুড়ী জামাইকে ষষ্ঠীর বাটা দিচ্ছেন।

ভরা—পূর্ণ : 'ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা'। —রবীন্দ্রনাথ

ভরা—বোঝাই নৌকা : প্রবল ঝড়ে ভরা ডুবি হ'ল।

হার—কণ্ঠালঙ্কার : 'ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার পথের ধূলার পরে'।

—রবীন্দ্রনাথ

হার—পরাজয় : 'এবার তো যৌবনের কাছে হার মেনেছ'। —রবীন্দ্রনাথ

একই শব্দের বিভিন্ন পদে প্রয়োগ

অন্ধকার (বিশেষ্য)—'অন্ধকার নিকটে করে আলোতে করে দূর'।

—রবীন্দ্রনাথ

অন্ধকার (বিশেষণ)—'অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ'। —রবীন্দ্রনাথ

অল্প (বিশেষণ)—তিনি অল্প কথার মানুষ, কিন্তু যা বলেন তা নিশ্চয়ই করেন।

অল্প (বিশেষ্য)—'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়'।

—রবীন্দ্রনাথ

অসীম (বিশেষণ)—'অসীম আকাশে কত গ্রহ নক্ষত্রের লীলা চলছে'।

অসীম (বিশেষ্য)—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'।

—রবীন্দ্রনাথ

আহা (অব্যয়)—'আহা, কিবা মানিয়েছে রে !' —দ্বিজেন্দ্রলাল

আহা (বিশেষ্য)—'আহা বলে এমন লোকও অঞ্চলে নেই।' —শরৎচন্দ্র

উঁচু (বিশেষণ)—ছেলের অন্যায় কাজে বাবার উঁচু মাথা হেঁট হয়েছে।

উঁচু (বিশেষ্য)—সে তার অধ্যবসায়ের গুণে অনেক উঁচুতে উঠেছে।

কালো (বিশেষণ)—'লোকে তারে কালো বলে কালো সে যে নয়,
নীলমণি মুকুতার পাঁতি।' —বৈষ্ণব পদ

কালো (বিশেষ্য)—'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে ?'
—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট (বিশেষণ)—'ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা নিতান্তই সহজ সরল।' —রবীন্দ্রনাথ

ছোট (বিশেষ্য)—বড়দের কথায় ছোটদের থাকতে নেই।

জোর (বিশেষ্য)—গায়ের জোরের চেয়ে কথার জোর বেশি।

জোর (বিশেষণ)—আজকাল অনেকে অন্যায় করে জোরগলায় তা' আবার সমর্থন করে।

জোর (ক্রি-বিশেষণ)—চোরটিকে ধরে সকলে মিলে এত জোরে মারল যে তার ফলে সে পঞ্চত্ব পেল।

জোর (অব্যয়)—তার কাছ থেকে মাঝে মাঝে বড় জোর দু' এক টাকা ধার নিয়েছি, তার চেয়ে বেশি কিছু চাইনি।

ধনী (বিশেষণ)—মুষ্টিমেয় ধনী লোকই আজ সমাজের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেছে।

ধনী (বিশেষ্য)—১। ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে এবং দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ছে।
২। 'ও ধনী কে কহ বটে'। —বৈষ্ণব পদ

নীল (বিশেষণ)—'নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।'

নীল (বিশেষ্য)—আকাশের নীল আর চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে গেছে।

পাপ (বিশেষ্য)—'এ আমার এ তোমার পাপ'। —রবীন্দ্রনাথ

পাপ (বিশেষণ)—সকল শাস্ত্রেই পাপ কাজ থেকে বিরত হবার উপদেশ রয়েছে।

বড় (বিশেষণ)—বড় মুখ করে তোমার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু নিরাশ হলাম।

বড় (বিশেষ্য)—'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ'। —ভারতচন্দ্র

বড় (ক্রি-বিশেষণ)—'কচি কচি গাল ভরা খিলখিল হাসি, আমি বড়ই ভালবাসি।'

আদি : প্রথম—বাংলা সাহিত্য **আদি**, মধ্য ও বর্তমান এই তিন পর্বে বিভক্ত।

আধি : মানসিক পীড়া—ব্যাধির চেয়ে **আধি** হ'ল বড়। —রবীন্দ্রনাথ

আপন : নিজ—**আপন** মনে বেড়ায় গান গেয়ে। —রবীন্দ্রনাথ

আপণ : দোকান—সুসজ্জিত **আপণ**গুলিতে বহুলোকের ভিড় হইতেছে।

আবরণ : আচ্ছাদন—একটি পাতলা **আবরণে** নিজেকে আবৃত করিয়া সে বাহির হইল

আভরণ : অলংকার—সিদ্ধার্থ বহুমূল্য **আভরণ** ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন।

আবাস : বাসস্থান—তোমার **আবাস** কোথায় ?

আভাস : ইঙ্গিত—**আভাসে** ইঙ্গিতে তিনি নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করলেন।

আভাষ : ভূমিকা—পুস্তকের **আভাষে** লেখক পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন।

আষাঢ় : মাস বিশেষ—এল **আষাঢ়ের** প্রথম দিবস। —রবীন্দ্রনাথ

আসার : বর্ষণ—ঘন মেঘ থেকে বারি ধারা **আসার** পৃথিবীতে নেমে আসছে।

আহুতি : হোম—তপস্যা বলে একের অনলে **বহুরে** আহুতি দিয়া।

—রবীন্দ্রনাথ

আহূতি : আহ্বান—দেশমাতৃকার **আহূতি** কে উপেক্ষা করিতে পারে ?

উপাদান : উপকরণ—পাঞ্চভৌতিক **উপাদান** দ্বারা মানবদেহ গঠিত।

উপাধান : বালিশ—সুকোমল **উপাধানে** ভর দিয়া রাজা বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছেন।

উদ্যত : প্রবৃত্ত—রঘুপতি খড়্গ লইয়া ধ্রুবকে বধ করিতে **উদ্যত** এমন সময় গোবিন্দমাণিক্য আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

উদ্ধত : অবিনীত—**উদ্ধত** যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ।

—রবীন্দ্রনাথ

কটি : কোমর—সেনাপতির **কটি**দেশে তরবারি বাঁধা রহিয়াছে।
কোটি : শতলক্ষ—আকাশের কোন কোন নক্ষত্র পৃথিবী হইতে **কোটি** কোটি মাইল দূরে রহিয়াছে।

কপাল : ললাট—আগুনের **কপালে** আগুন। —ভারতচন্দ্র
কপোল : গণ্ডদেশ—লজ্জায় বালিকাটির **কপোল** রক্তিম হইয়া উঠিল।

কষ্টি : পাথর বিশেষ—**কষ্টি**পাথরে বিশুদ্ধতা যাচাই করিতে হয়।
কোষ্ঠী : জন্মপত্রিকা—জ্যোতিষী নবজাতকের **কোষ্ঠী** তৈরী করলেন।

কুল : বংশ—জন্ম যার নীচ**কুলে** নীচ সে দুর্মতি।
কূল : তীর—সমুদ্রের **কূল**কিনারা পাওয়া যায় না।

কুজন : খারাপ লোক—**কুজনের** কথায় লুব্ধ হইয়া সে নিজের সর্বনাশ ঘটাইল।
কূজন : পাখীর ডাক—কোকিলের **কূজনে** বকুলবৃক্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল।

কৃত : যাহা করা হইয়াছে—**কৃত**কর্মের জন্য সকলকেই ফল ভোগ করিতে হইবে।
ক্রীত : যাহা কেনা হইয়াছে—ফলগুলি অল্পমূল্যে **ক্রীত**।

কৃতি : কর্ম—**সুকৃতির** পুরস্কার একদিন না একদিন নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।
কৃতী : সফলকাম—বিদ্যালয়ের **কৃতী** ছাত্রছাত্রীরা প্রতি বৎসর পুরস্কৃত হয়।

কীর্তি : মহৎকর্ম—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার **কীর্তির** জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।
কৃত্তি : ব্যাঘ্রচর্ম—মহাদেবের আর এক নাম **কৃত্তি**বাস।

কমল : পদ্ম—বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী **কমল** কুঞ্জাসনা। —রবীন্দ্রনাথ
কোমল : নরম—তাঁহার **কোমল** করস্পর্শে সব জ্বালা যেন জুড়াইয়া গেল।

গিরিশ : শিব—হিমালয়ের শিখরে **গিরিশ** যোগে মগ্ন হইয়া আছেন।
গিরীশ : হিমালয়—**গিরীশের** গৃহে তাঁহার কন্যা উমা আসিয়াছেন।

গোলক : গোলাকার বস্তু—স্বর্ণ **গোলক** সকলকেই লুব্ধ ও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে।

গোলোক : বিষ্ণুলোক—**গোলোকে** লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজমান রহিয়াছেন।

চির : অবিচ্ছিন্ন—**চির**কাল ভারত ত্যাগের মন্ত্র প্রচার করিয়াছে।

চীর : বস্ত্রখণ্ড—**চীর**খণ্ড পরিহিত সন্ন্যাসী হিমালয়ের গুহায় বসিয়া তপস্যা করেন।

চ্যুত : স্খলিত—প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি, কিন্তু আদর্শ**চ্যুত** হইতে পারি না।

চূত : আম—**চূত**বৃক্ষগুলি নব মুকুলে পরিপূর্ণ হইযা উঠিযাছে।

জ্যোতি : দীপ্তি—সূর্যের **জ্যোতিতে** চতুর্দিক আলোকিত হইয়া উঠিল।

যতি : মুনি-তপোবন **যতি**দের বেদমন্ত্র গানে মুখরিত হইয়া থাকিত।

দিনেশ : সূর্য—পূর্বগগনে আলোকেব রশ্মি ছডাইয়া **দিনেশের** আবির্ভাব ঘটিল।

দীনেশ : দরিদ্রের প্রভু—**দীনেশ** ভগবান সকলেব প্রতি সমান কৃপা বিতরণ করেন।

দ্বিপ : হস্তী—**দ্বিপ**যূথ অরণ্যের ডালপালা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

দ্বীপ : জলবেষ্টিত ভূখণ্ড—**দ্বীপে** জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বেদব্যাসের নাম হইয়াছিল দ্বৈপায়ন।

দীপ : হেনকালে হাতে **দীপ**শিখা ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।

—রবীন্দ্রনাথ

দু'কুল : দুই বংশ—পিতৃকুল শ্বশুরকুল এই **দু'কুলেই** তাহার কেহ মাত্র নাই।

দুকূল : দুই তীর—দেশনেতাকে দেখিবার জন্য নদীর **দুকূলেই** লোকের ভিড় জমিয়া গেল।

দুকূল : রেশমীবস্ত্র—সুসজ্জিতা মহিলাটির **দুকূল** অঞ্চল মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

দূত : চর—**দূত** অবধ্য, এই নীতিই প্রাচীন কালের রাজারা মানিয়া চলিতেন।

দ্যুত : পাশাখেলা—**দ্যুত**ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়াছিলেন।

নিরাশ : হতাশ—পরীক্ষায় একবার অকৃতকার্য হইলে নিরাশ হওয়া উচিত নহে।

নিরাস ত্যাগ, ক্ষালন—অদ্য আমরা সমস্ত সুসভ্য ব্যাঘ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া সেই অমূলক নিন্দাবাদের নিরাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

নিশিত ধারাল—নিশিত তরবারিগুলি সূর্যালোকে ঝকমক করিয়া উঠিল।

নিশীথ : গভীর রাত্রি—নিশীথ রাতের ঝড় জল উপেক্ষা করিয়া সব্যসাচী পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

নিরশন উপবাসী—মহাত্মা গান্ধী অনেকবার নিরশন ছিলেন।

নিরসন দূরীকরণ—আশা করি, তোমার ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হইয়াছে।

নীর : জল—যৌবন সরসী নীরে।

নীড় : পাখীর বাসা—পাখীর নীড়গুলি হাওয়ায় দুলিতেছে।

পরস্ব : পরের ধন—কদাপি পরস্ব হরণ করিও না।

পরশ্ব : পরের দিন—পরশ্ব দোল উপলক্ষে আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে।

পরভৃৎ : কাক—পরভৃৎনীড়ে কোকিল শাবক বড় হইয়া উঠিতেছে।

পরভৃত : কোকিল—পরভৃতকুল বকুল বৃক্ষে বসিয়া কূজন করিতেছে।

পরিচ্ছদ : পোশাক—সকল রকম পরিচ্ছদেই তাহাকে সুন্দর দেখায়।

পরিচ্ছেদ অধ্যায়—রাজসিংহ উপন্যাসে অনেকগুলি পরিচ্ছেদ রহিয়াছে।

পূর্বাহ : পূর্ব দিবস—অনুষ্ঠানের পূর্বাহেই অনেকে আসিয়া পড়িলেন।

পূর্বাহ্ণ : সকাল বেলা—পূর্বাহ্ণেই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

প্রকার : রকম—ধাতু কয় প্রকার তাহা উল্লেখ কর।

প্রাকার : প্রাচীর—প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া দক্ষিণে বহু দূরে

—রবীন্দ্রনাথ

প্রসাদ : অনুগ্রহ—বড়লোকের প্রসাদ পাইবার জন্য অনেকেই ঘোরাফেরা করে।

প্রাসাদ : অট্টালিকা—রাজা প্রাসাদের অলিন্দে আসিয়া প্রজাদের দর্শন দিলেন।

বলি : অর্ঘ্য—গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য মধ্যে বলি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

বলী : বলশালী—ভীম সর্বাপেক্ষা বলী ছিলেন।

বিকৃত : বিকারপ্রাপ্ত—ক্রোধে, বিরক্তিতে তাঁহার মুখ বিকৃত হইয়া গেল।

বিক্রীত : যাহা বিক্রয় হইয়াছে—আমগুলি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে।

বিজন : নির্জন—বিজন অরণ্যে নবকুমার পথ হারাইয়া ঘুরিতেছিল।

বীজন : পাখা—বীজন বাতাসে শরীর স্নিগ্ধ হইল।

বিশ : কুড়ি—বিশ শতকে বিজ্ঞানের অদ্ভুত অগ্রগতি ঘটিয়াছে।

বিষ : গরল—যদি করে বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ।

বিস : মৃণাল—বিসমুখে পদ্ম ফুটিয়াছে।

বিস্মিত : আশ্চর্যান্বিত—তরুণ পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

বিস্মৃত : যাহা ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে—মাঝে মাঝে বিস্মৃত অতীতের মুহূর্তগুলি মনকে সজল করিয়া তোলে।

ভাষণ : বক্তৃতা, কথা—প্রধান অতিথির ভাষণ খুবই চমৎকার হইয়াছিল।

ভাসন : দীপ্তি—দিবাকরের ভাসনে আকাশ ও অন্তরীক্ষ দীপ্ত হইয়া উঠিল।

শমন : যম—পাঠাইব তোরে শমন ভবনে।

সমন : আদালতে উপস্থিত হইবার নির্দেশ—আদালত হইতে সমন আসিয়াছে, সেখানে হাজির হইতে হইবে।

শর : বাণ—কর্ণ ঘটোৎকচের প্রতি একাঘ্নীশর নিক্ষেপ করিলেন।

স্মর : কামদেব—মহাদেবের ক্রোধবহ্নিতে স্মরদেব ভস্মীভূত হইয়াছিলেন।

সর : সরোবর—অচ্ছোদ সরোবরের তীর হইতে সঙ্গীতধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল।

স্বর : শব্দ—আজ যিনি ভাষণ দিয়াছিলেন তাঁহার কণ্ঠস্বর বড় মধুর

শঙ্কর : শিব—কৈলাস শিখরে শঙ্কর যোগমগ্ন হইয়া আছেন।

সঙ্কর : মিশ্র—প্রত্যেক ভাষায় অনেক সঙ্কর শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বশ্রূ : শাশুড়ী—ভুবনবাবুর শ্বশ্রূঠাকুরাণী মারা গিয়াছে।

শ্মশ্রু : দাড়ি—আজকালকার ছেলেদের মধ্যে পুনরায় গুম্ফ-শ্মশ্রুর আতিশয্য দেখা যাইতেছে।

শারদা : দুর্গা—আশ্বিন মাসে শারদার আগমন উপলক্ষে বাংলার ঘরে ঘরে উৎসবের আনন্দ শুরু হয়।

সারদা : সরস্বতী—বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল একখানি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ।

শ্রবণ : শোনা—ঈশ্বর সকলের কথাই শ্রবণ করেন।

স্রবণ : ক্ষরণ—আহত স্থান হইতে রক্তস্রবণ হইতেছে।

সর্গ : পরিচ্ছেদ—মেঘনাদবধ কাব্যে নয়টি সর্গ রহিয়াছে।

স্বর্গ : দেবলোক—থাকো স্বর্গে হাস্যমুখে দেবগণ, করো সুধাপান।

—রবীন্দ্রনাথ

স্বত্ব : অধিকার—পুস্তকটির সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

সত্ত্ব : গুণ—সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিনপ্রকার গুণ।

সত্য : প্রকৃত—সদা সত্য কথা বলিবে।

সাক্ষর—অক্ষর জ্ঞানবিশিষ্ট—ভারতে সাক্ষর লোকের সংখ্যা এখনও খুব কম।

স্বাক্ষর : দস্তখত—দরখাস্তখানিতে তোমার স্বাক্ষর লাগিবে।

সুত : পুত্র—দশরথসুত রামচন্দ্র নারায়ণের অবতার।

সূত : সারথি—অধিরথসূতপুত্র কর্ণ নাম যার।

স্কন্দ : কার্তিক—দেবসেনাপতি স্কন্দ তারকাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন।

স্কন্ধ : কাঁধ—বৃষস্কন্ধ পুরুষ বলশালী হয়।

সদৃশ শব্দ

বাংলা ভাষার কতকগুলি শব্দ আপাতত একার্থবোধক হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, অপরাধ, দোষ, পাপ। এইসব শব্দকে সদৃশ শব্দ বলা যাইতে পারে।

অপরাধ, দোষ, পাপ

অপরাধ : আইনবিরোধী কাজ—আয়কর ফাঁকি দেওয়া অপরাধ।

দোষ : স্বভাবগত কোন অপকর্ম—কুঁড়েমি তোমার সবচেয়ে বড় দোষ।

পাপ : যাহা ধর্ম ও নীতিবিরুদ্ধ—মিথ্যা বলা পাপ।

অকর্মা, নিষ্কর্মা

অপটু—তোমার মত অকর্মা লোক ঘর সাজাতে গিয়ে যে সব পণ্ড ক'রে দেবে তা' জানি।

নিষ্কর্মা : কর্মহীন, কর্মে বিরত—যতসব বেকার নিষ্কর্মা লোকের আড্ডা বসে পাড়ার মোড়ে মোড়ে।

আশঙ্কা, আতঙ্ক, ভয়

আশঙ্কা অনর্থ অথবা বিপদের সম্ভাবনায় মনের বিচলিত ভাব—আশঙ্কা হচ্ছে, এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তিনি আসতে পারবেন না।

আতঙ্ক : ভয়ঙ্কর কোন বস্তু দর্শনে অথবা ভাবনায় চিত্তের বিহ্বলতা—সুন্দরবনে বাঘের মুখোমুখি হ'য়ে লোকটি আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল।

ভয় বিপদকালে চিত্তের বিমূঢ়ভাব—ও ভয়ে কম্পিত নহে আমার হৃদয়।

সন্তোষ, পরিতোষ, সুখ, আনন্দ

সন্তোষ : আকাঙ্ক্ষার অভাব জনিত চিত্তের শান্তি—জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল কঠিন সন্তোষ। —রবীন্দ্রনাথ

পরিতোষ : আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি জনিত চিত্তের তৃপ্তি—পরীক্ষায় বালকটির সাফল্যে সকলেই পরিতোষ লাভ করলেন।

সুখ : দুঃখের বিপরীত অনুভূতি—নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সুখ, এ-ধরা কি শুধু বিষাদময়?

আনন্দ : সুখ দুঃখের মিলিত অনুভূতি—সুখ দুঃখকে পরিহার করে, কিন্তু দুঃখকে অবলম্বন ক'রেই আনন্দ সার্থক হয়ে ওঠে।

অর্থী, অর্থবান

অর্থী : আমাকে তোমার চিরশুভার্থী ব'লেই জেনো।

অর্থবান : ধনশালী—অর্থবান্ ব্যক্তিরাই এখন সমাজ পরিচালনা ক'রে থাকেন।

পরিশ্রমী, পরিশ্রান্ত

পরিশ্রমী : পরিশ্রমকারী—জাপানীরা খুব পরিশ্রমী।

পরিশ্রান্ত : ক্লান্ত—দীর্ঘ পথ হেঁটে পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি।

অস্ত্র, শস্ত্র

অস্ত্র : যাহা নিক্ষেপ করিয়া মারা হয়—প্রতাপসিংহ সেলিমকে লক্ষ্য ক'রে অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

শস্ত্র : যাহা হাতে ধারণ করিয়া মারা হয়—রাজসিংহ শাণিত শস্ত্রে দস্যুর মস্তক ছিন্ন ক'রে ফেললেন।

অহঙ্কার, গর্ব, অভিমান, দর্প, দম্ভ

অহঙ্কার : আমিত্বের বড়াই—হঠাৎ অনেক ধনের মালিক হ'য়ে অহঙ্কারে আর তার মাটিতে পা পড়ে না।

গর্ব : ধনবল প্রভৃতির জন্য অপরকে অবহেলা—ধন-জন-যৌবনের গর্ব করা বৃথা, কারণ ওগুলি ক্ষণিকের।

অভিমান : অন্যকে ক্ষুদ্র মনে কবিবার ভাব—বিদ্যার অভিমানে তিনি সকলকেই হেয় জ্ঞান করেন।

দর্প : নিজের ধন মান প্রদর্শন করিবার ভাব—রাবণের অতি দর্পের ফলেই তার পতন ঘটল।

দম্ভ : অযোগ্য ব্যক্তির বড়াই—মূর্খলোকের দম্ভ সত্যই সহ্য করা যায় না।

দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, প্রণয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, কৃপা, সহানুভূতি

দয়া : পরদুঃখকাতরতা—দরিদ্রের প্রতি দয়া দেখান উচিত।

মায়া : আত্মসুখ নিমিত্ত মানসিক অনুভূতি—সাংসারিক জীব মাত্রই মায়ায় আবদ্ধ।

কৃপা : অন্যায়কারী অথবা অপরাধীর প্রতি ক্ষমাশীল ভাব—বিশপ চোরকে কৃপা করিলেন।

সহানুভূতি : লোকের প্রতি সমভাবাপন্ন হওয়া—দীনবন্ধু মিত্রের বড় গুণ ছিল, সকলের প্রতি সমান সহানুভূতি।

স্নেহ—কনিষ্ঠদের প্রতি আকর্ষণ—চন্দ্রগুপ্ত নাটকে ক্ষমতার উপরে স্নেহের জয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রেম : হৃদয়ের সহজাত আকর্ষণ—কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ

—রবীন্দ্রনাথ

প্রণয় : কোন স্ত্রী কিংবা পুরুষের প্রতি গভীর অনুরাগ—সীতার প্রতি রামচন্দ্রের প্রণয় অতিশয় গভীর ছিল।

ভক্তি : পূজ্যের প্রতি অনুরাগ—এখনকার অনেক পূজায় দেবতার প্রতি ভক্তি দেখা যায় না, শুধু কেবল জাঁকজমকই দেখা যায়।

শ্রদ্ধা : শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি গুণমুগ্ধ ভাব—শিক্ষকশ্রেণীর প্রতি এখনো সমাজে গভীর শ্রদ্ধার ভাব বিদ্যমান।

হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ

হিংসা : পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি—মন্থরার মন হিংসায় পরিপূর্ণ ছিল।

ঈর্ষা : অন্যের সুখে কষ্ট—সুয়োরাণী দুয়োরাণীর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন।

দ্বেষ : অন্যের প্রতি ঘৃণা—প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর দ্বেষ অনেক স্থলেই দেখা যায়।

বন্ধু, মিত্র, সখা, সুহৃদ

বন্ধু—যাহারা পরস্পরের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না—ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয় পরস্পরের বন্ধু ছিলেন।

মিত্র : যাহারা এক রূপ কাজ করে—অফিসের রমেশবাবুর সঙ্গে মহেশবাবুর মিত্রতা বহু কালের।

সখা : সমপ্রাণ ব্যক্তিকে সখা বলে—অর্জুন ছিলেন কৃষ্ণের সখা।

সুহৃদ : সমহৃদয়সম্পন্ন—প্রকৃত সুহৃদ্ তিনি যিনি বিপদের সময়ে পাশে এসে দাঁড়ান।

দশম শ্রেণী

ব্যাকরণ

সমাস

পরস্পরের সম্বন্ধযুক্ত দুই বা বহুপদের একপদী হওয়াকে **সমাস** বলে। যথা, রাম ও লক্ষ্মণ=রামলক্ষ্মণ। শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া=যথাশক্তি। শূল পাণিতে যাঁহার=শূলপাণি। সমাসের দ্বারা বাক্য সংক্ষিপ্ত এবং বক্তব্য বিষয়টি সুন্দর হয়। তবে যে কোন দুই বা ততোধিক শব্দ একত্র করিলেই সমাস হইবে না। পদগুলির মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ থাকা উচিত এবং পদগুলির মিলিত হওয়ার ফলে একটি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ হওয়া চাই। সমাসবদ্ধ পদটিকে সমস্ত পদ বলে এবং যে পদগুলি একত্রিত হয় তাহাদের প্রত্যেকটিকে সমস্যমান পদ বলে। সমস্যমান পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হয়, যথা, গাছে পাকা= গাছপাকা। লোককে দেখানো=লোক দেখানো। সমস্যমান পদগুলির পরস্পরের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করিয়া দেখানো যায়। এই ব্যাখ্যাকে বলে ব্যাসবাক্য, বিগ্রহবাক্য বা সমাসবাক্য। যথা, পুরুষ সিংহের ন্যায়=পুরুষ সিংহ। সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা, দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব

যে সমাসে দুই বা বহু পদ মিলিত হইয়া এক পদ হয় এবং উভয় পদের অর্থই প্রধান থাকে তাহার নাম **দ্বন্দ্ব সমাস**। এবং, ও, আর প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা এই সমাসের ব্যাসবাক্য গঠিত হয়। যথা, অন্ন ও বস্ত্র=অন্নবস্ত্র। এখানে অন্ন ও বস্ত্র উভয় পদের অর্থ ই প্রধান।

দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ:

বাংলা শব্দ: ছাগল ও ভেড়া=ছাগলভেড়া। দুধ ও দই=দুধদই, বেচা ও কেনা=বেচাকেনা। হাট ও বাজার=হাটবাজার। রুই ও কাতলা রুইকাতলা। মুড়ি ও মুড়কি=মুড়িমুড়কি। জমা ও খরচ=জমাখরচ। আসা ও যাওয়া=আসাযাওয়া। দোয়াত ও কলম=দোয়াতকলম। দেখা ও শোনা=দেখাশোনা। হাসি ও ঠাট্টা=হাসিঠাট্টা। দিন ও রাত=দিনরাত। গোরু ও বাছুর=গোরুবাছুর। মশা ও মাছি=মশামাছি। ডাল ও ভাত= ডালভাত। ছেলে ও মেয়ে=ছেলেমেয়ে। ভাই ও বোন=ভাইবোন।

মা ও বাবা=মাবাবা। পাইক ও পেয়াদা=পাইকপেয়াদা। তীর ও ধনুক=তীরধনুক। গান ও বাজনা=গানবাজনা। নাচ ও গান=নাচগান। গৌর ও নিতাই=গৌরনিতাই।

সংস্কৃত শব্দ :

দেব ও দেবী=দেবদেবী। রাধা ও কৃষ্ণ=রাধাকৃষ্ণ। হর ও গৌরী=হরগৌরী। শিব ও দুর্গা=শিবদুর্গা। লক্ষ্মী ও নারায়ণ=লক্ষ্মীনারায়ণ। পিতা ও মাতা=পিতামাতা। রাজা ও প্রজা=রাজাপ্রজা। কৃষ্ণ ও অর্জুন=কৃষ্ণার্জুন। স্বামী ও স্ত্রী=স্বামীস্ত্রী। পাত্র ও মিত্র=পাত্রমিত্র। চন্দ্র ও সূর্য=চন্দ্রসূর্য। সীতা ও রাম=সীতারাম। গুরু ও শিষ্য=গুরুশিষ্য। ছাত্র ও ছাত্রী=ছাত্রছাত্রী। সুখ ও দুঃখ=সুখদুঃখ। দীন ও দুঃখী=দীনদুঃখী। শত্রু ও মিত্র=শত্রুমিত্র। আত্মীয় ও কুটুম্ব=আত্মীয়কুটুম্ব। জায়া ও পতি জায়াপতি বা দম্পতী।

দুইয়ের অধিক শব্দ :

রূপ ও রস ও গন্ধ ও শব্দ ও স্পর্শ=রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ। তেল ও নুন ও লকড়ি=তেলনুনলকড়ি। পাইক ও পেয়াদা ও বরকন্দাজ=পাইকপেয়াদা-বরকন্দাজ। কায়া ও মনঃ ও বাক্য=কায়মনোবাক্যে (কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তুমি যেন এই সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ কর)। স্বর্গ ও মর্ত্য ও পাতাল=স্বর্গমর্ত্যপাতাল (স্বর্গমর্ত্যপাতালে এরূপ ঘটনা কোনদিন ঘটে নাই)। পশু ও পাখী ও কীট ও পতঙ্গ=পশুপাখীকীটপতঙ্গ।

নিম্নলিখিত পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ :

অহঃ+রাত্রি=অহোরাত্র। অহঃ+নিশা=অহর্নিশ। কুশ ও লব=কুশীলব।

সমার্থক দ্বন্দ্ব :

সমস্যমান পদ দুইটি যখন একার্থক বস্তু বুঝায় তখন তাহাকে বলে **সমার্থক দ্বন্দ্ব** সমাস।

যথা, মামলা ও মোকদ্দমা—মামলামোকদ্দমা। মাথা ও মুণ্ড—মাথামুণ্ড। ছাই ও ভস্ম=ছাইভস্ম। দীন ও দরিদ্র=দীনদরিদ্র। চালাক ও চতুর—চালাক-চতুর। ছেলে ও ছোকরা—ছেলেছোকরা। বলা ও কওয়া—

বলাকওয়া (ছেলেটিকে অনেক বার বলা হয়েছে কিন্তু ফল হয় নি ; মনে হয় সে বলাকওয়ার বাইরে চলে গেছে)।

প্রায় সমার্থক শব্দের সহিত সমাস :

ঝড় ও ঝাপ্টা=ঝড়ঝাপ্টা। বিবাদ ও বিসম্বাদ=বিবাদবিসম্বাদ। বাক্ ও বিতণ্ডা=বাগ্‌বিতণ্ডা (আর বাগ্‌বিতণ্ডায় কাজ নেই, তুমি যা বলছ তাই মেনে নিলাম) তর্ক ও বিতর্ক=তর্কবিতর্ক। অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ=অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কথা ও বার্তা=কথাবার্তা। কাগজ ও পত্র=কাগজপত্র।

বিপরীতার্থক শব্দের সহিত সমাস :

লাভ ও ক্ষতি=লাভক্ষতি (লাভক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ—রবীন্দ্রনাথ)। হাসি ও কান্না=হাসিকান্না। বিরহ ও মিলন=বিরহমিলন। ক্রয় ও বিক্রয়=ক্রয়বিক্রয়। রৌদ্র ও ছায়া=রৌদ্রছায়া। জন্ম ও মৃত্যু=জন্মমৃত্যু (জন্মমৃত্যুর উপর কাহারও কোন হাত নাই)।

সমাহার দ্বন্দ্ব :

যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমষ্টি বা সমুদয়ের অর্থ প্রধান তাহাকে **সমাহার দ্বন্দ্ব** বলে। যথা, কাপড় ও চোপড়=কাপড়চোপড় (সমুদয় বস্ত্রাদি বুঝাইতেছে)। বৃষ্টি ও বাদল=বৃষ্টিবাদল (এই বৃষ্টিবাদলের মধ্যে বাইরে যাবার কোনো উপায় নেই)।

অলুক দ্বন্দ্ব :

যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি লুপ্ত হয় না তাহাকে **অলুক দ্বন্দ্ব** বলে। দুধে ও ভাতে=দুধেভাতে (আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে—অন্নদামঙ্গল)। হাটে ও বাজারে=হাটেবাজারে (সপ্তমী বিভক্তি এ দুই পদেই বজায় রহিয়াছে)। হাতে ও কলমে=হাতেকলমে। পথে ও ঘাটে—পথেঘাটে। হাতে ও পায়ে=হাতেপায়ে। রাজায় ও রাজায়=রাজায় রাজায় (রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়)।

তৎপুরুষ

যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলে। যথা, বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়=বালিকাবিদ্যালয়। এখানে

বিদ্যালয়ের অর্থটিই প্রধান। তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার। যথা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ :

পূর্বপদ দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত হয় এবং সমাস হইলে বিভক্তির লোপ হয়।

যথা, গঙ্গাকে প্রাপ্ত=গঙ্গাপ্রাপ্ত। বিস্ময়কে আপন্ন=বিস্ময়াপন্ন। দুঃখকে প্রাপ্ত=দুঃখপ্রাপ্ত। সাহায্যকে প্রাপ্ত=সাহায্যপ্রাপ্ত। ব্যক্তিকে গত=ব্যক্তিগত। শরণকে আগত=শরণাগত (শরণাগতকে রক্ষা করা প্রত্যেক মানুষের ধর্ম)।

লোককে দেখানো=লোকদেখানো (লোকদেখানো ভদ্রতাটুকু দেখিয়ে আর লাভ কি!)। হাত (কে) দেখা—হাতদেখা। ফুল (কে) তোলা=ফুলতোলা। নখকে নাড়া=নখনাড়া। হাঁড়ি (কে) ভাঙ্গা=হাঁড়িভাঙ্গা। জল (কে) খাওয়া—জলখাওয়া। ভাত (কে) রাঁধা=ভাতরাঁধা।

ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক দ্বিতীয়ান্ত পদের সহিত **দ্বিতীয়া তৎপুরুষ** সমাস হয়। যথা, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখ=চিরসুখ। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী=দীর্ঘস্থায়ী। স্বল্পকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী=স্বল্পস্থায়ী। চিরকাল ব্যাপিয়া শত্রু=চিরশত্রু।

ক্রিয়া-বিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণের সহিত পরবর্তী কৃদন্ত পদের দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

এরূপ স্থলে ব্যাসবাক্যে 'ভাবে', 'রূপে', বা 'যথা', 'তথা' শব্দের ব্যবহার করিতে হয়। যথা, দৃঢভাবে বদ্ধ=দৃঢ়বদ্ধ। অর্ধরূপে মৃত=অর্ধমৃত। অর্ধরূপে স্ফুট=অর্ধস্ফুট। পূর্ণরূপে পরিস্ফুট=পূর্ণপরিস্ফুট (পূর্ণপরিস্ফুট গোলাপের সৌন্দর্য সকলের মন মুগ্ধ করে)। শীঘ্র যথা তথা গামী (শীঘ্রগামী)। মৃদুরূপে ভাষিণী=মৃদুভাষিণী।

তৃতীয়া তৎপুরুষ :

পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে **তৃতীয়া তৎপুরুষ** সমাস বলে। যথা, মধু দ্বারা মাখা=মধুমাখা। রব দ্বারা আহূত=রবাহূত। বেত্র দ্বারা আঘাত=বেত্রাঘাত। বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত=বস্ত্রাচ্ছাদিত। তৈল দ্বারা লিপ্ত=তৈললিপ্ত। বজ্রদ্বারা আহত=বজ্রাহত। শোকের দ্বারা দীর্ণ=শোকদীর্ণ। জরা দ্বারা জীর্ণ=জরাজীর্ণ। বাক্

দ্বারা দত্তা=বাগ্‌দত্তা। হস্তদ্বারা চালিত=হস্তচালিত। কীটের দ্বারা দষ্ট=কীটদষ্ট। শোকের দ্বারা আকুল=শোকাকুল। ভয়ের দ্বারা বিহ্বল—ভয়বিহ্বল। দা দ্বারা কাটা=দা-কাটা। মন দিয়ে গড়া=মনগড়া। জুতা দ্বারা পেটা=জুতাপেটা। কালি দিয়ে মাখানো=কালিমাখানো। শান দিয়ে বাঁধানো=শানবাঁধানো। ঢেঁকি দিয়ে ছাঁটা=ঢেঁকিছাঁটা।

হীন, ঊন, শূন্য, রহিত, কম প্রভৃতি শব্দের যোগে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, নেতা দ্বারা হীন=নেতৃহীন। পোয়া দ্বারা কম=পোয়াকম। পিতা দ্বারা হীন=পিতৃহীন। গৃহ দ্বারা শূন্য=গৃহশূন্য।

চতুর্থী তৎপুরুষ:

পূর্বপদ চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হইলে **চতুর্থী তৎপুরুষ** সমাস হয়। যথা, দেবকে দত্ত=দেবদত্ত।

নিমিত্তার্থে অথবা উদ্দেশ্য বুঝাইলে **চতুর্থী তৎপুরুষ** সমাস হয়। যথা, বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়=বালিকাবিদ্যালয়। বিয়ের জন্য পাগলা=বিয়েপাগলা। মালের উদ্দেশ্যে গাড়ি—মালগাড়ি। তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা=তীর্থযাত্রা। স্নানের উদ্দেশ্যে যাত্রা=স্নানযাত্রা। ডাকের জন্য মাশুল=ডাকমাশুল। গাড়ির জন্য ভাড়া =গাড়িভাড়া। দেবের উদ্দেশ্যে আরতি=দেবারতি। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র =চিকিৎসাকেন্দ্র। মড়ার জন্য কান্না=মড়াকান্না। ভোজনের উদ্দেশ্যে আলয়= ভোজনালয়। দেবের উদ্দেশ্যে দত্ত=দেবদত্ত।

পঞ্চমী তৎপুরুষ:

পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে **পঞ্চমী তৎপুরুষ** সমাস বলে।

যথা, স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট=স্বর্গভ্রষ্ট (মঙ্গল কাব্যের নায়ক নায়িকা অনেকেই স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা)। গৃহ হইতে নির্গত=গৃহনির্গত। আদি হইতে অন্ত=আদ্যন্ত (নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণটি রোজ সকালে আদ্যন্ত গীতা পাঠ করেন)। বিদেশ হইতে আগত=বিদেশাগত। রাজ্য হইতে চ্যুত=রাজ্যচ্যুত। বিপদ হইতে মুক্ত=বিপন্মুক্ত। মৃত্যু হইতে ভয়=মৃত্যুভয় (লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর—রবীন্দ্রনাথ)। ঘর হইতে ছাড়া=ঘরছাড়া। গাছ হইতে পাড়া= গাছপাড়া। ভদ্র হইতে ইতর=ভদ্রেতর। ব্যাধি হইতে মুক্ত=ব্যাধিমুক্ত। আগা হইতে গোড়া=আগাগোড়া। স্কুল হইতে পালানো=স্কুলপালানো।

ঘোষ হইতে জাত=ঘোষজাত। স্নাতক হইতে উত্তর=স্নাতকোত্তর। রবীন্দ্র হইতে উত্তর=রবীন্দ্রোত্তর। তৎ হইতে ভব=তদ্ভব। জেল হইতে খালাস=জেলখালাস। জন্ম হইতে অন্ধ=জন্মান্ধ। পর্বত হইতে নিঃসৃত—পর্বতনিঃসৃত।

ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত পূর্বপদের ষষ্ঠী বিভক্তি লুপ্ত হইয়া এই **তৎপুরুষ সমাস** হয়।

যথা, পিতার গৃহ=পিতৃগৃহ। শ্বশুরের বাড়ি=শ্বশুরবাড়ি। অগ্নির শিখা=অগ্নিশিখা। আকাশের বাণী=আকাশবাণী। বন্দীদের শালা=বন্দীশালা। বিশ্বের পিতা=বিশ্বপিতা। রাজার বংশ=রাজবংশ। দূতের আবাস=দূতাবাস। তালের পাতা=তালপাতা। দেশের নেতা=দেশনেতা।

১। সহার্থ, তুল্যার্থ ও সমূহার্থ এবং প্রতি প্রভৃতি শব্দযোগে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, ভ্রাতার সহ=ভ্রাতৃসহ। পত্নীর সহ=পত্নীসহ। মিত্রের সমান—মিত্রসম। আমার সদৃশ=মৎসদৃশ। মুমূর্ষুর প্রায়=মুমূর্ষুপ্রায় (নগেন্দ্রনাথ জীর্ণ গৃহে উপস্থিত কুন্দনন্দিনীর মুমূর্ষুপ্রায় পিতাকে দেখিলেন)। পুত্রের গণ=পুত্রগণ। গল্পের চতুষ্টয়=গল্পচতুষ্টয়। দোষের সমষ্টি=দোষসমষ্টি। রত্নের রাজি=রত্নরাজি। মণির জাল=মণিজালে (পূর্ণ মণিজাল) তাহার প্রতি=তৎপ্রতি আমার প্রতি=মৎপ্রতি।

২। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে শিশু, দুগ্ধ, অণ্ড প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংলিঙ্গ রূপ হয়। যথা, ছাগীর দুগ্ধ=ছাগদুগ্ধ। হংসীর অণ্ড=হংসাণ্ড। মৃগীর শিশু=মৃগশিশু (শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবার সময় মৃগশিশুর প্রতি কাতর স্নেহ দেখাইয়াছিলেন)।

৩। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে দাস শব্দ পরে থাকিলে কালী, দেবী ও ষষ্ঠী শব্দের ঈ হ্রস্ব ই হয়। যথা, কালীর দাস=কালিদাস (কালিদাস মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন)। ষষ্ঠীর দাস=ষষ্ঠীদাস। দেবীর দাস=দেবিদাস।

৪। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে মিত্র শব্দ পরে থাকিলে বিশ্ব শব্দ স্থানে বিশ্বা এবং কুটি শব্দ পরে থাকিলে ভ্রূ শব্দ স্থানে বিকল্পে ভ্রূ ও ভ্রূ হয়। যথা, বিশ্বের মিত্র=বিশ্বামিত্র, ভ্রূর কুটি=ভ্রূকুটি, ভ্রুকুটি, ভৃকুটি।

৫। ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে রাজন্ শব্দের কখনও কখনও পূর্বনিপাত অর্থাৎ

পূর্বে স্থাপন হয়। যথা, হংসগুলির রাজা=রাজহংস। পথের রাজা=রাজপথ (প্রশস্ত রাজপথ দিয়া অনবরত অসংখ্য শকট চলিতেছে)।

অন্য কয়েকটি শব্দের পূর্বনিপাত হয়। যথা, রাত্রির পূর্ব=পূর্বরাত্রি। নদীর মাঝ=মাঝনদী (মাঝনদীতে নৌকাটি ডুবিয়া গেল)।

৬। বৃহস্পতি, বনস্পতি প্রভৃতি শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ। যথা, বৃহতের পতি =বৃহস্পতি। বনের পতি=বনস্পতি।

সপ্তমী তৎপুরুষ :

সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হইলে **সপ্তমী তৎপুরুষ** সমাস হয়। যথা, বনে বাস=বনবাস। জলে জাত=জলজাত। গৃহে স্থিত= গৃহস্থিত। গাছে পাকা=গাছপাকা। বিশ্বে বিখ্যাত=বিশ্ববিখ্যাত (রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত কবি)। পুরুষের মধ্যে উত্তম=পুরুষোত্তম। নরের মধ্যে অধম =নরাধম। লোকে প্রসিদ্ধ=লোকপ্রসিদ্ধ। পথে চলা=পথচলা। রণে নিপুণ =রণনিপুণ। কর্মে দক্ষ=কর্মদক্ষ। লড়াইতে পটু=লড়াইপটু। সংখ্যায় গুরু= সংখ্যাগুরু। সংখ্যায় লঘু=সংখ্যালঘু। সত্যে আগ্রহ=সত্যাগ্রহ (মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন)। শিরে ধার্য=শিরোধার্য (গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য)। রাতে কানা=রাতকানা।

সপ্তমী তৎপুরুষে কখনও কখনও পূর্বপদের পরনিপাত অর্থাৎ পরে স্থাপন হয়। যথা, পূর্বে ভূত=ভূতপূর্ব। পূর্বে অশ্রুত=অশ্রুতপূর্ব। পূর্বে অদৃষ্ট= অদৃষ্টপূর্ব।

নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাস :

নঞ্‌ একটি অব্যয়, ইহার অর্থ না, নাই, নয়। নঞ্‌ অব্যয়ের সহিত যে সমাস হয় তাহাকে বলা হয় **নঞ্‌ তৎপুরুষ** সমাস।

১। ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে নঞ্‌ স্থানে অ হয়। যথা, ন—মিল=অমিল। ন—কাজ=অকাজ। ন—ধর্ম=অধর্ম (আজকাল অধর্মের পথে অনেকেই অর্থ উপার্জন করে)। ন—দর্শন=অদর্শন (যে সত্যকার বন্ধু তার অদর্শনে প্রাণ কাতর হয়) ন—ভয়=অভয়। ন—কিঞ্চিৎকর=অকিঞ্চিৎকর। ন—সহযোগ=অসহযোগ (মহাত্মা গান্ধী ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন করিয়াছিলেন)। ন—কাতর=অকাতর। ন—কপট=অকপট।

২। স্বরবর্ণের পূর্বে নঞ্‌ স্থানে অন্‌ হয়। যথা, ন—অভিজ্ঞ=অনভিজ্ঞ।

ন—উচিত=অনুচিত। ন—আচার=অনাচার। ন—আদর=অনাদর (আশ্রিত ব্যক্তিকে অনাদর করা কখনো উচিত নহে)। ন—ইচ্ছা=অনিচ্ছা। ন—ঐক্য=অনৈক্য। ন—উর্বর=অনুর্বর (অনুর্বর জমিতে কখনও ভালো ফসল হয় না)।

৩। কখনও কখনও নঞ্ স্থানে ন হয়। যথা, ন—অতি শীতোষ্ণ=নাতিশীতোষ্ণ। ন—অতিদীর্ঘ=নাতিদীর্ঘ (এই নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে বহু বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে)। ন—পুংসক=নপুংসক।

৪। আ, বে, গর, না, নি ইত্যাদি শব্দযোগেও নঞ্ তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা, ন—ধোয়া=আধোয়া। ন—লুনি=আলুনি (আলুনি ব্যঞ্জন মুখে বিস্বাদ লাগে)। ন—সরকারী=বেসরকারী। ন—হাজির=গরহাজির। ন—আইনী=বেআইনী (বেআইনী কাজ করিলেই আইনের চোখে দণ্ডনীয় হইবে)। ন—বলা=নাবলা (নাবলা কথা মনের মধ্যে গুন্ গুন্ করে চলেছে)। ন—খরচা=নিখরচা—(প্রায় নিখরচায় বেড়িয়ে আসবার এত বড় সুযোগ অবহেলা করা উচিত নয়)। ন—মঞ্জুর=নামঞ্জুর (তোমার অনুরোধ নামঞ্জুর হল)।

উপপদ তৎপুরুষ সমাস ঃ

উপপদের সহিত কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাহাকে **উপপদ তৎপুরুষ সমাস** বলে (যে সকল পদের পরস্থিত ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় হয় তাহাকে উপপদ বলে)।

যথা, জলে চরে যে—জলচর। পঙ্কে জাত হয় যাহা=পঙ্কজ (লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলো অস্তাচলে—মধুসূদন)। মনে জাত হয় যাহা=মনোজ। কুম্ভ করে যে=কুম্ভকার। ইন্দ্রকে জয় করেন যিনি=ইন্দ্রজিৎ (ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন)। জল দান করে যে=জলদ। শত্রুকে হনন করেন যিনি=শত্রুঘ্ন। সূত্র ধারণ করেন যিনি=সূত্রধার (সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা অংশ সূত্রধার মূল নাটকের বক্তব্য বস্তু ব্যাখ্যা করিতেন)। শাস্ত্র করেন যিনি=শাস্ত্রকার। মধু পান করে যে=মধুপ (মৌমাছি)।

ছেলেকে ভোলায় যাহা=ছেলেভুলানো (রবীন্দ্রনাথ অনেক ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন)। লুচি ভাজে যে=লুচিভাজা। লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে যাহাকে=লক্ষ্মীছাড়া (দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে—রবীন্দ্রনাথ)।

হাড়ভাঙে যাহাতে=হাড়ভাঙা। পাস করিয়াছে যে=পাসকরা। বই পড়িয়া যাহা হয়=বইপড়া (বইপড়া বিদ্যার চেয়ে হাতে কলমে কাজ শিখলে তা বেশি উপকারে আসে)। বুক ফাটে যাহাতে=বুকফাটা। বাস্তু হারাইয়াছে যে=বাস্তুহারা (বাস্তুহারা লোকেরা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়িয়াছে)। সিনেমা দেখে যে=সিনেমাদেখা (সিনেমাদেখা ছোকরাদের মুখে দিনরাত কেবল সিনেমার গল্পই শুনতে পাওয়া যায়)। ছেলেকে ধরে যে=ছেলেধরা। নাড়ি টেপে যে=নাড়িটেপা।

অলুক তৎপুরুষ ঃ

যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ (লুক) হয় না তাহাকে **অলুক তৎপুরুষ** সমাস বলে।

যথা, সরোবরে (সরসি) জাত=সরসিজ। মনে (মনসি) জাত=মনসিজ (মদন)—(মনসিজের প্রভাব খুব কম লোকই জয় করিতে পারে)। যুদ্ধে (যুধি) স্থির=যুধিষ্ঠির। ভ্রাতুঃ (ভ্রাতার)+পুত্র=ভ্রাতুষ্পুত্র। বাচঃ (বাক্যের)+পতি=বাচস্পতি। ঘিয়ে ভাজা=ঘিয়েভাজা। গোরুর গাড়ি= গোরুর-গাড়ি। চোখের বালি=চোখের-বালি। গায়ে পড়া=গায়ে-পড়া (তার এই গায়ে-পড়া ভাব আমার মোটেই পছন্দ হয় না)। হাতে বোনা= হাতেবোনা। পেটের ভাত=পেটেরভাত। চিনির বলদ=চিনির-বলদ। অন্তে (সমীপে) বাসী=অন্তে-বাসী। জলে ভাসা=জলে-ভাসা। তেলে ভাজা=তেলে-ভাজা।

কর্মধারয় সমাস

পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের কিংবা একার্থবোধক দুই বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের সমাসকে **কর্মধারয়** সমাস বলে। এই সমাসেও পরপদের প্রাধান্য থাকে।

১। পূর্বপদ বিশেষণ :

যথা, নীল যে উৎপল=নীলোৎপল (রামচন্দ্র দেবীপূজার জন্য একশত আটটি নীলোৎপল সংগ্রহ করিয়াছিলেন)। শ্বেত যে বস্ত্র=শ্বেতবস্ত্র। বীর যে পুরুষ= বীরপুরুষ। মধুর যে বচন=মধুরবচন। মহান যে পুরুষ=মহাপুরুষ। মহান্ যে বীর=মহাবীর (মহাবীর প্রতাপসিংহ মেবারের মুক্তির জন্য বিরামবিহীন সংগ্রাম

করিয়াছিলেন)। মহান যে ঋষি=মহর্ষি (মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন)। মহান্ যে দেব=মহাদেব। মহতী যে কীর্তি=মহাকীর্তি। মহতী যে অষ্টমী=মহাষ্টমী। দুষ্টা যে মতি=দুষ্টমতি। মহৎ যে অরণ্য=মহারণ্য। মহান্ যে জন=মহাজন। মহতী যে নদী=মহানদী। লাল যে ফুল=লালফুল। নীল যে পাখী=নীলপাখী। ভালো যে ছেলে=ভালো-ছেলে। উড়ো যে জাহাজ=উড়োজাহাজ। বড়ো যে বাবু=বড়োবাবু। ফুল (Full) যে বাবু=ফুলবাবু। হাফ (Half) যে হাতা=হাফহাতা। ভাঙ্গা যে হাট=ভাঙ্গাহাট। মেজো যে বউ=মেজোবউ। কাঁচা যে কলা=কাঁচকলা। কালো যে পেঁচা=কালোপেঁচা। শাদা যে বিড়াল=শাদাবিড়াল।

(ক) কর্মধারয় সমাসে পরপদস্থিত সখি, রাজন্ ও অহন্ স্থলে যথাক্রমে সখ, রাজ এবং অহ হয়। যথা, মহান্ যে রাজা=মহারাজ (বাংলায় মহারাজাও ব্যবহৃত হয়)। প্রিয় যে সখা=প্রিয়সখ। অধি যে রাজা=অধিরাজ—(মহারাজ রাজ-অধিরাজ! মহিমা সাগর তুমি কৃপা-অবতার—রবীন্দ্রনাথ)। এক যে অহন্=একাহ।

(খ) পূর্ব, মধ্য, অপর ও সায়ম্ শব্দ যদি সেই দিবসের অংশ হয় তাহা হইলে উহাদের পরস্থিত অহন্ স্থানে অহ্ন হয়, অন্য দিবস হইলে অহ হয়। যথা, পূর্ব যে অহন্=পূর্বাহ্ন (দিনের প্রথমভাগ), পূর্ব যে অহন্=পূর্বাহ (আগের দিন), অপর যে অহন্=অপরাহ্ন (বৈকাল); অপর যে অহন্=অপরাহ (অপর দিন)। মধ্য যে অহন্=মধ্যাহ্ন। সায়ম্ যে অহন্=সায়াহ্ন।

(গ) কতকগুলি কর্মধারয় সমাসে পূর্বনিপাত হয়, অর্থাৎ পরের পদ আগে বসে। যথা, সিদ্ধ যে আলু=আলুসিদ্ধ। বাটা যে হলুদ=হলুদবাটা। ভাজা যে চাল=চালভাজা। অধম যে রাজা=রাজাধম। পড়া যে তেল=তেলপড়া। ভাজা যে বেগুন=বেগুনভাজা।

(ঘ) কর্মধারয় সমাসে অন্য শব্দ স্থানে অন্তর হয় এবং উহা পরে বসে। যথা, অন্যস্থান=স্থানান্তর (স্কুল বাড়িটি পুড়িয়া যাওয়াতে স্থানান্তরে নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)। অন্য গৃহ=গৃহান্তর। অন্য গ্রাম=গ্রামান্তর (গ্রামে গ্রামান্তরে সংবাদটি রটিয়া গেল)। অন্য রূপ=রূপান্তর। অন্য দেশ=দেশান্তর। অন্য ধর্ম=ধর্মান্তর। অন্য দেহ=দেহান্তর (সম্প্রতি পণ্ডিচেরীর শ্রীমার দেহান্তর ঘটিয়াছে)।

(ছ) পুরুষ ও পথ শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে কু স্থানে কা হয়। যথা, কু (কুৎসিত) পুরুষ = কাপুরুষ। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কু স্থানে কৎ হয়। কু আচার = কদাচার। কু অন্ন = কদন্ন। কু অভ্যাস = কদভ্যাস।

(চ) কর্মধারয় সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পূর্ব, পর, মধ্য, দীর্ঘ ও সর্ব প্রভৃতি শব্দের পর রাত্রি শব্দ স্থানে রাত্র হয়। যথা, পূর্ব যে রাত্রি = পূর্বরাত্র। দ্বি যে রাত্র = দ্বিরাত্র (পর পর দ্বিরাত্র জাগিয়া যাত্রাগান শুনিয়াছি)। মধ্য যে রাত্রি = মধ্যরাত্র। দীর্ঘ যে রাত্রি = দীর্ঘরাত্র।

২। দুই বিশেষ্যপদের অভেদ কল্পিত হইলেও কর্মধারয় সমাস হয়।

যথা, যিনি দেব তিনিই ঋষি = দেবর্ষি। যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি (রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দমাণিক্যকে রাজর্ষিরূপে কল্পনা করিয়াছেন)। যিনি হরি তিনিই হর = হরিহর। যিনি পিতা তিনিই দেব = পিতৃদেব (তোমার এই সৎকাজের জন্য তোমার স্বর্গত পিতৃদেব নিশ্চয়ই স্বর্গ হইতে আশীর্বাদ করিবেন)। যে কলিকাতা সেই নগরী = কলিকাতানগরী। যিনি নর তিনিই দেবতা = নরদেবতা (স্বামী বিবেকানন্দ নরদেবতার পূজার কথা বলিয়া গিয়াছেন)। যিনি ঋষি তিনিই কবি = ঋষিকবি। গঙ্গা যে নদী = গঙ্গানদী। যিনি মা তিনিই ঠাকরুণ = মাঠাকরুণ। যিনি বৌ তিনিই ঠান (ঠাকরুণ) = বৌঠান (রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান কবিকে খুব স্নেহ করিতেন)। যিনি ডাক্তার তিনিই বাবু = ডাক্তারবাবু। যাহা গোলাপ তাহাই ফুল = গোলাপফুল। যিনি গিন্নি তিনিই মা = গিন্নিমা।

৩। দুই বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়।

যথা, মহান্ যে ধনী = মহাধনী। পরম যে জ্ঞানী = পরমজ্ঞানী (শ্রীঅরবিন্দ পরমজ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন)। যাহা নীল তাহাই লোহিত = নীললোহিত। যে হিংস্র সেই কুটিল = হিংস্রকুটিল (ইয়াগোর হিংস্রকুটিল চক্রান্তে ওথেলো ও ডেসডিমোনার সর্বনাশ ঘটিয়াছিল)। যাহা মৃদু তাহাই মন্দ = মৃদুমন্দ (মৃদুমন্দ দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে)। যাহা মিঠা তাহাই কড়া = মিঠাকড়া। টাটকা যে ভাজা = টাটকাভাজা। আধ যাহা ফোটা = আধফোটা। যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর। যাহা পচা তাহাই গলা = পচাগলা।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঃ

যে কর্মধারয় সমাসের মধ্যপদ লুপ্ত হয় তাহাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** সমাস বলে।

যথা, ঘি দ্বারা পক্ব বা মাখা ভাত = ঘিভাত। ভিক্ষায় লব্ধ অন্ন = ভিক্ষান্ন। পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন। সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন (বিক্রমাদিত্য নবরত্নবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া থাকিতেন)। হস্তিসদৃশ মূর্খ = হস্তিমূর্খ। ছায়াপ্রধান তরু = ছায়াতরু। স্বর্ণের ন্যায় অক্ষর = স্বর্ণাক্ষর। স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কার = স্বর্ণালঙ্কার। কীর্তিপ্রকাশক মন্দির = কীর্তিমন্দির। যমপ্রদত্ত যন্ত্রণা = যমযন্ত্রণা। অর্থের লোভে পিশাচ = অর্থপিশাচ। জল মিশ্রিত দুধ = জলদুধ। সিংহ চিহ্নিত দরজা = সিংহদরজা। হস্ত দ্বারা চালিত শিল্প = হস্তশিল্প। ঘোড়ার দ্বারা চালিত গাড়ি = ঘোড়গাড়ি। প্রীতি উপলক্ষে ভোজ = প্রীতিভোজ। জন্ম দিবস উপলক্ষে উৎসব = জন্মোৎসব। লৌহে নির্মিত পিঞ্জর = লৌহপিঞ্জর। কণ্টকে নির্মিত মুকুট = কণ্টকমুকুট। ধর্ম রক্ষার্থে ঘট = ধর্মঘট। ঘরে থাকে যে জামাই = ঘরজামাই (ঘরজামাইয়ের পোড়া মুখ, মরা বাঁচা সমান সুখ)। আকাশ হইতে আগত বাণী = আকাশবাণী (আকাশবাণী হইতে সংবাদ প্রচারিত হইতেছে)। সিঁদুর রাখিবার কৌটা = সিঁদুরকৌটা। হাতে পরার ঘড়ি = হাতঘড়ি। আক্কেল সূচক দাঁত = আক্কেলদাঁত। হাঁটু পর্যন্ত গভীর যে জল = হাঁটুজল (বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে)। কাঠ পুড়িয়ে যে কয়লা = কাঠকয়লা। চালে জন্মে যে কুমড়া = চালকুমড়া। পানিতে (জলেতে) জন্মে যে ফল = পানিফল।

উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাস ঃ

দুইটি বস্তুর পরস্পর তুলনা বা উপমা করিয়াও কর্মধারয় সমাস হয়। যাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহাকে বলে **উপমান** এবং যাহাকে তুলনা করা হয় তাহাকে বলা হয় **উপমেয়**। উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে যে সাধারণ গুণ থাকে তাহাকে বলা হয় সাধারণ ধর্ম। চন্দ্রের মত সুন্দর মুখ এই বাক্যটির চন্দ্র উপমান, মুখ উপমেয় এবং সুন্দর সাধারণ ধর্ম।

সাধারণ ধর্মবোধক পদের সহিত উপমান পদের সমান হইলে তাহাকে **উপমান কর্মধারয় সমাস** বলে। যথা, ঘনের (মেঘের) ন্যায় শ্যাম = ঘনশ্যাম। দূর্বাদলের ন্যায় শ্যাম = দূর্বাদলশ্যাম (দূর্বাদলশ্যামতনু নয়নাভিরাম

রামচন্দ্র শবরীর প্রতীক্ষা পূর্ণ করিয়াছিলেন)। তুষারের ন্যায় ধবল=তুষারধবল (তুষারধবল শয্যায় শুইয়াও তিনি মানসিক অশান্তিতে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছেন)। কাজলের মত কালো=কাজলকালো। গো অথবা গোরুর মত বেচারা=গোবেচারা। কুন্দের ন্যায় শুভ্র=কুন্দশুভ্র। নবনীতের ন্যায় কোমল =নবনীতকোমল। জলদের ন্যায় গম্ভীর=জলদগম্ভীর (প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের জলদগম্ভীর কণ্ঠ ছাত্রদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে)। হস্তীর ন্যায় মূর্খ=হস্তিমূর্খ। কুসুমের ন্যায় কোমল=কুসুমকোমল। শশের (শশকের) ন্যায় ব্যস্ত=শশব্যস্ত। ইস্পাতের ন্যায় কঠিন=ইস্পাতকঠিন।

যে স্থলে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না, কেবল উপমেয় ও উপমানপদের সমাস হয় এবং উপমেয় উপমানের পূর্বে বসে সেখানে **উপমিত কর্মধারয়** সমাস হয়। এই সমাসে ন্যায়, তুল্য, সদৃশ, প্রায় প্রভৃতি সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত হয়। যথা, পুরুষ সিংহের ন্যায়=পুরুষসিংহ। মুখ চন্দ্র সদৃশ—মুখচন্দ্র। বাহু লতার ন্যায়=বাহুলতা (কাহারে সে জড়াতে চায় দুটি বাহুলতা—রবীন্দ্রনাথ)। চরণ কমলের ন্যায়=চরণকমল। পাদ পদ্মের ন্যায়=পাদপদ্ম। (সরস্বতীর পাদপদ্মে ছাত্রছাত্রীবৃন্দ পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে)। কর পল্লবের ন্যায়=করপল্লব। নর শার্দূলের ন্যায়=নরশার্দূল (দেশের লোকেরা আশুতোষকে নরশার্দূল বলিয়াই মনে করিতেন)।

উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যেখানে অভেদ কল্পনা করা হয় সেখানে **রূপক কর্মধারয় সমাস** হয়। এই সমাসের ব্যাসবাক্যে রূপ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

যথা, আঁখি রূপ পাখি=আঁখিপাখি। প্রাণ রূপ পাখি=প্রাণপাখি। মন রূপ মাঝি—মনমাঝি (মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি তো আর বাইতে পারলাম না)। মন রূপ বেড়ি=মনবেড়ি (ধরতে পারলে মনোবাড়ি দিতাম পাখির পায়—বাউলগান)। জ্ঞান রূপ আলোক=জ্ঞানালোক। শোক রূপ সিন্ধু=শোকসিন্ধু। বিরহ রূপ পয়োধি=বিরহ পয়োধি (বিরহপয়োধি পার কিয়ে পাওব—বিদ্যাপতি)। চরিত রূপ অমৃত=চরিতামৃত। হৃদয়রূপ মন্দির=হৃদয়মন্দির। চিত্তরূপ চকোর=চিত্তচকোর। জ্ঞান রূপ বৃক্ষ=জ্ঞানবৃক্ষ। বিষাদরূপ সিন্ধু=বিষাদসিন্ধু। কোপ রূপ বহ্নি=কোপবহ্নি। ভক্তিরূপ সুধা—ভক্তিসুধা। ক্ষুধারূপ অনল=ক্ষুধানল। দুঃখ রূপ অর্ণব=দুঃখার্ণব।

দ্বিগু সমাস

যে কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক শব্দ হয় এবং সমাহার অর্থাৎ অনেক বস্তুর সমাবেশ বুঝায় তাহাকে **দ্বিগু সমাস** বলে। যথা, সপ্ত অহের সমাহার=সপ্তাহ। পঞ্চভূতের সমাহার=পঞ্চভূত। নব রত্নের সমাহার=নবরত্ন (বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্ন শোভা পাইতেন)। দশচক্রের সমাহার=দশচক্র। চার রাস্তার সমাহার=চৌরাস্তা। তিন মাথার সমাহার=তেমাথা। চার মোহনার সমাহার=চৌমুহনী। তিন ভুবনের সমাহার=ত্রিভুবন। দশদিকের সমাহার=দশদিক। তিন মূর্তির সমাহার=ত্রিমূর্তি। সে (তিন) তারের সমাহার=সেতার। পাচ ফোড়নের সমাহার=পাচফোড়ন।

সমাহার দ্বিগু হইলে কোন কোন অকারান্ত শব্দ ঈকারান্ত হয়। যথা, পঞ্চ বটের সমাহার=পঞ্চবটী (রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ পঞ্চবটী বনে সুখে কাটাইয়াছিলেন)। তিন পদের সমাহার=ত্রিপদী। চার পদের সমাহার=চতুষ্পদী। শত বর্ষের সমাহার=শতবার্ষিকী (নাট্যশালার শতবার্ষিকী উৎসব পালন করা হইয়াছে)।

দ্বিগু সমাসে নদী শব্দের ঈ ও অঙ্গুলি শব্দের ই স্থানে অ হয়। যথা পঞ্চ নদীর সমাহার=পঞ্চনদ। পঞ্চ অঙ্গুলির সমাহার=পঞ্চাঙ্গুল।

বহুব্রীহি

যে সমাসে সমস্যমান পদ দুইটির অর্থ না বুঝাইয়া অতিরিক্ত কোনও অর্থ বুঝায় তাহাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে। বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন শব্দ বিশেষণ হয় এবং ইহার ব্যাসবাক্যে যে, যিনি, যাহার প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা, শূল পাণিতে যাঁহার=শূলপাণি (শিব)। দশ আনন যাহার=দশানন (রাবণ)। নার (জল) অয়ন যাঁহার=নারায়ণ। পীত অম্বর যাঁহার=পীতাম্বর (কৃষ্ণ)—(যমুনা পুলিনে পীতাম্বরের বাঁশী নিত্যকাল শোনা যাইতেছে)। যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন=জিতেন্দ্রিয়। দীর্ঘ বাহু যাঁহার=দীর্ঘবাহু। বীণা পাণিতে যাঁহার=বীণাপাণি। পদ্ম নাভিতে যাঁহার=পদ্মনাভ (ত্রিবেন্দ্রামের পদ্মনাভ মন্দিরে বহু ভক্ত প্রতিদিন যাইয়া থাকেন)। হরিণের ন্যায় নয়ন যাহার=হরিণনয়ন+আ (স্ত্রী)=হরিণনয়না। মহৎ আশয় যাঁহার=মহাশয়। বীত (বিগত) স্পৃহা যাহার=বীতস্পৃহ। সমান গোত্র

যাহার=সগোত্র। পুত্র সহ বর্তমান যে=সপুত্র। বদ্‌রোগ যাহার=বদ্‌রাগী। পোড়া কপাল যাহার=পোড়াকপালিয়া—পোড়াকপালে। এক গোঁ যাহার =একগুঁয়ে (ভবতোষ বাবু একগুঁয়ে ব্যক্তি, যা মনস্থ করেন তা করেই তবে ছাড়েন)। ল্যাজ কাটা যাহার=ল্যাজকাটা। মতি (উ) চ্ছন্ন যাহার =মতিচ্ছন্ন। এক চোখ যাহার=একচোখো। লাল পাড় যাহার= লালপাড়িয়া—লালপেড়ে। শুচি বায়ু যাহার=শুচিবেয়ে। মণি হারাইয়াছে যাহার=মণিহারা।

(ক) বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ প্রায়ই পুংলিঙ্গের ন্যায় ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তী আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ পদ অকারান্ত হয়। যথা, হৃতা শ্রী যাহার= হৃতশ্রী। তীক্ষ্ণা বুদ্ধি যাহার=তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা যাঁহার=দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (সুভাষচন্দ্র নির্ভীক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতা ছিলেন)। লব্ধা প্রতিষ্ঠা যাঁহার= লব্ধপ্রতিষ্ঠ (অচিন্ত্য সেনগুপ্ত বর্তমান কালের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক)। ছিন্না শাখা যাহার=ছিন্নশাখ। কৃতা বিদ্যা যাঁহার দ্বারা=কৃতবিদ্য (ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত কৃতবিদ্য ব্যক্তি বাংলা দেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন)।

(খ) বহুব্রীহি সমাসে সহ ও সমান শব্দ স্থানে বিকল্পে স, মহৎ শব্দ স্থানে মহা এবং স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কু স্থানে কৎ হয়। যথা, জলের সহিত বর্তমান=সজল (দরিদ্র লোকটি সজল চোখে করুণ মিনতি জানাইল)। সমান তীর্থ (আচার্য) যাহার=সতীর্থ। মহৎ বল যাহার=মহাবল (কর্ণ মহাবল ঘটোৎকচকে নিধন করিয়াছিলেন। কু আচার যাহার=কদাচার।

(গ) বহুব্রীহি সমাসের শেষ পদ ঋকারান্ত কিংবা স্ত্রী লিঙ্গ ঈকারান্ত ও ঊকারান্ত হইলে শেষে ক আসে। যথা, নদী মাতা যাহার=নদীমাতৃক (নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের ভূমি বিশেষ উর্বরা)। স্ত্রীর সহিত বর্তমান=সস্ত্রীক। দুই পত্নী যাহার=দ্বিপত্নীক। বিগতা হইয়াছে পত্নী যাহার=বিপত্নীক। প্রোষিত (প্রবাসী) ভর্তা যাহার=প্রোষিতভর্তৃকা (প্রোষিতভর্তৃকা নারী মনোবেদনায় দিন যাপন করে)। মৃতা পত্নী যাহার=মৃতপত্নীক। ভ্রাতার সহিত বর্তমান=সভ্রাতৃক।

(ঘ) বহুব্রীহি সমাসে নাভি স্থানে নাভ, অক্ষি স্থানে অক্ষ এবং ধর্ম স্থানে ধর্মন্ হয়। যথা, ঊর্ণা নাভিতে যাহার=ঊর্ণনাভ। পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি যাহার=পুণ্ডরীকাক্ষ। সমান হইয়াছে ধর্ম যাহার=সমানধর্মন্—সমানধর্মা

(ভবভূতি বলিয়াছিলেন, সমানধর্মা ব্যক্তি ভবিষ্যতে তাঁহার কাব্য সমাদর করিবেন)। পদ্মের ন্যায় অক্ষি যাহার=পদ্মাক্ষ। হরিণের ন্যায় অক্ষি যাহার=হরিণাক্ষ+ঈ (স্ত্রী)—হরিণাক্ষী। বিশাল অক্ষি যাহার=বিশালাক্ষ+ঈ (স্ত্রী)—বিশালাক্ষী।

(ঙ) বহুব্রীহি সমাসে জায়া ও ধনুস্ শব্দের স্থানে জানি ও ধন্বন্ হয়। যথা, যুবতী জায়া যাহার=যুবজানি (সাত পুত্র নৃপতির সব যুবজানি)। প্রিয়া জায়া যাহার=প্রিয়জানি। গাণ্ডীব ধনু যাঁহার=গাণ্ডীবধন্বা—(অর্জুন) (গাণ্ডীবধন্বা যুদ্ধে কর্ণকে বধ করিয়াছিলেন)। পুষ্প ধনু যাঁহার=পুষ্পধন্বা (পুষ্পধন্বা মদন মহাদেবের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন)।

(চ) সু, পূতি, উৎ ও সুরভি শব্দের পরস্থিত গন্ধ শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় হয়। যথা, শোভন গন্ধ যাহার=সুগন্ধি। পূতি গন্ধ যাহাতে=পূতিগন্ধি।

(ছ) বক্র শব্দ পরে থাকিলে অষ্টন্ শব্দের স্থানে অষ্টা এবং পদাদি শব্দ পরে থাকিলে শ্বন্ শব্দের স্থানে শ্বা হয়। যথা, অষ্ট বক্র যাঁহার=অষ্টাবক্র। শ্বার পদের মত পদ যাহার=শ্বাপদ।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ

১। পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়া করার নাম **ব্যতীহার বহুব্রীহি** সমাস। এই সমাসে পূর্বপদ আকারান্ত ও পরপদ ইকারান্ত হয়। যথা, কেশে কেশে ধরিয়া যে যুদ্ধ=কেশাকেশি। চুলে চুলে টানিয়া যে লড়াই=চুলাচুলি। ঘুষিতে ঘুষিতে যে লড়াই=ঘুষাঘুষি—ঘুষোঘুষি (তখন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষোঘুষি আরম্ভ হইল—বঙ্কিমচন্দ্র)। কানে কানে স্পর্শ করিয়া যে মন্ত্রণা=কানাকানি। লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই=লাঠালাঠি। দলে দলে যে বিরোধ=দলাদলি।

২। যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হয় এবং উভয়ই প্রথমা বিভক্তিযুক্ত হয় তাহাকে **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি** বলে। যথা, পক্ক কেশ যাহার=পক্ককেশ। পলিত কেশ যাহার=পলিতকেশ। চলিত কলম যাহার=চলিতকলম। নীল কণ্ঠ যাঁহার=নীলকণ্ঠ (মহাদেব)। পোড়া কপাল যাহার=পোড়াকপালে।

৩। পূর্বপদ বিশেষণ না হইলে তাহাকে **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি** বলে। যথা, দেশ হইয়াছে প্রাণ যাহার=দেশপ্রাণ। খড়্গ হস্তে যাহার=খড়্গহস্ত।

ঘরের দিকে মুখ যাহার = ঘরমুখো (বাঙালী ঘরমুখো জাতি)। গরুড় হইয়াছে বাহন যাহার = গরুড়বাহন। ঢেঁকি বাহন যাহার = ঢেঁকিবাহন (নারদ)।

৪। যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যে মধ্যপদের লোপ হয় তাহাকে **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** বলে। যথা, চাঁদের মত (সুন্দর) মুখ যাহার = চাঁদমুখ। দশ হাত (পরিমাণ) যাহার = দশহাতি। বৃষের ন্যায় (দৃঢ়) স্কন্ধ যাহার = বৃষস্কন্ধ। বিগত জন যে স্থান হইতে = বিজন। বিগত অর্থ যাহা হইতে = ব্যর্থ (দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ—রবীন্দ্রনাথ)। বিড়ালের মত চোখ যাহার = বিড়ালচোখো। বিড়ালের মত অক্ষি যাহার = বিড়ালাক্ষী (বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে—ঈশ্বরগুপ্ত)। সোনার মত উজ্জ্বল মুখ = সোনামুখী।

৫। যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হয় না তাহাকে **অলুক বহুব্রীহি** বলে। যথা, মুখে ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = মুখেভাত। গায়ে হলুদ হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ। হাতে ছড়ি যাহার = হাতেছড়ি অথবা ছড়িহাতে। লাঠি হাতে যাহার = লাঠিহাতে (লাঠিহাতে লোকটি অতি কষ্টে রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছে)।

৬। যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদে নঞর্থক কোন অব্যয় থাকে তাহাকে **নঞর্থক বহুব্রীহি** বলে। যথা, লাজ নাই যাহার = নিলাজ। নাই খোঁজ যাহার = নিখোঁজ। নাই সাড়া যাহার = নিঃসাড়। নাই বোধ যাহার = নির্বোধ। নাই তার যাহার = বেতার। নাই হায়া যাহার = বেহায়া। নাই পয় যাহার = অপয়া। নাই পুত্র যাহার = অপুত্র, অপুত্রক। নাই শোক যাহার = অশোক। নাই আদি যাহার = অনাদি। নাই অর্থ যাহার = অনর্থ, অনর্থক। নাই রাজা যে দেশে = অরাজ, অরাজক (কি বলিলে; রাজা কি নির্দয় তবে? দেশ অরাজক?—রবীন্দ্রনাথ)। নাই অন্ন যাহার = নিরন্ন। নাই দোষ যাহার = নির্দোষ। নাই লজ্জা যাহার = নির্লজ্জ। নাই আকার যাহার = নিরাকার। নাই শঙ্কা যাহার = নিঃশঙ্ক।

অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয় হয় এবং সেই অব্যয়ের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় তাহাকে **অব্যয়ীভাব সমাস** বলে। বিভিন্ন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা, সামীপ্য, বীপ্সা, অনতিক্রম, অভাব, পর্যন্ত, যোগ্যতা, সাদৃশ্য, পশ্চাৎ ইত্যাদি।

(ক) **সামীপ্য**—কূলের সমীপে = উপকূল (নদীর উপকূলে জেলেরা বাস করে)। গঙ্গার সমীপে = উপগঙ্গ। কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ। অক্ষির সমীপে = সমক্ষ। অক্ষির সম্মুখে = প্রত্যক্ষ। নগরীর সমীপে = উপনগরী (কলিকাতার আশে পাশে অনেক উপনগরী গড়িয়া উঠিতেছে)।

(খ) **বীপ্সা** (পুনঃপুনঃ অর্থে)—দিনে দিনে = প্রতিদিন। গৃহে গৃহে = প্রতিগৃহ। ক্ষণে ক্ষণে = অনুক্ষণ, প্রতিক্ষণ (পুত্রহারা মায়ের মনে অনুক্ষণ শোকের আগুন জ্বলিতেছে)। জনে জনে = প্রতিজন, জনপ্রতি। বছরে বছরে = ফিবছর (ফিবছর আমাদের দেশে হয় খরা না হয় বন্যা লাগিয়াই আছে)। রোজ রোজ = হররোজ।

(গ) **অনতিক্রম**—শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া = যথাশক্তি (যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া যাও যাহাতে পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে পার)। বিধিকে অতিক্রম না করিয়া = যথাবিধি। শাস্ত্রকে অতিক্রম না করিয়া = যথাশাস্ত্র (তিনি যথাশাস্ত্র পিতার পারলৌকিক কৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়াছেন)। জ্ঞানকে অতিক্রম না করিয়া = যথাজ্ঞান। কালকে অতিক্রম না করিয়া = যথাকাল। সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া = যথাসাধ্য।

(ঘ) **অভাব**—ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ (দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে জাগিয়া উঠিল হাহারবে—রবীন্দ্রনাথ)। বিঘ্নের অভাব = নির্বিঘ্ন। ঘরের অভাব = হাঘর। ভাতের অভাব = হাভাত। মিলের অভাব = গরমিল। বন্দোবস্তের অভাব = বে-বন্দোবস্ত। ঝঞ্ঝাটের অভাব = নির্ঝঞ্ঝাট। মানানের অভাব = বেমানান। চালের অভাব = বেচাল।

(ঙ) **পর্যন্ত**—কর্ণ পর্যন্ত = আকর্ণ। জীবন পর্যন্ত = আজীবন (তোমার কৃতজ্ঞতার কথা আজীবন স্মরণ রাখিব)। বাল বৃদ্ধ ও বনিতা পর্যন্ত = আবাল-বৃদ্ধবনিতা। সমুদ্র পর্যন্ত = আসমুদ্র। মূল পর্যন্ত = আমূল। মরণ পর্যন্ত = আমরণ। জানু পর্যন্ত = আজানু। কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ। পাদ হইতে মস্তক

পর্যন্ত = আপাদমস্তক (ছেলেটির পাকা পাকা কথা শুনিয়া আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল)।

অবধি—শৈশব অবধি = আশৈশব। কৈশোর অবধি = আ-কৈশোর।

(চ) **যোগ্যতা**—রূপের যোগ্য অনুরূপ (অনুরূপ আশ্বাস বাণী তো সকল নেতার মুখেই শোনা যাইতেছে)। কূলের যোগ্য = অনুকূল। গুণের যোগ্য = অনুগুণ।

(ছ) **সাদৃশ্য**—দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ। কথার সদৃশ = উপকথা। বনের সদৃশ = উপবন। মূর্তির সদৃশ = প্রতিমূর্তি (রামচন্দ্র সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্তির দিকে তাকাইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেন)। ভাষার সদৃশ = উপ-ভাষা (বাংলা ভাষায় চারটি প্রধান উপভাষা রহিয়াছে)। অস্থির সদৃশ = উপাস্থি।

(জ) **পশ্চাৎ**—গমনের পশ্চাৎ = অনুগমন (বনবাসে সীতা ও লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিলেন)। রথের পশ্চাৎ = অনুরথ। পদের পশ্চাৎ = অনুপদ। তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ।

নিত্যসমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলি নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্য হয়না, তাহাকে **নিত্য সমাস** বলে। কোন কোন স্থলে সমস্যমান পদের অর্থবোধক শব্দ দ্বারা ব্যাসবাক্যের কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। যথা, কেবল জল = জলমাত্র। কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র। কেবল এক = একমাত্র (একমাত্র প্রিয় বন্ধুকেই এই গোপন কথাটি বলা যায়)। অন্য দেশ = দেশান্তর। অন্যস্থান = স্থানান্তর। অন্য রূপ = রূপান্তর। বেলাকে উৎ (অতিক্রান্ত) = উদ্বেল। শৃঙ্খলাকে উৎ = উচ্ছৃঙ্খল। বাস্তু হইতে উৎ (উৎখাত) = উদ্বাস্তু। স্নানের জন্য = স্নানার্থ। ভ্রমণের জন্য = ভ্রমণার্থ।

নিভ, সন্নিভ, সঙ্কাশ, নিকাশ প্রভৃতি তুল্যার্থবোধক শব্দের সহিতও নিত্য সমাস হয়। যথা, ফেনের ন্যায় = ফেননিভ। বজ্রের ন্যায় = বজ্রসন্নিভ। অনলের ন্যায় = অনলসঙ্কাশ।

প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি উপসর্গের সহিত কৃদন্ত পদের নিত্য সমাস হয়। এই সমাসকে **প্রাদি সমাস** বলে। যথা, অনু (পশ্চাৎ) তাপ = অনুতাপ।

প্রতি (প্রতিকূল) বাদ = প্রতিবাদ। প্র (প্রকৃষ্ট) ভাব = প্রভাব (আধুনিক উপন্যাসের উপরে শরৎচন্দ্রের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য)।

সমাসঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সশঙ্কিত—	সশঙ্ক (শঙ্কার সহিত বর্তমান—বহু)
সলজ্জিত—	সলজ্জ
নির্দোষী —	নির্দোষ (নাই দোষ যাহার নঞ্ বহু।)
নিরপরাধী—	নিরপরাধ
ছাগীদুগ্ধ—	ছাগদুগ্ধ (ছাগীর দুগ্ধ ষষ্ঠীতৎ। পূর্বপদের পুংবদ্ভাব হয়)
কালীদাস —	কালিদাস (কালীর দাস—ষষ্ঠীতৎ। দাস শব্দ পরে থাকিলে পূর্বপদ ইকারান্ত হয়)
সক্ষম—	ক্ষম (ক্ষম শব্দই বিশেষণ। স যোগে পুনরায় বিশেষণ হইতে পারে না)
সাবহিত—	অবহিত। অথবা সাবধান (অবধানের সহিত বর্তমান) অবহিত বিশেষণ। পুনরায় স যোগ করিয়া বিশেষণ করা যায় না।
সুকেশিনী—	সুকেশী। (শোভন কেশ যাহার = সুকেশ—স্ত্রীলিঙ্গে সুকেশী)
শ্যামাঙ্গিনী-	শ্যামাঙ্গী। (শ্যাম অঙ্গ যাহার = শ্যামাঙ্গ। স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয়—শ্যামাঙ্গী)
মহারাজা —	মহারাজ। (কর্মধারয় সমাসে রাজন শব্দ রাজ হয়। মহান যে রাজা = মহারাজ)
অহোরাত্রি—	অহোরাত্র } (দ্বন্দ্ব সমাসে অহন্ শব্দের পরে রাত্রি ও নিশা অকারান্ত হয়)
অহর্নিশি—	অহর্নিশ }
সাপরাধী =	সাপরাধ অথবা অপরাধী
সবিনয়পূর্বক =	সবিনয় অথবা বিনয়পূর্বক
নীরোগী =	নীরোগ
শ্বেতাঙ্গিনী =	শ্বেতাঙ্গী

একই পদের বিভিন্ন সমাস

পীতাম্বর — পীত যে অম্বর = পীতাম্বর (কর্মধারয়)
পীত অম্বর যাহার = পীতাম্বর = কৃষ্ণ (বহুব্রীহি)

নীলাম্বর — নীল যে অম্বর = নীলাম্বর (কর্ম)
নীল অম্বর যাহার = নীলাম্বর = বলরাম (বহু)

রামেশ্বর — রামের ঈশ্বর (ষষ্ঠী তৎ)
রাম ঈশ্বর যাহার (বহু)
যে রাম সেই ঈশ্বর (কর্ম)

গরমিল — মিলের অভাব (নঞ্-তৎ, অব্যয়ী)
মিল নাই যাহাতে (বহু)

গায়েহলুদ : গায়ে হলুদ (৭মী তৎ)
গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে (বহু)

মুখচন্দ্র : মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র (উপমিত কর্ম) —
মুখ রূপ চন্দ্র = মুখচন্দ্র (রূপককর্ম)

মহিলামজলিস : মহিলাদের জন্য মজলিস (৪র্থীতৎ)
মহিলার মজলিস (ষষ্ঠীতৎ)

অনন্ত : ন অন্ত (নঞ্ তৎ)
= ন অন্ত যাহার সে = অনন্ত (বহু)

গাছেপাকা : গাছে পাকা (অলুক)
= গাছে পাকা যাহা (বহু)

গায়েপড়া : গায়ে পড়া (অলুক তৎপুরুষ)
গায়ে পড়ে যে (অলুক বহুব্রীহি)

মনমরা : মনে মরিয়াছে যে (উপপদ তৎ ও বহু)

কানকাটা — কান কাটা যাহার (উপপদ ও বহু)

হরবোলা : হর বোল যাহার (উপপদ ও বহু)

ঘি-ভাজা — ঘিয়ে ভাজা (৭মীতৎ)
ঘি দ্বারা ভাজা (৩য়া তৎ)

নাট্যালয় : নাট্যের আলয় (৬ষ্ঠীতৎ)
নাট্যের জন্য আলয় (৪র্থীতৎ)

অনুশীলনী

১। উদাহরণ সহ নিম্নলিখিত সমাসের লক্ষণ বল :

অব্যয়ীভাব, কর্মধারয়, উপপদ তৎপুরুষ, অলুক, নিত্যসমাস, মধ্যপদলোপী, কর্মধারয়, দ্বিগু, প্রাদি সমাস।

২। সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য নির্ণয় কর। সমস্যমান পদ ও ব্যাসবাক্য কাহাকে বলে?

৩। বহুব্রীহি সমাস কয় প্রকার? উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

৪। কোন কোন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

৫। পার্থক্য নির্ণয় কর :

উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয়। নঞ্ তৎপুরুষ ও নঞর্থক বহুব্রীহি। দ্বন্দ্ব ও তৎপুরুষ। তৎপুরুষ ও কর্মধারয়। কর্মধারয় ও বহুব্রীহি।

৬। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লিখ :

ভ্রাতুষ্পুত্র, অন্তেবাসী, দুধেভাতে, বনেজঙ্গলে, আবাল্য, যথাবিধি, অনুরূপ, জুতো-পায়ে, শ্রীকণ্ঠ, বজ্রপাণি, নিষ্ক্রিয়, অসীম, নিষ্করুণ, নিঃসন্তান, বহুরূপী, বে-তালা, পেঁচামুখো, মৃগনয়না, সুগন্ধি, সানন্দ, যুবজানি, সমাতৃক, মৃতভর্তৃকা। বীতশ্রদ্ধ, সকৌতুক, সুহৃদয়, ত্রিলোচন, মুখপোড়া, হতভাগা, তেমাথা, ত্রিপদী, বচনামৃত, কোপবহ্নি, নয়নপদ্ম, স্নেহপাশ, ভবনদী, নবপল্লব, আঁখিপাখি, মিশকালো, অরুণরাঙা, কাজলকালো, রজতচক্র, পণ্ডিতজন, হৃষ্টপুষ্ট, ঠাকুর-মশাই, করুণকোমল, বিম্বাধর, মহাজন, ভাঙাহাট, নাড়িটেপা, বইপড়া, পথচলা, শক্রঘ্ন, মনোজ, বাস্তুহারা, ধামাধরা, অনাদর, ঘরছাড়া, অনুচিত, আকাচা, না-দেখা, বে-আইনী, লোকহিত, অগ্নিভয়, ব্যাঘ্রহত, জলতোলা, যুদ্ধোত্তর, রুই-কাতলা, হরগৌরী, ফলমূল, সজ্জন, স্থিরপ্রজ্ঞ, সবান্ধব।

৭। সমাসবদ্ধ পদে পরিণত কর :

জায়া ও পতি, দিবা ও নিশা, খাওয়া ও দাওয়া, পদ্মনাভিতে যাঁহার, ছিন্ন শাখা যাহার, কু আচার যাহার, গাণ্ডীব ধনু যাহার, বিগত হইয়াছে ধর্ম যাহার, শোভন গন্ধ যাহার, চন্দ্র চূড়ায় যাহার, আশীতে বিষ যাহার, চক্র পাণিতে যাঁহার, এক রোখ যাহার, চিরকাল ব্যাপিয়া শত্রু, গুণকে উপেত, মোহদ্বারা অন্ধ, গুণের দ্বারা অন্বিত, বিবাহের জন্য উন্মত্ত, হাত বাঁধিবার জন্য কড়ি, ভ্রাতার সম, মেষীর শাবক, পুরুষের মধ্যে উত্তম, বিশ্বাসের অভাব, পঙ্কে জাত হয় যাহা,

মনকে লুব্ধ করে যে, মহৎ যে অরণ্য, রাজা ঋষির ন্যায়, বিদ্যারূপ ধন, গতির অভাব, ত্রি-ফলের সমাহার, জরনাশক বটিকা, হাড় ভাঙে যাহাতে, রাতে কানা, রাষ্ট্রের পাল, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখ, মধ্যবিত্ত যাহার, অন্ন নাই যাহার, পঞ্চ আনন যাঁহার, পরিবারের সহিত বর্তমান, বাক্যের সহিত বর্তমান, অধিক বয়স যাহার, কু আকার যাহার, রূপও যেখানে বাণীও সেখানে।

৮। পার্থক্য নির্ণয় কর :

মুখচন্দ্র ও চন্দ্রমুখ, পূর্বাহ ও পূর্বাহ্ন, অপরাহ ও অপরাহ্ন, মহারাজ ও মহারাজা, অর্ধচন্দ্র ও চন্দ্রার্ধ, মহাশয় ও মহদাশয়, মূর্খভ্রাতা ও মূর্খভ্রাতৃক, সুগন্ধ ও সুগন্ধি, কুপুরুষ ও কাপুরুষ, পদ্মালয় ও পদ্মালয়া। কবিরাজ ও রাজকবি, ধর্মরাজ ও রাজধর্ম, কবিশ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকবি, হাস্যোজ্জ্বল ও উজ্জ্বলহাস্য।

৯। অশুদ্ধি সংশোধন কর :

দেবীদাস, পূর্বাহ্ন, জামাতাগণ, মহিমাসাগর, যুবাগণ, স্থায়ীভাবে, পরমাত্মাবিষয়ক, পিতাসহ, কর্তাগণ, সাপরাধী, সাষ্টাঙ্গসহকারে, সলজ্জিত, নির্ধনী, নীরোগী, নির্দোষী, সবিনয়পূর্বক, প্রাণীবৃন্দ, মধ্যরাত্রি, সুবুদ্ধিমান, সাবহিত।

১০। নিম্নলিখিত শব্দগুলি পূর্বপদরূপে প্রয়োগ করিয়া সমাসবদ্ধ পদ গঠন কর ও বাক্যরচনা কর :

সু, স, কু, কা, যথা, না, বে, অ, বদ, মহা, প্রতি, উপ, অনু, আ, বীত।

১১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি পরপদরূপে প্রয়োগ করিয়া সমাসবদ্ধ পদগঠন কর ও বাক্যরচনা কর : লোক, রাত্রি, নিশা, অন্তর, অক্ষি, আলয়, পতি, ঈশ, পাণি, মুখ, পদ, জ, কার।

বাংলা ভাষায় শব্দ ভাণ্ডার

বাংলা ভাষায় যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় মোটামুটি তাহাদিগকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা, ১। **তৎসম** ২। **অর্ধ-তৎসম** ৩। **তদ্ভব,** ৪। **দেশী,** ৫। **বিদেশী।**

১। তৎসম শব্দ

(তৎ=তাহা, অর্থাৎ সংস্কৃত + সম=সমান)। যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় আসিয়াছে তাহাদিগকে **তৎসম** শব্দ বলে। বাংলা ভাষা তাহার উৎপত্তিকাল হইতে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আধুনিক কালেও এই ব্যাপার চলিতেছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত প্রায় পঞ্চাশটি শব্দই সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তৎসম শব্দের উদাহরণ :

সূর্য, চন্দ্র, জীবন, মৃত্যু, আকাশ, নক্ষত্র, মানব, মানবী, মেঘ, মৃত্তিকা, বায়ু, পৃথিবী, সন্ধ্যা, নদী, পর্বত, হ্রদ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয়, ক্রোধ, বত, পুস্তক।

২। অর্ধতৎসম শব্দ

বাংলা ভাষায় আগত তৎসম শব্দগুলি অনেকস্থানে কিছুটা বিকৃত হইয়াছে। এইরূপ বিকৃত তৎসম শব্দকে **অর্ধতৎসম** অথবা, **ভগ্নতৎসম** শব্দ বলে। অশিক্ষিত ও গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের মুখেই সাধারণত এই ধরনের উচ্চারণে বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। তবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে এই ধরনের বিকৃতি কমিয়া যাইতেছে। অর্ধতৎসম শব্দের উদাহরণ :

কৃষ্ণ—কেষ্ট। নিমন্ত্রণ—নেমন্তন্ন। শ্রদ্ধা—ছেদ্দা। শ্রাদ্ধ—ছেরাদ্দ। বিষ্ণু—বিষ্টু (কেষ্ট বিষ্টু লোকেদের না ধরতে পারলে আজকাল চাকরী পাওয়া যায় না)। ক্ষুধা—খিদে। মহোৎসব—মোচ্ছব (আলোর রোশনাই, খাওয়া দাওয়া, হৈ-চৈ, প্রভঞ্জন বাবুর বাড়িতে বিরাট মোচ্ছব শুরু হয়েছে)। স্পর্শ—পরশ। মহার্ঘ—মাগ্‌গি। বৈদ্য—বদ্দি। যজ্ঞ—যগ্‌গি। জ্যোৎস্না—জোছনা। পুরোহিত—পুরুত। সূর্য—সুজ্জি। বৈষ্ণব—বোষ্টম (কেন্দুবিল্বের মেলায় অনেক বোষ্টম বাউলের সমাগম হয়)। প্রীতি—পিরীত।

৩। তদ্ভব শব্দ

(তৎ অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে ভব অর্থাৎ উদ্ভূত যাহা)—যে সব শব্দ আদি আর্যভাষা অথবা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাংলা ভাষায় আসিয়াছে তাহাদিগকে **তদ্ভব** শব্দ বলে। তদ্ভব শব্দগুলিই খাঁটি বাংলা শব্দ। কৃষ্ণ একটি সংস্কৃত শব্দ। ইহার প্রাকৃত রূপ কণ্‌হ এবং বাংলা রূপ কান—ঐ শব্দের সহিত উ যোগ করিয়া কানু এবং আই যোগ করিয়া কানাই। এরূপ আরও কয়েকটি উদাহরণ—স-হস্ত>প্রা—হত্থ>বা—হাত। স—কার্য>প্রা—কজ্জ>বা—কাজ। স-কর্ম>প্রা—কম্ম>বা—কাম। স-মধু>প্রা—মহু>বা—মৌ। স-বধূ>প্রা—বহূ>বা—বউ, বৌ।

নিম্নে কতকগুলি তদ্ভব শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল—

সংস্কৃত	বাংলা (তদ্ভব)	সংস্কৃত	বাংলা (তদ্ভব)
পাদ	পা	হস্তী	হাতী
ঘৃত	ঘি	ব্যাঘ্র	বাঘ
চক্ষু	চোখ	পক্ষী	পাখী
চন্দ্র	চাঁদ	তাম্র	তামা
সন্ধ্যা	সাঁঝ	ঘট	ঘড়া
গাত্র	গা	মৎস্য	মাছ
মিথ্যা	মিছা	ভাণ্ড	ভাঁড়
বজ্র	বাজ	মিষ্ট	মিঠা
রাধা	রাই	অর্ধ	আধ
গৃহিণী	ঘরণী	ময়া	মুই
মৃত	মড়া	ত্বয়া	তুই
মাতা	মা		
ভ্রাতা	ভাই	অপর	আর
বিবাহ	বিয়া	করোতি	করে
ব্রাহ্মণ	বামুন	চলতি	চলে
কর্মকার	কামার	শৃণোতি	শুনে
কুম্ভকার	কুমার	চলিতব্য	চলিব

৪। দেশী শব্দ

আর্যগণের আগমনের পূর্ব হইতেই ভারতে দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি অনার্যগণ বাস করিত। বাংলা ভাষায় এই সব অনার্য জাতির ভাষা হইতে কিছু কিছু শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ইহাদিগকে **দেশী** শব্দ বলে। তবে এই সব দেশী শব্দ বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। যথা, প্রা—চঙ্গ>চাঙ্গা। প্রা—পেট্ট>পেট। প্রা—চট্টি>চাটা। প্রা - গোড্ড> গোড। প্রা—খড্ডু>খাড়ু।

ক। দ্রাবিড় গোষ্ঠী হইতে আগত শব্দ :

ইচলা (মাছ), উলু (খড), খাল, পিলে (ছেলেপিলে), মোট।

খ। অস্ট্রিক গোষ্ঠী হইতে আগত শব্দ :

টঙ্গ, ঢাক, কদলী, কম্বল, বুড়ি, বাণ, ল , লাঙ্গল, লিঙ্গ, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, খোকা, খুকি, ডেঙ্গর, ঢেঙ্গা।

গ। মোঙ্গোল গোষ্ঠী হইতে আগত শব্দ :

ঠাকুর, তুরুক।

ঘ। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সহিত সম্বন্ধ নাই এরূপ অনেক অজ্ঞাত ভাষার শব্দও বাংলায় পাওয়া যায়। যথা, বুলা, বাটা, ঝোল, ডাকা, ডাঙ্গা, ডাগর, ডাস, ডাঁটা, ডাঁসা, ডিঙ্গি, ডেকরা, ঢঙ্গ, ঢিল, ঢেউ, ঢেঁকি, ঢেঁড়শ, ঢোল, ঘোড়া।

বিদেশী শব্দ

বিদেশী ভাষাসমূহ হইতে যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় আসিয়াছে তাহাদিগকে **বিদেশী** শব্দ বলে। ভারতে যেসব বিদেশী জাতি আসিয়াছে তাহাদের সংস্পর্শে আসিবার ফলেই ভারতীয়দের ভাষায় বিদেশী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে।

(ক) গ্রীক শব্দ

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী হইতে কিছু কিছু শব্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। বাংলায় ব্যবহৃত কয়েকটি গ্রীক শব্দের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা, গ্রী—দ্রাখমে>দাম। গ্রা—সুরিংক্‌স (Surinks) >সুড়ঙ্গ। গ্রী—সেমিদালিস্ (Semidalis) >সিমুই।

(খ) প্রাচীন পারসীক শব্দ

পা—কর্ষপণ>কাহন। পা—মুদ্রায়>মুদ্রা। পা—পোস্ত (চামড়া)> সং পুস্তক> বা—পুথি, পুঁথি। পা—মোচক> মুচি। পা—মোজহ্> মোজা।

(গ) ফারসী শব্দ

বাংলা ভাষায় আগত বিদেশী শব্দগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক শব্দ আসিয়াছে ফারসী ভাষা হইতে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে তুর্কী বিজয়ের পর হইতে বাংলায় ফারসী শব্দ প্রবেশ করিতে থাকে। বর্তমানে বাংলা ভাষায় প্রায় আড়াই হাজার ফারসী শব্দ পাওয়া যায়। ফারসার মারফত অনেক আরবী শব্দ এবং কিছু কিছু তুর্কী শব্দও বাংলা ভাষায় আসিয়াছে। ফারসী শব্দের উদাহরণ:

শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক শব্দ—কাগজ, খাতা, গজল, সাগরেদ, সেতার, হরফ, এলেম, কেচ্ছা, মজলিস, তরজমা।

আইন-আদালত জমিজমা বিষয়ক—আবাদ, গোমস্তা, জমী, দারোগা, দপ্তর, পিয়াদা, ফরিয়াদী, মোহর, সরকার, আইন, জবানবন্দী, দস্তখত, নালিশ, পেশা, বকেয়া, বাজেয়াপ্ত, হাকিম, খাজনা, আসামী, তালুক, সাল, হিসাব, উকিল, দলিল, মোক্তার, রদ, রায়, সনাক্ত, হক, ফিরিস্তি, বীমা।

দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত শব্দ—অন্দর, আওয়াজ, আন্দাজ, আবরু, আবহাওয়া, আরাম, আমেজ, আসমান, ইয়ার, কম, কারখানা, কোমর, খরচ, খোরাক, গরম, চাকর, চাঁদা, চেহারা, জলদী, তাজা, দরকার, দপ্তর, দাগী, দোকান, নরম, নমুনা, পছন্দ, মেশা, বন্দোবস্ত, বাহবা, খোজা, শহর, সাদা, হজম, হাজার।

শিল্প-সভ্যতা ও বিলাসব্যসন সংক্রান্ত শব্দ—আয়না, আঙ্গুর, কিশমিশ, খানসামা, গোলাপ, চরখা, চশমা, চাবুক, জামা, জিন, তাকিয়া, দস্তানা, দালান, পরদা, পাজামা, পোলাও, বরফ, বাগিচা, বাদাম, বারকোশ, ময়দা, মলম, রুমাল, রেশম, শানাই, শাল, শিশি, সিন্দুক, সোরাই, হাউই, হালুই, হুঁকা।

রাজদরবার ও যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত শব্দ—উজীর, দরবার, দৌলৎ, বাদশাহ, মালিক, হুজুর, সেপাই, তাঁবু, তোপ, শিকার, বাজ, হিম্মৎ, বাহাদুর, তক্ত, তাজ, দুশমন।

(ঘ) ফারসীর মাধ্যমে আগত আরবী শব্দ

আক্কেল, আখের, আদব, আতর, আরক, আমলা, আসামী, আমীর, ওমরাহ্, ইজলাস, ইজমালী, ইশারা, ওজন, ওজর, কলম, কসাই, কায়দা, কায়েম, কানুন, কুচকাওয়াজ, কুলুপ, ক্রোক, খবর, খেতাব, খেয়াল, গরজ, গরীব, জবাব, জমা, জব্দ, জাহাজ, জারী, জিদ, জেরা, তরফ, তহসীল, তারিফ, তালুক, তামিল, তামাসা, তাঁবু, দস্তখত, নকীব, নকল, নগদ, নজীর, ফকির, ফতুর, ফসল, ফরাশ, ফুরসৎ, বকেয়া, বদল, বেকুব, মজবুত, মজুত, মশলা, মহকুমা, মিছরী, মুনশী, মুনসেফ, মোকদ্দমা, রকম, লোকসান, সই, সন, সদর, সাফ, সাবেক, সালিশ, সিন্দুক, হাওয়া, হাজির।

(ঙ) তুর্কী শব্দ

আলখাল্লা, কাবু, কাঁচি, কুলী, কোর্মা, চাকু, চিক, তুর্ক, তোপ, বাবুর্চি, বেগম, বোঁচকা, বিবি, মুচলকা, লাস, গালিজা, চকমকি, বেগম।

ফারসীর মাধ্যমে আগত প্রত্যয় ও উপসর্গ :

প্রত্যয় : আন, আনা, খানা, খোর, গর, গিরি, চা, চি, দান, দার, নবিশ, বন্দ, বাজ ইত্যাদি।

উপসর্গ : গর, দর, না, ফি, বদ, বে, হর ইত্যাদি।

(চ) পোর্তুগীস শব্দ

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পোর্তুগীসরা বাংলা দেশে আগমন করে এবং হুগলী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করে। পোর্তুগীস ভাষার প্রায় একশত শব্দ বাংলায় স্থান পাইয়াছে। অনেকগুলি শব্দ এমনভাবে বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাদিগকে আর আগন্তুক শব্দ বলিয়া মনে হয় না। কতকগুলি পোর্তুগীস শব্দ :

আতা, আনারস, আলপিন, আলকাতরা, আলমারি, ওলন্দাজ, কপি, কামিজ, কেরানী, ক্রুশ, গরাদ, গামলা, গীর্জা, গুদাম, চাবি, জানালা, তামাক, তোয়ালে, নীলাম, পিপা, পেয়ারা, পেঁপে, পেরেক, ফালতো, ফিতা, বরগা, বারান্দা, বালতি, বাসন, বেহালা, বোতাম, বোমা, মস্করা, মিস্ত্রি, মার্কা, যীশু, রেস্ত, সাবান, সাবু বা সাগু, সায়া।

(ছ) ফরাসী শব্দ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী ও ওলন্দাজরা বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলা দেশে আসিয়াছিল। তাহাদের ভাষার কিছু কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। কয়েকটি ফরাসী শব্দ :

শেমিজ, কুপন, কার্তুজ, দিনেমার, রেস্তোরাঁ, ফিরিঙ্গী।

(জ) ওলন্দাজ শব্দ

হরতন, রুইতন, ইস্কাবন, তুরুপ, ইস্ক্রুপ।

(ঝ) ইংরেজী শব্দ

ইংরেজ শাসনাধীনে আসার পর হইতে ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্য বাংলা দেশে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিল। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিবার ফলে বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য ও চিন্তাধারায় সর্বময় ইংরেজ প্রভাব বিস্তৃত হইল। ইংরেজী ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিল, কতকগুলি শব্দ বাঙালীর চিন্তা, মনন ও রসবোধের সঙ্গে একাত্ম হইয়া গেল। অনেক বিদেশী শব্দ ইংরেজী ভাষার মারফত বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করিল। কতকগুলি ইংরেজী শব্দ কিছুটা বিকৃত হইয়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বহু ইংরেজী শব্দ অবিকৃত ভাবেই বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। আধুনিক কালে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত বহু শব্দ ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়া বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিতেছে।

১। কয়েকটি বহু প্রচলিত ইংরেজী শব্দ : চেয়ার, বেঞ্চ, স্কুল, টেবিল, পকেট, স্টেশন, ডাক্তার, কলেজ, পেন্সিল, প্রফেসার, মাস্টার, টিকিট, ট্রেন, পোস্টাফিস, টেলিফোন, পোস্টকার্ড, কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটী, সিনেমা, থিয়েটার, হোটেল, ফটো, ফুটবল, ক্রিকেট, রোমান্টিক, ক্লাসিক, লিরিক, পেনসন।

২। কয়েকটি ইংরাজী শব্দ কিছুটা বিকৃত হইয়া বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে। যথা, লাট (lord), বাক্স (box), কৌঁসুলী (Counsel) লণ্ঠন (lantern), লম্প (lamp), গেলাস (glass), আপিস (office), আস্তাবল (stable), কার (cord), আর্দালী (orderly), জাঁদরেল (general), তোরঙ্গ (trunk), সান্ত্রী (sentry)।

৩। কিছু কিছু বিদেশী শব্দ ইংরেজী ভাষার মারফত বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। যথা: নাৎসী (জর্মান)। ম্যালেরিয়া, ফাসিস্ত, ম্যাজেণ্টা (ইতালীয়)। হারাকিরি, রিকশা (জাপানী)। চকোলেট (মেক্সিকান)। ক্যাঙারু (অস্ট্রেলিয়ান)। কুইনাইন (পেরু ভাষার শব্দ)। বলশেভিক, সোবিয়েত (রুশীয়)। জেব্রা (দক্ষিণ আফ্রিকার)।

৪। কতকগুলি ইংরেজী শব্দ, বাক্যাংশ ও বাগ্‌রীতি বাংলায় অনুবাদ করিয়া বাংলা ভাষায় নূতন শব্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই ধরনের শব্দ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যথা:

বাধিত (obliged)। সানন্দে বা আনন্দের সঙ্গে (with pleasure)। দুঃখিত (sorry)। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ (thanks, many many thanks)। গলাবন্ধ (neck-tie)। হাতঘড়ি (wrist watch)। বাতিঘর (light house)। সুবর্ণ সুযোগ (golden opportunity)। স্বর্ণ যুগ (golden age)। বিশ্ববিদ্যালয় (university)। শীতল জল নিক্ষেপ করা (to throw cold water)। হিমঘর (cold storage)। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত (air conditioned)।

মিশ্র শব্দ

এক ভাষার শব্দ অথবা প্রত্যয়ের সঙ্গে অপর ভাষার শব্দ অথবা প্রত্যয়ের মিশ্রণের ফলে **মিশ্র শব্দ** গঠিত হয়। বাংলা ভাষার এই ধরনের মিশ্র শব্দের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে।

১। (এক ভাষার শব্দের সহিত অপর ভাষার শব্দের মিশ্রণ): রাজা-উজির, হাট-বাজার, ধন-দৌলত, মাস্টার-মশাই, হেড-পণ্ডিত, ডাক্তারবাবু, পুলিস-সাহেব, হেডমিস্ত্রি, ফুলহাতা, হাফ-মোজা, ফুলবাবু।

২। এক ভাষার শব্দের সহিত আর এক ভাষার প্রত্যয়ের মিশ্রণ: মাস্টার+ই=মাস্টারি। শহর+ইক=শাহরিক। হিন্দু+ত্ব=হিন্দুত্ব।

৩। এক ভাষার উপসর্গের সহিত অন্য ভাষার শব্দের মিশ্রণ: বে+টাইম =বেটাইম। বে+হেড=বেহেড। বে+লজ্জা=বেলজ্জ।

অনুশীলনী

১। তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দ কাহাকে বলে? প্রত্যেক শ্রেণীর শব্দের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। দেশী শব্দ কাহাকে বলে? বাংলা ভাষায় দেশী শব্দগুলি কোন্ কোন্ ভাষা হইতে কিভাবে আসিয়াছে তাহা আলোচনা কর।

৩। বাংলা ভাষায় আগত বিদেশী শব্দগুলির শ্রেণীবিভাগ কর। মিশ্র শব্দ কাহাকে বলে? কয়েকটি মিশ্র শব্দের উদাহরণ দাও।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বাংলা শব্দভাণ্ডারের কোন্ কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যায় তাহা উল্লেখ কর :

রিকশা, কুইনাইন, লাট, বোতাম, শেমিজ, শরম, বাবুর্চি, আতা, হুঁকা, বাহাদুর, ঝুল, গাই, ষাঁড়, পিদ্দিম, নারী, ক্ষেলি, চাঙ্গা, চিংড়ি, বাজ, জাহাজ, ইংরেজ, বেটাইম, লাট সাহেব, বালতি, মজলিস, বেতন, দাম, শাহরিক, কর্তাগিরি, দারোগা, আসে, রালা।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত

বাংলায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি ধ্বনিগৌরবেই সার্থকতা লাভ করে। এগুলিকে **ধ্বন্যাত্মক শব্দ** বলে। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি নিছক ধ্বনিদ্যোতক হইতে পারে, আবার ধ্বনির সাহায্যে বিশেষ ভাবব্যঞ্জকও হইতে পারে।

১। ধ্বনিদ্যোতক শব্দের উদাহরণ :

ক। এদিকে **টুং টাং টুং** ক'রে মেকাবী ক্লকে পাঁচটা বাজল।

—হুতোম প্যাঁচার নক্সা

খ। দেখতে দেখতে **গুড়ুম** ক'রে নটার তোপ পড়ে গেল—ঐ

গ। রাস্তায় **ভোঁ পোঁ ভোঁ পোঁ** শব্দের তুফান উঠেছে—ঐ

ঘ। **ঢং ঢং** ক'রে গির্জের ঘড়িতে রাত্রি দুটো বেজে গেল—ঐ

ঙ। **ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং** চিংড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং

—ঐ

চ। **চপ চপ চপ** চিবিয়ে খেলে আপন পেটের ছেলে'

—ঠাকুরমার ঝুলি

ছ। **হাঁউ মাঁউ খাঁউ**

মানুষের গন্ধ পাঁউ —ঐ

জ। **চ্যাম কুড় কুড়** বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডাল পাড়া

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ

ঝ। **ড্যাং ডাঙা ড্যাং** বাদ্যি বাজে চড়ক ডাঙায় ঘর —রবীন্দ্রনাথ

ঞ। পাল্কিহাটে বেতোঘোড়া চলে **টুকুর টুকুর** —ঐ

ট। বৃষ্টি পড়ে **টাপুর টুপুর** নদেয় এল বান —ঐ

ঠ। গলদা চিংড়ি **তিংড়ি মিংড়ি** লম্বা দাঁড়ার করতাল —ঐ

২। ভাবব্যঞ্জক ধ্বন্যাত্মক শব্দ :

ক। বাড়ীতে অনেক লোক ছিল, সকলে চলে যাওয়াতে শূন্য বাড়িটা এখন **খাঁ খাঁ** করছে।

খ। ভয়ে তাহার বুকের ভিতরটা **ঢিপ ঢিপ** করিতে লাগিল।

গ। বহু লোকের আনাগোনা ও হৈ-হুল্লোড়ে সমস্ত বাড়িটা **গম গম** করিতে লাগিল।

ঘ। **চল চল** কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়

ঙ। **ঘন ঘন ঝন ঝন** বজরনিপাত —গোবিন্দ দাস

চ। কথাটা **ফস** ক'রে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

ছ। **শির শির** ক'রে ওঠে তাবো গা —রবীন্দ্রনাথ

জ। তাহার বুকের ভিতরটা **ধড়াস** করিয়া উঠিল।

শব্দদ্বৈত

একই শব্দের পুনরাবৃত্তিকে **শব্দদ্বৈত** বলে। বিশেষ্য, বিশেষণ, অসমাপিকা, সমাপিকা ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিশেষণ প্রভৃতি সকল রকম শব্দেরই পুনরাবৃত্তি হইতে পারে। যথা, পাড়ার ছেলেরা **বাড়ি বাড়ি** গিয়ে চাঁদা তুলছে। (বিশেষ্য)। **বড় বড়** বাঁদরের **বড় বড়** পেট। (বিশেষণ)। **বলে বলে** হয়রান হ'য়ে গেলাম তবুও মিস্ত্রী এসে টেলিফোন সারিয়ে দিয়ে গেল না (অসমাপিকা ক্রিয়া)। **যাই যাই** ক'রেও আর বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে না (সমাপিকা ক্রিয়া)। **ভালোয় ভালোয়** আজকের দিনটা যদি কাটাতে পারি তাহ'লে বোধ হয় এবার সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাব। (ক্রিয়া বিশেষণ)।

এক শ্রেণীর যুগ্ম শব্দ অথবা জোড়া শব্দকেও শব্দদ্বৈত বলা যায়। যথা, **মাথামুণ্ডু** তুমি কি বলে চলেছ কিছুই বুঝতে পারছি না। তার সংসারটি বেশ **সাজানো গোছানো**, দেখলেই যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। **ভেবেচিন্তে** দেখলাম, আপনার কথাই ঠিক। এখনকার তরুণ-তরুণীরাই জাতির **ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা**। আমি আপনা থেকেই এসে পড়েছি, তোমার **বলা-কওয়ার** অপেক্ষা করিনি।

একটি সার্থক শব্দ এবং তাহার অনুকার বা বিকারজনিত নিরর্থক শব্দের যোগেও শব্দদ্বৈত হয়। যথা, আমি অত দূর নেমন্তন্ন খেতে **যেতেটেতে** পারব না। **বুঝেসুঝে** না চললে এ-বাজারে টিঁকে থাকতে পারবে না। **কাগজটাগজ** যা আছে সব নিয়ে আসবে। **দেখে শুনে** আমি মতামত দেব। আজকাল ট্রাম বাসের ভিড়ের মধ্যে **ছাতা-ফাতা** নিয়ে চলা যায় না।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তি হইলে তাহাকে বলা যায় **ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত** এবং একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের অনুকার বা বিকার জাত আর একটি শব্দ একসঙ্গে ব্যবহৃত হইলে **জোড়া ধ্বন্যাত্মক** শব্দ হয়। যথা, **সোঁ সোঁ** ক'রে বাতাস

বইতে শুরু করেছে। তীরটি **সাঁ সাঁ** করে ছুটে লক্ষ্যস্থানে বিদ্ধ হ'ল। গুরু গুরু মেঘ **গুমরি গুমরি** গরজে **গগনে গগনে**—রবীন্দ্রনাথ। **কলকল ছলছল টলটল** তরঙ্গ—ভারতচন্দ্র। কাঁচের গেলাস ভেঙ্গে চাকরটি মুখখানা **কাচু-মাচু** করে দাঁড়িয়ে রইল। পকেটমারকে মারবার জন্য সকলের হাতই যেন **নিসপিস** করতে থাকে।

১। বিভিন্ন অর্থে দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

ক। বিশেষ্য বা বিশেষণ পদের পুনরাবৃত্তিতে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ পায়। যথা, নব নব পূর্বাচল **আলোকে আলোকে**—রবীন্দ্রনাথ। **মাঠে মাঠে** ধান পাকতে শুরু করেছে। **ঘরে ঘরে** নবান্নের উৎসব শুরু হয়েছে। **পাতায় পাতায়** পড়ে নিশির শিশির। **ঝাঁকে ঝাঁকে** উড়ে চলে যায় উৎকণ্ঠিত পাখি—রবীন্দ্রনাথ।

কচি কচি গালভরা **খিল খিল** হাসি। **শাদা শাদা** কাশফুলে নদীতীর ভরে গিয়েছে। **গরম গরম** লুচি নিয়ে এসো। **ছোট ছোট** ঢেউগুলি নদীর কিনারে আছড়ে পড়ছে। **নরম নরম** আঙ্গুলগুলো দিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দাও। **চিকণ চিকণ** চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে।

খ। একই শব্দের পুনরাবৃত্তিতে অনেক সময় আতিশয্য, আত্যন্তিকতা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। যথা, সুশীলা **কেঁদে কেঁদে** চোখ লাল করে ফেলেছে। **চলতে চলতে** ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একই কথা রেডিওতে **শুনতে শুনতে** কান ঝালাপালা হয়ে গেল। **ঘুরে ঘুরে** কত তীর্থ দেখলাম, কিন্তু মন ভরল না। **ঝুরিয়া ঝুরিয়া** মৈলাম—বৈষ্ণব পদ। লেখাপড়ায় মন নাই, দিনরাত **উড়ে উড়ে** বেড়াচ্ছ।

গ। সাদৃশ্য, স্বল্পতা, আসন্নতা, অনিশ্চয়তা, প্রভৃতি বুঝাইতেও শব্দের পুনরুক্তি হয়। যথা, **হাসি হাসি** মুখ দেখতে ভালো লাগে। গান তা শুনে মৌনমুখে রহে দ্বিধার ভরে, **যাব যাব** করে—রবীন্দ্রনাথ। আজ যে তোমার **খুশী খুশী** ভাব দেখছি, ব্যাপারটা কি? কার্তিক মাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু **ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা** লাগছে। **নিবু নিবু** প্রদীপের আলোয় অন্ধকার আরো যেন গাঢ় হ'য়ে উঠেছে। **কাঁদো কাঁদো** গলায় ছেলেটি তার অপরাধ স্বীকার করল। অনেক দিনের পুরোনো বাড়িটা **পড়ো পড়ো** হয়েছে। মন যে আমার **কেমন কেমন** করে।

ঘ। এক শ্রেণীর বহুব্রীহি সমাসেও শব্দের দ্বিরুক্তি হয়। যথা, প্রথমে ঝগড়া তারপর **লাঠালাঠি** বেধে গেল। কথা বলতে বলতে দুই বন্ধুর মধ্যে **হাতাহাতি** লেগে গেল। দুই বোনের **চুলোচুলি** দিনরাত লেগেই আছে।

২। যুগ্ম শব্দে শব্দদ্বৈত

ক। সমার্থক শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত। যথা, সে **পাকাপোক্ত** লোক, তার পরে নির্ভর করা চলে। পরীক্ষার খাতায় একজন পরীক্ষার্থী যে কি লিখেছে **মাথামুণ্ডু** কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তার সঙ্গে অনেক বড় বড় লোকের **জানাশোনা** আছে। দীর্ঘ পথ বাসে যেতে যেতে **গা-গতর** সব ব্যথা হ'য়ে গেল। **বেঁটে-খাটো** জোয়ান লোকটি কাজ করতে কাল এসেছিল। এরূপ আরও শব্দ :

অস্ত্র-শস্ত্র, মাল-মশলা, রাজা-বাদশা, ফন্দি-ফিকির, ভুল-ভ্রান্তি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাঁধা-ধরা, ছাই-ভস্ম, টাকা-কড়ি, কড়া-ক্রান্তি, পাই-পয়সা, জন-মানব, ডাক্তার-বৈদ্য, চিন্তা-ভাবনা, ধুলো-মাটি, লোক-জন, পাইক-পেয়াদা, পাইক-বরকন্দাজ, ঠাট্টা-রসিকতা, ঠাট্টা-মস্করা, আত্মীয়-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব, মামলা-মোকদ্দমা।

খ। দুইটি ক্রিয়াপদ জুড়িয়া ক্রিয়া-বিশেষণ পদ গঠন। যথা, পাশের বাড়ির কর্তা রেগে গেলেই জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুরে **তচনচ** করেন। **ব'লে ক'য়ে** দেখব, তিনি রাজি হন কি না। আজকালকার হালচাল **দেখেশুনে** তাজ্জব বনে যেতে হয়। আমি **রেখে ঢেকে** কথা বলতে জানি না, সব স্পষ্টাস্পষ্টি বলি। **মিলে মিশে** কাজ করলে অসাধ্য সাধন করা যায়। তার যা ইচ্ছা করুক না, আমার তাতে কি **এল-গেল**!

এরূপ আরও শব্দ :

চ'লে-ফিরে, আসে-যায়, কেঁদে-কেটে, নেচে-কুঁদে, কেটে-ছেঁটে, হেসে-খেলে, চলবে-ফিরবে, বুঝে-শুনে।

৩। অনুকার বা বিকারজাত শব্দের যোগে শব্দদ্বৈত

ক। একটি সার্থক শব্দের সঙ্গে তাহারই অনুকার বা বিকার জাত আর একটি শব্দের যোগে বাংলায় বহু শব্দদ্বৈতের গঠন হইয়াছে। যথা, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ফলে ধর্মঘটের **মিটমাট** হ'য়ে গেছে। **চুপচাপ** থাক, কোনো কথায় প্রতিবাদ কোরো না। **হাবা-গোবা** মানুষ,

তাকে ঠকানো তো খুবই সহজ। তোমার **রকম-সকম** দেখলে সত্যি হাসি পায়। **খায়-দায়** গান গায় তাই রে নারে না—ছড়া। সভায় কেউ কথা শুনল না বলে বক্তা **রেগে-মেগে** সভা ছেড়ে চ'লে গেলেন। সরকারী টাকা **লুটে-পুটে** খাওয়ার দিকেই এখন অনেকের ঝোঁক।

এরূপ আরো উদাহরণ:

ডাগর-ডোগর, ফিট-ফাট, টুকরা-টাকরা, ভাত-টাত, রুটি-ফুটি, বললে-টললে, ব'কে-ঝ'কে, কেঁদে-কেটে, নাড়ে-চাড়ে, জড়-সড়, মোটা-সোটা, ঠেলে-ঠুলে, ঠেসে-ঠুসে, বই-টই, কেড়ে-কুড়ে, এঁটে-সেঁটে, চোট-পাট, আলু-থালু।

খ। কোন কোন শব্দদ্বৈত যেটি নিরর্থক শব্দ মনে হয়, আসলে সেটি তাহা নহে, অন্য কোন সার্থক শব্দের বিকৃত রূপ। এরূপ শব্দদ্বৈতের উদাহরণ:

বাঁধা-ছাঁদা (বন্ধ ও ছন্দ হইতে)। হাঁড়ি-কুঁড়ি (কুণ্ডীর বিকারে কুঁড়ি)। আশে-পাশে (অগ্রে—পার্শ্বে)। আলাপ-সালাপ (সংলাপের বিকারে সালাপ)। ছাত্রা-নাত্রা (স-সূত্রক ও নক্তক)।

৪। ধ্বন্যাত্মক শব্দে শব্দদ্বৈত

পূর্বেই বলা হইয়াছে ধ্বন্যাত্মক শব্দ নিছক ধ্বনিদ্যোতক হইতে পারে আবার ধ্বনির মধ্য দিয়া ভাবব্যঞ্জকও হইতে পারে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তির ফলে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, অব্যয় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার পদ গঠন হইতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ:

ধক-ধক জলে অগ্নি ললাট-লোচনে—ভারতচন্দ্র। **ববম্ ববম্ বম্** ঘন বাজে গাল—ঐ। **ডিম ডিম ডিম ডিমি** ডমরু বাজিছে। **'তাধিয়া তাধিয়া থিয়া** পিশাচ নাচিছে'—ঐ। **চুকু চুকু চুকু** চুয্য চুষিয়া। **কচর মচর** চর্ব্য চিবিয়া:—ঐ **লটপট** জটা লপটে গায়। **ঝর ঝর** ঝরে—জাহ্নবী তায়। **গর গর গর** গরজে ফণী। **দপ দপ দপ** দীপয়ে মণি॥—ঐ। টাকা **ঝন ঝন** ঝনৎকার বাজায়ে সে গেল চলি—রবীন্দ্রনাথ। **টিপ টিপ** ক'রে সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে। **ঘন ঘন ঝন ঝন** বজরনিপাত—গোবিন্দদাস। **ঝর ঝর কলকল** দিন নাই রাত নাই—রবীন্দ্রনাথ। হেসে **খলখল** গেয়ে **কলকল** তালে তালে দিব তালি—ঐ। **থরথর** করি কাঁপিছে ভূধর—ঐ। ছোট নদীর জল **ঝির ঝির** ক'রে ব'য়ে চলেছে। মেয়ের দল **খিল খিল**

ক'রে হেসে উঠল। বাইরেতে বিষ্টি পড়ে **ঝুপ ঝুপ ঝুপ**। প্রখর রৌদ্র বাইরে **ঝাঁ ঝাঁ** করছে। আমি উচ্ছল জল **ছল-ছল** চল ঊর্মির হিন্দোল দোল —নজরুল। মরু নির্ঝর **ঝর-ঝর**—ঐ। আমি **তাথিয়া তাথিয়া** মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য—ঐ। রাতের বেলা অন্ধকার বটতলা দিয়ে যাবার সময় গা বেশ **ছমছম** করে। মাথাটা **দপদপ** করছে। **থর থর** করি কাঁপে মুক্তাময়ী গৃহচূড়া—মধুসূদন। বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি **মড় মড়ে**—ঐ। বৃষ্টিল শিলা **তড় তড়তড়ে**—ঐ। **ঝক ঝক ঝকে** স্বর্ণবর্ম ধাঁধি আঁখি—ঐ। **টলমল** টলে টলিয়া কনকলঙ্কা—ঐ। উড়িল কলম্ব-কুল অম্বর প্রদেশে **শনশনে**—ঐ।

খ। ধ্বন্যাত্মক শব্দ অনেক স্থানে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, **কনকনে** শীত পড়েছে। লোকটির গায়ে **দগদগে** ঘা দেখে শিউরে উঠতে হয়। ফুলের বাগান থেকে **ভুরভুরে** গন্ধ আসছে। ধর্মঘটের দিন চারদিকে একটা **থমথমে** ভাব বিরাজ করছিল। রোগে ভুগে ভুগে তিনি একটু **খিটখিটে** হয়ে পড়েছেন। **দুরুদুরু** বুকে ছাত্রটি প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। যত্ন না নিলে **ঝকঝকে** দাঁত হয় না। ছেলেটি বেশ **চটপটে**। **ফুটফুটে** জ্যোৎস্নায় বাগানের ফুলগুলি যেন হাসছে।

গ। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সাধারণত কৃ-ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হইয়া ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, মিষ্টির দোকানে মাছি **ভনভন** করছে। নির্মল আকাশে রৌদ্র **ঝলমল** করছে। **ছটফট** করে লাভ নেই, আর কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করতেই হবে। কম্বলটা গায়ে **কুটকুট** করছে।

কোন কোন স্থলে কৃ-ধাতুর যোগ ছাড়াই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, ঘরেতে ভ্রমর এল **গুণগুণিয়ে**—রবীন্দ্রনাথ। ব্যথাটা মাঝে মাঝে **টনটনিয়ে** উঠছে। **থরথরি** কাঁপিলা বসুধা—মধুসূদন। **টগবগিয়ে** ঘোড়া ছুটে চলেছে।

অনুশীলনী

১। ধ্বন্যাত্মক শব্দ কাহাকে বলে? ধ্বনিদ্যোতক ও ভাবব্যঞ্জক উভয় প্রকার ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ দাও।

২। আতিশয্য, স্বল্পতা, আসন্নতা ও বহুবচনের অর্থজ্ঞাপক শব্দদ্বৈতের উদাহরণ দাও।

সমার্থক দুই শব্দের যোগে এবং সার্থক ও অনুকার বা বিকার জাত নিরর্থক শব্দের যোগে যেসব শব্দদ্বৈত গঠিত হয় তাদের উদাহরণ দাও।

৪। ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত কিভাবে ক্রিয়াবিশেষণ ও ক্রিয়া রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৫। বাক্যে প্রয়োগ কর: ঝমাঝম, ধুপধাপ, ফিস ফিস, বন্‌বন্‌, হুহু, ধুকধুক, খুসখুসে, কুচকুচে, ম্যাজ ম্যাজ, খচখচ, বোঁ বোঁ, গাঁ গাঁ, গো গোঁ, অলি-গলি, সোর-গোল, দুম দুম, দুড়দাড়, ভুল-ভ্রান্তি, ছাই-ভস্ম, ভগ-ভগ, লজ্জাসরম, ধীরে সুস্থে, ভেবে-চিন্তে, কাড়াকাড়ি, হাঁকাহাঁকি, দাপাদাপি, উড়ু উড়ু, ডুবু-ডুবু, মর-মর, উঠি-উঠি, হন-হন, খুশী-খুশী, হাসি-হাসি, কান্না-কান্না, নীল-নীল, ড্যাব-ড্যাব, চোখে-চোখে, ঝিমি-ঝিমি।

বাক্য

যে পদসমূহের দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় তাহাকে **বাক্য** বলে। যে উক্তি সার্থক তাহাকেই বাক্য বলা যায়, উক্তি নিরর্থক হইলে তাহা বাক্যরূপে স্বীকার্য নহে। কয়েকটি পদ মিলিয়া একটি বাক্য হয়। এই পদগুলির রূপ এবং উহাদের পারস্পরিক সঙ্গতি ও বিন্যাসরীতির উপরেই বাক্যের গঠন নির্ভর করে।

প্রত্যেক বাক্যে অন্তত একটি কর্তা ও একটি ক্রিয়া থাকা আবশ্যক। যথা, রাম যাইতেছে। আমি খাইতেছি। বাক্যের তিনটি লক্ষণ, যথা, (ক) **আকাঙ্ক্ষা**, (খ) **যোগ্যতা** ও (গ) **আসত্তি**।

ক। **আকাঙ্ক্ষা**—বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণের জন্য একটি পদের পর আরেকটি পদ শুনিবার যে ইচ্ছা হয় তাহাকে **আকাঙ্ক্ষা** বলে। মাধব এই নামটি উচ্চারিত হইলেই মাধবের কোন ক্রিয়ার কথা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। মাধব খায়। এই পদ দুইটি শোনার পর আর একটি আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। মাধব কি খায়? না, ভাত খায়। আকাঙ্ক্ষা এখনও থাকে। কোথায় খায়? না, বাড়িতে ভাত খায়।

খ। **যোগ্যতা**—পদসমূহের অর্থবোধে পরস্পর সম্বন্ধে বাধা না থাকাকে **যোগ্যতা** বলে। গোরু পদটির উল্লেখ থাকিলেই তাহার ঘাস খাওয়ার যোগ্যতার কথা মনে পড়িবে। সুতরাং গোরু ঘাস খায়—এই বাক্য সার্থক বাক্য হইল। কিন্তু যদি বলা হয়, গোরু গাছে ওঠে তাহা হইলে সার্থক বাক্য হয় না। কারণ গোরুর গাছে ওঠার যোগ্যতা নাই। তবে অলঙ্কৃত বাক্যে পদের আপাত যোগ্যতা না থাকিতে পারে, সেই যোগ্যতার সন্ধান করিতে হইবে গূঢ়ার্থ এবং ভাবব্যঞ্জনার মধ্যে। লোকটি আকাশে উড়ছে,—এই বাক্যটি আপাত অসার্থক মনে হইবে, কারণ কোন লোকের আকাশে উড়িবার যোগ্যতা নাই। কিন্তু লোকটির মনে উচ্চাশা রহিয়াছে কিংবা কোন স্বপ্ন বাসা বাঁধিয়াছে, এই ভাবটি বুঝাইবার জন্য এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ভাবব্যঞ্জনার দিক দিয়া বিচার করিলে বাক্যটি সার্থক।

গ। **আসত্তি**—আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী পদগুলিকে বাক্যের মধ্যে সুসঙ্গতভাবে বিন্যস্ত করার নাম **আসত্তি**। সে বাড়ি যাইতেছে, এই বাক্যে

পদগুলি অর্থসঙ্গতি অনুযায়ী স্থাপিত হইয়াছে। যাইতেছে সে বাড়ি, এই বাক্যটি সার্থক হইল না, কারণ পদগুলি সুসঙ্গত অর্থ অনুযায়ী বিন্যস্ত হয় নাই। তবে বাক্যের মধ্য দিয়া বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশ করিবার জন্য, কিংবা বাক্যের চলন, ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য আনিবার জন্য বাক্যের অন্তর্গত পদবিন্যাসরীতির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য আনা যাইতে পারে। এক রাজা ছিলেন —এই বাক্যটির ভঙ্গি বৈচিত্র্য এবং বিশেষ বিশেষ পদের উপর গুরুত্ব আনিবার জন্য পদগুলিকে বিভিন্ন ভাবে স্থাপন করা যাইতে পারে ; যথা, ছিলেন এক রাজা, রাজা এক ছিলেন, রাজা ছিলেন এক, এক ছিলেন রাজা, ছিলেন রাজা এক ইত্যাদি।

বাক্যে পদস্থাপন রীতি

১। বাক্যে প্রথমে সম্বোধন, পরে কর্তৃপদ এবং সর্বশেষে ক্রিয়াপদ স্থাপন করিতে হয়। যথা, ভদ্রমহোদয়গণ ! আপনারা শ্রবণ করুন।

২। ক্রিয়াপদ সকর্মক হইলে কর্মপদটি ক্রিয়ার আগে বসে, দ্বিকর্মক হইলে আগে গৌণ কর্ম এবং পরে মুখ্য কর্ম বসে। যথা, মোহন আমাকে বইখানা দিল। আমি তোমাকে গান শোনাব।

৩। অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যথা, আমরা সেখানে গিয়া দৃশ্যটি দেখিলাম। ছাত্ররা দুষ্ট ছাত্রটির বিরুদ্ধে নালিশ **করিতে** যাইতেছে।

৪। করণ, সম্প্রদান ও অপাদান পদ কখনও কর্মপদের পূর্বে বসে এবং কখনও বা পরে বসে, রাখাল বালকটি **লাঠিদ্বারা** গোরুটিকে প্রহার করিয়েছে। রাজা **দরিদ্রকে** ধন দান করিতেছেন। বালিকারা **স্কুল হইতে** বাড়ি ফিরিতেছে।

৫। সম্বন্ধপদ যে পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহার অব্যবহিত পূর্বে বসে। যথা, **গঙ্গার** জল পবিত্র। **তোমার** মা তোমাকে ডাকিতেছেন।

৬। অধিকরণ কারক কখনও কর্তৃপদের পূর্বে এবং কখনও বা পরে বসে। যথা, গাছতলায় সাধুটি বসিয়া রহিয়াছে। কিংবা, সাধুটি গাছতলায় বসিয়া রহিয়াছে।

৭। ক্রিয়াপদে জোর দেওয়ার জন্য অনেক সময় বাক্যের প্রথমেই ক্রিয়াপদ বসান হয়। যথা, গেল তো একবার আর আসার নাম নেই। না আছে তোমার বুদ্ধি, না বিবেচনা।

বাক্যের অংশ

প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ থাকে, উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলা হয় তাহাকে **উদ্দেশ্য** বলা হয়। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহাকে বলা হয় **বিধেয়**। বালকটি পড়িতেছে,—এই বাক্যে বালকটিকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলা হইয়াছে। সেজন্য বালকটি উদ্দেশ্য এবং ঐ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পড়িতেছে. সেজন্য পড়িতেছে বিধেয়।

উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

চারপ্রকার উদ্দেশ্য হইতে পারে। যথা, **বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম** ও **ক্রিয়া**।

ক। বিশেষ্য **যাদুকর** খেলা দেখাইতেছে।

খ। বিশেষণ—**পাপী** অনুতাপ করিতেছে।

গ। সর্বনাম—**সে** মাঠে খেলিতেছে।

ঘ। ক্রিয়া—**চলাই** জীবনে মুক্তি আনে।

একটি মাত্র পদবিশিষ্ট উদ্দেশ্যকে সরল উদ্দেশ্য বলে। যথা, **লোকটি** অনেক তীর্থ ঘুরিয়াছে। একাধিক বিশেষ্য ও বিশেষণাদিযুক্ত উদ্দেশ্যকে **সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য** বলে। যথা, **ধার্মিক লোকটি** অনেক তীর্থে ঘুরিয়াছে। **রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা** বনে গমন করিলেন।

উদ্দেশ্য প্রসারণবিধি

কয়েক প্রকারে উদ্দেশ্য সম্প্রসারিত হইতে পারে। যথা,—

ক। বিশেষণ পদ দ্বারা—**কালো** লোকটি এখানে আসিয়াছিল।
ধার্মিক ব্যক্তি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

খ। সম্বন্ধ পদ দ্বারা—**তোমার** ছেলেটি কাল কোথায় গিয়াছিল ?

গ। সমকারক পদ দ্বারা—**রাজা** রামচন্দ্র প্রজানুরঞ্জনের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন।

ঘ। অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা—রতীশ **আসিয়া** বলিল।

ঙ। কর্মপদ যুক্ত করিয়া—সে **অসৎ কর্ম** করিয়া বড় লোক হইয়াছে।

চ। সম্বন্ধ ও অধিকরণ পদ যুক্ত করিয়া—ব্যবসায়ী লোকটি **কলিকাতায় পাটের** কারবারে অনেক লাভ করিয়াছে।

ছ। অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্মপদে করণ, সম্প্রদান ও অপাদান কারক যোগ করিয়া—কুমারসেন **অস্ত্রদ্বারা** নিজ মস্তক ছিন্ন করিয়া গোবিন্দমাণিক্যকে উপহার পাঠাইলেন। হরিশ্চন্দ্র **বিশ্বামিত্রকে** সর্বস্ব দান করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। **শীত সরোবর** হইতে জল আনিতে গেল।

জ। যে, যাহারা, যাহাকে প্রভৃতি সর্বনামযুক্ত বাক্য বা বাক্যাংশ দ্বারা—**যে বালকটি এখানে আসিয়াছিল** তাহাকে আমি চিনি।

বিধেয় প্রসারণবিধি

উদ্দেশ্যের ন্যায় বিধেয়ও দুই প্রকার, সরল ও সম্প্রসারিত। একটি মাত্র ক্রিয়াপদ থাকিলে তাহাকে সরল বিধেয় বলে। রমলা কাঁদিতেছে, এই বাক্যে কাঁদিতেছে সরল বিধেয়। যে বিধেয়ের সহিত এক বা একাধিক পদ যুক্ত থাকে তাহাকে প্রসারিত বিধেয় বলে। যথা, রমলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

নিম্নলিখিত প্রকারে বিধেয় সম্প্রসারিত হয়। যথা,

ক। ক্রিয়াবিশেষণ দ্বারা—নকুল **দ্রুত** হাঁটিতে পারে। **ধীরে ধীরে** বাতাস বহিতেছে।

খ। বিভিন্ন কারক দ্বারা—আমি **চন্দ্র** দেখিতেছি। আমি হাত দিয়া খাইতেছি। আমি **ভিক্ষুককে** বস্ত্র দান করিয়াছি। আমি **বিদ্যালয়** হইতে পুরস্কার পাইয়াছি। আমি **বাড়িতে** আছি।

গ। ক্রিয়াস্থানীয় বাক্যাংশ দ্বারা—গ্রাম্য লোকটি এখনও শহরে **চলাফেরা** করতে শেখেনি।

ঘ। বিধেয় বিশেষণ দ্বারা—শঙ্করাচার্য মহাপণ্ডিত ছিলেন।

ঙ। কালবাচক শব্দের যোগে—গান্ধীজী **বহুদিন** অনশনে কাটাইয়াছিলেন।

সরল উদ্দেশ্য ও কয়েকটি বাক্য

	উদ্দেশ্য	বিধেয়
ক।	রামচন্দ্র	বধ করিলেন
খ।	কালিদাস	রচনা করিয়াছিলেন
গ।	সুভাষচন্দ্র	সংগ্রাম করিয়াছিলেন
ঘ।	শরৎচন্দ্র	লিখিয়াছেন।

সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্বলিত কয়েকটি বাক্য

	উদ্দেশ্য	বিধেয়
ক।	দশরথ পুত্র রামচন্দ্র	রাবণকে বধ করিলেন
	দশরথ পুত্র অজেয় বীর রামচন্দ্র	রাবণকে লঙ্কায় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা বধ করিলেন
খ।	কবি কালিদাস	মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন,
	উজ্জয়িনীর রত্ন কবি কালিদাস	অপূর্ব রসপূর্ণ কাব্য মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন।
গ।	নেতাজী সুভাষচন্দ্র	দেশের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন
	নির্ভীক সংগ্রামী বীর	ভারতের বাহিরে ইংরেজ শক্তির সঙ্গে
	নেতাজী সুভাষচন্দ্র	দেশের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন
ঘ।	অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র	বহু উপন্যাস লিখিয়াছেন
	জনদরদী অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র	চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত প্রভৃতি বহু উপন্যাস লিখিয়াছেন

বাক্য-বিশ্লেষণ

বাক্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে বাক্যটি সরল, যৌগিক কিংবা জটিল তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যের বিবর্ধক, বিধেয় ও বিধেয়ের বিবর্ধক এই চার অংশে বাক্যকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। যৌগিক ও জটিল বাক্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি খণ্ডবাক্যকে এভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

সরল বাক্যের বিশ্লেষণ ঃ

১। প্রাতঃস্মরণীয় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর দীনদুঃখীকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন

ক। উদ্দেশ্য—বিদ্যাসাগর

খ। উদ্দেশ্যের প্রসারক—প্রাতঃস্মরণীয়, দয়ার সাগর

গ। বিধেয়—সাহায্য করিয়াছিলেন

ঘ। বিধেয় প্রসারক—দীনদুঃখীকে (কর্ম), নানাভাবে (ক্রিয়াবিশেষণ)

২। কাঁটালপাড়ার অধিবাসী সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে দেশের মুক্তিস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

ক। উদ্দেশ্য—বঙ্কিমচন্দ্র

খ। উদ্দেশ্যের প্রসারক—কাঁটালপাডাব অধিবাসী, সাহিত্যসম্রাট

গ। বিধেয়—স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন

ঘ। বিধেয়ের প্রসারক—আনন্দমঠ উপন্যাসে, দেশের মুক্তি

জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ

১। যে মিথ্যাবাদী কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না।

প্রধান খণ্ডবাক্য—কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না।

ক। উদ্দেশ্য—কেহ

খ। উদ্দেশ্যের প্রসারক—যে মিথ্যাবাদী (বিশেষণ বো কে খণ্ডবাক্য)

গ। বিধেয়—বিশ্বাস কবে না।

ঘ। বিধেয়ের প্রসাবক—তাহাকে (কর্ম)

অপ্রধান বাক্য :

ক। উদ্দেশ্য—যে (সর্বনাম)

খ। বিধেয় (হয়)

গ। বিধেয়ের প্রসারক—মিথ্যাবাদী।

২। লক্ষ্মণ কহিলেন, এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিবি।

প্রধান খণ্ডবাক্য—লক্ষ্মণ কহিলেন।

ক। উদ্দেশ্য—লক্ষ্মণ।

খ। বিধেয়—কহিলেন।

অপ্রধান খণ্ডবাক্য—এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি।

ক। উদ্দেশ্য—এই।

খ। বিধেয়—(হয়)

গ। বিধয়ের প্রসারক—সেই, জনস্থান মধ্যবর্তী, প্রস্রবণ গিরি।

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ :

১। অমরনাথ তীর্থে তীর্থে ঘুরিলেন কিন্তু শান্তি পাইলেন না।

স্বাধীন বাক্য দুইটি—ক। অমরনাথ…ঘুরিলেন। খ। শান্তি পাইলেন না।

ক। উদ্দেশ্য—অমরনাথ।

বিধেয়—ঘুরিলেন।

বিধেয়ের প্রসারক—তীর্থে তীর্থে।

খ। উদ্দেশ্য—(অমরনাথ)।

বিধেয়—পাইলেন না।

বিধেয়ের প্রসারক—শান্তি (কর্ম)

২। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার অধিপতি ছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি অর্জুনের সারথি হইয়াছিলেন।

স্বাধীন বাক্য দুইটি—ক। শ্রীকৃষ্ণ......ছিলেন। খ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে...... হইয়াছিলেন।

ক। উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণ।

বিধেয়—ছিলেন।

বিধেয়ের প্রসারক—দ্বারকার অধিপতি।

খ। উদ্দেশ্য—তিনি।

বিধেয়—হইয়াছিলেন।

বিধেয়ের প্রসারক—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, অর্জুনের সারথি।

বাক্যের প্রকারভেদ

বাক্য তিন প্রকার—১। **সরল**, ২। **মিশ্র বা জটিল**, ৩। **যৌগিক**।

১। সরল বাক্য

যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাহাকে **সরল বাক্য** বলে। সরল বাক্যে উদ্দেশ্যপদের প্রসারক থাকিতে পারে এবং বিধেয় পদেরও প্রসারক থাকিতে পারে। কিন্তু একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকিবে। অর্জুন কর্ণকে বধ করিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন মহাবীর কর্ণকে বধ করিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণের সহায়তায় প্রবল যুদ্ধ করিয়া মহাবীর কর্ণকে বধ করিলেন। এই তিনটি বাক্যই সরল কারণ প্রত্যেকটি বাক্যেই বিধেয় ক্রিয়া (সমাপিকা ক্রিয়া) একটি।

মিশ্র বা জটিল বাক্য

মূল বাক্যের অধীন এক কিংবা একাধিক খণ্ড বাক্য অথবা বাক্যাংশ (clause) থাকিতে পারে। একটি উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেয় থাকিলেই খণ্ডবাক্য হয়। যে ছেলেটি ক্লাসে প্রথম হয়েছে, সে আমাদের বাড়িতে এসেছে। এই

বাক্যে যে ছেলেটি ক্লাসে প্রথম হয়েছে—একটা খণ্ড-বাক্য, সে আমাদের বাড়িতে এসেছে—আর একটি খণ্ডবাক্য। যে খণ্ডবাক্যে প্রধান উদ্দেশ্য ও প্রধান বিধেয় থাকে তাহা প্রধান খণ্ডবাক্য (Principal clause) এবং অন্য খণ্ডবাক্যগুলি অপ্রধান।

যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্য (Principal clause) এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য (Subordinate clause) থাকে তাহাকে বলা হয় **মিশ্র বা জটিল বাক্য**। যথা, যে পঞ্চবটী বনে সুখে কাটাইয়াছিলেন সীতা সেই বনের কথা বর্ণনা করিলেন। অহল্যা যেখানে পাষাণ হইয়াছিলেন রামচন্দ্র সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে এখন কি কাজ করে তাহা আমি সন্ধান করিব।

অপ্রধান খণ্ডবাক্য তিন প্রকার ; যথা, **বিশেষ্য স্থানীয় খণ্ডবাক্য** (Noun clause), **বিশেষণ স্থানীয় খণ্ড বাক্য** এবং **ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য**।

ক। বিশেষ্য স্থানীয় অপ্রধান খণ্ড বাক্য (Noun clause)-লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, **মেঘনাদ অগ্নিপূজা করিতেছেন**। একথা সকল ছাত্র-ছাত্রীই জানে যে, **ভালো ভাবে না পড়িলে পরীক্ষা পাশ করা যায় না**। রোহিণী কৃষ্ণকান্তের শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, **তিনি ঘুমাইতেছেন**। (বিশেষ্যের ভূমিকায় ব্যবহৃত খণ্ডবাক্য)।

খ। **বিশেষণ স্থানীয় অপ্রধান খণ্ড বাক্য**—(Adjective clause) **শৈশবে যাহাদের সঙ্গে খেলা করিয়াছি,** তাহারা দূরে দূরান্তরে হারাইয়া গিয়াছে। **যিনি একদিন তপোবনে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন** রাজসভায় তিনি নিজের পত্নীকে চিনিতেই পারিলেন না। **যাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল** সে কখনও দেখা দেয় না। (প্রধান খণ্ডবাক্যের নাম-পদকে বিশেষিত করে)

গ। ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয় অপ্রধান খণ্ডবাক্য—(Adverbial clause) **যখন শাজাহান দারার মৃত্যুসংবাদ শুনিলেন** তখন তিনি শোকে অধীর হইলেন। **যদি তুমি পরিশ্রম কর** তবে নিশ্চয়ই ফল পাইবে। **যতদিন তুমি আমার কাছে থাকিবে** ততদিন তোমাকে আমি দেখিব। (প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে)

৩। যৌগিক বাক্য

পরস্পর-নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক বাক্য যখন সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন যৌগিক বাক্য গঠিত হয়। যথা,—

গোরা সুচরিতার সন্ধানে সেখানে গেল কিন্তু সুচরিতা সেখানে ছিল না। রমেশ গ্রামের উন্নতি করিতে আসিল বটে, তবে সকলের কাছে শুধু বাধাই পাইল। রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসে যাত্রা করিলেন এবং অযোধ্যার যত নরনারীও অনুগমন করিতে লাগিল।

উদ্দেশ্য বা অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণী বিভাগ

১। নির্দেশক বাক্য (Indicative Sentence): নির্দেশক বাক্য দুই প্রকার ; যথা, অস্ত্যর্থক (Affirmative) ও নাস্ত্যর্থক (Negative)।

অস্ত্যর্থক : আমি বাজারে যাইব। তুমি মেলায় আসিবে।

নাস্ত্যর্থক : রমেন বেড়াইতে যাইবে না। সে আর কোনদিন ফিরিবে না।

২। প্রশ্নবোধক বাক্য (Interrogative Sentence):

রমা কি পরীক্ষা দিবে না? চঞ্চল কবে আসিবে?

৩। ইচ্ছাসূচক বা প্রার্থনাসূচক বাক্য (Optative, Precative):

ভগবান যেন সকলের ভালো করেন। কামনা করি, সে যেন নিরাপদে পৌঁছিতে পারে।

৪। আজ্ঞাসূচক বাক্য (Imperative): তুমি চট করে গিয়ে দোকান থেকে জিনিসটা নিয়ে এসো। কখনো গুরুজনের অবাধ্য হবে না।

৫। কার্যকারণাত্মক বাক্য (Conditional): (এইরূপ বাক্যে কোন নিয়ম, স্বীকৃতি, সংকেত বা শর্ত দ্যোতিত হয়) যদি পরিশ্রম কর তবে নিশ্চয়ই ফল পাইবে। খুব যদি পীড়াপীড়ি করে তাহা হইলে হয়তো বিবাহ বাড়িতে যাইতে পারি।

৬। সন্দেহদ্যোতক বাক্য (Dubitative): চিনির দর বোধ হয় আরও বাড়িবে। মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবত এই অনুষ্ঠানে আসিবেন।

৭। বিস্ময়বোধক ব্যাক্য (Interjective): (হর্ষ, শোক, বিস্ময় ইত্যাদি ব্যক্ত হয়) মরি মরি কি অপূর্ব রূপ! চোখ আর ফেরানো যায় না! হায়, যাহাকে এত বড় বন্ধু ভাবিয়াছিলাম সেই কিনা শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসঘাতকতা করিল!

এক প্রকার বাক্যের অন্যপ্রকার বাক্যে পরিবর্তন

১। অস্ত্যর্থক	নাস্ত্যর্থক
ক। পরের জন্য আত্মত্যাগেই সুখ।	পরের জন্য আত্মত্যাগের মত সুখ আর নাই।
খ। তিনি এখন নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ।	তাঁহার এখন কোন বিঘ্ন ও আপদ নাই।
গ। ভীষ্ম সারাজীবন তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।	ভীষ্ম সারাজীবন কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই।
ঘ। কর্ণের মত দাতা বিরল।	কর্ণের মত দাতা দেখা যায় না।
ঙ। একলব্য ঠিক গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন।	গুরুদক্ষিণা দিতে একলব্যের ভুল হয় নাই।

২। নির্দেশ-সূচক	প্রশ্ন-সূচক
ক। ভরতের ভ্রাতৃভক্তি অতুলনীয়।	ভরতের ভ্রাতৃভক্তির তুলনা কোথায়?
খ। পুত্রের বিবাহে তিনি অকারণে অপরিমিত ব্যয় করিয়াছেন।	পুত্রের বিবাহে তাঁহার অকারণ অপরিমিত ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল কি?
গ। লবকুশের রামায়ণ গান শুনিয়া সকলের হৃদয় মুগ্ধ হয়।	লবকুশের রামায়ণ গান শুনিয়া কাহার হৃদয় না মুগ্ধ হয়?
ঘ। শিক্ষকরা সব সময়েই ছাত্রের মঙ্গল চিন্তা করেন।	শিক্ষকরা কোন সময়ে ছাত্রের মঙ্গল চিন্তা না করিয়া পারেন কি?
ঙ। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয় না।	যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয় কি?

৩। ইচ্ছাসূচক	নির্দেশসূচক
ক। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।	ভগবানের কাছে তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।
খ। তুমি যেন ভালোয় ভালোয় পৌঁছিতে পার।	কামনা করি, তুমি ভালোয় ভালোয় পৌঁছিয়া যাও।

গ।	ভগবানের আশীর্বাদে সে পরীক্ষায় সফল হউক।	তাহার পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছি।
ঘ।	তুমি একবার যদি আমার আছে আস।	আমার ইচ্ছা, তুমি একবার আমার কাছে আস।
ঙ।	বিশ্বের সকলে সুখী হউক, অবৈরী হউক।	ইচ্ছা করি, বিশ্বের সকলে যেন সুখী ও অবৈরী হয়।

৪।	**বিস্ময়সূচক**	**নির্দেশসূচক**
ক।	পাহাড় ও পাইন অরণ্যঘেরা গুলমার্গের দৃশ্য কি সুন্দর!	পাহাড় ও পাইন অরণ্যঘেরা গুলমার্গের দৃশ্য খুবই সুন্দর।
খ।	ছি ছি! ঐ রকম মান্যলোকের এই কাণ্ড!	ঐ রকম মান্যলোকের এই কাণ্ড দেখিয়া ধিক্কার দিতে হয়।
গ।	আহা! পুত্রহারা মাতার বিলাপ কি করুণ।	পুত্রহারা মাতার করুণ বিলাপ সহানুভূতি উদ্রেক করে।
ঘ।	ধন্য সৈনিকদের দেশপ্রীতি!	সৈনিকদের দেশপ্রীতি প্রশংসাজনক।
ঙ।	বাঃ, বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে লইয়া বেশ খেলা দেখাইতেছে!	বাঁদরওয়ালা বাঁদরটাকে লইয়া যে খেলা দেখাইতেছে তাহা বেশ কৌতুকজনক।

৫।	**সন্দেহদ্যোতক**	**নির্দেশসূচক**
ক।	বোধ হয় কাল মহিম আসিবে।	মহিমের কাল আসিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।
খ।	হয়তো তোমার সঙ্গে আমার আর জীবনে দেখা হইবে না।	তোমার সঙ্গে আমার আর জীবনে দেখা হইবার সম্ভাবনা কম।
গ।	শ্রীলতা বুঝি আর পাস করিতে পারিল না।	শ্রীলতার পাস করিবার সম্ভাবনা কম।
ঘ।	বিদ্যালয়পরিদর্শক সম্ভবত কাল আসিবেন।	বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাল আসিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ঙ।	সুলেখা বোধহয় এ-দুঃসংবাদ সহ্য করিতে পারিবে না।	সুলেখার পক্ষে এ-দুঃসংবাদ সহ্য করা কঠিন।
৬।		**নির্দেশসূচক**
ক।	গুরুজনকে ভক্তি করিবে।	গুরুজনকে ভক্তি করিবার জন্য তোমাকে উপদেশ দিতেছি।
খ।	লক্ষ্মীটি, কাল লাইব্রেরী থেকে বইখানা নিয়ে এসো।	লাইব্রেরী থেকে বইখানা আনবার জন্য তোমাকে আদর জানিয়ে অনুরোধ করছি।
গ।	শীগ্‌গীর যা, মাস্টার মশাইয়ের পা ধ'রে ক্ষমা চেয়ে আয়।	শীগ্‌গীর গিয়ে মাস্টার মশাইয়ের পা ধ'রে ক্ষমা চেয়ে আসবার জন্য আদেশ করছি।
ঘ।	একটি চাকরী দিয়ে এই বেকার ছেলেটিকে বাঁচান।	এই বেকার ছেলেটিকে একটি চাকরী দিয়ে বাঁচাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
ঙ।	পাড়ার বদ ছেলেদের সঙ্গে কখনো মিশো না।	পাড়ার বদ ছেলেদের সঙ্গে তোমাকে মিশতে নিষেধ করছি।

বাক্যান্তরী করণ

ক। সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্তন।

১। সরল : সরল ও প্রাঞ্জল রচনা সকলের মন আকর্ষণ করে।

জটিল : যে রচনা সরল ও প্রাঞ্জল হয় তাহা সকলের মন আকর্ষণ করে।

২। সরল : আমার হারান বইখানা পাইয়াছি।

জটিল : আমার যে বইখানা হারাইয়াছিল তাহা পাইয়াছি।

৩। সরল : জন্মিলেই মরিতে হইবে।

জটিল : যে জন্মলাভ করে তাহাকে মরিতে হইবে।

৪। সরল : পরিশ্রম করিলে ফল পাইবে।

জটিল : যদি পরিশ্রম কর তবে ফল পাইবে।

৫। সরল : ক্রন্দনরত বালিকাটিকে আমি সান্ত্বনা দিলাম।

জটিল : যে বালিকাটি ক্রন্দন করিতেছিল তাহাকে আমি সান্ত্বনা দিলাম।

৬। সরল : হৃদয়ের কথা কেহ জানিতে পারে না।

জটিল : যে কথা হৃদয়ে থাকে তাহা কেহ জানিতে পারে না।

৭। সরল : তুমি আসিলেই আমার দেখা পাইবে।

জটিল : যখন তুমি আসিবে তখন আমার দেখা পাইবে।

খ। জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন :

১। জটিল : যাহার বুদ্ধি আছে সে এ-কাজ করে না।

সরল : বুদ্ধিমান এ-কাজ করে না।

২। জটিল : রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ছিল আশী, তখন তিনি পরলোক গমন করেন।

সরল : রবীন্দ্রনাথ আশী বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

৩। জটিল : যে সব যাত্রী বিমান দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছিল তাহারা আজ মারা গেল।

সরল : বিমান দুর্ঘটনায় আহত যাত্রীরা আজ মারা গেল।

৪। জটিল : যদি নিয়মিত ব্যায়াম কর, তাহা হইলে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবে।

সরল : নিয়মিত ব্যায়াম করিলে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবে।

৫। জটিল : যেদিন মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকে সে দিন ট্রামে বাসে আর জায়গা পাওয়া যায় না।

সরল : মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলার দিন ট্রামে-বাসে জায়গা পাওয়া যায় না।

৬। জটিল : যদি প্রশ্ন কর তবে উত্তর পাইবে।

সরল : প্রশ্ন করিলে উত্তর পাইবে।

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

। সরল : তিনি ধনী হইলেও হৃদয়বান নহেন।

যৌগিক : তিনি ধনী বটে কিন্তু হৃদয়বান নহেন।

সরল : তিনি অফিসে যাইয়া সকলের কৈফিয়ত তলব করিলেন।

যৌগিক : তিনি অফিসে গেলেন এবং সকলের কৈফিয়ত তলব করিলেন।

২। সরল: তিনি প্রত্যেক বাড়ি ঘুরিয়াও ভোট আদায় করিতে পারিলেন না।

যৌগিক: তিনি প্রত্যেক বাড়ি ঘুরিলেন বটে কিন্তু ভোট আদায় করিতে পারিলেন না।

৩। সরল: বেদব্যাসের বলা মহাভারতের কাহিনী গণেশ লিখিয়া যাইতেন।

যৌগিক: বেদব্যাস মহাভারতের কাহিনী বলিয়া যাইতেন এবং গণেশ তাহা লিখিতেন।

৪। সরল: আরব্ধ কাজ শেষ কর।

যৌগিক: কাজ আরম্ভ কর এবং শেষও কর।

৫। সরল: জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

যৌগিক: জগৎসিংহ তিলোত্তমাকে দেখিলেন এবং মুগ্ধ হইলেন।

৬। সরল: নবকুমার অরণ্যের মধ্যে ঘুরিবার সময় কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

যৌগিক: নবকুমার অরণ্যের মধ্যে ঘুরিতেছিলেন, এমন সময় কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন

১। যৌগিক: সময় ও নদীস্রোত বহিয়া চলিতেছে, তাহার কখনও বিরাম নাই।

সরল: সময় ও নদীস্রোত অবিরাম বহিয়া চলিতেছে।

২। যৌগিক: মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফরিকা হইতে আসিলেন এবং ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

সরল: মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফরিকা হইতে আসিয়া ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

৩। যৌগিক: সুনীল গাভাসকার ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রিকেট খেলায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইলেন এবং সকলের বিস্ময় উদ্রেক করিলেন।

সরল: সুনীল গাভাসকার ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রিকেট খেলায় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়া সকলের বিস্ময় উদ্রেক করিলেন।

৪। যৌগিক : রাণা প্রতাপসিংহ আমরণ সংগ্রাম চালাইলেন কিন্তু চিতোর উদ্ধার করিতে পারিলেন না।
সরল : রাণা প্রতাপসিংহ আমরণ সংগ্রাম চালাইয়াও চিতোর উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

৫। যৌগিক : চুনী গোস্বামী ও বলরামের মত খেলোয়াড় অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই ক্রীড়াচাতুর্যও অন্তর্হিত হইয়াছে।
সরল : চুনী গোস্বামী ও বলরামের মত খেলোয়াড়ের অবসরগ্রহণের পর সেই ক্রীড়াচাতুর্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

৬। যৌগিক : লর্ডস মাঠে ভিনু মানকড় ব্যাটিং ও বোলিং-এ অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, সেজন্য বিশ্বের ক্রীড়ারসিকদের দ্বারা সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন।
সরল : লর্ডস মাঠে ভিনু মানকড় ব্যাটিং ও বোলিং-এ অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়া বিশ্বের ক্রীড়ারসিকদের দ্বারা সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন।

একই বাক্যের তিন প্রকার বাক্যরূপ

১। সরল : ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখিলে মনে শান্তি পাইবে।
যৌগিক : ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখ, মনে শান্তি পাইবে।
জটিল : যদি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখ তবে মনে শান্তি পাইবে।

২। সরল : কৃষ্ণের অবতার চৈতন্যদেব সকলকে প্রেমধর্ম বিতরণ করিয়াছিলেন।
যৌগিক : চৈতন্যদেব কৃষ্ণের অবতার ছিলেন এবং তিনি সকলকে প্রেমধর্ম বিতরণ করিয়াছিলেন।
জটিল : যিনি কৃষ্ণের অবতার ছিলেন সেই চৈতন্যদেব সকলকে প্রেমধর্ম বিতরণ করিয়াছিলেন।

৩। সরল : মহেশের কৃতিত্বের জন্য তাহার শিক্ষকরা গৌরব বোধ করিতেছেন।
যৌগিক : মহেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, সেজন্য তাহার শিক্ষকরা গৌরব বোধ করিতেছেন।

জটিল : যে সব শিক্ষক মহেশকে পড়াইয়াছেন তাঁহারা তাহার কৃতিত্বে গৌরব বোধ করিতেছেন।

৪। সরল : তিনি বিদ্বান্ হইলেও অহঙ্কারী নহেন।

যৌগিক : তিনি বিদ্বান্ বটে, কিন্তু অহঙ্কারী নহেন।

জটিল : যদিও তিনি বিদ্বান্ তবুও তাঁহার অহঙ্কার নাই।

৫। সরল : এই গ্রামের অনেক মানুষ বন্যায় মারা গিয়াছে।

যৌগিক : এই গ্রামে অনেক মানুষ ছিল কিন্তু তাহারা বন্যায় মারা গিয়াছে।

জটিল : অনেক মানুষ যাহারা এ গ্রামে ছিল তাহারা বন্যায় মারা গিয়াছে।

৬। সরল : বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ সব্যসাচী ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পথে বাহির হইলেন।

যৌগিক : সব্যসাচী বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তিনি পথে বাহির হইলেন।

জটিল : যিনি বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ ছিলেন সেই সব্যসাচী ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পথে বাহির হইলেন।

বাক্য সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

সরল বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিতে পারে। খণ্ড বাক্যের মধ্যেও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকা প্রয়োজন। বাক্যের মধ্যে যাহাতে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া না থাকে সেজন্য সরল বাক্য ইয়া, ইলে প্রভৃতি ক্রিয়া প্রত্যয় যুক্ত করিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার স্থান পূরণ করে। জটিল বাক্যের অন্তর্গত অনেক খণ্ড বাক্য সরল বাক্যে সমাসবদ্ধ পদ কিংবা কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত পদে পরিণত হয়। এইভাবে একটি খণ্ড বাক্য একটি পদে রূপান্তরিত হয়। যথা, যাহারা অশেষ গুণ আছে এমন এক ব্যক্তি আমার কাছে আসিয়াছিল (জটিল বাক্য)। অশেষ গুণবান্ এক ব্যক্তি আমার কাছে আসিয়াছিল (সরল বাক্য)। শিবের উপাসনা করেন এমন অনেক ব্যক্তি রামেশ্বর মন্দিরে গিয়াছিলেন (জটিল)। অনেক শৈব রামেশ্বর মন্দিরে গিয়াছিলেন (সরল)। পান করা যায় এমন জল নিয়ে এসো (জটিল)। পানীয় জল নিয়ে এসো (সরল)।

যৌগিক বাক্যে খণ্ড বাক্যগুলির প্রত্যেকটিই স্বাধীন কোনটিই কাহারও অধীন নহে। কিন্তু এই খণ্ড বাক্যগুলির মধ্যে যদি পূর্ণচ্ছেদ বসে তাহা হইলে খণ্ড বাক্যগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাদিগকে একত্রে রাখিবার জন্যই সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করিতে হয়। এবং, ও, আর, কিন্তু, এজন্য, সেজন্য, সেকারণে, তাই ইত্যাদি অব্যয় খণ্ডবাক্যগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখে। আধুনিক বাংলা ভাষায় অনেক লেখক সংযোজক অব্যয়গুলি তুলিয়া দিয়া প্রত্যেকটি খণ্ড বাক্যের পর একটি পূর্ণচ্ছেদ দিয়া স্বতন্ত্র বাক্যরূপে উহাদিগকে প্রয়োগ করেন। সরল বাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়া বেশি ব্যবহার না করিবার দিকেও একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে। তিনি এখানে এলেন, আমাকে কাজের কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং তারপর চ'লে গেলেন (যৌগিক)। এই বাক্যটিকে বর্তমানে অনেক লেখক এভাবে ব্যবহার করবেন—তিনি এখানে এলেন। আমাকে কাজের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর চলে গেলেন।

জটিল বাক্যেও যৌগিক বাক্যের ন্যায় বাক্যবিস্তারের দিকেই লক্ষ্য। সেজন্য সমাসবদ্ধ, কৃদন্ত অথবা তদ্ধিতান্ত পদ ভাঙ্গিয়া একটা খণ্ড বাক্য রূপ দিবার চেষ্টাই এই বাক্যে পরিস্ফুট। বিশেষণ স্থানীয় খণ্ড বাক্যগুলিতে যে-সে, যাহারা-তাহারা, যিনি-তিনি, যাঁহারা-তাঁহারা, যাহাকে-তাহাকে, যাহাদের-তাহাদের, যাহারা-তাহারা ইত্যাদি নিত্যসম্বন্ধ যুক্ত পদ ব্যবহৃত হয়। আবার ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ড বাক্যেও যদি—তবে, তাহা হইলে, যত—তত, যখন—তখন ইত্যাদি নিত্যসম্বন্ধযুক্ত পদের ব্যবহার হয়। বিশেষ্য স্থানীয় খণ্ড বাক্য সাধারণত প্রধান খণ্ড বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম রূপে প্রয়োগ করা হয়।

বাক্য সংযোজন ও বিয়োজন

পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক বাক্য একটিমাত্র বাক্যে পরিবর্তিত করার নাম **বাক্য সংযোজন**। একটি বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশ বিযুক্ত করিয়া পৃথক পৃথক বাক্যে প্রয়োগ করিলে তাহাকে বলা হয় **বাক্য বিয়োজন**।

বাক্য সংযোজনের কয়েকটি নিয়ম

১। ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের উদ্দেশ্য পৃথক হইলেও বিধেয় যদি এক হয় তবে দুই উদ্দেশ্যকে সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত করিয়া বাক্য সংযোজন করা যাইতে পারে।

যথা, বিযুক্ত বাক্য—বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ খেলা দেখিতে আসিয়াছেন। অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তিও খেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

সংযুক্ত বাক্য—বিদ্যালয়েব শিক্ষকগণ **এবং** অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি খেলা দেখিতে আসিয়াছেন।

২। যে কোন বাক্যের কর্তার একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাহা হইলে প্রধান সমাপিকা ক্রিয়াটি রাখিয়া অন্য ক্রিয়াগুলিকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করিয়া ; যথা—

বিযুক্ত বাক্য—স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গেলেন। তিনি বিশ্বসভায় বক্তৃতা করিলেন। সকলের চিত্ত জয় করিলেন। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন।

সংযুক্ত বাক্য—স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়া বিশ্বসভায় বক্তৃতা দ্বারা সকলেব চিত্ত জয় করিয়া হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন।

৩। বাক্যকে বাক্যাংশে পরিণত করিয়া ; যথা,

বিযুক্ত বাক্য—ভোর হইল। পক্ষিসমূহ কূজন শুরু করিল। চতুর্দিক মুখরিত হইল।

সংযুক্ত বাক্য—ভোরে পক্ষিকূজনে চতুর্দিক মুখরিত হইল।

৪। একটি বাক্যকে অন্য বাক্যের বিবর্ধক রূপে পরিণত করিয়া ; যথা,

বিযুক্ত বাক্য—রামচন্দ্র অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। রাবণ ছিলেন লঙ্কার রাজা। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়াছিলেন।

সংযুক্ত বাক্য—অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র লঙ্কার রাজা রাবণকে বধ করিয়াছিলেন।

৫। যদি, তবে, তথাপি, যখন, তখন, যেখানে, সেখানে, যেমন, তেমন, যত, তত, কারণ, যেহেতু ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে ; যথা,

বিযুক্ত—সাহস অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবে।

সংযুক্ত—যদি সাহস অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবে।

বিযুক্ত—প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন বকাবকি শুরু করিল, অপরজনও সমানভাবে উত্তর চালাইতে লাগিল।

সংযুক্ত—প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন যেমন বকাবকি শুরু করিল অপরজনও তেমনি উত্তর চালাইতে লাগিল।

অনুশীলন।

১। বাক্য কাহাকে বলে? বাক্যের লক্ষণগুলি নির্দেশ কর।

২। ব্যাখ্যা কর—উদ্দেশ্য, বিধেয়, উদ্দেশ্যের প্রসারক, বিধেয়ের প্রসারক।

৩। বাক্যের মধ্যে পদস্থাপনের সাধারণ নিয়মগুলি উল্লেখ কর।

৪। উদাহরণ সহ সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

৫। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর বাক্য তাহা নির্ণয় কর এবং যৌগিক ও জটিল বাক্যগুলির খণ্ড বাক্যসমূহ বিশ্লেষণ কর :

ক। মরণেই আমার সুখ—কিন্তু যদি তাহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ।

খ। তখন হরমণি ব্রহ্মচারীর আদেশমত তাহাকে আর্দ্র বস্ত্রের পরিবর্তে আপনার একখানি শুষ্ক বস্ত্র পরাইল।

গ। আমি হাসিয়া বলিলাম, 'পুরুষের শপথে বিশ্বাস নাই'।

ঘ। আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম।

ঙ। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পালাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতীকার হয় না।

চ। যে সন্ন্যাসীটি কল্যাণীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ভবানন্দ।

৬। উদ্দেশ্য বা অর্থ অনুযায়ী বাক্যের কি কি শ্রেণী বিভাগ হইতে পারে তাহা উল্লেখ কর।

৭। কোন্‌টি কোন্ শ্রেণীর বাক্য তাহা নির্ণয় কর—

ক। অহো কি দুর্দৈব, তাহার এত বড় সর্বনাশ হইল!

খ। ভগবান তাকে সুমতি দিন।

গ। তুমি কি এ বছর পরীক্ষা দেবে?

ঘ। পরিশ্রম না করিলে পরীক্ষায় পাস করা যায় না।

ঙ। বাজার থেকে মাছ কিনে নিয়ে এসো।

৮। সরল বাক্যকে কিভাবে যৌগিক ও জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় তাহা কয়েকটি উদাহরণের মধ্য দিয়া দেখাও।

শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ

এক বা একাধিক পদ বাক্যে ব্যবহৃত হইয়া সাধারণ অর্থের অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করে। এইরূপ পদপ্রয়োগে বক্তব্য বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। নীচে এই ধরনের শব্দ ও বাক্যাংশের কতকগুলি প্রয়োগ দেখান হইতেছে।

অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ, অল্পবয়সী অকর্মণ্য)—ভবদেব বাবুর অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটি শুধু খায় দায় আর দিনরাত আড্ডা মারে, কাজকর্মের ধার দিয়েও যায় না।

অকূল পাথার (অকূল সমুদ্র—সীমাহীন ঝামেলা ঝঞ্ঝাট অথবা বিপদ) —পিতার মৃত্যুতে কানাই যেন অকূল পাথারে পড়েছে।

অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া অথবা মারা (অনুমান অথবা আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া কিছু করা)—আগে তার কাছে গিয়ে খোঁজ খবর না", অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লে কিছুই সুবিধা হবে না।

অন্ধকারে হাতড়ানো—প্রকৃত অবস্থা আগে জান, অন্ধকারে হাতড়ালে কিছুই লাভ হবে না।

অন্ধের যষ্টি অথবা অন্ধের নড়ি (নিরুপায় অথবা অসহায়ের অবলম্বন) —অভাগীর কাছে কাঙ্গালীচরণ ছিল অন্ধের যষ্টির মত, তাহার জন্যই অভাগী জীবনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

অমাবস্যার চাঁদ (যাহার দর্শন পাওয়া যায় না)—নোতুন বন্ধুবান্ধব পেয়ে সুরেশ একেবারে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেছে, তার দেখাই পাওয়া যায় না।

অর্ধচন্দ্র দেওয়া— (গলাধাক্কা দেওয়া)—জোচ্চোর লোকটিকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে দারোয়ান বাড়ির বাইরে তাড়িয়ে দিল।

অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল অনুনয়-বিনয়)—শ্রমিকরা মালীকের কাছে অরণ্যে রোদন করল মাত্র, তাদের কোনো দাবীই গ্রাহ্য হল না।

অতল জলে (অচল অবস্থায়)—সব পরিকল্পনা এখন অতল জলে রয়েছে, শীঘ্র কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না।

অহি-নকুল সম্বন্ধ (সাপ ও বেজির মত শত্রুতার সম্বন্ধ)—দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও উত্তর ভিয়েৎনামের মধ্যে যেন অহি-নকুল সম্বন্ধ, উভয়দেশের মধ্যে শত্রুতা লেগেই আছে।

অষ্টরম্ভা (ফাঁকি, শূন্য)—সে কেবল বড় বড় কথা বলে, কাজের মধ্যে অষ্টরম্ভা।

আকাশ-কুসুম (অলীক অথবা কাল্পনিক বস্তু)—আজকালকার সাহিত্যিক গজদন্ত মিনারে বসে আকাশ-কুসুম রচনায় বিশ্বাস করেন না।

আকাশে তোলা (অত্যধিক প্রশংসা করা)—তুমি আমাকে একেবারে আকাশে তুলছ যে, আমি তো অত প্রশংসার যোগ্য নই।

আকাশ পাতাল তফাত (বিস্তর প্রভেদ)—বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত ছিল।

আকাশ (মাথায়) ভাঙ্গিয়া পড়া (বিপদগ্রস্ত হওয়া)—বড় ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে সোমেনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

আকাশ থেকে পড়া (অত্যন্ত বিস্মিত হওয়া)—বিদ্যালয়ের প্রথম হওয়া ছেলেটির ফেলের সংবাদে সকলে যেন আকাশ থেকে পড়ল।

আকাশ হাতে পাওয়া (অতিমাত্রায় সৌভাগ্যবান হওয়া)—প্রথম বিভাগে পাস করে সে যেন আকাশ হাতে পেয়েছে।

আক্কেল সেলামি (না বোঝার দণ্ড)—সরকারী দপ্তরে এখানে ওখানে ঘুরে হয়রান হ'য়ে অনেক আক্কেল সেলামি দিয়ে তবে কাজ আদায় করা গেল।

আদায় কাঁচকলায় (বনিবনা না হওয়ার ভাব)—দুই বন্ধুতে যেন আদায়-কাঁচকলায়, দিনরাত ঝগড়া লেগেই আছে।

আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি)—তার কাণ্ডকারখানা দেখে সকলের একেবারে আক্কেল গুড়ুম।

আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক হওয়া)—চোরাকারবার করে অনেকের একেবারে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

আঠার মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রতা, কুঁড়েমি)—নটবরকে কোনো কাজের ভার দিলে তাড়াতাড়ি সেটি সিদ্ধ হয় না, তার তো আঠার মাসে বছর।

আনাগোনা (আসা যাওয়া)—এখন নিজের কাজ আদায় করবার জন্য তার খুব আনাগোনা চলছে, অন্য সময়ে তো তার টিকিটি দেখা যায় না।

আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর (সামান্য লোকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মাথা ঘামানো)—বড়লোকের বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা আমি

জানতে চাই না, আমি আদার ব্যাপারী, আমার জাহাজের খবরের দরকার কি ?

আপন কোলে ঝোল টানা (নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা)—আপন কোলে ঝোল টানাই বেণীবাবুর স্বভাব, কমিটির মধ্যে থেকে তিনি কখনো সকলের স্বার্থরক্ষা করতে পারবেন না।

আঁতে ঘা দেওয়া (মনে আঘাত দেওয়া)—আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলা তোমার একটা বদ স্বভাব, এতে সবাই তোমার পরে অসন্তুষ্ট হন।

আমতা আমতা করা (সংকোচের সঙ্গে মনের ভাব ব্যক্ত করা)—দোষ করে স্পষ্ট ভাবে সে স্বীকার করছে না, কেবল আমতা আমতা করছে।

আবোল তাবোল (অর্থহীন কথা)—তখন থেকে বাচাল ছেলেটি কি আবোল তাবোল বলে চলেছে, কিছুই আমার কানে ঢুকছে না।

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অকর্মণ্য)—দেখতে শুনতে বেশ ছিমছাম, কিন্তু আসলে সে একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি বই তো নয়, কোনো কাজ তাকে দিয়ে হবার নয়।

আমড়া গাছি (তোষামোদ)—এত আমড়াগাছি করলে কি হবে, তোমার অন্যায় অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।

আলালের ঘরের দুলাল (ধনীর আদুরে সন্তান)—পিতার অত্যধিক আদরে মোতিলাল আলালের ঘরের দুলাল হয়ে উঠল।

আষাঢ়ে গল্প (উদ্ভট কাল্পনিক কাহিনী)—তুমি যে আষাঢ়ে গল্প শুরু করলে দেখছি, কাজের কথায় এসো তো।

ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ক)—জীবানন্দবাবুর ছেলেটি অল্প বয়সে ইঁচড়ে পেকে গিয়েছে, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

উত্তম মধ্যম (প্রহার)—চোরটি ধরা পড়লে তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হল।

উভয়-সঙ্কট (দুই দিক দিয়াই সমস্যা)—দুই মনিব দুই রকম হুকুম দিচ্ছেন, কর্মচারীরা পড়েছে উভয় সঙ্কটে, কার কথা মানবে ভেবেই পাচ্ছে না।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে (একের দোষ অপরে চাপানো, ভুল করিয়া এক বস্তুর জায়গায় অন্য বস্তু চাপানো)—মন্টু দোষ করল, কিন্তু ছেলেরা নন্টুকেই দোষী সাব্যস্ত করল, একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো।

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো (অপাত্রে কোন কথার অপপ্রয়োগ)—উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কি—অশিক্ষিত চাষীরা রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাখ্যা বুঝতে পারবে কি?

একচোখো (পক্ষপাতী)—পঞ্চাননবাবুর মত একচোখো লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়, তিনি অপরের ছেলে সম্বন্ধে কেবল নিন্দা করেন, কিন্তু নিজের ছেলে সম্পর্কে একেবারে নীরব।

কড়ায় গণ্ডায় (কিছুই না ছাড়িয়া)—তিনি নিজের অংশ কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া তবে ছাড়িলেন।

কড়াক্রান্তি (সামান্যতম লভ্যাংশ)—মহীতোষবাবুর মত স্বার্থপর লোক দেখা যায় না, নিজের প্রাপ্য অংশের কড়াক্রান্তিও তিনি ছাড়িতে প্রস্তুত নন।

কথায় কথায় (কথা প্রসঙ্গে)—কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল যে লাইব্রেরী থেকে কয়েকখানা দামী বই কিছুদিন আগে চুরি হয়ে গিয়েছে।

কথার কথা (বাজে কিংবা অসার কথা)—এ একটা কথার কথা মাত্র, এতে অত মন খারাপ করা তোমার উচিত নয়।

কথা দেওয়া (প্রতিশ্রুতি দেওয়া)—সমরেশবাবু কথা দিয়েছেন যে, তাঁর ছেলের সঙ্গে পরমেশবাবুর মেয়ের বিয়ে দেবেন।

কথা পাড়া (প্রসঙ্গ উত্থাপন)—বিয়ের কথা পাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল।

কথার পিঠে কথা (এক কথার উত্তরে আর এক কথা)—তার কথার পিঠে শুধু কথা বলেছিলাম, তখন অত তলিয়ে বুঝিনি।

কথার মাথা নাই মুণ্ডুও নাই (অর্থহীন কথা)—সে তো অনেক কথাই বলে গেল, কিন্তু সে সব কথার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই।

কলুর বলদ (যে নীরবে শুধু খাটিয়া চলে)—কাকে কি বলব বল, কলুর বলদের মত শুধু কেবল সংসারের ঘানি টেনে চলেছি।

কপাল ভাঙ্গা, কপাল ফাটা (ভাগ্য মন্দ হওয়া)—ঝি-চাকরাণী-প্রতিবেশিনী সকলেই ভ্রমরকে জানিয়ে গেল যে তার কপাল ভেঙেছে।

কপালক্রমে (ভাগ্যক্রমে)—কপালক্রমে যদি লটারীর টাকা পাই তা' হলেই বাড়ি করব, তা'ছাড়া আর বাড়ি করার কোন উপায় নেই।

কাজীর বিচার (খেয়ালী বিচার)—কে প্রকৃত দোষী তা নির্ণয় না করেই বিচার হ'য়ে গেল, এ যে কাজীর বিচার দেখছি।

কাঁচা পয়সা (নগদ টাকা)—বাবার মৃত্যুর পর ছেলেটি কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে খুব কাপ্তেনী করছে।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে (কষ্টের উপর কষ্ট দেওয়া)—একে আমার মন খারাপ তারপর তোমার বাক্যযন্ত্রণা শুরু হল, আর কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ো না।

কান ভারী করা (কাহারও কাছে অন্যের নিন্দা করা)—বৌটি সব সময়ে সংসারের অন্য সকলের নামে স্বামীর কান ভারী করে তুলছে।

কান পাতলা—(সহজেই যিনি অপরের কথা বিশ্বাস করেন) নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও শ্যামবাবু বড় কান পাতলা লোক, সহজেই অপরের কথা বিশ্বাস করেন।

কানে আঙুল দেওয়া—(কোন কিছু না শোনা) ঝগড়ার সময় মাতঙ্গিনীর মুখ থেকে এমন ভাষা বেরোয় যে শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়।

কানাকড়ি—(বিন্দু মাত্র) তোমার রাগের আমি কানাকড়ি মূল্য দিই না, এখন রাগ করে আছ, কাল আবার সেধে তার সঙ্গে কথা বলবে।

কালে ভদ্রে—(কদাচিৎ) তার সঙ্গে আমার কালে ভদ্রে দেখা হয়, তাই এ-খবরটি তাকে দিতে পারব কিনা তা বলতে পারছি না।

কুঁড়ের বাদশা—(অতিশয় কুঁড়ে) তোমার বন্ধুটি হ'ল কুঁড়ের বাদশা, তাকে বাড়ি থেকে নড়ানো সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না।

কেঁচে গণ্ডূষ—(নূতন ভাবে আরম্ভ করা) আমি আগে যা লিখেছিলাম সব বাদ দিয়ে এখন কেঁচে গণ্ডূষ করে আবার নোতুন করে লিখতে হবে।

কেষ্ট-বিষ্টু—(গণ্যমান্য ব্যক্তি) মাঠে আজ সভা হবে, অনেক কেষ্ট-বিষ্টু আসবেন শুনছি।

কোন গগনের চাঁদ—(বিশিষ্ট ব্যক্তি—ব্যঙ্গোক্তি) চাণক্যকে দেখে নন্দের এক সভাসদ ব্যঙ্গ করে বলল, 'তুমি কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ, তুমি কি নাচতে জান?'

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন—(অযোগ্য ব্যক্তির রাশভারী নাম) দিন রাত ঝুরি ঝুরি মিথ্যা কথা বলে চলেছে কিন্তু নাম হ'ল সত্যব্রত—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

খয়ের খাঁ (খোসামুদে)—আমার চাকরী হোক আর না হোক, দিনরাত আমি খয়ের খাঁগিরি করতে পারব না।

গড্ডলিকা প্রবাহ (নির্বিচারে গতানুগতিক ভাবে চলা)—প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে অথচ লোকের মুখে কথা নেই, সকলেই যেন গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

গোকুলের ষাঁড় (স্বেচ্ছাচারী ও অপরের অনিষ্টকারী ব্যক্তি)—মূর্খ ব্যবসায়ীর ছেলেগুলো যেন এক একটা গোকুলের ষাঁড়, তাদের অত্যাচারে পাড়া-প্রতিবেশীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা (কাহারও কৃতিত্বদ্বারা তাহাকেই সম্মান প্রদর্শন)—আজকের সভায় রবীন্দ্রনাথের কথা ও গান দিয়েই তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা জানাব, এ আমাদের গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।

গা সহা হওয়া (সহ্য হওয়া)—এখন সমাজের মধ্যে কোনো কিছুতেই যেন কারো চেতনা জাগে না, সব কিছু যেন গা সহা হয়ে গেছে।

গুড়ে বালি (কোন কিছু পণ্ড হওয়া)—সে আমার ওপর টেক্কা দেবে ভেবেছিল, কিন্তু সে গুড়ে বালি, আমি আগে ভাগে সকলকে বলে ঠিক করে রেখেছি।

গায়ে মাখা (কিছু মনে করা)—জ্ঞানদা কালো বলে তার আত্মীয় স্বজন কত না তাকে গঞ্জনা দেয়, কিন্তু সে এখন আর কিছুই গায়ে মাখে না।

গোঁজামিল (আংশিকভাবে শুধু মীমাংসা অথবা সমাধান করা)—শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে আমূল পরিবর্তন করতে হবে, কোথাও গোঁজামিল দিলে চলবে না।

গোড়ায় গলদ (মূলেই ভুল)—তোমার দেখছি গোড়ায় গলদ, তুমি শুদ্ধ ভাবে এক লাইন লিখতে পার না, তুমি কিভাবে সাহিত্য রচনা করবে?

গোবর-গণেশ (মূর্খ, নির্বোধ)—রতিকান্ত বাবুর বড় ছেলেটি একটি গোবর গণেশ, কোনো কিছুই তার মাথায় ঢোকে না।

গণেশ ওলটানো (ব্যবসায়ে লাল বাতি জ্বালা)—বড়বাজারের অনেক ব্যবসায়ী গণেশ ওলটানো ব্যবসা করেন, কদিনের মধ্যেই তাঁরা দোকানপাট বন্ধ করে উধাও হয়ে যান।

গোবরে পদ্মফুল ফোটা (অকৃতীকুলে কৃতী সন্তানের জন্ম)—কুণ্ডু বাবুদের পরিবারের কেউ কোনোদিন লেখাপড়া শেখেনি, অথচ তাঁদের পরিবারের মোহন প্রথম হয়ে বৃত্তি পেয়েছে, এ-যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে দেখছি।

গোঁফখেজুরে (নিতান্ত অলস)—ষষ্ঠীচরণের গোঁফখেজুরে ছেলেটি কাজকর্ম করে না, দিনরাত শুয়ে থাকে।

গো বেচারা (নিরীহ)—প্রিয়লাল নিতান্তই গো-বেচারা লোক, তাঁকে মেরে গেলেও সে কথা কয় না।

গোঁয়ার-গোবিন্দ (কোপনস্বভাব হঠকারী ব্যক্তি)—গোঁয়ার গোবিন্দ বিলাসবিহারীকে রাসবিহারী অনেক বুঝিয়েও শান্ত রাখতে পারেন না।

গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা)—এতক্ষণ তো শুধু গৌরচন্দ্রিকা করলে, এবার আসল কথা বল।

ঘাটের মড়া (জরাজীর্ণ মুমূর্ষু ব্যক্তি)—আগে অনেক কুলীন পিতা ঘাটের মড়ার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হতেন।

ঘুণাক্ষরে (আভাস ইঙ্গিতে)—সতর্ক থেকো এ বিষয়টি ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ না জানতে পারে।

ঘরকুনো (ঘর আঁকড়ে থাকতে যে ভালবাসে)—সুধীরবাবু এমন ঘরকুনো লোক, দিনরাত ঘরে পড়ে থাকেন, কারুর সঙ্গে মেশেন না।

চক্ষুশূল (অপ্রিয়)—শ্রীরাধা জটিলা-কুটিলার চক্ষুশূল ছিলেন।

চোখের বালি (অপ্রিয়)—ননদিনী দেখয়ে চোখের বালি—চণ্ডীদাস।

চোখটাটান (অপরের সুখ সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হওয়া)—দিগম্বরীর স্বভাব এমন যে অপরের ভালো দেখলেই তার চোখ টাটায়।

চোখের মাথা খাওয়া (না দেখে, খেয়াল না ক'রে)—চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ, ঘরের কোণে বাটিটা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না।

চিনির বলদ (পরিশ্রমী কিন্তু ফলভোগী নয়)—যোগেশ সারা জীবন ধরে চিনির বলদের মত সংসারের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ালেন, কিন্তু সংসারে সুখ পেলেন না।

চোখে অন্ধকার দেখা (চারিদিকে শূন্য বোধ করা)—অল্পবয়সে বাবা মারা যাওয়াতে অতুল এখন চোখে অন্ধকার দেখছে।

চোখে ধুলো দেওয়া (ঠকানো)—মানুষ অপরের চোখে ধুলো দিতে পারে কিন্তু ভগবানের চোখে ধুলো দিতে পারে না।

চোখে সরষে ফুল দেখা (কাতর হওয়া)—সংসার চালাতে এখন সকলে চোখে সরষে ফুল দেখছে।

চুনোপুঁটি (নগণ্য লোক)—যতসব রাঘব বোয়াল বড় বড় অপরাধ করে পার পেয়ে যাচ্ছে, চুনোপুঁটিদের ধরে আর লাভ কি !

ছাইচাপা আগুন (যাহার শক্তি বাহিরে বুঝা যায় না) —ব্রজেশ্বরকে দেখে বেশ নিরীহ মনে হত, কিন্তু তার ভিতর ছিল ছাই চাপা আগুন, বিপ্লবের মধ্যে সে আগুন একদিন প্রকাশ পেল।

ছাই ফেলতে ভাঙ্গাকুলো (তুচ্ছ কাজে যাহার প্রয়োজন হয়)—স্বরেন বেকার বলেই সে এখন সংসারের ছাই ফেলতে ভাঙ্গাকুলো, সব কাজেই তার দরকার হয়।

জগাখিচুড়ি (বিচিত্র বস্তুর মিশ্রণ)—জিনিসপত্র সব জগাখিচুড়ি হয়ে আছে, গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

জড়-ভরত (নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়)—পর পর পুত্রের শোকে রামকান্তবাবু এখন যেন জড়ভরত হয়ে পড়েছেন, কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, কোথাও যান না।

জিলিপির প্যাঁচ (কুটিল, ঘোরালো লোক সম্পর্কে প্রযোজ্য)—স্বর্ণ মঞ্জরীর কথায় কথায় জিলিপির প্যাঁচ, কখনো সোজাভাবে সরল কথা বলতে পারে না।

টইটুম্বুর (কানায় কানায় পরিপূর্ণ)—সদানন্দ গোঁসাইয়ের অন্তরটি রসে একেবারে টইটম্বুর হয়ে আছে।

টনক নড়া (চৈতন্য হওয়া)—এতদিন পরে তার টনক নড়েছে, প্রকৃত অবস্থা সে বুঝতে পেরেছে।

টাকার কুমীর (মস্ত বড় ধনী)—কৃষ্ণধন সাহা গরীবী চালে থাকলে কি হয়, আসলে সে একটি টাকার কুমীর।

ঠোঁটকাটা (স্পষ্টবাদী)—চাটুজ্যে মশাই ঠোঁটকাটা লোক, সকলকে মুখের পরে যা তা বলে দেন।

ডানহাতের ব্যাপার (খাওয়া)—বিয়েবাড়িতে গিয়ে এখন আর কেউ বিয়ে দেখতে চায় না, সকলেই ডান হাতের ব্যাপার তাড়াতাড়ি সেরে নিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ডানে আনতে বাঁয়ে কুলায় না (খরচ কুলাইয়া উঠিতে না পারা)—এখন সকল সংসারের হয়েছে কি ডানে আনতে বাঁয়ে কুলায় না।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে স্বার্থসিদ্ধি করা)—এতদিনে বুঝলাম তুমি ডুবে ডুবে জল খেয়েচ, আমাকে না বলে যাওয়ার সব আয়োজন করেছ।

ডুমুরের ফুল—তুমি আসছ না, বাড়িতে গিয়েও তোমার দেখা পাওয়া যায় না, একেবারে ডুমুরের ফুল হয়েছ।

তছনছ করা (এলোমেলো করা, নষ্ট করা) বিয়ে বাড়িতে লোকজন এসে জিনিসপত্র সব তছনছ করেছে।

তালকানা (খেয়ালশূন্য) তুমি তালকানা নাকি, সামনেই তো বইখানা পড়ে রয়েছে, অথচ তোমার চোখে পড়ছে না।

তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী)—এই সোনার সংসার একদিন তাসের ঘরের মত ভেঙে যাবে, সবই সহ্য করতে হবে।

তীর্থের কাক (প্রত্যাশী ব্যক্তি)—লোকটি কখন থেকে তীর্থের কাকের মত মহাজনের কাছে বসে আছে কয়েকটি টাকা ধার নেবার জন্য।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার (বৃহৎ ব্যাপার)—পরেশবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তার বাড়িতে যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার শুরু হয়েছে, খাওয়া-দাওয়া হৈ-চৈ-এর আর অন্ত নেই।

দাঁও মারা (আত্মসাত করা)—উদ্বাস্তু তহবিল থেকে সম্পাদক মশাই বেশ একটা মোটা টাকা দাঁও মেরেছেন।

দা-কুমড়ো (শত্রুতার সম্পর্ক)—অফিসের দুই কেরাণীর মধ্যে যেন দা-কুমড়োর সম্পর্ক, দিনরাত মনোমালিন্য লেগেই আছে।

ধনুকভাঙা পণ (দৃঢ় সংকল্প)—দিবাকর ধনুকভাঙা পণ করেছে, সে কোনো দিন বিয়ে করবে না, দেশের কাজ করবে।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা (গর্বভরে সকলকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা)—দীপঙ্কর ক্ষমতা পেয়ে এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, কাউকে মানুষ বলেই মনে করে না।

ধামাধরা (খোসামোদ করা)—কোনো ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ধামা ধরতে না পারলে আজকাল চাকরী হয় না।

ননীর পুতুল (কষ্ট সহিতে অক্ষম ব্যক্তি)—একটু হাঁটতে গেলেই তোমার পায়ে ব্যথা হয়, একেবারে ননীর পুতুল দেখছি।

নেই-আঁকড়া (নাছোড় বান্দা)—নেই-আঁকড়া ছেলেটি কিছুতেই মায়ের পদ ছাড়ে না।

নেক-নজর (সুনজর)—হরিশ বড়সাহেবের নেক নজরে আছে, তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

পটল তোলা (মরা)—কৃপণ বুড়োটি ভুগে ভুগে এতদিন পরে পটল তুলেছে।

পাকা ধানে মই দেওয়া (অনিষ্ট করা)—আমি তোমার কি পাকা ধানে মই দিয়েছি যে, এভাবে আমার ক্ষতি করছ?

পরের মুখে ঝাল খাওয়া (পরের কথা মত চলা)—তিনি কখনও স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, কেবল পবের মুখে ঝাল খাওয়াই তাঁর অভ্যাস।

পায়াভারি (অহঙ্কারী)—উঁচুপদে গিযে এখন তার পায়াভারি হয়েছে, সহকর্মীদের সঙ্গে কথাই বলে না।

পুকুর চুরি—(বড় রকমের চুরি)—চাকরীতে ঢুকে এককড়ি এমন পুকুর চুরি শুরু করল যে কিছু দিনের মধ্যেই তার চাকরীটি গেল।

পুঁটি মাছের প্রাণ (ক্ষীণপ্রাণ)—বাঙালীর তো পুঁটিমাছের প্রাণ, এত আঘাত কি তার সহ্য হয়?

পেটে পেটে বুদ্ধি (দুষ্টবুদ্ধি) ধূর্ত লোকটির পেটে পেটে বুদ্ধি, সব সময়ে কোনো বদ উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পোয়াবারো (চরম লাভ)—ধানচালের যত অভাব বাড়বে অসাধু ব্যবসায়ীদের ততই পোয়াবারো হবে, বেশি দামে তারা তখন ধান চাল বিক্রী করতে পারবে।

বকধার্মিক } (ভণ্ড)—গোলোক চাটুজ্যে ফোঁটা তিলক কেটে
বিড়াল তপস্বী } পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকেন বটে কিন্তু আসলে তিনি একটি বকধার্মিক ছাড়া কিছুই নয়, কিসে কার ক্ষতি করা যায় সেই চিন্তাই সব সময় তাঁর মাথায়।

ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব)—যেদিন সে পাস করবে সেদিন ব্যাঙের সর্দি হবে।

ব্যাঙের আধুলি (সামান্য ধন লইয়া অহঙ্কার)—সামান্য ওই ক'কাঠা জমির আয়—ব্যাঙের আধুলি, তাই নিয়ে আবার গর্ব করে।

বিনা মেঘে বজ্রপাত (আকস্মিক বিপর্যয়)—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বাঙালীর জাতীয় জীবনে নেমে এসেছিল।

বিদুরের ক্ষুদ (শ্রদ্ধার সঙ্গে দেওয়া সামান্য দান)—বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য এই সামান্য টাকা আমার বিদুরের ক্ষুদ দিলাম।

বুকের পাটা—(সাহস) লোকটির বুকের পাটা আছে বলতে হয়, এত লোকের সঙ্গে একাই লড়াই ক'রে গেল।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো (ফাঁকি দেওয়া)—অনেক বাঙালী যুবক আগে ব্রহ্মদেশে গিয়ে বর্মী মেয়ে বিয়ে ক'রে তারপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাত।

ভরাডুবি (সর্বনাশ)—ব্যাঙ্ক ফেল পড়াতে তার সর্বস্ব গেল, সপরিবারে তার ভরাডুবি হ'ল।

ভুঁইফোঁড় (হঠাৎ উদ্ভূত হওয়া)—আজকাল অনেক ভুঁইফোঁড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে।

ভূতের বেগার খাটা (নিষ্ফল পরিশ্রম করা)—সারাজীবন সংসারে শুধু কেবল ভূতের বেগার খাটতে হয়, এর কোনো পুরস্কার নেই।

মগের মুলুক (অরাজক দেশ)—দিন দুপুরে ডাকাতি, দেশটা যে মগের মুলুক হয়ে গেল।

মাঠে মারা যাওয়া (ব্যর্থ হওয়া)—তার বক্তৃতা একেবারে মাঠে মারা গেল, নির্বাচনই এখন হবে না।

মাণিক জোড় (অভিন্নহৃদয় বন্ধু)—এই যে মাণিক-জোড় এলেন, একসঙ্গে দিনরাত কেবল ঘোরা হচ্ছে।

যমের অরুচি (যমও যাহাকে পছন্দ করেন না)—গুণ্ডা সর্দার ভাণ্ডয়ার অত্যাচারে সমস্ত লোক অতিষ্ঠ, যমেরও তার প্রতি অরুচি, তাই তার হাত থেকে যাব নিষ্কৃতি নেই।

রগচটা (রাগী)—অফিসের বড় সাহেব রগচটা লোক, তার কাছে যেতে কেউ সাহস করে না।

রাঘব বোয়াল (বড় বেশি লোভী যে)—লাইসেন্স আদায় করতে হলে এক একজন রাঘব বোয়ালের পিছনে যে কত টাকা খরচ করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই।

রাশভারী (গম্ভীর)—প্রধান শিক্ষক মশাই বেশ রাশভারী ব্যক্তি, সবাই তাকে সম্ভ্রম করে।

রাশটানা (সংযত হওয়া)—যে ভাবে খরচ করে চলেছ শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারলে হয়, এখন একটু রাশ টেনে চল।

রাঙা মুলা } অতনু দেখতে শুনতে বেশ; কিন্তু আসলে রাঙা মুলো,
মাকাল ফল } কোনো কাজের সার নেই।

লম্বা দেওয়া (পালান)—গতিক সুবিধা নয় দেখে লোকটি গোলমালের ভিতর থেকে লম্বা দিল।

লেজে খেলান (ঠকান, ফাঁকি দেওয়া)—তাকে খুব ভালো মানুষ ভাবছ, কিন্তু আসলে সে তোমাকে লেজে খেলাচ্ছে, একদিন তার মতলব টের পাবে।

লেজে গোবরে (বিপর্যস্ত হওয়া)—কমিটির অনেক রকম পরিকল্পনা তো ছিল, কিন্তু টাকার অভাবে সব লেজে গোবরে হয়ে গেছে।

শাঁখের করাত (উভয় সংকট)—চাকরী করতে গিয়ে দিনরাত অপমান সহ্য করছি, অথচ চাকরী ছাড়লে না খেয়ে মরতে হবে, আমার হয়েছে শাঁখের করাতের মত অবস্থা।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (গোপন রাখবার চেষ্টা)—শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না, তোমার অনুগ্রহপুষ্ট লোকটির সব কুকাজ আমরা জেনেছি।

শাপে বর (অনিষ্ট থেকে ইষ্ট হওয়া)—অবনীবাবুর চাকরী যাওয়াটা শাপে বর হয়েছে, কারণ চাকরী যাওয়ার পরই ব্যবসায়ে তার উন্নতি হয়েছে।

শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র ক্ষীণ অবলম্বন)—বিধবা মেয়েলোকটির আর কেউ নেই, শুধুমাত্র শিবরাত্রির সলতের মত কোলের ছেলেটি রয়েছে।

শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন সঙ্কট)—ছাত্রছাত্রীর এখন শিরে সংক্রান্তি কারণ পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে।

শ্মশান বৈরাগ্য (সাময়িক অনাসক্তি)—গুণধরবাবু বিরক্ত হয়ে নাকি বলছেন যে এবার নির্বাচনে দাঁড়াবেন না, কিন্তু এ হল তাঁর শ্মশান বৈরাগ্য, দেখো শেষ পর্যন্ত ঠিকই দাঁড়াবেন।

সাত খুন মাপ (সব অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া)—গ্রামের মোড়লটি অন্যান্য সকল ছেলের কঠিন শাস্তি বিধান করেন, কিন্তু তাঁর নিজের ছেলের সাত খুন মাপ।

সাত পাঁচ / **সাত সতেরো** } (ঘোর প্যাঁচ) — আমি অত সাত পাঁচ কিছু বুঝি না সরল ভাবে মনের কথা বলে ফেলি।

সাপে নেউলে (শত্রুতার সম্পর্ক)—দুই বন্ধুর মধ্যে এখন সাপে নেউলে সম্পর্ক হয়েছে, কেউ কারুর মুখ দেখে না।

সাপের পাঁচ পা দেখা (অহঙ্কার করা)—তিনকড়ি যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে, গর্বে মাটিতে তার পা পড়ে না।

সুখের পায়রা (চিন্তাভাবনাহীন সুখের জীবন যে যাপন করে)—হীরালাল বড়লোকের ছেলে, কোন কাজকর্ম নেই, সুখের পায়রার মত উড়ে উড়ে বেড়ায়।

সোনায় সোহাগা (শুভ সংযোগ)—ব্যবসায়ে রমেশের বুদ্ধি ছিল, ভবেশ অনেক টাকা নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল, এ যেন সোনায় সোহাগা হ'ল।

হাত ধরা (বশীভূত)—পাঁচকড়ি বড়লোক জমিদারের হাতধরা, দিনরাত মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছে।

হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা—(গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া)—দুই বন্ধুর রেষারেষির ফলে একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেছে, অনেক গোপন তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

হাঁড়ির হাল (অতিশয় দুরবস্থা)—এক এক করে গুরুচরণের তিনটি ছেলের মৃত্যু হল, তাঁর এখন হাঁড়ির হাল হয়েছে।

হাড় হাবাতে (নিরন্তর বিরক্তি উৎপাদনকারী)—কাজকর্ম করবে না, কেবল একটার পর একটা চাহিদা জানাবে, এই সকল হাড় হাবাতের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে পড়েছি।

হাতের পাঁচ (অবশিষ্ট)—মামলা মোকদ্দমায় সব নিঃশেষ হয়ে গেছে, কেবল হাতের পাঁচ স্বরূপ ব্যাঙ্কে হাজার খানেক টাকা পড়ে আছে।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (সুযোগ নষ্ট করা)—বিদেশ যাত্রার সুযোগ এল তুমি গেলে না, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিলে, এখন আফশোস করে আর লাভ কি।

হাতে মারা নয় ভাতে মারা (সোজাসুজি শত্রুতা না করে অন্য উপায়ে জব্দ করা)—ম্যানেজার গরীব শ্রমিকটির চাকরী খেতে না পেরে অন্য উপায়ে জব্দ করার চেষ্টা করেছেন, তিনি হাতে না মেরে এখন ভাতে মারছেন।

হাড়ে বাতাস লাগা (স্বস্তি বোধ করা)—সমাজবিরোধী লোকটির জেল হওয়াতে পাড়ার সকলের হাড়ে যেন বাতাস লেগেছে।

হাল ছেড়ে দেওয়া (হতাশ হওয়া)—পরীক্ষায় নকল রোধ করা সম্পর্কে সকলেই যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

হালে পানি না পাওয়া (সমর্থন না পাওয়া)—কয়েকটি দুর্বৃত্ত লোক গোলমাল বাধাবার জন্য অনেক গুজব ছড়াল, কিন্তু তারা হালে পানি পেল না, কেউ তাদের কথা শুনল না।

হাতে স্বর্গ পাওয়া (সৌভাগ্যলাভ করা)—ছেলে পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়াতে মা-বাবা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন।

হাতীর পাঁচ পা দেখা (অহঙ্কার করা)—প্রথম বিভাগে পাস করে সে যেন হাতীর পাঁচ পা দেখছে, অহঙ্কারে কারুর সঙ্গে কথাই বলে না।

হাড়ে দূর্বা গজানো (কুঁড়ের লক্ষণ)—বাজার থেকে আসতে হাড়ে দূর্বা গজিয়ে গেল দেখছি।

হাড়ভাঙ্গা (কঠোর)—হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে সনাতন বাবু অকালে বুড়ো হয়ে পড়েছেন।

হিতে বিপরীত (ভাল করিতে মন্দ)—মন দিয়ে পড়াশুনা করবে বলে শ্যামা চরণ বাবু ছেলেকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে আনলেন, কিন্তু এখন দেখছেন পড়াশুনাতে তার মন নেই, এ যে হিতে বিপরীত হল।

প্রবাদ-প্রবচন

মনের ভাব প্রকাশ করিবার সময় উক্তিকে জোরাল করিবার জন্য অনেক স্থলে বহুপ্রচলিত ও সর্বজনবিদিত বাক্য অথবা বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের বাক্য ও বাক্যাংশকে প্রবাদ বলে। প্রবাদের ব্যবহারের ফলে ভাষার মধ্যে তীক্ষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা আসে এবং শ্রোতাদের মনের উপর গভীরতর প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইতে অনেক প্রবাদের জন্ম হইয়াছে। কোনো অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য বার বার লোকজীবনে ব্যবহৃত হইলেই তাহা প্রবাদে পরিণত হয়। কোনো সামাজিক অথবা ঐতিহাসিক ঘটনা হইতেও বহু উক্তি বার বার ব্যবহারের ফলে প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। যে সব উক্তি সমাজের সকল লোকই জানে ও ব্যবহার করে সেগুলিই প্রবাদরূপে স্বীকৃত হইতে পারে। প্রবাদগুলির আকার নানা ধরণের হইতে পারে ; যথা, ১। কয়েকটি পদ-সমন্বিত বাক্যাংশ, ২। কয়েকটি পদ-সমন্বিত পূর্ণ বাক্য, ৩। ছড়াজাতীয় ছন্দোবদ্ধ দুই চরণের কবিতা। কোন কোন প্রবাদ আবার প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নীতি-উপদেশ বাক্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেগুলির মধ্য দিয়া নীতি অথবা ধর্মবিষয়ক তত্ত্বই ব্যক্ত হইয়া থাকে।

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট (বেশি লোভে ঠকিতে হয়)—দোকানে লাভ হচ্ছিল মন্দ নয়, কিন্তু বেশি লোভের ফলে জিনিসপত্রের দাম যেই বাড়তে থাকল অমনি বিক্রী কমে গেল, কথায় বলে না, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট, এও হয়েছে তাই।

অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি (অতিরিক্ত বুদ্ধি দেখাইতে গেলে ঠকিতে হয়) – তোমার অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি, তার উপরে টেক্কা মারতে গিয়েছিলে, এখন ঠকলে কেমন ?

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ (অতিরিক্ত ভক্তি দেখিলে কোন স্বার্থসিদ্ধি সম্পর্কে সংশয় জন্মে)—নটবর কয়েকদিন ধরে মহাজনের খুব গুণগান করছে—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, বোঝাই যাচ্ছে তার কিছু টাকার দরকার পড়েছে।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট (সকলেই কাজ করিতে গেলে সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ হয় না)—অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার ব্যাপার ঘটল ছাত্রদের বনভোজনে—সবাই রাঁধতে গেল ব'লে রান্না পণ্ড হ'ল।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম (আত্মরক্ষা করাই সকলের আগে বিধেয়) —আপনি বাঁচলে বাপের নাম, আগে হাঙ্গামা থেকে নিজেকে তো রক্ষা করি, পরে দেখা যাবে কে কোথায় আছে।

আপনার থাকার ঠাঁই নাই শঙ্করারে ডাকে (নিজের থাকার জায়গা নাই, আবার অপরকে থাকিতে আহ্বান করে)—গোপালের নিজের থাকবার জায়গা নেই, সে আবার দুলালকে তার কাছে শুতে বলেছে, কথায় বলে না, আপনার থাকার ঠাঁই নাই, শঙ্করারে ডাকে।

একমাঘে শীত যায় না (একবার কেহ হয়তো জব্দ করিয়াছে, কিন্তু বার বার সে জব্দ করিতে পারিবে না)—টাকার খুব দরকার পড়েছিল বলে তোমার কাছে টাকা চেয়েছিলুম, কিন্তু তুমি টাকা দিলে না—মনে রেখো এক মাঘে শীত যায় না, তোমারও টাকার দরকার হবে।

এক ঢিলে দুই পাখী মারা (একসঙ্গে উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা)— রাসবিহারী এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চেয়েছিল, বিজয়ার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং বিজয়ার সম্পত্তিও হস্তগত করতে চেয়েছিল।

কনের ঘরের পিসী, বরের ঘরের মাসী (দুই বিরোধী পক্ষের হিতৈষী সাজা)—পাড়ার কাত্তমণি হল কনের ঘরের পিসী ও বরের ঘরের

মাসী, সে বড় তরফের কাছে ছোট তরফের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে এবং ছোট তরফের কাছে গিয়ে তাদের উস্কে দিচ্ছে।

কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ (কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ)—যুদ্ধের সময় কারও হয় পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ—চোরাকারবারীরা ফুলে ফেঁপে উঠে আর সাধারণ লোকের দুর্গতির অবধি থাকে না।

কালনেমির লঙ্কা ভাগ (কোন কিছু পাইবার আগেই সে-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ)—লটারীতে টাকা পেয়ে দু'ভাই কিভাবে তা খরচ করবে তা' নিয়ে গভীর আলোচনায় মেতে গেল, একেই বলে কালনেমির লঙ্কা ভাগ।

কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা—(এক শত্রু দিয়া অপর শত্রুর অনিষ্ট সাধন) –চাণক্যের নীতিই ছিল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, তাঁর এই নীতি খুব কার্যকরী হয়েছিল।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা (কষ্টের উপর কষ্ট দেওয়া)—কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটা দিয়ো না, একে ছেলেটি ফেল করে মনের কষ্টে আছে, তার পরে আর তাকে বাক্যযন্ত্রণা দিয়ো না।

কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরালে পাজী (স্বার্থসিদ্ধির পর বিরূপ হওয়া)—গরীব ছেলেটিকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে তারপর তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিল, একেই বলে কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরালে পাজী।

গোরু মেরে জুতো দান (বড় অন্যায় কাজ করিয়া পরে কোন ছোট ধরনের ভালো কাজ করা) —গোরু মেরে জুতো দান করে আর কি লাভ, আচ্ছা করে মেয়েটিকে মেরে এখন তার হাতে একটা লজেন্স দিচ্ছ!

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল (কেহ মানুক আর না মানুক, নিজেই মাতব্বর সাজা)—ওই যে বলে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সুবলের হয়েছে তাই, কেউ তাকে গ্রাহ্য করে না, আর সে গেল মাতব্বর সেজে গোলমাল মেটাতে।

গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল (আগে থাকিতে আশা করিয়া থাকা)—গুরুপদ বাবু আশা করিয়া আছেন কবে তাঁহার ছেলে চাকরী পাইয়া তাঁহাদের অভাব ঘুচাইবে, এ যেন গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল।

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না (কাছের লোক সম্মান পায় না)—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না—কথাটা খুবই ঠিক, জগদীশবাবু পাড়ার মধ্যে অতবড়

পণ্ডিত হয়েছেন, অথচ পাড়ার ছেলেরা তাঁকে সম্মান দেয় না, সভাপতি ধরে নিয়ে আসে অন্য পাড়া থেকে।

ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় (একবার বিপদের অভিজ্ঞতা থাকিলে বিপদের সম্ভাবনাতেই ভীত হইযা পড়ে)—জানো তো ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়, একবার ডাকাতদের হাতে পড়ে জীবন বিপন্ন হয়েছিল, তাই ডাকাতের কথা শুনলেই আঁতকে উঠি!

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান (অকারণে পরের জন্য বেগার খাটা) —ধরণীর আর তো কোনো কাজ নেই তাই সে ঘরের খেযে বনের মোষ তাড়ায়, পরের কাজ ক'রে দিনরাত সময় কাটায়।

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি (এখনও প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই বলিয়া শাসানি)—তুমি ঘুঘু দেখেছ এখনও ফাঁদ দেখনি, এতদিন লোকে তোমার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে নি, কিন্তু আমি তোমাকে দেখে নেব।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই (একই শ্রেণীর মন্দ লোকের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব) চোরে চোরে মাসতুতো ভাই এ তো জানা কথা, তুমি নকল করেছ তাই যারা নকল করেছে তাদের তুমি সমর্থন করছ।

চোরের উপর বাটপাড়ি (এক দুষ্ট লোকের অপর দুষ্ট লোকের দ্বারা জব্দ হওয়া)—চোরের উপর বাটপাড়ি দেখছি, দোকানদার ঠকিয়েছে সাধারণ ক্রেতাকে, কিন্তু দোকানদারকে আবার ঠকিয়েছে আড়তদার।

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী (মন্দ লোককে ভালো উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল)—মন্ত্রীরা চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলছেন, কিন্তু তারা তো শুনছে না, কারণ চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ (উভয় সঙ্কট)—বাবা অভিনয় করতে নিষেধ করেছেন, আবার বন্ধুবান্ধবরা শাসিয়েছে, অভিনয় না করলে দেখে নেবে—ধীরেশের অবস্থা কি রকম হয়েছে জান?—জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।

ঝড়ে বক মরে, ফকীরের কেরামত বাড়ে (দৈবাৎ কোন ঘটনা ঘটিলে তার জন্য কৃতিত্ব দাবী করা)—ছেলেটির অসুখ ভালো হ'য়ে গেল আর জ্যোতিষী দাবী করছেন তাঁর মাদুলি ধারণের ফলেই এটা হ'ল, একটা কথা আছে না—ঝড়ে বক মরে, ফকীরের কেরামত বাড়ে।

ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার (কোন অস্ত্র শস্ত্র নাই, অথচ বীরত্বের বড়াই করা)—তার ঢাল নেই তরোয়াল নেই অথচ নিধিরাম

সর্দারের মত ডাকাতদলের মোকাবিলা করতে যাওয়া যে কত বড় নির্বুদ্ধিতার ব্যাপার হয়েছে তা বলবার নয়।

ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় (অপরকে জব্দ করিতে গেলে নিজেকেই জব্দ হইতে হয়)—তোমার জানা উচিত ছিল ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়, ওই দুর্দান্ত লোকটির পিছনে লাগতে গিয়েছিলে, এখন আচ্ছা জব্দ হলে তো?

ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধান ভানে (কেহ কোন অবস্থাতেই নিজের স্বভাব বদলাতে পারে না)—হাজারীবাগে বেড়াতে এসেছ, এখানেও রাজনীতি করছ? লোকে মিথ্যা বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

দশের লাঠি একের বোঝা (মিলিত ভাবে যাহা করা সহজ, একা করিতে গেলে তাহাই কঠিন হইয়া পড়ে)—সকলে মিলে লাইব্রেরীটা বেশ সুশৃঙ্খলভাবে চালাচ্ছিলেন, এখন একা ভবদেববাবুর উপরে সেই দায়িত্ব পড়েছে তাই তিনি হিমসিম খাচ্ছেন, কথায় বলে দশের লাঠি একের বোঝা।

দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ (সকলে এক সঙ্গে কাজ করিলে সিদ্ধি লাভ না করিলেও লজ্জা নাই)—স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্ররা একসঙ্গে রাস্তাটা তৈরী করার কাজে লেগেছেন, কাজটা শেষ না করতে পারলেও তাদের কোনো অগৌরব নেই, কারণ কথায় বলে, দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

দিনে দুপুরে ডাকাতি (প্রকাশ্য ভাবে অন্যায় আচরণ করা)—এ যে দেখছি দিনে দুপুরে ডাকাতি, আমার পকেট থেকে কেড়ে কুড়ে সব নিয়ে নিলে!

ধান ভানতে শিবের গীত (অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা)—বইখানিতে লেখক ধান ভানতে শিবের গীত গেয়েছেন, সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে কেবল ইতিহাসের আলোচনাই করেছেন।

নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা (কাজ করিতে ব্যর্থ হইয়া কাজের সরঞ্জামের প্রতি দোষারোপ করা)—লোকে যে বলে নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা, গান গাইতে পার না, এখন দোষ দিচ্ছ, হারমোনিয়াম খারাপ।

নিজের পায়ে কুড়ুল মারা (নিজের ক্ষতি করা)—ধনপতিবাবু ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছেন, এখন ছেলে আর দেশে ফিরে আসতে চাইছে না।

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো (কিছু না থাকার চেয়ে স্বল্প কিছু থাকাও ভালো)—একেবারে বসে থাকার চেয়ে টিউশানী করাও ভালো, কথায় যে বলে, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

পেটে খেলে পিঠে সয় (কিছু পাইলে অপমানও সহ্য করা যায়)—বিপদে আপদে তিনি অনেক সাহায্য করেন, তাই তাঁর বকুনিগুলো সহ্য করি। সকলেরই জানা আছে—পেটে খেলে পিঠে সয়।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় (অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ প্রায়শ্চিত্তে খরচ হইয়া যায়) শ্যামলালবাবুর পাপের ধন সব প্রায়শ্চিত্তে গেল, ঘুষ খেয়ে অনেক টাকা করেছিলেন, কিন্তু এখন মোকদ্দমার পিছনেই সব খরচ হয়ে গেল।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো (সামান্য খরচে কৃপণতা, অথচ বেশি খরচ রোধ করিতে পারেন না)—রামধনবাবুর বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো, চাইলে একটি পয়সা দেবেন না, অথচ সকলেই তাঁর টাকা মারছে।

বয়সের গাছপাথর নেই (অধিকবয়স্ক)—দুর্গাপদবাবুর বয়সের গাছ-পাথর নেই, অথচ তিনি বলেন, তাঁর এমন কি বয়স হয়েছে।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় (বড়র চেয়ে ছোটর বেশি তেজ)—এ যে দেখছি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, বাবা চুপ করে আছেন, কিন্তু ছেলের তড়পানির অন্ত নেই।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা (মন্দ লোকের পাল্লায় পড়িলে কিছু না কিছু ক্ষতি হইবেই)—কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, মণ্টু অসৎ সংসর্গে পড়েছে, এখন তার চরিত্র নির্মল রাখাই কঠিন হবে।

বাপ-কা বেটা সিপাইকা ঘোড়া (পিতার দোষগুণ পুত্র পাইয়া থাকে) —মহীরাবণের পুত্র অহীরাবণ,—যেন বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া—মায়ের পেট থেকে বেরিয়েই যুদ্ধ করতে লাগল।

বামন হয়ে চাঁদে হাত (ছোট হওয়া সত্ত্বেও বড়র সঙ্গে মিত্রতার আশা) —ছায়া বামন হয়ে চাঁদে হাত দিয়েছিল—পার্বত্যকন্যা হয়েও সে চন্দ্রগুপ্তকে ভালোবেসেছিল।

বিনা মেঘে বজ্রপাত (আকস্মিক বিপর্যয়)—পাকিস্তানের আক্রমণ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই বহু ভারতবাসীর মনে হয়েছিল।

বোঝার উপরে শাকের আঁটি (অনেক ভারের উপর আর একটি ভার

চাপান)—করভারে পীড়িত জনগণের উপরে এই বাড়তি করটি যেন বোঝার উপরে শাকের আঁটি।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না (অনেকের উপরে দায়িত্ব থাকিলে কোন দায়িত্বই ভালো করিয়া পালন করা হয় না)—কথায় বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না, বিদ্যালয়ে এত ছাত্র, কিন্তু সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জনের সময় কোনো ছাত্র পাওয়া যায় না।

মরা হাতী লাখ টাকা (কাজের লোক বৃদ্ধ হইলেও অনেকখানি কার্যক্ষম থাকে)—আরে জানিস, মরা হাতী লাখ টাকা, বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো যা কাজ করতে পারি, তোরা দশটা মিলেও তা পারবি না।

মড়ার ওপর খাড়ার ঘা (দুর্বলের উপর অত্যাচার)—মরেই তো আছি, আর মরার ওপর খাড়ার ঘা দিচ্ছ কেন, বাক্যযন্ত্রণা একটু থামাও।

মশা মারতে কামান দাগা (সামান্য ব্যাপারের প্রতিকার করিতে বৃহৎ আয়োজন)—তুমি যে মশা মারতে কামান দেগেছ দেখছি, সামান্য অসুখের জন্য ডাঃ অমিয় মুখার্জীকে ডেকে এনেছ!

মুখে মধু পেটে বিষ (মুখে মিষ্টি অথচ ভিতরে ভিতরে ক্রূর)—জগমণির মুখে মধু পেটে বিষ, তার সম্পর্কে সতর্ক থেকো।

যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই- তোমার বাড়িতে কাজ আর আমি খেটে মরি, কথায় বলে যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।

যারে দেখতে নারি তার চরণ বাঁকা (যাহাকে অপছন্দ হয় তাহার কথা ও আচরণ বিরক্তিকর বোধ হয়)—ওই যে বলে না—যারে দেখতে নারি তার চরণ বাঁকা—আমাকে দেখতে পার না তাই আমার প্রতি কথাতেই খুঁত ধর।

যার শিল তার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া (যাহার কাছ হইতে উপকার পাওয়া যায় তাহারই ক্ষতি করা)—সুশীলবাবু যে অনাথ ছেলেটিকে বাড়ি এনে মানুষ করেছিলেন সেই এখন তাঁর নিন্দা করে বেড়ায়, তাই তো লোকে বলে—যার শিল তার নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর (উপকৃত ব্যক্তির উপকারীকে নিন্দা করা)—যা অন্যায় করেছি তা তো তোমার জন্যই করেছি, এখন তুমিই আমার নিন্দা করছ,—এ দেখছি যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।

যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দৈ (একজনের উপার্জিত সম্পদ অন্য জনে ভোগ করে)—মোহিতবাবু অনেক টাকা রেখে মারা গেলেন, এখন তাঁর জ্ঞাতিকুটুম্বরা সেই টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। লোকে যে বলে তা সত্যি—যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দৈ।

যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন (দুই বস্তুর মধ্যে সামান্য পার্থক্য বিবেচ্য নহে)—সব জিনিসের দামই আগুনের মত, আর সাবানের দাম বাড়ালেই বা কি—ওই যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।

সে সয় সে রয় (যে সহ্য করে সেই লোকের মনে বাঁচিয়া থাকে)—যে সয় সে রয় এটা অতি সত্য কথা, যাঁরা আদর্শের জন্য লাঞ্ছনা-অত্যাচার সহ্য করেছেন তাঁরাই অমর হয়েছেন।

যেমন কুকুর তার তেমন মুগুর (বড় অপরাধের জন্য বড় শাস্তি বিধানই প্রয়োজন)—যেমন কুকুর তার তেমন মুগুর হওয়া দরকার, যারা অপরের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাদের শাস্তিও কঠোর হওয়া প্রয়োজন।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন (সকল রকম খরচই এই বিশেষ জায়গা হইতে নির্বাহ হইবে)—যত সব বড় বড় পরিকল্পনার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, কারুর কোন ভাবনা নেই, যত টাকা লাগে দেবে গৌরী সেন।

সস্তার তিন অবস্থা (সুলভ মূল্যে কেনা জিনিস প্রায়ই খারাপ হয়)—কম দামের বাজে সিল্কের শাড়ি কিনেছ, একবার ধোয়ার পরেই নষ্ট হ'য়ে গেছে, সস্তার তিন অবস্থা আর কি!

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে
জহুরী জহর চেনে } (সম শ্রেণীর লোকই সেই শ্রেণীর লোককে বুঝিতে পারে)—প্রলয়ের বাবা ছেলেকে ভালো করবার জন্যে অন্য পাড়ায় নিয়ে গেলেন, কিন্তু সেখানেও বদ্ ছেলেরা তাকে ঠিক চিনে নিল, সত্যিই জহুরী জহর চেনে।

স্বভাব যায় না মলে ইজ্জৎ যায় না ধুলে (স্বভাবের কখনও পরিবর্তন হয় না) ছেলেটির একটু হাতটানের স্বভাব রয়েছে, কত বোঝানো হল, কিছুতেই স্বভাবের পরিবর্তন হ'ল না, কথায় বলে—স্বভাব যায় না মলে ইজ্জৎ যায় না ধুলে।

সুখে থাকতে ভূতে কিলায় (অকারণে সুখের জীবন থেকে অস্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের মধ্যে যাওয়া)—বাড়িতে ছিলাম ভালো, বাইরে এসে একগাদা টাকা খরচ, অসুখ-বিসুখ, একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

স্রোতের মুখে বালির বাঁধ (প্রবল বিপদের বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিরোধ)—বিদ্যালয়টি নিদারুণ অর্থসঙ্কটের মধ্যে পড়েছে, জনসাধারণের দেওয়া সামান্য চাঁদা তার পক্ষে স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতই।

হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল (শক্তিমানের অসাধ্য কাজ করিতে দুর্বলের স্পর্ধা) ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ গেলেন এখন শল্য হলেন সেনাপতি, ওই যে লোকে বলে, হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।

অন্যান্য ভাষা অথবা সংস্কৃতি হইতে গৃহীত প্রবাদ

অন্যান্য ভাষা এবং বিদেশ হইতে আগত জাতিদের সমাজ ও সংস্কৃতি হইতেও অনেক প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমানী রীতিনীতি হইতে অনেক প্রবাদ জন্ম লাভ করিয়াছে, যথা—

ক। **বিসমিল্লায় গলদ** (গুরুতেই ভুল)। **মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত** (সীমাবদ্ধ ক্ষমতা)। **মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী** (মরা-বাঁচা উভয় ক্ষেত্রেই সম্মানলাভ)।

খ। ইংরেজী ভাষা হইতে অবিকল অনুবাদ করিয়া অনেক প্রবাদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। যথা, **শীতল জল নিক্ষেপ করা** (নিরুৎসাহ করা)।

চক চক করলেই সোনা হয় না (বাইরে মূল্যবান মনে হলেও আসলে মূল্যবান নয়)। **রূপোর চামচ মুখে নিয়ে পৃথিবীতে আসা** (ধনীর ঘরে জন্ম লাভ করা)।

গ। সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক উক্তি বাংলাভাষায় প্রবাদ রূপে গৃহীত হইয়াছে। যথা—

অতি দর্পে হতা লঙ্কা (অহঙ্কারই পতনের মূল)। **অভ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ** (পরিণাম না ভাবিয়া কাজ করা)। **অধিকন্তু ন দোষায়** (অধিক হইলে দোষের নয়)। **অন্নচিন্তা চমৎকারা** (অন্নচিন্তায় কোন গুণের বিকাশ হয় না)। **অমৃতং বালভাষিতং** (শিশুর কথা মধুর)। **অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী** (সামান্য বিদ্যা ক্ষতিকর)। **আতুরে নিয়মো নাস্তি** (অশক্ত লোকের পক্ষে নিয়ম প্রযোজ্য নহে)। **ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট** (একূল ওকূল দুকূল পণ্ড হওয়া)। **কণ্টকেনৈব কণ্টকম্** (কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা)। **কা কস্য পরিবেদনা** (কে কার জন্য ভাবে?)। **কালস্য কুটিল গতি** (কালের গতি বিচিত্র)। **কীর্তির্যস্য স জীবতি** (কীর্তিমানই অমর)। **গতস্য**

শোচনা নাস্তি (যাহা গত হইয়াছে তাহার জন্য শোক করিয়া লাভ নাই)। **ন যযৌ ন তস্থৌ** (যাইতে পারে না, থাকিতেও পারে না)

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে (অদৃষ্টের ফল কেহ খণ্ডাইতে পারে না)। **প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ** (শেষপর্যন্ত প্রহারই একমাত্র ঔষধ)। **বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া** (অধিক আস্ফালনে অল্প কাজ)। **ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র** (ভাগ্যই শেষ পর্যন্ত সর্বত্র ফলে)। **ভিন্নরুচির্হি লোকঃ** (লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার)। **মধুরেণ সমাপয়েৎ** (মধুর বস্তুতে শেষ করা উচিত)। **মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ** (সাধারণ লোক চায় শুধু মিষ্টান্ন)। **মুনীনাঞ্চমতিভ্রমঃ** (মুনিদিগেরও মতিভ্রম হয়)। **যঃ পলায়তি স জীবতি** (যে পলায়ন করে সেই বাঁচিয়া যায়)। **শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ** (শঠ ব্যক্তির সঙ্গে শঠতাই আচরণীয়)। **শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্** (শুভ কাজ শীঘ্র এবং অশুভ কাজ বিলম্বে করা উচিত)। **সর্বং অত্যন্ত গর্হিতম** (অতিরিক্ত কিছুই ভালো নহে)। **হংসমধ্যে বকো যথা** (সুন্দর ব্যক্তিদের মধ্যে একজন অসুন্দর)।

অনুশীলনী

১। শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ সম্পর্কে দশটি উদাহরণ দাও।

২। প্রবাদ কাহাকে বলে? প্রবাদ প্রয়োগে ভাষার শক্তি কিরূপ বৃদ্ধি পায় তাহা কয়েকটি উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

৩। নিম্নলিখিত প্রবচনগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর :

যে সয় সে রয়, বিনা মেঘে বজ্রপাত, মড়ার উপর খাড়ার ঘা, সন্তার তিন অবস্থা, পেটে খেলে পিঠে সয়, ধান ভানতে শিবের গীত, চোরের উপর বাটপাড়ি, কালনেমির লঙ্কাভাগ, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, মেও ধরে কে, তেলা মাথায় তেল ঢালা, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, যত দোষ নন্দ ঘোষ।

৪। অন্যান্য ভাষা হইতে গৃহীত কয়েকটি প্রবাদের নাম কর এবং তাহাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

বাক্য-প্রসারণ

বাক্যসম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এখন বাক্য-সম্প্রসারণের কয়েকটি নিয়ম সাধারণভাবে আলোচিত হইতেছে। নিম্নলিখিত উপায়ে বাক্যসম্প্রসারণ হইতে পারে :

ক। সমাসবদ্ধ শব্দগুলি খণ্ড বাক্যে পরিণত করিয়া; যথা, বৃষস্কন্ধ—বৃষের ন্যায় স্কন্ধ যাহার, পুণ্ডরীকাক্ষ—পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি যাহার, অকর্মা—কর্ম নাই যাহার, নির্বোধ—বোধ নাই যাহার, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাহার, পীতাম্বর—পীত অম্বর যাহার, পা-চাটা—পা চাটে যে, গাসহা—গা সহে যাহা, হাতধরা—হাত ধরিয়া আছে যে।

খ। কৃদন্ত পদ খণ্ডবাক্যে পরিণত করিয়া; যথা, ইন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রকে জয় করিয়াছেন যিনি, জয় করিতে যিনি ইচ্ছুক—জিগীষু, জলদ—জল দান যে করে, কুম্ভকার—কুম্ভ করে যে, গৃহস্থ—গৃহে যে থাকে, জলজ—জলে যাহা জাত হয়, পানীয়—যাহা পানের যোগ্য, দৃশ্যমান—যাহা দেখা যাইতেছে, শয়ান—যিনি শুইয়া আছেন, কৃত—যাহা করা হইয়াছে, মৃত—যে মরিয়া গিয়াছে, ভক্ষ্য—যাহা ভক্ষণ করা যায়, গম্য—যেখানে গমন করা যায়।

গ। তদ্ধিতান্ত পদ খণ্ড বাক্যে পরিণত করিয়া; যথা, খেলোয়াড়—যে খেলায় আসক্ত, ভাঙ্গড়—যে ভাঙ্গে আসক্ত, নিদ্রালু—নিদ্রার ভাব আছে যাহার, দেশীয়—দেশে যাহা জাত, শ্রীমান্—শ্রী আছে যাহার, দয়াবান্—দয়া আছে যাহার, মুখর—মুখ আছে যাহার, আফিমখোর—আফিম খায় যে, গুলিখোর—গুলি খায় যে।

ঘ। উপসর্গযুক্ত পদকে খণ্ড বাক্যে পরিণত করিয়া; যথা, অবলা—যাহা বলা হয় নাই, আলুনি—লবণ (লুন) নাই যাহাতে, না-টক—যাহা টক নয়, হাঘরে—ঘর নাই যাহার, গরহাজির—হাজির নয় যে, সজাগ—যে জাগিয়া আছে, আহৃত—যাহা আহরণ করিয়া আনা হইয়াছে, উদ্ধৃত—যাহা উদ্ধার করা হইয়াছে, আগত—যাহা আসিয়াছে, দুর্গম—যেখানে গমন করা কষ্টকর, দুঃসাধ্য—যাহা সাধন করা কষ্টকর।

বহু পদের এক পদে পরিণতি

মিলের অভাব—অমিল, গরমিল
জ্ঞানের অভাব—অজ্ঞান
ধর্মের অভাব—অধর্ম
সুখের অভাব—অসুখ
ঔচিত্যের অভাব—অনৌচিত্য
ভয়ের অভাব—অভয়, নির্ভয়
যাহা পূর্বে হয় নাই—অভূতপূর্ব
যাহা পূর্বে দেখা যায় নাই—অদৃষ্টপূর্ব
যাহা পূর্বে শোনা যায় না—অশ্রুতপূর্ব
পূর্বে যাহা চিন্তা করা হয় নাই—অচিন্তিতপূর্ব
যাহা কাচা হয় নাই—আকাচা
যাহা ভাঙ্গা হয় নাই—আভাঙ্গা
যাহা দেখা হয় না—না-দেখা
যাহা বলা হয় নাই—অ-বলা
যাহা ঠিক নয়—বেঠিক
যাহা মঞ্জুর হয় নাই—নামঞ্জুর
যে হাজির হয় নাই—গরহাজির
যে রসিক নয়—বেরসিক
যে হিসাবী নয়—বেহিসাবী
যাহা লঙ্ঘন করা যায় না—অলঙ্ঘ্য
যাহা পান করা যায় না—অপেয়
যেখানে গমন করা যায় না—অগম্য
যাহা সাধন করা যায় না—অসাধ্য
যাহা লাভ করা যায় না—অলভ্য
যাহা পাওয়া যায় না—অপ্রাপ্য
যাহা বোঝা যায় না—অবোধ্য
যাহা শোনা যায় না—অশ্রাব্য
যাহা দেখা যায় না—অদৃশ্য

যাহা প্রতিরোধ করা যায় না—অপ্রতিরোধ্য
যাহা নিবারণ করা যায় না—অনিবার্য, অনিবার
যাহা শোধ করা যায় না—অশোধ্য
যাহা করা কষ্টকর—দুষ্কর
যাহা দমন করা কষ্টকর—দুর্দম
যাহা দমন করা যায় না—অদম্য
যাহা বহন করা কষ্টকর—দুর্বহ
যাহা উত্তীর্ণ হওয়া কষ্টকর—দুস্তর
যাহা চলে না—অচল, নিশ্চল
যাহা বলা যায় না—অবাচ্য, অবচনীয়, অনির্বচনীয়
যাহা নিন্দা করা যায় না—অনিন্দ্য, অনিন্দনীয়
যাহার সীমা নাই—অসীম
যাহার অন্ত নাই—অনন্ত
রূপে যাহাকে ধরা যায় না—অরূপ
যাহার পরিবর্তন নাই—অব্যয়, অপরিবর্তনীয়
যাহার তল নাই—অতল
যাহাকে শাসন করা কষ্টকর—দুঃশাসন
যাহা উচ্চারণ করা কষ্টকর—দুরুচ্চার্য
সমান উদর যাহার—সহোদর, সোদর
সুন্দর মুখ যাহার সেই নারী—সুমুখী
যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন—জিতেন্দ্রিয়
পুত্রের সহিত বর্তমান—সপুত্র, সপুত্রক
বান্ধবের সহিত বর্তমান—সবান্ধব

সমান গোত্র যাহার—সগোত্র
সমান তীর্থ যাহার—সতীর্থ
বীত (বিগত) স্পৃহা যাহার—বীতস্পৃহ
শঙ্কার সহিত বর্তমান—সশঙ্ক
হিংসার সহিত বর্তমান—সহিংস
দয়ার সহিত বর্তমান—সদয়
ছিন্ন শাখা যাহার—ছিন্নশাখ
স্থির প্রজ্ঞা যাহার—স্থিরপ্রজ্ঞ
বহুপত্নী যাহার—বহুপত্নীক
মূর্খ ভ্রাতা যাহার—মূর্খভ্রাতৃকা
নদীমাতা যাহার—নদীমাতৃক
প্রবাসী ভর্তা যাহার—প্রোষিতভর্তৃকা
মৃত ভর্তা যাহার—মৃতভর্তৃকা
বিগতা পত্নী যাহার—বিপত্নীক
যুবতী জায়া যাহার—যুবজানি
প্রিয় জায়া যাহার—প্রিয়জানি
সমান ধর্ম যাহার—সমানধর্মা
শোভন ধর্ম যাহাতে—সুধর্মা
সুন্দর গন্ধ যাহার—সুগন্ধি
বরার (বরাহের) মত খুর যাহার—বরাখুরে
উদগত বাহু যাহার—উদ্বাহু
নাই সাড়া যাহাতে—নিঃসাড়, নিসাড়
নাই রাজা যে দেশে—অরাজক
পদ্ম নাভিতে যাহার—পদ্মনাভ
ঊর্ণা নাভিতে যাহার—ঊর্ণনাভ
কূলের সমীপে—উপকূল
অক্ষির সম্মুখে—প্রত্যক্ষ
শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া—যথাশক্তি
বিধিকে অতিক্রম না করিয়া—যথাবিধি
রীতিকে অতিক্রম না করিয়া—যথারীতি
কর্ণ পর্যন্ত—আকর্ণ
বাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই—আবালবৃদ্ধবনিতা
কূলের যোগ্য—অনুকূল
রূপের যোগ্য—অনুরূপ
বিঘ্নের অভাব—নির্বিঘ্ন
ভিক্ষার অভাব—দুর্ভিক্ষ
আশীতে (দন্তে) বিষ যাহার—আশীবিষ
গাণ্ডীব ধনু যাহার—গাণ্ডীবধন্বা
পুষ্প ধনু যাহার—পুষ্পধন্বা
হায়া নাই যাহার—বেহায়া
পঞ্চবটের সমাহার—পঞ্চবটী
তিন পদের সমাহার—ত্রিপদী
বনের পতি—বনস্পতি
প্রিয় বলে যে—প্রিয়ংবদা (স্ত্রীলিঙ্গ)
ত্বরায় গমন করে যে—তুরগ, তুরঙ্গ।
ধুর (ভার) ধারণ করে যে—ধুরন্ধর
শত্রুকে হনন করে যে—শত্রুঘ্ন
নিজেকে পণ্ডিত মনে করে যে—পণ্ডিতম্মন্য
জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা
হননের ইচ্ছা—জিঘাংসা
লাভের ইচ্ছা—লিপ্সা
অনুসন্ধানের ইচ্ছা—অনুসন্ধিৎসা
পান করিবার ইচ্ছা—পিপাসা
অনুকরণ করিবার ইচ্ছা—অনুচিকীর্ষা
পুনঃ পুনঃ যাহা দুলিতেছে—দোদুল্যমান

পাণ্ডুর পুত্র—পাণ্ডব
বসুদেবের পুত্র—বাসুদেব
যদুর পুত্র—যাদব
কুরুর পুত্র—কৌরব
চণকের পুত্র—চাণক্য
দিতির পুত্র—দৈত্য
অদিতির পুত্র—আদিত্য
কুন্তীর পুত্র—কৌন্তেয়
গঙ্গার পুত্র—গাঙ্গেয়
কৃত্তিকার পুত্র—কার্তিকেয়
শিবের ভক্ত—শৈব
বিষ্ণুর ভক্ত—বৈষ্ণব
শক্তির ভক্ত—শাক্ত
ন্যায় জানেন যিনি—নৈয়ায়িক
দ্বীপে জাত—দ্বৈপায়ন
যে তীর নিক্ষেপ করে—তীরন্দাজ
যে গাড়ী চালায়—গাড়োয়ান
যে ভূমির উৎপাদন শক্তি নাই—অনুর্বর
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে না যে—অবিমৃশ্যকারী
অতিশয় শীতও নয় উষ্ণও নয়—নাতিশীতোষ্ণ
অল্প কথা বলে যে—অল্পভাষী
অপত্য হইতে বিশেষ না করিয়া—অপত্যনির্বিশেষে
অন্য বিষয়ে মন যাহার—অন্যমনস্ক
আকাশে উড়িয়া বেড়ায় যে—খেচর
আপনাকে কৃতার্থ মনে করে যে—কৃতার্থম্মন্য
আমার তুল্য—মাদৃশ
উপায় নাই যাহার—নিরুপায়
যাহার শত্রু হয় নাই—অজাতশত্রু
একই সময়ে বর্তমান—সমসাময়িক

কোন স্থান হইতে ভয় নাই যাহার—অকুতোভয়
কি কর্তব্য তাহা ঠিক করিতে পারিতেছে না যে—কিংকর্তব্যবিমূঢ়
কোন্‌টা দিক্ কোন্‌টা বিদিক্ এই জ্ঞান নাই যাহার—দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য
জানু পর্যন্ত লম্বমান—আজানুলম্বিত
জন্ম হইতে—আজন্ম
দর্শন জানেন যিনি—দার্শনিক
দূর দেখে যে—দূরদর্শী
নৌকা চালায় যে—নাবিক
পরের শ্রী দেখিয়া যে কাতর হয়—পরশ্রীকাতর
পরের মুখ চাহিয়া থাকে যে—পরমুখাপেক্ষী
বাস্তু হইতে উৎখাত হইয়াছে যে—উদ্বাস্তু
মর্মে পীড়া দেয় যাহা—মর্মন্তুদ
মাটির তৈয়ারী—মৃন্ময়
যে নারী সূর্য দেখে নাই—অসূর্যম্পশ্যা
যাহা অবশ্য হইবে—অবশ্যম্ভাবী
ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায়—ওষধি
যে বাঁচিয়া থাকিয়াও মৃতের ন্যায়—জীবন্মৃত
সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত—আসমুদ্রহিমাচল
যাহার মমতা নাই—নির্মম
যাহা পরিমাণ করা যায় না—অপরিমেয়
সুমিত্রার পুত্র—সৌমিত্রি
যে দ্বার রক্ষার জন্য নিযুক্ত—দৌবারিক
পদপ্রক্ষালনের জন্য জল—পাদ্য
বিশ্বজনের নিমিত্ত হিত—বিশ্বজনীন

যিনি ব্রহ্মের উপাসনা করেন—ব্রাহ্ম
চক্ষুর দ্বারা নিষ্পন্ন—চাক্ষুষ
ইহার তুল্য—ঈদৃশ
যিনি পরলোক আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন—আস্তিক
যাহা নষ্ট হয়—নশ্বর
যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়—ভঙ্গুর
আকাশে গমন করে যে—বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম
যাহা চিবাইয়া খাওয়া যায়—চর্ব্য
যাহা লেহন করিয়া খাওয়া যায়—লেহ্য
যাহা চুষিয়া খাওয়া যায়—চোষ্য
যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন—লব্ধপ্রতিষ্ঠ
কেবল এক বিষয়ে চিত্ত যাহার—একাগ্রচিত্ত
কুলশীল যাহার অজ্ঞাত রহিয়াছে—অজ্ঞাতকুলশীল
পুরুষের মধ্যে উত্তম—পুরুষোত্তম
নার (জল) অয়ন যাঁহার—নারায়ণ
জল ওক (আশ্রয়) যাহার—জলৌকা
বৃহৎ অরণ্য—অরণ্যানী
বিম্বের ন্যায় ওষ্ঠ যাহার—বিম্বোষ্ঠা, বিম্বোষ্ঠী
সেতারে দক্ষ—সেতারী
শান্তিপুরে উৎপন্ন—শান্তিপুরিয়া, শান্তিপুরে
ধন আছে যাহার—ধনী, ধনবান, ধনশালী
জ্ঞান আছে যাহার—জ্ঞানবান
বুদ্ধি আছে যাহার—বুদ্ধিমান
শাসন করে যে—শাস্তা
লইয়া যায় যে—নায়ক
বিধান করে যে—বিধায়ক
গঙ্গা ধারণ করেন যিনি—গঙ্গাধর
পূজার যোগ্য—পূজার্হ
পাপ হনন করে যে—পাপঘ্ন
গিরিতে শয়ন করেন যিনি—গিরিশ
অরিকে দমন করে যে—অরিন্দম
স্বয়ং পতি বরণ করে যে—স্বয়ংবরা
অন্য দেশ—দেশান্তর
অন্য গৃহ—গৃহান্তর
অন্যরূপ—রূপান্তর
প্রাপ্ত বয়স যাহার—প্রাপ্তবয়স্ক
মহান্ আশয় যাহার—মহাশয়
গো-র পদচিহ্নিত স্থান—গোষ্পদ
গতির অভাব—বেগতিক
অক্ষির সমীপ—সমক্ষ
পদের পশ্চাৎ—অনুপদ
আমিষের অভাব—নিরামিষ
বিচলিত মন যাহার—বিমনা
এক গোঁ যাহার—একগুঁয়ে
বধের যোগ্য—বধ্য
রাধার পুত্র—রাধেয়
অগ্নি সম্বন্ধীয়—আগ্নেয়
অলঙ্কারের ধ্বনি—শিঞ্জন
অশ্বের ধ্বনি—হ্রেষা
হস্তীর ধ্বনি—বৃংহণ, বৃংহিত
ভ্রমরের ধ্বনি—গুঞ্জন
কোকিলের ধ্বনি—কূজন
হরিণের চর্ম—অজিন
ব্যাঘ্র চর্ম—কৃত্তি
ব্যাঘ্রচর্ম বাস (বসন) যাহার—কৃত্তিবাস

অশুদ্ধি-সংশোধন

১। বর্ণশুদ্ধি

ক। ই, ঈ ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধিন	অধীন	অতিত	অতীত
বিণা	বীণা	নীরিহ	নিরীহ (নির্ + ঈহা)
নবিন	নবীন	রবী	রবি
রবিন্দ্র	রবীন্দ্র (রবি + ইন্দ্র)	প্রাচিন	প্রাচীন
রথি	রথী (রথিন্ শব্দের ১মা ১ বচন)	সারথী (রথী শব্দের সাদৃশ্যে ভুল)	সারথি
অতীথি	অতিথি	মনিষী	মনীষী (মনীষিন্ শব্দের ১মা ১ব, কিন্তু মনীষিগণ, মনীষিবৃন্দ)
মনিষা	মনীষা	মেধাবী	মেধাবী (মেধাবিন্ শব্দের ১মা ১ব, কিন্তু মেধাবিগণ, মেধাবিবৃন্দ)
প্রতিক্ষা	প্রতীক্ষা (প্রতি + ঈক্ষা)	কুটীল	কুটিল
জটীল	জটিল (জটা + ইল)	প্রহরি	প্রহরী (প্রহরিন শব্দের ১ মা ১ ব)
পীপিলিকা	পি	দীলিপ	দিলীপ
নিলীমা	নীলিমা (নীল + ইমা)	নাগরীক	নাগরিক
সমিচীন	সমীচীন		কৃতিত্ব
দধিচি	দধীচি	সুধি	সুধী
সুধিবৃন্দ	সুধীবৃন্দ (সুধিন্ শব্দ নহে—শোভনা ধী যাহার = সুধী)	কালীদাস	কালিদাস (দাস শব্দের আগে ঈ ই হয়, যথা—দেবিদাস। কিন্তু—কালীপদ কালিপদ নহে)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভাগিরথি	ভাগীরথী (ভাগীরথ+ঈ)	শারিরীক	শারীরিক (শরীর+ইক)
চিকীৎসা	চিকিৎসা	মরিচীকা	মরীচিকা
বাল্মিকী	বাল্মীকি	ইষৎ	ঈষৎ
পৃথীবি	পৃথিবী	নিশিথ	নিশীথ (কিন্তু নিশিত)
নিপিড়িত	নিপীড়িত (নি—পীড়িত)	কৃষিজীবি	কৃষিজীবী (জীবিন্ শব্দের ১মা ১ব)
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী (কিন্তু বুদ্ধিজীবিগণ)	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা (কিন্তু প্রতিযোগী)
বীভিষিকা	বিভীষিকা	দ্রবিভূত	দ্রবীভূত
সলীল	সলিল	নিরব	নীরব (নিঃ+রব)
নিরস	নীরস (নিঃ+রস)	নিরোগ	নীরোগ (নিঃ—রোগ)
দাশরথী (রথী শব্দের সাদৃশ্যে ভুল)	দাশরথি (দশরথ+ই)	বিকির্ণ	বিকীর্ণ
বিদির্ণ	বিদীর্ণ	উন্মিলিত	উন্মীলিত
নিমিলিত	নিমীলিত (নি—√মীল+ক্ত)		

খ। উ, ঊ ঘটিত অশুদ্ধি

মধুসুদন	মধুসূদন (মধু নামক দৈত্যকে সূদন করিয়াছিলেন যিনি)	কৌতুহল (কৌতুকের সাদৃশ্যে ভুল)	কৌতূহল
মুমুর্ষ	মুমূর্ষু	মুহুর্ত	মুহূর্ত
সুদুর	সুদূর (সু-দূর)	উদ্ভুত	উদ্ভূত (উৎ-ভূত কিন্তু অদ্ভুত)
বিদুষী	বিদূষী	বধু	বধূ (কিন্তু বঁধু)
মুর্খ	মূর্খ	দূর্গা	দুর্গা
পূণ্য	পুণ্য (কিন্তু পূর্ণ)	দূর্গ	দুর্গ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
রূপ	রূপ	নূতন	নূতন (কিন্তু নতুন, নোতুন)
নুপুর	নূপুর	ময়ুর	ময়ূর
অনুকুল	অনুকূল (অনু-কূল)	দুর্বা	দূর্বা
শম্ভু	শম্ভু	চক্ষুরোগ	চক্ষুরোগ (চক্ষুঃ + রোগ)
মুহুর্মুহু	মুহুর্মুহু	উর্ধ্ব	ঊর্ধ্ব
মুষিক	মূষিক	স্ফুরণ	স্ফুরণ (কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত)
দুষিত	দূষিত	শ্মশ্রু	শ্মশ্রু
শ্বশ্রু	শ্বশ্রূ		

গ। ঙ, ঞ ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শঞ্‌খ	শঙ্খ (ক বর্গের কোন বর্ণ ঐ বর্গের নাসিক্য বর্ণ ঙ-র সঙ্গে শুধু যুক্ত হইতে পারে)	সঞ্‌ঘ	সঙ্ঘ (পাশের নিয়ম)
বাঙ্‌ছা	বাঞ্ছা (চ বর্গের কোন বর্ণ ঐ বর্গের নাসিক্য বর্ণ-ঞ-র সঙ্গে শুধু যুক্ত হইতে পারে)	পুঙ্‌জ	পুঞ্জ
ঝঙ্‌ঝা	ঝঞ্ঝা (উপরের নিয়ম)		

ঘ। ঋ ঘটিত অশুদ্ধি :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ (ভ্রাতৃ + গণ)	শ্রোতামণ্ডলী	শ্রোতৃমণ্ডলী (তৃচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে অন্য কোন শব্দ থাকিলে তৃ হয়)
অভিনেতাবৃন্দ	অভিনেতৃবৃন্দ	পৈত্রিক	পৈতৃক

ঙ। ণ, ন ঘটিত অশুদ্ধি :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গননা	গণনা	শূণ্য	শূন্য
ফাল্গুণ	ফাল্গুন	সায়াহ্ন	সায়াহ্ন (অহ্ন—ণ)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ (র-এর পর ন-ণ)	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন (অহ্ন-ন)
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ (ন নহে ণ)	পরাহ্ন	পরাহ্ণ (ন নহে-ণ)
কল্যানী	কল্যাণী	ক্ষুন্ন	ক্ষুণ্ণ (ক্ষ-র পরে ণ)
ক্ষিন্ন	খিন্ন	পুন্য	পুণ্য
ফেণ	ফেন	বর্ণণা	বর্ণনা
দুর্ণাম	দুর্নাম	স্মরন	স্মরণ (র-এর পরে ণ)
	অঙ্গন	প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ (র-এর পর ক বর্গের বর্ণ থাকিলেও পরে ণ হয়)
প্রনয়	প্রণয়	রসায়ন	রসায়ন (রস+ অয়ন—অয়নে ন)
রামায়ন	রামায়ণ (র এর পরে প বর্গের কোন বর্ণ এবং য থাকিলে পরে ণ হয়)		
শিবায়ণ	শিবায়ন (আগে কোন র নাই, সেজন্য ন)		
মুর্ধণ্য	মূর্ধন্য	কারন	কারণ (র এর পরে ণ)
পরিনাম	পরিণাম (উপরের নিয়ম)		
মৃণ্ময়	মৃন্ময়	হিরন্ময়	হিরণ্ময়

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
চিণ্ময়	চিন্ময় (চিৎ + ময়)	করূণ (ক্রিয়াপদ)	করুন
		করুন (বিশেষণ)	করুণ
		ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ (র এর পরে য এবং ম আছে, সেজন্য ণ)
রূপায়ন	রূপায়ণ	সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ (অগ্র + হায়ণ)		
নিবারন	নিবারণ	প্রনয়ন	প্রণয়ন (র-এর পরে ণ)
নির্ণিমেষ	নির্নিমেষ	বানিজ্য	বাণিজ্য
বণিতা	বনিতা	সঙ্করমান	সঙ্করমাণ
বক্ষ্যমান	বক্ষ্যমাণ (ক্ষ-র পরে ম থাকিলেও পরের ন ণ হয়)		
কমলিণী	কমলিনী	অণু (পশ্চাৎ)	অনু
অনু (ক্ষুদ্রতম অংশ)	অণু	আনবিক	আণবিক

(চ) ট ও ঠ-ঘটিত অশুদ্ধি

ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ	যথেষ্ঠ	যথেষ্ট (যথা + ইষ্ট)
ইষ্টক	ইষ্টক	ঘঠিত	ঘটিত
হটাৎ	হঠাৎ	জ্যেষ্ট	জ্যেষ্ঠ
যষ্ঠি	যষ্টি	গোষ্টী	গোষ্ঠী
ষষ্টী	ষষ্ঠী	মুষ্ঠি	মুষ্টি
শ্রেষ্ট	শ্রেষ্ঠ	অম্বিষ্ঠ	অম্বিষ্ট
বলিষ্ট	বলিষ্ঠ (ইষ্ঠপ্রত্যয়)		

(ছ) ত ও থ ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
রোগগ্রস্থ	রোগগ্রস্ত	আশ্বস্থ	আশ্বস্ত
মধ্যস্ত	মধ্যস্থ	মুখস্ত	মুখস্থ (মুখ+স্থ)
কণ্ঠস্ত	কণ্ঠস্থ	ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত
গৃহস্ত	গৃহস্থ	মনস্ত	মনস্থ
মস্থিষ্ক	মস্তিষ্ক	অভ্যস্থ	অভ্যস্ত
প্রস্থর	প্রস্তর	পরাস্থ	পরাস্ত
সুস্ত	সুস্থ	বিশ্বস্থ	বিশ্বস্ত
ব্যস্থ	ব্যস্ত	অন্তরস্ত	অন্তরস্থ
সমস্থ	সমস্ত	অস্তি	অস্থি

জ। ড়, ঢ় ও র ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘড়	ঘর	ভারা	ভাড়া
তারাতারি	তাড়াতাড়ি	দৃড়	দৃঢ়
বারি	বাড়ি	বরাই	বড়াই
হাঁরি	হাঁড়ি	কাপর	কাপড়
গড়ুর	গরুড়	মাকরসা	মাকড়সা
বড়াকর	বরাকর	তারকা (রাক্ষসী)	তাড়কা
তাড়কা (নক্ষত্র)	তারকা	তাড়া (নক্ষত্র)	তারা

ঝ। অ ও ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
কথপোকথন	কথোপকথন (কথা +উপকথন)		
ওতোপ্রোতো	ওতপ্রোত	পরপোকার	পরোপকার (পর+উপকার)
আলচ্য	আলোচ্য	আপোষ	আপস

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৌত্তোলিকতা	পৌত্তলিকতা	আমদ	আমোদ
প্রোমোদ	প্রমোদ	উপোযোগী	উপযোগী
মনযোগ	মনোযোগ	মনমোহন	মনোমোহন
মনলোভা	মনোলোভা	মনহারী	মনোহারী
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	শিরধার্য	শিরোধার্য

ঞ। অ, আ ঘটিত অশুদ্ধি

অনাটন	অনটন	অত্যান্ত	অত্যন্ত
অজাগর	অজগর	অনাশন	অনশন (ন+অশন)
আরাম্ভ	আরম্ভ	সমচার	সমাচার
বাতসা	বাতাসা	তামশা	তামাশা
আনুমান	অনুমান	যদ্যাপি	যদ্যপি (যদি+অপি)

ট। শ, ষ, স ঘটিত অশুদ্ধি

ধ্বংশ	ধ্বংস	নমষ্কার	নমস্কার
বৃহস্পতিবার	বৃহস্পতিবার	পরিস্কার	পরিষ্কার (ই-র পরে ষ)
শসঙ্ক	সশঙ্ক (স-শঙ্ক)	শষ্য	শস্য
নৃসংশ	নৃশংস	নিস্পন্ন	নিষ্পন্ন (ই-র পরে ষ)
নিস্প্রভ	নিষ্প্রভ (ই-র পরে ষ)	জ্যোতিস্ক	জ্যোতিষ্ক
অনসন	অনশন (ন অশন)	তিরষ্কার	তিরস্কার
ভ্রাতুস্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র	আয়ুস্মতি	আয়ুষ্মতী (উ-র পরে ষ)
প্রসংশা	প্রশংসা	কল্যাণীয়েসু	কল্যাণীয়েষু (এ-র পরে ষ)
কল্যাণীয়াষু	কল্যাণীয়াসু (আ-র পরে স)	দুর্বিসহ	দুর্বিষহ (ই-র পরে ষ)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভবিস্যৎ	ভবিষ্যৎ	আবিস্কার	আবিষ্কার (ই-র পরে ষ)
স্পস্ট	স্পষ্ট (ট-এর আগে ষ)		
বিস্ফোটক	বিস্ফোটক	বনস্পতি	বনস্পতি
মনীসা	মনীষা	স্নেহাস্পদ	স্নেহাস্পদ (আস্পদে স)
বিসম	বিষম (ই-র পরে ষ)		
শুচিষ্মিতা	শুচিস্মিতা	শসরীরে	স-শরীরে
গোস্পদ	গোষ্পদ	আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
পরিস্ফুট	পরিস্ফুট	ভস্ম	ভস্ম
প্রাষঙ্গিক	প্রাসঙ্গিক	সুসুপ্তি	সুষুপ্তি
আশক্তি	আসক্তি	মুমূর্স	মুমূর্ষ

(ঠ) য ফলার পরে ভুলক্রমে আকারের লোপ কিংবা আকারের অপপ্রয়োগ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আদ্যান্ত	আদ্যন্ত (আদি + অন্ত)	যদ্যাপি	যদ্যপি (যদি + অপি)
ব্যাক্ত	ব্যক্ত (বি—অনজ্ + ক্ত)	ব্যাঞ্জন	ব্যঞ্জন (বি—অঞ্জ + অন)
ব্যাতিক্রম	ব্যতিক্রম (বি—অতিক্রম)	ব্যাথা	ব্যথা (ব্যথ ধাতু)
ব্যায়	ব্যয়	ব্যাবহার	ব্যবহার (বি—অবহার)
ব্যাবধান	ব্যবধান (বি—অবধান)	ব্যার্থ	ব্যর্থ (বি—অর্থ)
অত্যান্ত	অত্যন্ত (অতি + অন্ত)	ব্যাতীত	ব্যতীত (বি—অতীত)
ব্যাবসায়	ব্যবসায় (বি—অবসায়)	অত্যাধিক	অত্যধিক (অতি—অধিক)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ব্যাভিচার	ব্যভিচার (বি—অভিচার	অধ্যাবসায়	অধ্যবসায় (অধি—অবসায়)
ব্যাধিকরণ	ব্যধিকরণ (বি—অধিকরণ)	ত্যাক্ত	ত্যক্ত (ত্যজ্ + ক্ত)
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন (অধি—অয়ন)	ব্যাবস্থা	ব্যবস্থা (বি—অবস্থা)
পর্য্যাটন	পর্যটন (পরি—অটন)	ব্যখ্যা	ব্যাখ্যা (বি—আখ্যা)
অদ্যপি	অদ্যাপি (অদ্য + অপি)	অদ্যবধি	অদ্যাবধি (অদ্য + অবধি)
ব্যপ্ত	ব্যাপ্ত (বি—আপ্ + ক্ত)	ব্যধি	ব্যাধি (বি—আধি)
ব্যকরণ	ব্যাকরণ (বি—আ—করণ)	ব্যাঘাত	ব্যাঘাত (বি—আঘাত)
ব্যয়াম	ব্যায়াম (বি—আয়াম)	ব্যবর্তন	ব্যাবর্তন (বি—আবর্তন)
যাথার্থ	যাথার্থ্য		

(ভ) ব ফলার ভুলক্রমে লোপ কিংবা অপপ্রয়োগ

উর্ধ	ঊর্ধ্ব	দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব
আয়ত্ব	আয়ত্ত	সত্ত্বা	সত্তা (সৎ + তা)
সত্ব	স্বত্ব (স্ব + ত্ব)	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস (উৎ—শ্বাস)
পার্শ	পার্শ্ব	সাস্থ্য	স্বাস্থ্য
স্বান্তনা	সান্ত্বনা	উজ্জল	উজ্জ্বল (উৎ—জ্বল)
স্বরস্বতী	সরস্বতী (সরস্বৎ + ঈ)	সতন্ত্র	স্বতন্ত্র (স্ব + তন্ত্র)

(ম) [illegible]

বা হাত	বাঁ হাত (বাম > বাঁ)	বাশ	বাঁশ (বংশ > বাঁশ)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পাজর	পাঁজর (<পঞ্জর)	কাটা	কাঁটা (<কণ্টক)
হাঁতী	হাতী (<হস্তী)		
তার (গৌরবে)	তাঁর (<তাঁহার)	পাচ	পাঁচ (<পঞ্চ)
পিজরাপোল	পিঁজরাপোল	আচ	আঁচ
হাঁসপাতাল	হাসপাতাল	ঘোঁড়া	ঘোড়া
সাঁপ	সাপ (<সর্প)	পচিশ	পঁচিশ (<পঞ্চবিংশ)
তাত	তাঁত (<তন্ত্রী)		

(ণ) কতকগুলি বহুপ্রচলিত বর্ণাশুদ্ধি

জগত	জগৎ	অচিন্ত	অচিন্ত্য
অনিন্দ	অনিন্দ্য	গর্ধব	গর্দভ
বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়	মূহুঃমূর্হুঃ	মুহুর্মুহুঃ
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ	পুঙ্খানুপুঙ্খ
উচিৎ	উচিত	কুৎসিৎ	কুৎসিত
লক্ষণ (রামের অনুজ)	লক্ষ্মণ	লক্ষী	লক্ষ্মী
সত্ত্বর	সত্বর	সম্নুখ	সম্মুখ (সম্ — মুখ)
সাহার্য	সাহায্য	পক্ক	পক্ব
সন্মান	সম্মান (সম্ - মান)	একাধিক্রমে	একাদিক্রমে (এক + আদিক্রমে)
উশৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খল (উৎ + শৃঙ্খল, কিন্তু বিশৃঙ্খল)	সঙ্গবদ্ধ	সঙ্ঘবদ্ধ
অন্তর্হৃত	অন্তর্হিত	এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা (এতৎ দ্বারা)

(২) সন্ধি ঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পরিক্ষা	পরীক্ষা (পরি + ঈক্ষা)	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট (দুর্ + অদৃষ্ট
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর (লজ্জা + কর)	দিক্‌দর্শন	দিগ্‌দর্শন
মনো কষ্ট	মনঃকষ্ট	বাগেশ্বরী	বাগীশ্বরী (বাক্ + ঈশ্বরী)
শিরোপীড়া	শিরঃপীড়া	দুরাবস্থা	দুরবস্থা (দুর্ + অবস্থা)
অন্তস্থল	অন্তঃস্থল		
নভঃস্তল	নভস্তল (নভঃ + তল)	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ (শিরস্ + ছেদ)
স্বতোসিদ্ধ	স্বতঃসিদ্ধ	দিক্‌ভ্রান্ত	দিগ্‌ভ্রান্ত
যশলাভ	যশোলাভ	অধগতি	অধোগতি
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে (ইতিপূর্বে বাংলায় বহুব্যবহৃত)		
বয়োপ্রাপ্ত	বয়ঃপ্রাপ্ত	স্রোতবেগ	স্রোতোবেগ
শিরশোভা	শিরঃশোভা	ভবিষ্যংবাণী	ভবিষ্যদ্‌বাণী
পৃথকান্ন	পৃথগন্ন	বাক্‌দত্তা	বাগ্‌দত্তা
তির্যকভাবে	তির্যগ্‌ভাবে	হৃদ্‌পিণ্ড	হৃৎপিণ্ড
হৃদ্‌কম্প	হৃৎকম্প	পশ্চাদ্‌পদ	পশ্চাৎপদ
সুহৃদ্‌সভা	সুহৃৎসভা	বিপদ্‌পাত	বিপৎপাত
কিম্বা	কিংবা	সম্বাদ	সংবাদ
সম্বরণ	সংবরণ	বারম্বার	বারংবার
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা	কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী
আদ্যাক্ষর	আদ্যক্ষর (আদি + অক্ষর)	ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী (ভূমি + অধিকারী)
অনুমত্যানুসারে	অনুমত্যনুসারে (অনুমতি + অনুসারে)	জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান (জাতি + অভিমান)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দিগেন্দ্র	দিগিন্দ্র (দিক্+ইন্দ্র)	জ্যোতিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র (জ্যোতিঃ+ইন্দ্র)
তরুছায়া	তরুচ্ছায়া	মুখছবি	মুখচ্ছবি
চক্ষুদ্বয়	চক্ষুর্দ্বয় (চক্ষুঃ+দ্বয়)	নিরব	নীরব (নিঃ+রব)
চক্ষুরোগ	চক্ষুরোগ (চক্ষুঃ+রোগ)	নিস্কাম	নিষ্কাম (নিঃ+কাম)

৩। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় ঘটিত অশুদ্ধি

জ্ঞানমান্	জ্ঞানবান্ (অ-কারের পর বতুপ প্রত্যয় মতুপ নয়)	রুচিবান্	রুচিমান্ (ই-কারের পর মতুপ প্রত্যয়)
সংস্কৃতিবান্	সংস্কৃতিমান্ (ই কারের পর মতুপ প্রত্যয়)	গৃহীতা	গ্রহীতা (গ্রহ+তৃ—১মা ১ বচন—কিন্তু গৃহীত)
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ (উৎকর্ষই বিশেষ্য তা অপ্রয়োজনীয়)	লক্ষ্যণীয়	লক্ষণীয় (লক্ষ+অনীয়)
অচিন্ত্যনীয়	অচিন্তনীয় (অনীয়), অচিন্ত্য (যৎ)	মাধুরিমা	মধুরিমা (মধুর+ইমা —ইমন্ প্রত্যয় বিশেষণের সঙ্গেই যুক্ত হইতে পারে)
দোষনীয়	দূষণীয়	সখ্যতা	সখ্য
দারিদ্রতা	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা, (দারিদ্রও হয়)	সৌজন্যতা	সৌজন্য (বিশেষ্যের সঙ্গে তা ভুল)
মাধুর্যতা	মাধুর্য, মধুরতা (মধুর তা বিশেষ্য প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য)	বৈশিষ্ট্যতা	বৈশিষ্ট্য অথবা বিশিষ্টতা (উপরের নিয়ম)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	
ঐক্যতা	ঐক্য, একতা	গ্রাহ্যযোগ্য	গ্রাহ্য অথবা গ্রহণযোগ্য (যোগ্য বিশেষ্যের সঙ্গেই যুক্ত হয)
স্বাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য (ষ্ণ্য প্রত্যযের য ফলা)		
বাহ্যিক	বাহ্য (ইক প্রত্যয বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয)	পৌরুষত্ব	পুরুষত্ব অথবা পৌরুষ
প্রসারতা	প্রসার (প্রসার বিশেষ্য)	যদ্যপিও	যদ্যপি (অপি-র অর্থ ই ও)
তথাপিও	তথাপি	মহত্ব	মহত্ত্ব (মহৎ+ত্ব)
মাহাত্ম	মাহাত্ম্য	সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রান্ত অথবা সম্ভ্রমশালী (সম্ভ্রান্ত—বিশেষণ)
ব্যাকুলিত	ব্যাকুল (ব্যাকুল বিশেষণ, বিশেষ্যের সঙ্গে ইত প্রত্যয যুক্ত হয)	নিঃশেষিত	নিঃশেষ (নিঃশেষ বিশেষণ)

৪। সমাস ঘটিত অশুদ্ধি

শশীভূষণ	শশিভূষণ (শশিন্+ভূষণ—সমাসে ন্ লুপ্ত)	গুণীগণ	গুণিগণ (গুণিন্+গণ)
পক্ষীশাবক	পক্ষিশাবক	মহিমাবর	মহিমবর (মহিমন্+বর- সমাসে ন্ লুপ্ত)
মহিমামণ্ডিত	মহিমমণ্ডিত	যুবাগণ	যুবগণ (যুবন্ শব্দ)
দুরাত্মাগণ	দুরাত্মগণ (দুরাত্মন্ শব্দ)	সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ (বিশেষ্যের সঙ্গে স যুক্ত হয)
সাবহিত	সাবধান, অবহিত	নিঃশঙ্কা	নিঃশঙ্ক
মধ্যরাত্রি	মধ্যরাত্র (কিন্তু দিবারাত্রি)	ছাগীদুগ্ধ	ছাগদুগ্ধ
আকণ্ঠপর্যন্ত	আকণ্ঠ (কণ্ঠ পর্যন্ত)		সুবুদ্ধি অথবা বুদ্ধিমান (সু বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয়)।
পিতৃসখা	পিতৃসখ		

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভগবান্‌চন্দ্র	ভগবচ্চন্দ্র	ভগবান্‌প্রদত্ত	ভগবৎপ্রদত্ত
সলজ্জিত	সলজ্জ	সবিনয় পূর্বক	বিনয়পূর্বক, সবিনয়

৫। বিভক্তি, লিঙ্গ, বচনাদি ঘটিত অশুদ্ধি

সকল বালকেরা আসিয়াছে—সকল বালক আসিয়াছে।

নানাবিধ লোকেরা এখানে বাস করে—নানাবিধ লোক এখানে বাস করে

বুদ্ধিমতী বালিকাগণ পুরস্কার পাইয়াছে—বুদ্ধিমতী বালিকারা পুরস্কার পাইয়াছে।

যে যে ভিক্ষুক আসিয়াছে তাহাকে পয়সা দাও—যে যে ভিক্ষুক আসিয়াছে তাহাদিগকে পয়সা দাও।

তাহারা একত্রে আসিল—তাহারা একত্র আসিল।

অনেক ছাত্রগণ পরীক্ষা দিতেছে—অনেক ছাত্র পরীক্ষা দিতেছে।

৬। বিশেষ্য ও বিশেষণপদের অপপ্রয়োগ

ইহা প্রমাণ হইয়াছে—প্রমাণিত হইয়াছে, প্রমাণ করা হইয়াছে।

পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম—সন্তুষ্ট হইলাম, সন্তোষ লাভ করিলাম।

তদ্দৃষ্টে সকলে ভীত হইল—তদ্দর্শনে।

আমি খুবই অপমান হইয়াছি—অপমানিত হইয়াছি, অপমান বোধ করিয়াছি।

মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে হইবে—সাক্ষ্য।

তোমার কথায় আশ্চর্য হচ্ছি—আশ্চর্যান্বিত।

সে আরোগ্য হইয়াছে—সে আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

নিমেষের মধ্যেই চোরটি অন্তর্ধান হইল—অন্তর্হিত।

গৌড়ের গৌরব লোপ হইয়াছে—পাইয়াছে।

একাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে—সম্ভবপর।

কাজটি আরম্ভ হইল—আরব্ধ।

৭। ব্যাকরণদুষ্ট, কিন্তু বাংলায় বহুচপ্রলিত

অশুদ্ধ শুদ্ধ

সকরুণ—করুণ (সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়—রবীন্দ্রনাথ)

সলজ্জিত—সলজ্জ—(সলজ্জিত বাসরশয্যাতে—রবীন্দ্রনাথ)

সকাতর—কাতর (সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে—রবীন্দ্রনাথ)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনাথিনী	অনাথা	কিম্বা, সম্বাদ	কিংবা, সংবাদ
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে		(শরৎচন্দ্রের প্রয়োগ)
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত	সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ

৮। অক্ষরের রূপ না জানার ফলে অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বিঞ্গান	বিজ্ঞান (ঞ জ-এর আগে থাকিলে ঞ্জ, পরে থাকিলে জ্ঞ)	ক্রটি	ত্রুটি (ত-র ফলা হ্রস্ব উ —ত্রু)
শক্র (ইন্দ্র)	শক্র (ক-এ র ফলা—ক্র)	অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ (হ-এ ণ ফলা—হ্ণ)
মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন (হ-এ ন ফলা—হ্ন)	আক্রমণ	আক্রমণ
		ব্রাক্ষণ	ব্রাহ্মণ
উপলব্ধি	উপলব্ধি (দ-এর সঙ্গে ধ-এর যোগ দ্ধ, ব-এর সঙ্গে ধ-এর যোগ—ব্ধ)	আঙ্গা	আজ্ঞা (ঙ-এর সঙ্গে গ-এর যোগ ঙ্গ, জ-এর সঙ্গে ঞ-র যোগ জ্ঞ)

৯। উভয় রূপই শুদ্ধ

অবনি—অবনী	অন্তরীক্ষ—অন্তরিক্ষ
কুশীদ—কুসীদ	কিশলয়—কিসলয়
কৈকেয়া—কেকয়ী	কৌশল্যা—কৌসল্যা
প্রতিকার—প্রতীকার	বিকশিত—বিকসিত
শূর্পনখা—সূর্পনখা	শ্রেণী—শ্রেণি
তরণী—তরণি	কটি—কটী
দারিদ্র্য—দারিদ্র	হনুমান—হনূমান
কুটীর—কুটির	সূচী—সূচি

আকুতি—আকূতি

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য

প্রবন্ধ ও রচনা

প্রবন্ধ ও রচনা

প্রবন্ধ একপ্রকার সাহিত্যসৃষ্টি। ইহা এক স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ম। রচনা প্রবন্ধেরই আর এক শ্রেণী। ব্যাপকার্থে প্রবন্ধ ও রচনা একই গোত্রের সাহিত্য-কর্ম। কিন্তু সূক্ষ্ম তাৎপর্যে ইহারা স্বতন্ত্র, প্রকারভেদে বিশিষ্ট।

প্রবন্ধ কোন লেখকের যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার বিন্যাস। প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের সিদ্ধান্তমুখী যুক্তি-সজ্জা থাকে। সুন্দর সুষ্ঠুভাবে যুক্তি-বিন্যাসের মধ্যেই প্রবন্ধ-লেখকের সার্থকতা নির্ভর করে। প্রবন্ধের সাধারণ অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধন', এখানে বন্ধন অর্থে রচনার নির্মিতিগুণই বোঝায়। প্রবন্ধে গঠনকারুর গুরুত্ব অনুপক্ষেণীয়। সুষ্ঠু-সাবলীল চিন্তার জন্য স্বচ্ছ ও সহজ গঠনকারু প্রয়োজন। চিন্তার মাহাত্ম্যের সঙ্গে চিন্তার দেহসৌষ্ঠবও মূল্যবান। তাই প্রবন্ধের সংজ্ঞা বলিতে বোঝায়, যে সাহিত্যকর্মে চিন্তার পারিপাট্য যুক্তি-সৌষ্ঠবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রবন্ধ।

প্রবন্ধের তিনটি মুখ্য অঙ্গ আছে: ভূমিকা, বিষয়-বিবৃতি ও সিদ্ধান্ত। ইহার মধ্যে অনেক উপবিভাগও থাকিতে পারে। ভূমিকাতে বিষয়ের সূচনা হয় বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা বা বিষয়-সংকেত পাওয়া যায়, তাই ভূমিকা-অংশ প্রবন্ধ-সাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়-প্রবেশ বা বিবৃতিতে মূল বিষয়ের আখ্যান ও ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। এই অংশে লেখককে নানারকম যুক্তি দ্বারা সতর্কতা সহযোগে বিষয় বিন্যাস করিতে হয়। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের মতামত উপস্থাপিত করিতে হয়। এই অংশে বহু উপ-বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। সিদ্ধান্ত প্রবন্ধ-সাহিত্যে অত্যন্ত মূল্যবান অংশ। কারণ সমগ্র প্রবন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহার নিষ্কর্ষ এই অংশে পাওয়া যায়। এই অংশেই প্রবন্ধের সমস্ত বক্তব্যের ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রবন্ধের সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য রীতি বা Style. স্টাইল লেখকের ব্যক্তিত্বের সুরভি। স্টাইল মানে রচনার ভঙ্গী—কিন্তু এই ভঙ্গী নির্ভর করে লেখকের মানস-ভঙ্গীর উপর। সর্বোপরি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী লেখকের সমগ্র ব্যক্তিত্ব স্টাইলের ক্ষেত্রে প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়। কেবল ভাষা-শিল্প নয়, অঙ্গ-সৌষ্ঠব নয়, সমগ্র রচনাবৈশিষ্ট্যই প্রবন্ধের আকর্ষণ।

প্রবন্ধের ভাষা, আয়তন প্রভৃতি সব লইয়া অবয়ব-নৈপুণ্য নির্ণীত হয়। প্রবন্ধের ভাষা সহজ ও সাবলীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের ভাষার প্রধান লক্ষ্য বোধগম্যতা। ভাষা নির্বাচন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখককে সতর্ক হইতে হইবে। ভাষা-রীতি দুই প্রকারের হইতে পারে—সাধুভাষা ও চলিত-ভাষা। পরীক্ষায় দুইটিরই ব্যবহার চলিতে পারে। সাধু-ভাষার অন্বয়-রীতি রক্ষণশীল, ক্রিয়াপদের অবস্থান বাক্যের গতি অনুসারে পরিবর্তনশীল নয়। কিন্তু চলিত ভাষায় অন্বয়-রীতি একটু পরিবর্তনশীল, কারণ ক্রিয়াপদের সংস্থান অনেক ক্ষেত্রেই নমনীয়। সাধু ও চলিত-রীতি একই প্রবন্ধে ব্যবহার করা চলে না। শুদ্ধরীতি বলিতে বোঝায় ব্যাকরণগত শুদ্ধি। ভাষার একটা ঐতিহ্য ও নিয়ম আছে—এই নিয়ম রীতিসিদ্ধ ও প্রথাসিদ্ধ। এই প্রথাসিদ্ধ নিয়মকে মানিয়া চলা শুদ্ধ রীতির আদর্শ। চলিত-রীতিতে ভাষার প্রচলিত বাগ্‌ধারা (Idiom) ব্যবহার করা হয় বেশী। বাঙলা ব্যাকরণ অনুযায়ী ও প্রচলিত ভাষা-রীতি-অনুগ রীতিকেই শুদ্ধ রীতি বলা হয়। সাধু ভাষায় পদক্রম বা অন্বয়ক্রম প্রচলিত রীতিতে প্রতিষ্ঠিত। কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার অবস্থান নির্দিষ্ট। ক্রিয়া ভাষার প্রাণ। সাধু বা শুদ্ধ রীতিতে এই পদক্রম অনুসৃত হয়। কিন্তু চলিত রীতিতে বহু ক্ষেত্রে এই পদক্রম-বিপর্য্যাস হয়। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নমনীয়তা চলিত রীতির আদর্শ। আধুনিক গদ্যরীতিতে চলিত রীতিতে অনেক সময় ক্রিয়াকে উহ্য রাখা হয়।

'প্রবন্ধ' যুক্তনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যকর্ম। কিন্তু 'প্রবন্ধ' ও 'রচনার' মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। 'রচনা' ভাবধারা সৃষ্টি—এক্ষেত্রে বস্তু অপেক্ষা লেখকের ব্যক্তিত্বের কুহকই বেশী কার্যকরী হয়। তাই যে সাহিত্যকর্ম অন্তর্মুখী (Subjective), সহজ মানস-লীলা (Loose sally of mind) বা বস্তু-নিরপেক্ষ নির্মিতি, সেই সাহিত্যকর্মই রচনা। রচনায় লেখক স্বয়ং লেখার-বিষয়বস্তু—ফরাসী লেখক মঁতে এই ধরনের মন্ময়-শ্রেণী রচনার গুরু।

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ—তাই তাঁহার সৃষ্টির তুলনা একমাত্র তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের ভাষারীতি, অবয়বনৈপুণ্য, স্পষ্টতার যাথার্থ্য ও ঋজুতা প্রবন্ধের চিরকালীন গুণ। সরল ও প্রাঞ্জল গদ্যই আদর্শগদ্য—প্রসাদগুণান্বিত ভাষাই উৎকৃষ্ট ভাষা। বাগ্‌বাহুল্য, পুনরাবৃত্তি, অস্পষ্টতা প্রবন্ধের সর্বস্বীকৃত ত্রুটি।

মাত্রাজ্ঞান-ছাড়া অবয়ব-নৈপুণ্য আসে না—তাই প্রবন্ধ লেখককেও সদা-সর্তক হইতে হয়। প্রবন্ধের গদ্যের আদর্শ বলিতে প্রমথচৌধুরী বা 'সবুজ পত্র'-গোষ্ঠী বুঝিত ফরাসী গদ্যের আদর্শ।

ফরাসী গদ্যের স্বচ্ছতাই প্রধান গুণ। আধুনিক বাংলা গদ্যে স্বচ্ছতাই প্রধান কাম্য বস্তু। ছাত্রদের প্রবন্ধরচনায় সাফল্য অর্জনের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, প্রমনাথ বিশী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির প্রবন্ধ ও রচনার সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হইবে তরুণ ছাত্রদের রচনাশিক্ষার প্রেরণা ও শিক্ষা ততই গভীর ও সম্ভাবনাময় হইয়া উঠিবে।

বাঙলা ও বাঙালী

'বাঙলা' বলিতে বোঝায় বাঙলাদেশ, বাঙলাভাষা, বাঙলা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ। 'বাঙালী' এই বাঙলাদেশের অধিবাসীবৃন্দ, বাঙালীত্বের ভাব-সম্পদে যাহারা সমৃদ্ধ। বাঙালীত্বের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিয়া নিত্য নূতন পরিবর্তনের পথে বহমান। এই পরিবর্তন যুগোপযোগী ও কালোপযোগী।

বাঙলা ভারতের একটি অঙ্গ। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় "ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙলা হইতেছে বিশেষ।" তাই ভারতীয়তা হইতে বাঙালীত্বকে আলাদা করিয়া দেখা যায় না। ভারতীয়ত্বের স্পন্দন বাঙালীত্বের মধ্যেও স্পন্দিত হয়। যদিও একথা সত্য যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব পরিচয় আছে। বাঙলাদেশের নিজস্ব পরিচয় তাহার ভূগোল-ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে বিধৃত হইয়া আছে।

বাঙলার এই বৈশিষ্ট্য কী? একবার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন:—'উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিলিত হয়েছে এই বাংলার সাধনাক্ষেত্রে। কাজেই এখানে শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার স্থান নেই। বাংলা দেশের এই উদার বিস্তৃতির ফল দেখা যাবে তার সর্বক্ষেত্রে। তার শিল্পে, সংগীতে, সাহিত্যে,

সাধনায়।...বাংলা দেশের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে সুকুমার সূক্ষ্মতা বোধ। সত্যই বাঙালীর উদারতা, গ্রহণশীলতা সূক্ষ্মতা বোধ বাঙালীর ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও সাহিত্যে এমন এক অভাবনীয় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।'

বাঙলাদেশের ধর্মকর্মের সাধনায় এই উদারতার পরিমণ্ডল সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। হরি-হর, ব্রহ্মা-বিষ্ণু বৈষ্ণব-শাক্ত এখানে পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বিরোধের ইতিহাসও যেমন আছে, মিলন ও সমন্বয়ের ইতিহাসও তেমন পাওয়া যায়। নালন্দার মন্দিরে শিব, বিষ্ণু, গণেশ মনসার পাশে বৌদ্ধ দেবদেবী একই সঙ্গে পূজা লাভ করিয়াছে। বাংলার ইতিহাসের আদিপর্ব হইতেই এই সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন, কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন—তিনজনেই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, কিন্তু তাঁহাদের রাজকীয় শীলমোহরে সদাশিবের মূর্তি মুদ্রিত আছে। এই ব্যাপারে কোন সাম্প্রদায়িক বাধা তাহাদের ছিল না। বাঙালার ধর্মগত সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্য বাঙালীত্বের নিজস্ব সম্পদ। বাঙলাদেশে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের জয় ঘোষিত হইয়াছে, তখন লোকধর্মও তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ইহাই বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাসের শিক্ষা।

প্রাচীন কাল হইতেই বাঙলার সংস্কৃতি-জীবনের স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনা কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদকে লইয়া। এ-সব শাস্ত্রচর্চা বাঙলাদেশকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ঐতিহাসিকগণ এমন কথা বলেন। কিন্তু তাই বলিয়া একথা কেহ মানিবেন না যে, বাঙালীর কোন সাহিত্য বা সংস্কৃতি ছিল না। সমাজবদ্ধ মানুষের নিশ্চয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ছিল, সেকালের প্রাক্-আর্য নরনারীর শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতির নিদর্শন নিশ্চয় ছিল। বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারামগুলি ছিল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলিতে কেবল বৌদ্ধ দর্শন নয়, ব্যাকরণ, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি সবই চর্চা করা হইত। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের বাংলাদেশে আর্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটে। প্রাচীন বাংলায় ব্যাকরণ-চর্চায় অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্র গোমীর নাম এইক্ষেত্রে অমর হইয়া আছে। চন্দ্র গোমীর জন্ম হইয়াছিল বরেন্দ্র ভূমিতে, তিনি বৌদ্ধ বলিয়া অনুমিত। ব্যাকরণ ও তর্কশাস্ত্র ছাড়াও দর্শনের আলোচনায় বাংলাদেশে

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। সাহিত্য রচনায় গৌড়ী রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। এ সব কীর্তি প্রাচীন বাঙালীর গৌরবের পরিচয়। সেই প্রাচীন যুগ হইতে বাঙালীর সাহিত্যসাধনার সুরু হয়। চর্যাপদের কবিবৃন্দ হইতে সুরু করিয়া বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-মুকুন্দরাম-কৃত্তিবাস-কাশীরাম-ভারতচন্দ্র-মধুসূদন ও বিংশ শতব্দীতে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল বাংলা কাব্যধারার এক বেগবান প্রবাহ বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। বাঙালীর সৃষ্টিশীলতার এমন উদাহরণ ভারতবর্ষে সত্যই দুর্লভ।

প্রাচীন বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ধর্ম-সমন্বয়, উদারতা, পরমত সহিষ্ণুতা,—তাই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে উদার মানবতা ও ঈশ্বরে ভক্তির কথা বার বার শোনা যায়। বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্তপদাবলী, বাউল সংগীত প্রভৃতি মানবীয়তার সৌন্দর্যে ও ঈশ্বর ভক্তির বিশ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া আছে। সাহিত্য হিসাবে যেমন এগুলি রত্নমালা, ভক্তি-কাব্য হিসেবেও এগুলির তুলনা নাই। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—এই মানবতার আহ্বান মধ্যযুগের বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রেম ও ভক্তির সাধনা বাঙালীর ইতিহাসে এক যুগান্তর আনিয়াছিল। বাঙালী ভক্তিমান জাতি, বাঙালী মানবপ্রেমিক জাতি—এই বাণীই বাঙালীর শ্রেষ্ঠ বাণী।

মানবতার সাধনায় বাঙালী মনীষীর অক্লান্ত প্রয়াস কখনও ব্যর্থ হয় নাই। রামমোহন হইতে বাঙলার ইতিহাসে যে নবযুগ সুরু হইল, তাহা এই কথার সত্যতাই প্রমাণ করে। কুসংস্কারের অবলুপ্তি ঘটাইয়া রামমোহন রায় যেমন এদেশে নবযুগের সূচনা করিলেন, তেমনি বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনায় এই সংস্কারমুক্তি ও মানবপ্রীতিই মুখ্যস্থান লাভ করিয়াছে। ঈশ্বরও এখানে মানুষের সখা—চৈতন্য-প্রবর্তিত এই সাধনার ধারাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের মুক্তিই বাঙালীর মনীষীর চিন্তার ও সাধনার বস্তু—বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ এই সত্যের জলন্ত প্রমাণ। বাঙালীর বাঙালীত্ব এই মহামনীষীদের সাধনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইখানে বাঙলা ও বাঙালীত্বের পরিচয়।

বাংলাদেশ ঃ অতীত ও বর্ত্তমান

বাংলাদেশের অতীত এক গৌরবময় অতীত। সুজলা-সুজলা বাংলাদেশ আজ স্বপ্নের বস্তু। কিন্তু অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে যে বাংলাদেশের চিত্র দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হয়, সে সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা এক বাংলাদেশ। 'আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু'র অধিকারী অসংখ্য মানুষ সেদিন প্রাণের সম্পদে পূর্ণ হইয়া এক শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনযাপন করিত। মাঠে মাঠে সোনালী ধানের প্রাচুর্য, আম্রবীথিকার ছায়ায় ছায়ায় রাখালের পদচিহ্ন, আম-জাম-কাঁঠালের গন্ধেভরা বাংলার গ্রাম তখন আনন্দে পূর্ণ, দেবালয়ে কাঁসরঘণ্টার ধ্বনি 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথে,' সুখী মানুষের পদচারণা—এই লইয়া অতীত বাংলাদেশের এক মধুর চিত্র ফুটিয়া ওঠে।

অতীতকালের বাংলাদেশ ছিল পল্লীগ্রাম পূর্ণ, তাই ইহাকে বলা চলে পল্লীবাংলা। কৃষিপ্রধান সভ্যতার প্রাণ এই পল্লীবাংলায়। গ্রামগুলি ছিল 'ছোট ছোট শান্তির নীড়', তাই সেই সহজ-সরল জীবনযাত্রার কৃত্রিমতা বা আড়ম্বর, কলুষ বা বিকৃতি, অস্বাস্থ্য বা অশিক্ষা প্রবেশ করে নাই। সেই পল্লীবাংলা আজ স্বপ্নের বস্তু।

পল্লী-বাংলার কৃষিসম্পদ ছিল প্রচুর, কুটিরশিল্প ছিল সজীব—তাই আর্থিক জীবনে পল্লীবাংলার মানুষ অনটনগ্রস্ত ছিল না। অতীতের বাংলাদেশে এই সমৃদ্ধির চিত্র চোখে পড়ে। তন্তুশিল্পীর বয়নশিল্প তখন বাংলার বাহিরে সমাদর লাভ করিয়াছিল। বাংলার মৃৎশিল্পীরা অনবদ্য মৃৎমূর্তি সৃষ্টি করিয়া কারুশিল্পের এমন নমুনা রাখিয়া গিয়াছে যে বৃহত্তর ভারতেও এই শিল্পের এক মর্যাদাময় স্থান ছিল। বাংলার স্বর্ণকার ও মণিকার কাঞ্চন-কারুর অপূর্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। গৃহে গৃহে ইহাদের নিত্য আনাগোনা, উৎসবে-ব্যসনে ইহাদের আহ্বান পথে পথে ইহাদের পদচিহ্ন অতীত বাংলার গৌরবময় অধ্যায় সূচিত করে। সেকালে কর্মচঞ্চল শিল্পী ও কর্মীদের সাধনায় বাংলার পল্লীকেন্দ্রগুলি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

অতীত বাংলা ছিল উৎসবের বাংলা—'বার মাসে তের পার্বণ'-এর দেশ এই বাংলাদেশ ছিল উৎসবে মুখরিত। সব উৎসবই ছিল শুভ উৎসব। মানুষে-মানুষে আত্মীয়তা, মৈত্রী ও প্রীতিই ছিল উৎসবের প্রধান বন্ধনসূত্র। বাঙালীর

জীবনে সেদিন সহযোগিতা ও মৈত্রী বর্তমান ছিল, অবাধ প্রাণের স্ফূর্তি ও প্রীতি সেদিন পল্লীবাংলার সমাজ-জীবনকে উচ্ছল করিয়া তুলিয়াছিল। পল্লীর আসরে নাটমন্দিরে, চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন প্রাণের প্রবাহের কোন অভাব ছিল না। এগুলি ছিল লোকশিক্ষা ও লৌকিক আনন্দের অফুরন্ত উৎস। যাত্রা-গান-পাঁচালীর মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষ শিক্ষা ও আনন্দ দুইই লাভ করিত। প্রতিটি অনুষ্ঠানের মধ্যে এই শিক্ষার সুযোগ ছিল অব্যাহত। দেশের পুরাণ ও ইতিহাস, ধর্মশিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষা এই যাত্রা-পাঁচালীর মণ্ডপে প্রতিফলিত হইত। তাই পল্লীবাংলার সমাজ ছিল দেশীয় শিক্ষায় সমৃদ্ধ সমাজ, বলা চলে স্বদেশী সমাজ।

এই স্বয়ংস্পূর্ণ আনন্দময় শান্তিনিকেতন পল্লীবাংলার জীবনে আসিল এক অভাবিত পরিবর্তন। ইংরেজদের আবির্ভাবের সঙ্গে পট-পরিবর্তন দেখা দিল। পল্লীবাংলার শান্তির নীড়ে আসিল নতুন যুগের, নতুন সংস্কৃতি-সভ্যতার আঘাত। কৃষিপ্রধান পল্লীবাংলার পাশে গড়িয়া উঠিল শিল্পসমৃদ্ধ নগরী। ধীরে ধীরে নূতন নাগরিক সভ্যতার জন্ম হইল। বিদেশী শিল্পবিপ্লবের ফলে এই নূতন শহুরে সমাজে প্রতিযোগিতা ও সমৃদ্ধির প্রেরণা দেখা দিল। দেশী কুটির-শিল্পের স্থলে অভিষিক্ত হইল বিদেশী যন্ত্রশিল্প। পল্লীসমাজ কক্ষচ্যুত হইয়া গতিশীল শহরের তরঙ্গের দিকে ছুটিয়া গেল। বিদেশী শিক্ষার ফলে এক নতুন সমাজ-সংস্কৃতির জন্মলাভ করিল। মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর জন্ম হইল, কলকারখানা প্রসারিত হইল, সওদাগরী অফিস, আদালত, শহরে অট্টালিকার আবির্ভাবে এক নূতন যুগ দেখা দিল। এই যুগ হইতেই আধুনিক কালের সূত্রপাত। পল্লী যে সভ্যতার কেন্দ্রে ছিল, সেখানে শহর আসন অধিকার করিল। গ্রাম হইতে দলে দলে ভাগ্যান্বেষী মানুষ শহরে ছুটিয়া আসিল। পল্লী মরিতে বসিল, কুটিরশিল্প মুমূর্ষু হইল, শান্তির নীড় ভ্রষ্ট হইল। গ্রামজীবনে নানা দুর্দৈব নামিয়া আসিল।

নাগরিক জীবনের সমৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে একদিকে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন বাঙালীর মধ্যে নবপ্রেরণা দেখা দিল, খ্যাতি-কীর্তির বাসনা, সম্পদলাভের বাসনা যেমন ক্রমশঃ সীমা ছাড়াইয়া আসিল, অন্যদিকে তেমনি অনুকরণ ও প্রতিযোগিতা আসিয়া শহুরে সমাজকে কলুষিত করিয়া তুলিল। নতুন সমাজের অভিশাপ ও আশীর্বাদ হইল অতৃপ্তি। একদিকে এই অতৃপ্তির ফলে নব নব বিকাশ সম্ভব হইল। অন্যদিকে এই অতৃপ্তির ফলে লোভ

অপরিমিত হইয়া উঠিল। শহুরে জীবনে ধর্মের স্থানে আসিল বিজ্ঞান। ইহার সুফল ও কুফল দুইই দেখা দিল। আর্থিক সমৃদ্ধির পাশে ভয়াবহ দারিদ্র্যও দেখা দিল, বৈষম্যের বিষ সমাজদেহে সঞ্চারিত হইল, মানুষে-মানুষে বিভেদ দেখা দিল, বিচ্ছিন্নতা-বোধ হইল নাগরিক সমাজের ক্রমবর্ধমান লক্ষণ।

বর্তমানের বাংলাদেশ বলিতে এই শহর-কেন্দ্রিক দেশ ও সমাজকে বোঝায়। এই বাংলাদেশে যেমন প্রগতির চিহ্ন অনেক চোখে পড়ে তেমনি অস্বাস্থ্যের চিহ্নও কম নয়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে আধুনিককালে এই জীবনের বিশিষ্ট লক্ষণ চতুর্দিকে পরিস্ফুট হইয়াছে। পথ-ঘাট, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ও আধুনিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেমন শহরে সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি কলকাতাকে কেন্দ্র করিয়া উপগ্রহের মত উপনগরী সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক বিশেষজ্ঞের মতে, অত্যধিক লোকসংখ্যা ও জনবসতির ফলে নাগরিক জীবনে অস্বাস্থ্য ও নানামুখী সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া পথ নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও, কলকাতাকে কেন্দ্র করিয়া যে দেশ গড়িয়া উঠিতেছে, সে দেশের জীবনযাত্রায় প্রগতির সহিত অনেক সমস্যাও সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ সর্বোপরি দেশবিভাগ একালের সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাই বর্তমান বাংলাদেশ বলিতে যে দেশের চিত্র চোখে পড়ে, সে দেশ এক প্রগতি ও হতাশা, উন্নতি ও দৈন্য, সমৃদ্ধি ও নৈরাশ্যকে যুগপৎ বহন করে। একদিকে অভ্রভেদী সৌধ ও নূতন নূতন পরিকল্পনা-সঞ্জাত কল-কারখানা, অফিস-আদালত, অন্যদিকে বেকার সমস্যা, হানাহানি, বিদ্বেষ ও অশান্তি আধুনিক বাংলাদেশের সমাজে বিষবাষ্পের মত প্রবেশ করিয়াছে।

বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্য

বাংলাদেশের প্রকৃতি-সম্ভার বিচিত্র ও সম্পন্ন। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বিচিত্র রূপসম্ভার আত্মপ্রকাশ করে। এই রূপবৈচিত্র্য ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবর্তিত হয়। এত রূপসম্ভার অন্য কোন দেশে দুর্লভ। বাংলার প্রকৃতি সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে নানামুখী সৌন্দর্যের রূপ-রঙ ও রসের বর্ণমালা যুগ যুগ ধরিয়া সৌন্দর্য-রসিক মানুষকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে, কবিকে

অনুপ্রাণিত করিয়াছে, শিল্পীকে বিচলিত করিয়াছে। এই রূপ অক্ষয় ও অমর।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত-বসন্ত—ষড় ঋতুর আবর্তন-বিবর্তনে কালের যাত্রাপথ চিহ্নিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য, প্রতিটি ঋতুই অফুরন্ত সৌন্দর্যের আকর হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালকে আমাদের কাব্যে সম্মানের আসন দেওয়া হয় নাই। কারণ গ্রীষ্মকাল দুঃখ কষ্টের নামান্তর। গ্রীষ্মে মৃত্তিকা শুষ্ক, নীরস, নিদাঘতাপে রূঢ় ও কঠিন রূপ ধারণ করে। বাংলার চিরপরিচিত কোমল রসমধুর মূর্তিটি এইসময় দাবদগ্ধ নিদাঘকাল হইয়া উঠে। কিন্তু এই গ্রীষ্মকে কবি যতই কৃচ্ছ্রসাধনকারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করুন—এই সময় আম্রমুকুলের গন্ধব্যাকুল সমীরণ মাঝে মাঝে মানুষকে আকুল করিয়া তোলে, ছায়া-সুশীতল দীঘির স্থির জল মদির স্বপ্ন ডাকিয়া আনে। তাই গ্রীষ্মকে কেবলই 'আগুন-ফোয়ারা' মনে করা ঠিক নয়। ফুটিফাটা মাঠের অকরুণ চিত্র দেখিয়া আমরা যতই বিহ্বল হই না কেন, ইহার আগ্নেয়রূপের অন্তরালে স্নিগ্ধতার ছায়া-সঞ্চার ঘনাইয়া আসে। মরুপ্রতিম গ্রীষ্মের মধ্যে তাই সন্ধান করিলে মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।

ঋতুচক্রে গ্রীষ্মের পরই বর্ষার আবির্ভাব ঘটে। নিদাঘের অগ্নিপরীক্ষা শেষ হইলে আসে নবযৌবনা "বরষা"-র রাজকীয় সমারোহ। রূঢ়-রিক্ত, তাপদগ্ধ বসুন্ধরার বুকে করুণাধারার মত বর্ষণধারা নামিয়া আসে। কেকাধ্বনি মুখরিত ডাহুক-ডাহুকী বিতানিত বর্ষা আসে নূতন দৃশ্যপট সৃষ্টি করিয়া। বনে বনে করবী-যূথী-মালতী-কেতকী ফুটিয়া ওঠে। গগনে গগনে মেঘছায়া ঘনাইয়া আসে, কালবৈশাখীর ডম্বরধ্বনিতে পৃথিবী মন্দ্রিত হয়, উদ্দাম প্রলয়ের তাণ্ডবলীলার মধ্যে আসে নব-সৃষ্টির কিশলয়।

বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বর্ষার মহাসমারোহে একদিকে যেমন আনন্দের সীমা থাকে না, অন্যদিকে তেমনি ব্যবহারিক অসুবিধারও শেষ নাই। কিন্তু বর্ষায় প্রকৃতি সকলকে রূপশ্রী উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেয়। তাই বাংলা কাব্যে বর্ষার এত স্তুতি দেখা যায়; বর্ষা সৌন্দর্যের অভিপ্রকাশই শুধু নয়, আশার দূত, সৌভাগ্যের সূচনা। তাই বর্ষা বাঙালীর চিরাকাঙ্ক্ষিত ঋতু।

বর্ষার ধারাস্রোত যখন শেষ হয়, তখন ফোটে শরতের নিষ্কলঙ্ক হাসি। শরতের সোনালী রৌদ্রে শারদোৎসবের আগমনী ধ্বনিত হয়। নবকিশলয়ের

শ্যামসমারোহে নূতনের বোধন সুরু হয়। এ এক অপূর্ব রূপ। বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকার হইতে মানুষ এক শরৎ-স্নিগ্ধ নীলাভ আকাশের তলায় আসিয়া উপস্থিত হয়। শরতের মায়াবী রৌদ্রে, শিউলির উৎসবে, কাশগুচ্ছের আমন্ত্রণে, স্ফটিক-স্বচ্ছ আকাশে লঘু মেঘের পাল-তোলা নৌকার আনাগোনায় বা তন্দ্রালস জ্যোৎস্নায় অপূর্ব রূপের ভাণ্ডার উছলিয়া উঠে। শরৎ তাই বাঙালীর উৎসবের ঋতু, প্রাণের আনন্দের ঋতু।

হেমন্তের আবির্ভাবে পৃথিবীর বুকে একটি গাম্ভীর্যের পালা আসে। কৃষকদের পাকা ধানের সম্ভারে নবান্নের আয়োজন হয়। হেমন্তের নবীনায়নের সঙ্গে আসে আর এক পালাবদল।

এই পালাবদল শীতকালের। কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়, গাছের পাতা ঝরিতে থাকে, রাত্রি দীর্ঘ হয়, দিন হ্রাস হয়। শীতকাল বিচিত্র পুষ্পের বর্ণ-শোভায় মুখরিত হইয়া ওঠে।

বসন্ত আসে যুবরাজের মত। বসন্তই শ্রেষ্ঠ কাল। কাব্যে-সাহিত্যে তাই বসন্ত বন্দনা। নবীন পুষ্পপল্লবের সমারোহে-কোকিলের কুহুধ্বনিতে, পলাশ-শিমূলের সম্ভারে বসন্ত সৌন্দর্যের সম্রাজ্ঞীর ন্যায় আবির্ভূত হয়।

বাংলাদেশে ষড় ঋতুর বিবর্তন এক একটি সৌন্দর্য-চিত্রের প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়, প্রকৃতি এক অনুপম স্রষ্টা—তাঁহার তুলিতে এই সৌন্দর্য-চিত্রের শেষ নাই।

বাঙলার কুটীরশিল্প

বাঙলার কুটীরশিল্প একদা প্রাচীন বাঙালীর বাণিজ্য-জীবনের গৌরবময় পরিচয় বহন করিত। ইতিহাসের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচয় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পারিবারিক বৃত্তি-অনুযায়ী এই শিল্পের সমৃদ্ধি ও বিকাশ হইত। বাংলার কৃষকসম্প্রদায় কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করিত, তন্তুশিল্পী তন্তুজ-বস্ত্র নির্মাণ করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিত। শাঁখারী-কাঁসারী, কর্মকার-চর্মকার সকলেই জন্মগত ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যে রত থাকিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিত।

বাংলার কুটীর শিল্পের গৌরবময় দিনগুলি আজ অন্তমিত। সেই সাফল্যের স্পন্দন বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় শিল্পবিপ্লবের

ফলে এদেশেও তাহার প্রভাব লাগিয়াছিল। ফলে উনবিংশ শতাব্দী হইতেই যন্ত্রযুগের ময়দানব এদেশে স্বদেশী শিল্পকে গ্রাস করিয়াছিল। পল্লীর সরল-সহজ শিল্পীরা তাহাদের জন্মগত ব্যবসা ত্যাগ করিয়া শহরের পথে পদার্পণ করিল। গ্রামীণ শিল্পী শ্রমিকে পরিণত হইল। যাহারা শহরের পথে পথে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিল না, তাহারা দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যকে বরণ করিতে বাধ্য হইল; তাঁতি, ছুতোর, শাঁখারী, কাঁসারী সকলেই বেকারত্বের করাল গ্রাসে পতিত হইল।

এই কুটীরশিল্পের অপমৃত্যু আমাদের দেশের প্রগতির পথে শোচনীয় এক ঘটনা রূপে চিহ্নিত করা চলে। এদেশের সব মনীষীই একবাক্যে বলিয়াছেন, গ্রামই এদেশের প্রাণ-কেন্দ্র। কৃষির উন্নতি ছাড়া গ্রামের উন্নতি সম্ভব নয়। কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক অধোগতি রোধ করা অসম্ভব। কুটীর শিল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দেশের প্রগতির পক্ষে অপরিহার্য। এই জন্য প্রয়োজন 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও হে নগর'। শিল্পায়ন উন্নতিশীল দেশের পক্ষে অপরিহার্য সন্দেহ নাই; কিন্তু গ্রাম-প্রধান বাংলাদেশের পক্ষে কুটীরশিল্পের প্রাণবত্তাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কুটীরশিল্প ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মর্যাদা লইয়া বাড়িয়া উঠিলে তবেই তাহার বিকাশ ঘটিবে।

কুটীরশিল্প ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—ইহার একটি মস্ত সুবিধার দিক এই যে ইহার জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয় না। এ দেশের গ্রামের মানুষ দরিদ্র ও সম্বল-বঞ্চিত। তাই আপন গৃহের অঙ্গনে বসিয়া পুরুষানুক্রমিক বৃত্তির চর্চায় তাহার সুযোগ যত অধিক, অন্য যন্ত্রচালিত বৃহৎ শিল্পে সেই সুযোগ ও স্বাধীনতা তত নাই। একথা প্রমাণিত হইয়াছে, নিত্যনূতন রুচির সহিত তাল দিয়া চলিবার মত ক্ষমতা কুটীরশিল্পের আছে। কারণ এদেশের কুটীরশিল্প দেশে-বিদেশে সমাদৃত হইয়াছে। এই ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগ ও যত্নশীলতার চর্চা হইলে সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। কুটীর শিল্পের আর একটি সুবিধা এই যে শ্রমিক-অসন্তোষ প্রভৃতি আধুনিক সংগঠনগত প্রতিকূলতা এখানে প্রায় নাই বলিলেই চলে। বৃহৎ শিল্প একটি জটিল ও সংগঠনগত বিশাল দায়িত্বের ব্যাপার। সেই দিক হইতে ইহার সুবিধার মত অসুবিধাও অনেক। সরকারের সহযোগিতা সত্ত্বেও বৃহৎ শিল্পে অশান্তি এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু কুটীর শিল্পের ক্ষেত্রে এই দিক হইতে সমস্যা ও জটিলতা কম।

যুগের অগ্রগতির সাথে সাথে কুটীর শিল্প স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউরোপের উন্নতিশীল দেশে বৃহৎ শিল্পের পার্শ্বে কুটীর শিল্পের অবস্থান দেশীয় অর্থনীতিতে সার্থকতা দান করিয়াছে। জাপানের মত উন্নতিশীল দেশে উন্নতির চাবিকাঠি নিহিত আছে কুটীরশিল্পের মধ্যে। এদেশে ‘শ্রীনিকেতন’ ও ‘খাদি প্রতিষ্ঠান’এর মত কুটীরশিল্পের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যথেষ্ট উৎসাহ ও উত্তমের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালে হার্ভে কমিটি কুটীরশিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয়। একটি সর্বভারতীয় বোর্ড গঠনের দ্বারা দেশে কুটীরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা মর্যাদা লাভ করে। সরকার দেশের নানা স্থানে বিক্রয় কেন্দ্রের সুযোগ দিয়া দেশের কুটির শিল্পের প্রসার বৃদ্ধিতে প্রেরণা দেন। ভরসা করা চলে যে, এইভাবে সুপরিচালিত কুটীরশিল্প একদিন দেশে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ আনিতে পারিবে। ক্রমবর্ধমান জনস্রোতের ফলে দেশে বেকার-সমস্যা দেখা দিয়াছে। অন্যান্য সমস্যার সাথে অনুন্নত দেশের সর্বপ্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক অবসাদ বা মন্দা। কুটীরশিল্প এইদিক হইতে দেশে এক নূতন মুক্তির বার্তা আনিতে পারে।

একটি নূতন রাষ্ট্রের জন্ম ঃ বাংলাদেশ

বাংলাদেশের জন্ম একালের পৃথিবীর ইতিহাসের এক অভাবনীয় ঘটনা। এই আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি বীরত্বমণ্ডিত। এই অভ্যুত্থান যেমন আদর্শ-উদ্বুদ্ধ, তেমনি মানবতায় সমুন্নত। মানবসভ্যতার ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন জলন্ত নিদর্শন আর নাই।

বাংলাদেশের জন্মের পশ্চাতে একটি রাজনৈতিক ভূমিকা আছে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগেই বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সংকেত নিহিত ছিল। জিন্নার নেতৃত্বে যেদিন পাকিস্তানের জন্ম হয় সেদিন পশ্চিম পাকিস্তান-বাসীদের মত পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরাও নবলব্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনতার আস্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অচিরেই এই মোহ অপনীত হইল। দেখা গেল দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সবই পশ্চিমী পাকিস্তানীদের করতলগত হইয়া গেল। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীবৃন্দ বঞ্চিত সম্প্রদায় হইয়া রহিলেন। দেখা গেল, কার্যত পূর্ববঙ্গ হইয়া উঠিল পশ্চিমীদের উপনিবেশ।

ভারত-বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের বিকাশ সম্ভবপর হইল না, বাংলার অস্তিত্বই খর্ব হইল। পূর্ববঙ্গবাসীর ভাষা-সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবন নিরাপত্তা হারাইল। উর্দুর প্রাধান্যের ফলে বাংলাভাষা মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের ফলে বহু মানুষের রক্তদানে বাংলা ভাষা মর্যাদালাভ করিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী যে স্বাধিকারের সূত্রপাত, তাহারই উচ্ছ্বসিত বিকাশ বাংলাদেশ আন্দোলন।

স্বাধিকার চেতনার আন্দোলন মানুষের ভাবজগতের সম্পদ, কিন্তু অন্নবস্ত্রের সমস্যাও জীবনের কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ১৯৫৮ সালে অক্টোবর মাসে জেনারেল আয়ুব খাঁ সামরিক শাসন জারী করিয়া পূর্ববঙ্গের অধিবাসীবৃন্দকে নিপীড়িত ও পর্যুদস্ত করিলেন। এই শোষণ ও শাসন দেশে এক অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি করিল। শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য স্বাধীনতার সাধকবৃন্দ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

এই অবস্থা বেশীদিন থাকিল না। আয়ুব খান অবশেষে জেনারেল ইয়াহিয়ার হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। ইয়াহিয়া খান দেশের সাধারণ মানুষের মতামত বুঝিবার জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিলেন। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সাফল্য সহজেই সংঘটিত হইল, এই সাফল্য জেনারেল ইয়াহিয়া খানের স্বপ্নাতীত ছিল—তাই এই সাফল্যে তিনি অভিভূত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর পরামর্শে সময় হাতে লইয়া মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসিলেন। ইহা ছিল একটি ঘৃণ্য রাজনৈতিক কৌশল। এইভাবে দশ দিন অতিবাহিত হইল। সেই সুযোগে পাকিস্তান হইতে পূর্ববঙ্গে রণসজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ দেশে সামরিক শাসন জারি করা হইল। ২৬শে মার্চ দেশময় বিক্ষোভের তরঙ্গ আছড়াইয়া পড়িল। এক দুর্নিবার জাতীয় অভ্যুত্থান দেখা দিল। সমগ্র দেশময় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী এক সন্ত্রাসের রাজত্ব সুরু করিল। এমন পৈশাচিক অত্যাচারের চিত্র ইতিহাসে আর দেখা যায় না। খান সেনাদের অত্যাচারে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, দেশপ্রেমিক সকলেই ভয়াবহ তাণ্ডবের মুখে পড়িল। বহু জীবন ধ্বংস হইল, বহু গৃহ লুণ্ঠিত হইল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-অফিস-আদালত-হাসপাতাল সবই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল, দেশের উপর এক ভয়ংকর তাণ্ডবের স্রোত প্রবাহিত হইল। শেখ মুজিবর রহমান ইয়াহিয়া-ভুট্টোর চক্রান্তে বন্দী হইলেন। সন্ত্রস্ত মানুষ, গৃহহারা

মানুষ, বিপন্ন মানুষ সকলেই একে একে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতবর্ষের পথে পা বাড়াইল। ভারত সরকার হাজার হাজার আশ্রয় শিবির খুলিয়া এই আশ্রয় হারা মানুষদের আশ্রয় দিলেন।

ইয়াহিয়া শাহীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়া বাংলাদেশের 'মুক্তিফৌজ' এক অসাধারণ সাহস ও শক্তির পরিচয় দিলেন। স্বাধীনতার জন্য উদ্বেল মানুষ এই সংগ্রামের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলায় রত হইল। বাংলা দেশের ভিতরে 'গেরিলা' যুদ্ধের নীতি চালাইয়া দুর্ধর্ষ শত্রু-বাহিনীকে তাহারা বিপন্ন করিয়া তুলিল। ভারত তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া 'মুক্তিফৌজ'-কে সাহায্য করিল। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দেশে-দেশে জনমত সৃষ্টি করিয়া পূর্ববঙ্গের ন্যায্য স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি বিশ্ববাসীর মনকে প্রভাবিত করিলেন। ভারতের দুর্ধর্ষ সশস্ত্র বাহিনী পাক-বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। এই ভয়ংকর যুদ্ধের করুণ পরিণতি হইল পাক সেনাধ্যক্ষ লে. জেনারেল নিয়াজির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিফৌজের কাছে পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করিল।

শেখ মুজিবের বন্দীদশা অবসানের জন্য নানা দিক হইতে অনেক চাপ সৃষ্টি করা হইল। অবশেষে মুজিব মুক্তিলাভ করিলেন। নতুন বাংলাদেশ গঠনের জন্য শেখ মুজিব প্রধান মন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার লইলেন। এই স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক শেখ মুজিব বাংলাদেশের কর্ণধার হইলেন। গণতন্ত্র, জাতীয়তা, ধর্ম-নিরপেক্ষতার মন্ত্র লইয়া নূতন সংবিধান রচনা করা হইল। স্বাধীন বাংলার জন্ম হইল। নতুন রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য দেশ-দেশান্তরের মানুষ উৎসুক হইলেন, আবার কেহ কেহ নীরব রহিলেন। তবু এই নবজাতকের জন্মলগ্নে ললাটে লিখা রহিল একটি বাণী "জয় বাংলা"।

বাঙালীর উৎসব

উৎসবের দিন মানুষের সমাজে আনন্দের দিন বলিয়া গৃহীত হয়। উৎসবের মধ্যে মানুষের আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য ও মিলনের প্রকাশ দেখা দেয়। উৎসবের তাৎপর্য তাই মিলনের তাৎপর্য, একাত্মবোধের তাৎপর্য। উৎসব কেবল আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি নয়, মনুষ্যত্বের গভীর উপলব্ধি।

উৎসবের দিন অন্যান্য দিন হইতে স্বতন্ত্র। তাই ক্যালেণ্ডারের পাতায়

এ দিন আনন্দ-রক্তিম বর্ণে চিহ্নিত। বৎসরের অন্যান্য দিন অভ্যাসের ম্লান স্পর্শে মলিন, সুখদুঃখের জড়তায় তমোপূর্ণ, তাই মনে হয় এই দিনগুলি প্রকাশ সম্পদ হইতে বঞ্চিত। কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ একা নয়, অনেকের সাথে মিলিত। তাই মানুষ এই দিনে প্রকাশবান ও তাৎপর্যময়।

বাঙালী উৎসব-প্রিয় জাতি। এদেশের একটি বহুশ্রুত প্রবাদ আছে, 'বার মাসে তের পার্বণ'। এত উৎসব-বৈচিত্র্য অন্য কোন দেশের সামাজিক, ধর্মীয় জীবনে আছে কিনা সন্দেহ। এই উৎসবের মধ্যে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা প্রকাশিত হয়। কখনও কখনও ঋতু-চক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসব নির্নীত হয়। কখনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া, কখনও স্বজন-প্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া, কখনও জনহিতকর নানা কার্যাবলীকে লইয়া এই উৎসব আবর্তিত হয়। নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, মহাপুরুষ আর্বির্ভাব-তিথিও এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে। বাঙালীর উৎসবে দেব-মাহাত্ম্য, মানব-মাহাত্ম্য ও প্রকৃতি-মাহাত্ম্য সবই আছে।

নূতন ঋতুর আর্বির্ভাবে আনন্দ প্রকাশ করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। বর্ষার দুর্ভোগ শেষ করিয়া শরৎকাল আসে বলিয়া শারদোৎসবের মধ্যে মানুষ আনন্দ করে।

বসন্তে মানুষের মধ্যে হৃদয়ানন্দের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ দেখা দেয় বলিয়া বসন্তোৎসবের মধ্যে মানুষ অফুরন্ত আনন্দ পাইয়া থাকে। আমাদের দেশে দুর্গাপূজা যেমন শারদোৎসব বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়া থাকে, শ্রীপঞ্চমী ও দোল তেমনি বসন্তোৎসবের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সরস্বতীপূজা সর্বজনীন উৎসব। কেবল বিদ্যার্থী-সমাজের নয়, আবালবৃদ্ধবণিতার প্রিয় এই উৎসব। এ ছাড়া 'দীপান্বিতা' উৎসব বা 'হোলি' উৎসব সর্বসম্প্রদায়ের আনন্দ-লীলাময় উৎসব।

উৎসবের সঙ্গে সামাজিক মানুষের ব্যবহারিক আকাঙ্ক্ষা বা বাস্তব-বাসনা যেমন জড়িত থাকে, কবিকল্পনাও তেমনি যুক্ত থাকে। শস্যোৎসব এমনই এক উৎসব। জীবনযাত্রার কেন্দ্রভূমিতে আছে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা। শস্যোৎসবের মধ্যে মানুষের ব্যবহারিক আকাঙ্ক্ষার পরিচয় বর্তমান।

নবান্ন ও অম্বুবাচী এমনই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শস্যোৎসব। নতুন ধান দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঘরে ঘরে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। নবান্নে নূতন অন্ন পিতৃপক্ষীয়-মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া,

দেবতা-মানুষ ও প্রাণীকুলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। উৎসবের কল্যাণশ্রী ও একাত্মতা ইহাতে বর্ধিত হয়। পৌষপার্বণের অন্তরালেও শস্য-বন্দনাই মুখ্য স্থান অধিকার করে। অম্বুবাচীও মুখ্যতঃ শস্য-বন্দনা বা শস্যোদগম উপলক্ষে উৎসব। ইহা উৎপাদন-শক্তি বা শ্রীবৃদ্ধির স্মারক উৎসব।

হিন্দু-সমাজে প্রকৃতিকে এক একটি শক্তির আধার রূপে কল্পনা করা হয়। এই কল্পনা হিন্দু-সমাজের কল্পনা। পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উৎসবের মধ্যে হিন্দুর কল্যাণ-কামনা ও বিশ্বাত্মবাদের প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়।

নববর্ষ উৎসব, স্বাধীনতা দিবস-উৎসব, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব। এই উৎসব সর্বজনীন। এই সব উৎসবে সাংস্কৃতিক দান প্রতিদান, শিল্প-সংগীত সাহিত্যের চর্চা ও চর্যার একটি প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

পারিবারিক উৎসবের মধ্যে জন্মোৎসব এখন ধর্মীয় সূত্র হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হইয়াছে। জন্মোৎসব আসলে জন্মতিথি পূজা—কিন্তু আজকাল অনেক গৃহে এই তিথি-পূজা একটি সংগীত-সংস্কৃতির সহর্ষ মিলনসূত্র হইয়া উঠিয়াছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও জামাইষষ্ঠী এদেশে জনপ্রিয় পারিবারিক উৎসব। এই সব উৎসবে স্বজন কল্যাণ-কামনা বর্ষিত হয়, পারিবারিক আনন্দচক্র সৃষ্টি হয়। এই সব উৎসবের লক্ষ্য কল্যাণ-কামনা ও একাত্মতা বোধ।

বাঙালীর একান্নবর্তী পরিবার

বাঙলাদেশ ঐতিহ্যপ্রধান দেশ। যুগ যুগ ধরিয়া রামায়ণ মহাভারতের জীবনাদর্শ বাঙালী জীবন ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বহুকে এক করিবার সাধনা এদেশের জীবন সাধনা। বাঙালী পরিবার এই সাধনার সার্থক রূপ। একান্নবর্তী পরিবার মিলিত জীবনের সাধনা, বহুমুখী কর্মোদ্যম ও জীবনাচারকে সংহত করিবার সাধনার মধ্যে পর্যবসিত হইয়াছে।

মানুষের সামাজিক জীবনের প্রধান গুণ কর্তব্য-চেতনা। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে এই কর্তব্যচেতনা ও যৌথ-স্বার্থবোধের চর্চা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিমুখী সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই যৌথ-স্বার্থবোধ লুপ্ত হয়।

সমষ্টিগত সমাজের ফলশ্রুতি একান্নবর্তী পরিবার। পরিবারই হচ্ছে সমাজের ক্ষুদ্রতম সংস্থা। এই সংস্থার ঐক্য ও সামঞ্জস্যে সমাজ সুসংগঠিত হয়। তাই সমাজের প্রাণ পরিবার। একান্নবর্তী পরিবার এক স্বার্থ, এক প্রেরণা, এক প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত। তাই ঐক্যবোধের বন্ধনে পরিবার বাঁধা পড়ে। আগে একান্নবর্তী পরিবারের গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী, পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা-নাতি-নাতিনীবৃন্দ সকলেই ঐ এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিত। প্রতিটি পরিবার ছিল 'সুখী সংসার'। কিন্তু কালের নিয়মে এই আদর্শ বিধ্বস্ত হইল।

নতুন কালের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র বদলাইয়া গেল। পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে এদেশের একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরিয়াছে। একান্নবর্তী পরিবারের কেন্দ্রীয় শক্তি ঐক্যবোধ। এই ঐক্যবোধ পশ্চিমের ব্যক্তিপ্রধান সমাজের প্রভাবে অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হইয়াছে। পশ্চিমী সভ্যতার প্রভাবে বাঙালী তথা হিন্দুসমাজের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে। এই পরিবর্তনের ফলে রামায়ণ মহাভারত-আশ্রিত জাতীয় ঐতিহ্য লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। যৌথ-সমাজ-চিন্তা বা সমষ্টিগত চিন্তা সমাজ হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছে। প্রতিটি ব্যক্তি তাহার স্বার্থবোধ লইয়া যৌথ-চিন্তাকে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়। স্বকীয় স্বার্থচেতনা বিসর্জন দিয়া পরিবার-গোষ্ঠীর ভালো-মন্দর সঙ্গে একাত্ম হইবার শিক্ষাদীক্ষা না থাকিলে এই প্রথা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই নূতন কালের স্বাতন্ত্র্যধর্মী চিন্তায় এই প্রথা অনিবার্য নিয়মে ধ্বংস হইয়া গেল। মানুষের সমষ্টিগত সম্পর্কের ভিত্তি গোষ্ঠীভাবনা। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ একাধিক মানুষের সুখদুঃখের সহিত একাত্ম হইতে পারিত। কিন্তু ব্যক্তিপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থায় স্নেহ-দয়া-মায়া-প্রীতির চর্চা অপেক্ষা ব্যক্তির বিকাশের প্রশ্নই প্রধান হইয়া উঠে। তাই ত্যাগ অপেক্ষা ভোগ, হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা শুধু ব্যক্তিত্ব বিকাশ যে প্রথা বা ব্যবস্থায় যত বেশি চরিতার্থ হয়, ব্যক্তিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা সেই প্রথাকে তত পছন্দ করে। তাই আধুনিক ব্যবস্থায় একান্নবর্তী পরিবার পুরাতন ক্ষয়িষ্ণু এক সংস্থা।

একান্নবর্তী পরিবারের কতকগুলি সদর্থক দিক আছে। প্রথমতঃ, এই পরিবারে মানুষের হৃদয়বৃত্তির চর্চার সুযোগ আছে। মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহ বা আত্মত্যাগের প্রকৃতিবিকাশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র একান্নবর্তী পরিবার। মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংযম প্রতিষ্ঠা

করিতে হইলে, একান্নবর্তী পরিবারই প্রধান বেদীপীঠ। একান্নবর্তী পরিবারে আর একটি সুফল উল্লেখযোগ্য; ইহাকে বলা চলে নিরাপত্তার বোধ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা একান্নবর্তী পরিবারে লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক পরিবারেই দু-একজন অক্ষম বা দুর্বল ব্যক্তির অবস্থান খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ নয়। একান্নবর্তী পরিবারে ইহাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা নিঃসংশয়। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত একান্নবর্তী পরিবার দুর্বল স্বজনের আশ্রয়-দুর্গ। তৃতীয় সদর্থক দিক এই, যে মানুষের মধ্যে 'বড়ো-আমি'-র লালন-পালন এই ব্যবস্থায় সম্ভব হয়। এই 'বড়ো-আমি'র-র ফলশ্রুতি দেশপ্রীতি, সমাজপ্রীতি ইত্যাদি বৃত্তি। এই বৃত্তিগুলির অঙ্কুরোদ্গম হয় একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থায়।

একান্নবর্তী পরিবারের নঙর্থক দিক এই যে, এই প্রথায় একটি সফল বা কৃতী ব্যক্তির উপর পরিবারের অন্যান্য লোকজন অযৌক্তিকভাবে নির্ভরশীল হইয়া উঠে। ফলে অনেকে অলসভাবে জীবনযাপন করে। অনেক ক্ষেত্রেই উৎসাহাভাবে বা আগ্রহাভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় না। দেশের অর্থনীতি এইভাবে গতিশীল হইতে পারে না। একটি দেশের বা জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষে ইহা অন্তরায়। ব্যক্তির প্রতিভাও অনেকক্ষেত্রে বিকশিত হয় না। নানা দিক হইতে ইহা এক শোচনীয় অপব্যয়। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক জীবনযাত্রার পক্ষে ইহা প্রতিকূল। আধুনিক জীবনযাত্রার ধ্যান-ধারণা ব্যক্তিমুখী। তাই আধুনিক জীবনের উন্নত মান অর্জন করিতে হইলে এই একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা সম্ভব নয়।

কালের গতিতে সমাজ ও জীবনের পরিবর্তন হয়। সমাজের ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে মানুষের নিত্যনূতন অভিযোজনই সমাজের ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করে। এই পথে একান্নবর্তী পরিবার আজ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইতিহাস বিধাতার আশীর্বাদ যদি ইহার উপর বর্ষিত হয়, তবে কোন বাধাই আর বাধা থাকিবে না। ইহাই হইবে কালের বিধান।

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

যে বাঙালী জাতি হিসেবে একদিন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নায়কের মত আবির্ভূত হইয়াছিল, যে বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মনীষার দীপ্তি দেশে-

বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই বাঙালী জাতি পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ-পরিক্রমার শেষে আজ ক্লান্ত ও অবসিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে বাঙালীর বুঝি জাগিবার আর আশা নাই। হয়ত নানাচারী তথ্য এই সত্যকেই উদ্ভাসিত করিবে বাঙালীর আত্মবিকাশের পথ আজ রুদ্ধ।

ভারতবর্ষ এক বিরাট দেশ। এই বিরাট দেশের মধ্যে বাঙালী জাতি শিক্ষায়-দীক্ষায় স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনায় সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। কিন্তু ভারত-বিভাগের নিয়তির নির্দেশে বাঙালী আজ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে এক অসহায় জীবনযাপন করিতেছে।. পূর্ববঙ্গ আজ স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে, পূর্ববঙ্গের মানুষ আজ স্বাধীন বাঙলাদেশের মানুষ। কিন্তু অর্থনৈতিক ভাগ্য তাহাদের এখনও নিজের হাতে আসে নাই। আর্থিক দুঃখদুর্দশা তাহাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার আনন্দকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে নাই। তবু এই অভিনব অভিজ্ঞতা তাঁহাদের বীর করিয়া তুলিয়াছে।

দেশ-বিভাগের অশনি-আঘাত পশ্চিম বাঙলাকে করিয়াছে অসহায়। পূর্ববাঙলার দুঃখদুর্দশা পশ্চিমবাঙলাকে বিচলিত করিয়া তোলে। তাই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দলে দলে শরণার্থী পশ্চিম বাঙলাতেই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। দেশ বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও উদ্বাস্তু-সমস্যা, বেকার-সমস্যা ও বাঙলার বাণিজ্যসংকট পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা আনয়ন করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ক্রমে ক্রমে জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙালী আজ নানা জাতিগত বৈরিতার সম্মুখীন। দেশের বাহিরে বাঙালী আজ অপ্রিয়, দেশের সংস্কৃতির বিকাশের পথ রুদ্ধ। একদা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাইয়াছে। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত বাঙালী আজ ধ্বংসের পথে। তাহার অর্থনৈতিক ভিত্তি ভাঙিয়া গিয়াছে, পরাজিত মানুষের হতাশা তাহার দেহ-মনে পুঞ্জিত হইয়াছে। চাকরির প্রতিযোগিতায় বাঙালী আজ কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে। বেকারত্বের অভিশাপ আজ দেশকে গ্রাস করিয়াছে।

জাতি হিসাবে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করিয়াছে তাহার দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর ; দুর্ভিক্ষে বন্যায় খরায় সাধারণ বাঙালী আজ আক্রান্ত। পুষ্টির অভাবে বাঙালী আজ দৈহিক স্বাস্থ্য হারাইতে বসিয়াছে। জীবন-যুদ্ধে দাঁড়াইবার মত বীর্য ও শক্তি বাঙালীর আজ নাই। যে জাতি স্বাধীনতা-সংগ্রামে

অকুতোভয় হইয়া মৃত্যুর মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, সেই জাতি আজ নানা দুঃসাধ্য মহামারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, দৈহিক স্বাস্থ্য হারাইয়া এক সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন।

দেশের কৃষি ও শিল্প আজ কোন আশার চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে না। বাঙলা দেশের কৃষি-সম্পদ অসামান্য। যে জমি 'আবাদ করলে ফলতো সোনা', সেই জমি আজ বন্ধ্যা না হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহার উৎপাদন যে স্বল্প, একথা না বলিয়া কোন উপায় নাই। কারণ আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে কৃষকদের হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই, এবং কৃষককে এখনও প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। দেশে 'পতিত জমি' উদ্ধারের বৃহৎ যজ্ঞ এখনও সুসম্পন্ন হয় নাই। দেশে পূর্বের তুলনায় ফসল-উৎপাদন বাড়িলেও, এই ফসলকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজন, তাহা এখনও দেশবাসীর করায়ত্ত হয় নাই। শিল্পেও বাঙালী পূর্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষেত্রে নায়কের স্থান গ্রহণ করিয়া আছে প্রতিবেশী রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ। শিল্পোন্নয়নের উপযোগী ভৌগোলিক সংস্থান থাকা সত্ত্বেও অনেক শিল্পের অনুমতি-পত্র এদেশে না পাওয়ায়, সেই সব শিল্প অন্যদেশে অপসৃত হইয়াছে। ইহা বাঙালীর অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যের সূচনা করিয়াছে।

প্রতিবেশীসমাজে বাঙালী কোণঠাসা, অনেকের দৃষ্টিতেই বাঙলাদেশ 'সমস্যা-সঙ্কুল রাজ্য'। বেকার-সমস্যায় জর্জরিত বাঙলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় আজ ক্ষুব্ধ, বিপন্ন, হতাশ। 'What Bengal thinks today India thinks tomorrow'-উক্তির প্রতিধ্বনি আজ প্রতারিত বাঙালীর কাছে মৃত অতীতের অবিশ্বাস্য উক্তি বলিয়া মনে হয়। তবু আশা মৃত্যুঞ্জয়, আশা অপরাজিত। বাঙালীর প্রাণের সাধনা দুঃখ-দুর্দৈব মহামারীকে অতিক্রম করিয়া একদিন তাহাকে ভাস্বর অতীতের যথার্থ উত্তরাধিকারীরূপে প্রস্তুত করিবে। ভারতবর্ষের সামগ্রিক প্রগতির পথে অন্যান্য বন্ধু দেশের মত বাঙালীর যথাযোগ্য স্থান এদেশের শক্তিকে পরিবর্ধিত করিয়া তুলিবে, এই প্রার্থনা সকলের অন্তরের প্রার্থনা।

শিক্ষার মূল্য

শিক্ষা মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহা জীবনকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। তাই সমাজের অগ্রগতি, মানুষের প্রগতি নির্ভর করে শিক্ষার সার্থকতার উপর। যে জাতির শিক্ষা নাই, সে জাতির দিবার মত ধন নাই, ইতিহাসের কর্মযজ্ঞে সে জাতির ভূমিকা নিঃস্বের। যে ব্যক্তির শিক্ষা নাই, সে ব্যক্তির জীবন বৃথা। তাই শিক্ষাকে বলা চলে মানব সমাজের হৃৎপিণ্ড।

শিক্ষা বলিতে বোঝায় পূর্বাচার্য-বাহিত জ্ঞানের চর্চা। জ্ঞান আমাদের পরিবেশকে বুঝিতে সাহায্য করে। এই বোধ দ্বারা নূতন পরিবেশকে আয়ত্ত করার ক্ষমতা লাভ করা যায়। শিক্ষার দ্বারাই মানুষ সৃজনক্ষমতা অর্জন করে। সে নূতন নূতন বস্তু সৃষ্টি করিয়া সমাজবদ্ধ মানুষের নানামুখী চাহিদা পূরণ করে। শিক্ষা তাই লব্ধ-জ্ঞানের সঙ্গে পরিবেশ-জনিত জ্ঞানের সমন্বয়। শিক্ষা সৃষ্টিমূলক বলিয়া মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে ইহার অবদান অসীম। শিক্ষা একদিকে ঐতিহ্য নির্ভর, অন্যদিকে সৃষ্টিমূলক।

মানুষের ভিতরে জৈবশক্তি দুর্বার। আবার শৈবশক্তিও দুর্লক্ষ্য নয়। শিক্ষা মানুষের মধ্যে ডকটর জেকিল ও মিস্টার হাইডের দ্বন্দ্বকে এক সুসমঞ্জসকল্যাণমুখী সার্থকতায় নিয়োজিত করে। অর্থাৎ মানুষের পাশব-শক্তিকে আনন্দ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে। মানুষ আলোকার্থী। এই মৌলিক সত্য অস্পষ্ট থাকিয়া যায় যদি না তাহার পশ্চাতে শিক্ষার প্রেরণা না থাকে। মানুষের প্রতিভাবিকাশের প্রেরণাকে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে সমাজকর্মে নিয়োগ করার সার্থকতার নামই শিক্ষা। এইখানেই শিক্ষার মূল্য।

শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবস্তু। সেইজন্য শিক্ষার গুরুত্ব সর্বসমাজেই সমান। উন্নতিশীল দেশগুলিতে শিক্ষার মাহাত্ম্য সর্বাধিক। তাই শিক্ষার নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা উন্নত দেশগুলিতে এত বেশী করিয়া হইয়াছে। শিক্ষার যেমন একটা ব্যবহারিক দিক আছে, তেমনি আর একটি পরমার্থিক দিক আছে। ব্যবহারিক দিক বলিতে বোঝায় শিক্ষা যেখানে সমাজমুখী, বস্তুমুখী ও প্রয়োজন-নিষ্ঠ। পরমার্থিক দিক বলিতে বোঝায় শিক্ষা যেখানে

আত্মিক কল্যাণে নিবদ্ধ। শিক্ষা একদিকে যেমন সমাজের বৈভব বাড়ায়, অন্যদিকে তেমনি আত্মিক বৈভব বাড়ায়। তাই য়ুরোপের মত উন্নত দেশগুলিতে একদিকে যেমন শিক্ষাকে যুগোপযোগী করিয়া তোলার জন্য আয়োজনের শেষ নাই, অন্যদিকে ভারতবর্ষের তপোবনের বা গ্রীকদের "লাইসিয়ামের" শাশ্বত আত্মিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, তাই এই বিষয়ে প্রেরণারও শেষ নাই। শিক্ষা তাই বৃত্তিশিক্ষা ও ব্রত-উদ্‌যাপন দুইই হইয়া উঠিয়াছে। বৃত্তিশিক্ষা দ্বারা দেশের বেকার-সমস্যা দূর হয়, দেশের আর্থিক বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাকে যখন ব্রত-উদ্‌যাপন বলিয়া মনে করা হয়, তখন তাহা সম্পূর্ণ মানুষকে গড়িয়া তোলে। শিক্ষা একদিকে যেমন প্রয়োজন মিটায়, অন্যদিকে তেমনি মানুষকে মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষা যেখানে প্রয়োজন-নির্ভর, সেখানে শিক্ষার আবেদন সীমিত। শিক্ষাদর্শ যত আধুনিক হইয়া উঠে, ততই তাহা দেশের বস্তুগত প্রয়োজনকে মিটাইতে চেষ্টা করে। শিক্ষার মূল্য তাই দুই দিকে—একদিকে যুগের প্রয়োজন পূরণ করা, অন্য দিকে চিরকালের প্রয়োজন মেটান। একদিকে বৃত্তিশিক্ষা, অন্যদিকে ব্রতচর্যা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিক্ষা ছিল সমাজজীবনের বাহিরে, ঋষিদের তপোবনে। ধেনু ও বেণু-পরিবৃত শিক্ষা তখন এক স্বতন্ত্র জীবনাচার হইয়া গিয়াছিল। আধুনিক শিক্ষাদর্শ স্বতন্ত্র। এখন শিক্ষার অর্থ দেশ ও সমাজকে পরিবর্তিত করা। সমাজ ও জীবন এখন দ্রুত পরিবর্তনশীল। কোন দেশকে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে গেলে অতীতের কঙ্কাল আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিলে চলিবে না। শিক্ষাকে পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে। নইলে সারা পৃথিবীতে আজ এত উন্নতির জোয়ার, আধুনিক শিক্ষা ছাড়া কিভাবে এই বিশ্ব-উন্নতির সাথে অগ্রসর হইয়া কোন দেশ চলিবে? শিক্ষার বিষয়বস্তুও তাই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। আগে ব্যাকরণ বা ন্যায়শাস্ত্র-স্মৃতিশাস্ত্র বা মীমাংসা লইয়া নবদ্বীপ হইতে ভট্টপল্লীর যত পণ্ডিত মাথা ঘামাইত, এখন কি আর তত লোকে মাথা ঘামায়? কারণ যুগের প্রয়োজনে শিক্ষার বিষয় বদলাইয়া গিয়াছে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিমানবিদ্যা, নৌ-বিদ্যা, সামরিক-বিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, প্রয়োগমূলক মনস্তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি কত আধুনিকী বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে তাহার শেষ নাই। শিক্ষার মূল্য বিষয়-বস্তুর পরিবর্তনে সূচিত করিয়াছে। মানবজ্ঞানের পরিচয়ও আজ কতদিকে বিস্তৃত হইয়াছে।

শিক্ষার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মনুষ্যত্বের জাগরণ, আধুনিকীজ্ঞানের চর্চা ও প্রয়োগ। অর্থাৎ শিক্ষাকে আধুনিক হইতে হইবে আবার মানবিক হইতে হইবে। যে শিক্ষা কেবলই প্রযুক্তিবিদ্যা, সে শিক্ষা যতই সমৃদ্ধি আনুক, মানুষের অন্তর তাহাতে ভরিয়া উঠে না। রবীন্দ্রনাথ-মালব্য-আশুতোষ প্রভৃতি শিক্ষা-নায়কবৃন্দ শিক্ষাকে মানুষের সম্পদ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় শিক্ষাগুরু পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তিনি শিক্ষার মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন শিক্ষার আত্মিক মূল্যে। যে শিক্ষা মানুষকে প্রাণবান, সংস্কৃতিমান ও আত্মাবান করিয়া না তোলে, কবিগুরুর মতে সে শিক্ষা ব্যর্থ। অর্থাৎ শিক্ষা কেবল পুঁথিসর্বস্ব নয়, জীবনধর্মী। শিক্ষার মূল্য নির্ভর করে জীবন-ধর্মিতার উপর। যে শিক্ষা জীবনকে সহজ, সুন্দর ও সুসমৃদ্ধ করে সে শিক্ষা সার্থক। শিক্ষা মানুষের সৃষ্টিশীলতা জাগাইয়া তুলিবে—এইখানেই শিক্ষার মূল্য।

বৃত্তিশিক্ষা

সমাজে মানুষের শক্তিকে কল্যাণমুখী ও সৃজনমুখী কর্মে নিযুক্ত করাই শিক্ষার কাজ। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পথচারণার ফলে অনেক সময় বিভ্রান্তি আসে, ব্যর্থতা আসে, মানবশক্তির অপচয় হয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনা যেমন দেশ-গঠনের কার্যে অপরিহার্য, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও এই পরিকল্পনা ও প্রয়োগের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মানুষের আগ্রহ ও প্রয়োজন, প্রবণতা ও প্রবৃত্তি বিচার করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত বৃত্তিকে সুসংহত ও বিকশিত করার নামই বৃত্তি-শিক্ষা। বৃত্তিশিক্ষা কেবল চিত্তবৃত্তির বিকাশ নয়, ইহা সমাজের মানুষকে বিশেষ বিশেষ কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করে। বৃত্তি-শিক্ষা অর্থে তাই বোঝায় যে শিক্ষা দ্বারা বৃত্তি গ্রহণ ও জীবিকা অর্জন করা হয়। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলিতে এই ব্যবস্থার সার্থকতা পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক সমাজে তাই বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজন সর্বস্বীকৃত।

আধুনিক সমাজ শিল্প-সমৃদ্ধ সমাজ। আধুনিক যুগ শিল্পের বিকাশ ও সমৃদ্ধির যুগ। ভারতবর্ষও এই শিল্পযুগে প্রবেশ করিয়াছে ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। দেশের উন্নতি নির্ভর করে সার্থক শিল্পায়নের উপর।

বৃত্তিশিক্ষা এই শিল্পযুগের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া বিকশিত হইতে চলিয়াছে। জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ এই বৃত্তিশিক্ষার দ্বারা জীবনের মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সচলতা সৃষ্টি করিয়াছে। জীবন-সংগ্রামকে স্বীকার করা ও এই ক্ষেত্রে জয়ী হবার মধ্যে শিক্ষার সার্থকতা। বৃত্তিশিক্ষা এই পথেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করে।

বৃত্তিশিক্ষা অর্থকরী শিক্ষা। এই শিক্ষা শিক্ষাতত্ত্বের আত্মিক দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করিয়া তোলে না। শিক্ষার মধ্যে যে মানবিক দিক আছে, সে সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে ততখানি অবহিত করে না। শিক্ষার ব্যবহারিক দিককে গুরুত্ব দিয়া সমাজের মানুষকে এক জীবিকানির্বাহের জন্য উপযোগী করিয়া তোলাই বৃত্তিশিক্ষার উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা মানবতাধর্মী বা আত্মাবাদী, সে শিক্ষার মূল্য অন্য স্তরের। কিন্তু বৃত্তিশিক্ষা জাতির বনিয়াদকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া রাখে। বেকার সমস্যা আজ ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমস্যা। জাপানেও একদিন এ অবস্থা ছিল। হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়া প্রয়োগ-বিদ্যার দক্ষতার উপর বৃত্তিশিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। ভাববাদী শিক্ষার জন্য চাই মনন, মেধা ও প্রতিভা। কিন্তু বৃত্তিশিক্ষা সাধারণ মানুষের কাছে অস্ত্রস্বরূপ।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা নানাশ্রেণীর হইতে পারে। আমাদের মত কৃষি-প্রধান দেশে, কৃষি-শিক্ষাই বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হইতে পারে। গ্রামে কুটীর-শিল্প যুগ যুগ ধরিয়া পরিচিত ও স্বীকৃত। কৃষির প্রয়োগধর্মী জ্ঞান কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজন। গ্রামে বৃত্তিশিক্ষার প্রাথমিক স্তর নির্ভর করে কৃষি-মূলক ও কুটীর-শিল্পমূলক ব্যবস্থার উপর। গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এই কার্যকরী শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিল্পশিক্ষাও একপ্রকার বৃত্তিশিক্ষা। শিল্পায়নের যুগে শিল্পশিক্ষার জন্য দেশে নানা 'পলিটেকনিক স্কুল', 'টেকনিকাল স্কুল' 'মাইনিং স্কুল', 'কমার্শিয়াল স্কুল বা কলেজ' গড়িয়া ওঠা প্রয়োজন। দেশের বড় বড় কারখানাতে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রস্তুত করাও অন্যতম পদ্ধতি।

শিক্ষার দুই দিক জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের উপর গুরুত্ব মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবে ('ওয়ার্ধা প্রস্তাব') ধরা পড়িয়াছে। গান্ধীজীর 'নঈ-তালিম'-ও এই কর্মকাণ্ডের একটি স্তর। মুদালিয়ার কমিশন, রাধাকৃষ্ণণ কমিশন প্রভৃতি শিক্ষা-প্রস্তাবেও বৃত্তিশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

বৃত্তিশিক্ষাও একপ্রকার গণশিক্ষা। সাধারণ মানুষের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে মনোযোগ-নির্ধারণের জন্য ভারতবর্ষ ও আমেরিকার সহিত কারিগরি শিক্ষাগত চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তি এদেশের পক্ষে সুফলপ্রসূ হইতে পারে।

বৃত্তিশিক্ষার সুফল অনেক। ইহা দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ তৈয়ারী করে। সাধারণ মানুষের কর্মশক্তি বা শ্রমশক্তি যথাযোগ্য পথে পরিচালিত করে। দেশের সাধারণ মানুষের স্বাবলম্বন বা স্বাধীনতার আদর্শ আনয়ন করে। বৃত্তিনির্বাচন অভিভাবকদের পক্ষে একটি বিভ্রান্তিকর ব্যাপার। এই বিভ্রান্তির কুয়াশা হইতে যুক্তি দিয়া তরুণ মন ও শক্তিকে ঠিক পথে চালিত করিবার মধ্যে বৃত্তিশিক্ষার সার্থকতা। কিন্তু ইহার অত্যধিক গুরুত্ব জাতির মধ্যে কারিগর সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে পারে, ভাবুক সম্প্রদায় সৃষ্টি না করিতেও পারে। একটি দেশে চিন্তাবীরের প্রয়োজন আছে। চিন্তার জাগরণের জন্য মানবতাবাদী বিদ্যার উদ্যোগ আয়োজন প্রয়োজন। বাঙলাদেশ ভাববাদীর দেশ—এ দেশের পক্ষে বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অসীম। কিন্তু যে দেশে ভাবের ঘরে চুরি হইয়া গিয়াছে, সেদেশে কারিগরি বিদ্যা গোটা মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে না। 'Man cannot live by bread alone'—কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

শিক্ষা ও ভ্রমণ

ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ। শিক্ষা যেমন শিক্ষালয়ে বসিয়া অর্জন করা যায়, তেমনি শিক্ষা জীবনের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও লাভ করা যায়। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র হইতে শিক্ষালাভ না করিতে পারিলে শিক্ষার সার্থকতা হয় না। শিক্ষা তাই শ্রেণী গৃহে আবদ্ধ তত্ত্বচর্চা নয়, শিক্ষা প্রয়োগনির্ভর। যে বিদ্যা কেবল তত্ত্বাশ্রয়ী, সে বিদ্যা অর্ধ-সত্য। প্রাচীন ভারতবর্ষে বিদ্যার দুইভাগ করা হইয়াছিল : জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। জ্ঞান ও কর্মের যোগসাধনই সার্থক শিক্ষা। যে শিক্ষা প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত, সেই শিক্ষাই খাঁটি শিক্ষা। ভ্রমণ এই দিক হইতে শিক্ষার অঙ্গ হইয়া উঠে। তাই শিক্ষার জন্য দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

তত্ত্বকেন্দ্রিক জ্ঞানের সীমা থাকিতে বাধ্য। এই জ্ঞান অস্পষ্ট, ভাবাশ্রয়ী ও অমূর্ত। এই জ্ঞান পুঁথির অক্ষর-সজ্জা হইতে বাহির হইয়া মনে দানা

বাঁধিবার আগে একটি বাস্তব ধারণা আবশ্যক। ব্যারমিটারকে জানিতে হইলে আগে ব্যারমিটার দেখা উচিত। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার প্রধান ধর্ম হইতেছে স্পষ্টতা। দেশভ্রমণের ফলে অভিজ্ঞতা বাড়ে, মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আসে। ইতিহাস বা ভূগোল, সাহিত্য বা সমাজতত্ত্বের ছাত্রের পক্ষে তাই দেশভ্রমণ অনস্বীকার্য। কারণ চেতনালোকের আলো-আঁধারি হইতে প্রত্যক্ষতায় জ্ঞানকে দাঁড় করাইবার জন্য এই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।

মানুষই জ্ঞানের লক্ষ্য। মানুষকে লইয়াই বিদ্যাজগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই প্রাচীন মনীষী বলিয়াছেন, 'Nothing human is foreign to me'! দেশভ্রমণের মধ্যে মানুষকে জানার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। মানুষের নানাচারী রূপ, তাহার প্রকৃতি, তাহার সমাজ-জীবন, আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন জীবন কেবল নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত বা ঐতিহাসিকের আগ্রহের বিষয় নয়, যে কোন জ্ঞানীরই পরম কাম্য। মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা সার্থক শিক্ষা।

সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দেশভ্রমণের অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ ঔপন্যাসিকদের কর্ম মানুষকে লইয়া। মানুষের স্বরূপ ও দেশবিদেশের আচার-আচরণকে জানিবার জন্য দেশভ্রমণের উপযোগিতা অনেক। বিদেশী ঔপন্যাসিকগণ এইজন্য দেশে-দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতালাভের উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়িয়া বাহির হন। রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যকর্মের প্রেরণা ছিল দেশভ্রমণ। বিশ্বপরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে সৃষ্টিশীল করিয়া তুলিয়াছিল।

ভ্রমণ মানুষকে চারি দেওয়ালে বদ্ধ জীবন হইতে মুক্তি দিয়া উদারতার আকাশে পাঠাইয়া দেয়। চিত্তপ্রসার ও চিত্তশুদ্ধি শিক্ষার মূল কথা। সংস্কৃতিমান মানুষ তাই ভ্রমণকে পছন্দ করে। বৃহতের সান্নিধ্যে, প্রকৃতির ক্রোড়ে মানুষ শান্তি ও বিশালতা লাভ করে। নাগরিক সমাজ ও সম্পর্কের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা, রূঢ়তা ও যান্ত্রিকতা আছে, ভ্রমণের মধ্যে তাহার মুক্তি লক্ষ্য করা যায়। ভ্রমণের আনন্দ শিক্ষাকে সহজ, সুন্দর ও সজীব করিয়া তোলে। লাইব্রেরী-বিহারী সরস্বতী তাই বিশ্বের আনন্দযজ্ঞে আনন্দময়ী হইয়া উঠেন। শিক্ষার মধ্যে আনন্দের প্রেরণা থাকিলে সেই শিক্ষা সার্থক হইয়া উঠে।

ছাত্রজীবনের কর্তব্য

ছাত্রজীবন জীবন-গ্রন্থের সূচনা অংশ। যে গ্রন্থের সূচনায় ত্রুটি থাকে, সে গ্রন্থের সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত হয়। তাই জীবনের প্রথম ভাগেই বৃহৎ প্রস্তুতির অবকাশ। এইজন্য ছাত্রজীবনকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল বলা হইয়াছে। ছাত্রজীবনের কর্তব্য তাই দুরূহ সংযম ও ব্রতনিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। ছাত্রজীবনই প্রস্তুতি-পর্বের কাল।

ছাত্রজীবনের সাধনা মনুষ্যত্বের সাধনা। চিত্তবৃত্তির সামগ্রিক অনুশীলন ও বিকাশই ছাত্রজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ছাত্ররা যাহাতে জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারে, নিজেকে সার্থকভাবে গড়িয়া তুলিয়া যদি দেশ ও জাতির কার্যে আসিতে পারে, তাহার জন্ম প্রথম হইতেই প্রস্তুতির প্রয়োজন। দেশের ঋণ, সমাজের ঋণ, মাতাপিতার ঋণ পরিশোধ করাই জীবনের লক্ষ্য! তাই ছাত্রজীবনই এই বিবেকসৃষ্টির সময়। এইজন্যই মানবীয় শিক্ষায় সমৃদ্ধ না হইলে ছাত্রজীবনের শিক্ষা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

ছাত্রজীবনের অভিভাবক হন শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষালয়ে এই জীবন গঠিত হয়। ছাত্রজীবনে তাই শিক্ষালয় ও শিক্ষকবৃন্দের নিকট ঋণ সর্বাধিক। শিক্ষার এই ঋণশোধের জন্ম যে বিবেক সৃষ্টির প্রয়োজন, সেই বিবেকের জন্ম হয় এই সময়। শিক্ষকের তপস্যা যেমন আদর্শ শিক্ষক হওয়ার জন্য, ছাত্রের তপস্যা তেমনি সুষ্ঠু বিবেক সৃষ্টির জন্য। আজকে দেশের যে দুর্যোগ সর্বত্র গ্রাস করিয়াছে, সেই দুর্যোগের দিনে এই সত্য বিশেষ করিয়া স্মরণ করা উচিত। একজন বিদেশী পণ্ডিত বলিয়াছেন, কৃতজ্ঞতাই বিদ্যার ভিত্তি। ভারতবর্ষের গুরু-শিষ্য-সংবাদে এই কৃতজ্ঞতার ঐতিহ্যই পরিস্ফুট হইয়াছে। সুতরাং ছাত্রজীবনের সুরুতেই যদি এই বিবেক, কৃতজ্ঞতা ও আদর্শবাদ ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়, তবে একটি অখণ্ড মানুষ সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হইবে না।

প্রাথমিক দিক হইতে বলা চলে, ছাত্রজীবনের কর্তব্য অধ্যয়ন। ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ। এখানে অধ্যয়ন অর্থে পাঠ্যপুস্তক-চর্চা নয়—জ্ঞানের অনুশীলন, জাতীয় বিদ্যার উত্তরাধিকার। ইহার জন্য প্রয়োজন মনোযোগ ও অধ্যবসায়। শ্রম না করিলে বিদ্যা হয় না - এই জাতীয় উক্তি কেবল 'বর্ণপরিচয়'-এর পাতায় আবদ্ধ থাকিলে বিদ্যার্থীর বিদ্যালাভ হইবে না। প্রকৃত বিদ্যালাভ

করিতে হইলে ছাত্রকে পরিশ্রমী হইতে হইবে, অধ্যবসায়ী হইতে হইবে। মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় চরিত্র। চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ সময় ছাত্রজীবন। চরিত্রের ভিত্তি এই বিবেকবোধ ও কর্তব্যবোধ। চরিত্রের মূল কথা আন্তরিকতা ও আদর্শে আস্থা। আদর্শের প্রতি আত্যন্তিক নিষ্ঠা না থাকিলে চরিত্র গঠিত হয় না।

বিদ্যাচর্চা যদি কেবলমাত্র কেতাবী হইয়া ওঠে, তাহা হইলে সেই বিদ্যা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বিদ্যা বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। দেশের ইতিহাস, ভূগোল, জীবন-যাপন পদ্ধতি প্রভৃতির সহিত জীবন্ত পরিচয় না থাকিলে পুঁথি-পড়া বিদ্যা সফল হয় না। এইজন্য বিদ্যাচর্চার সহিত দেশভ্রমণ ও নানা বিষয়বস্তুর সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ চাই।

বিদ্বানকে সংস্কৃতিমান হইতে হইলে শিল্প-সংস্কৃতির নানা বিভাগে প্রবেশের উৎসাহ থাকা চাই। দেশ ও জাতি সম্পর্কে কৌতূহল না থাকিলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। সমসাময়িক কালকে ভালভাবে না জানিতে শিখিলে জ্ঞান সার্থক হয় না। সংস্কৃতিমান ব্যক্তিকে একটি সমগ্র দেশ-কালের স্রোত সম্পর্কে ধারণা রাখিতে হইবে।

ছাত্র জীবনকে আমরা 'প্রস্তুতির কাল' আখ্যা দিয়াছি। শ্রদ্ধাপ্রীতি, স্নেহ-মায়া, চরিত্র ও বিবেক প্রভৃতি গঠন করিবার শ্রেষ্ঠ সময় ছাত্রজীবন। মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সময় ছাত্রজীবনের এই উষা-কাল। কারণ এই সময়ে মানুষের মন সজীব ও সরস, কৌতূহলী ও গ্রহণশীল থাকে। দেশের ভবিষ্যৎ নেতাদের নৈতিক চরিত্র না থাকিলে নেতৃত্ব ব্যর্থ হইতে বাধ্য। শিক্ষা-দীক্ষা রাজনীতি-সংস্কৃতি সর্বত্রই নেতৃত্ব দিবার জন্য প্রস্তুতি-পর্বের জন্য ছাত্রজীবনের স্বর্ণ-সময় প্রয়োজন।

ছাত্র অসন্তোষ

ছাত্র-অসন্তোষ আজ একটি বহু পরিচিত বিষয়। শুধু এদেশে নয়, বিশ্বের সর্বত্র আজ ছাত্র-অসন্তোষ ইতিহাসের এক নূতন পর্ব সৃষ্টি করিয়াছে। ছাত্ররা যুগ যুগ ধরিয়া যে শান্ত ও গ্রহণশীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে—এতদিনের পোষ-মানা সুবাধ্য ছাত্র-সম্প্রদায় যদি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, তবে

বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। গবেষকগণ নিশ্চয় কার্যকারণ আবিষ্কার করিতে পারেন, কিন্তু ঘটনার বিস্ময়-প্রাধান্য তাহাতে অপনীত হয় না। সত্যই বিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল প্রশ্ন-চিহ্ন ছাত্র-অসন্তোষ।

ছাত্র-অসন্তোষ আজ আন্তর্জাতিক চেহারা গ্রহণ করিয়াছে। তবু এদেশে ইহা একটি জলন্ত সমস্যা। উন্নত দেশে বা অনুন্নত দেশে এই সমস্যা সমান আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং বোঝা যায় যে অর্থনৈতিক কারণই ইহার একমাত্র কারণ নয়। ইহার নানাচারী কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ অন্যতম হইতে পারে, হয়ত প্রবলতম কারণ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ কারণ ইহা নয়। প্রত্যেকটি ছাত্র আজ সভ্যতার মূঢ়তা ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, এই কৃত্রিম ও অন্তঃসারহীন সভ্যতা মানুষের মধ্যে শুধু বিভেদের দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, মানুষে-মানুষে হানাহানি, দুঃখ ও যন্ত্রণার পাঁচালী লিপিবদ্ধ করিয়াছে, তাই এই বিদ্রোহ। যে সমাজ পচিয়া গলিয়া গিয়াছে, যে সমাজ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই সমাজের বিরুদ্ধে তরুণের বিদ্রোহ আজ আকাশচুম্বী। অসুস্থ ও ব্যাধিগ্রস্থ সমাজের বিরুদ্ধে ছাত্রের এই বিদ্রোহ অকৃত্রিম।

ছাত্র-সমাজ, সমাজ-দ্রোহী, ইতিহাস-দ্রোহী, প্রথা-দ্রোহী তরুণ সম্প্রদায়। এই বিদ্রোহের পটভূমিতে আছে অধিকারচেতনা। শ্রমিক-কৃষকের বিদ্রোহের কথা এতদিন ইতিহাসের ছাত্রগণ শুনিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ছাত্র-বিদ্রোহ এক নূতন বস্তু। ছাত্ররা এক নূতন শক্তি। ছাত্ররা চায় আমূল পরিবর্তন। তাহারা চায় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন। ইহার জন্য তাহারা যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। অভিভাবকদের ব্যবহারে যে কর্ম ও চিন্তায় ফারাক, যে ফাঁকি ও কৃত্রিমতা, তাহার বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিদ্রোহের যৌক্তিকতা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তাই এই বিদ্রোহ অযৌক্তিক নয়, অকারণ নয়, একথা যদি কেহ বলেন, তবে তিনি অন্যায় বলিবেন না।

শিক্ষা ব্যবস্থার আজ সর্বাঙ্গীণ সংকট। স্বাধীনতা লাভের পরও দেশে সাক্ষরতার সংখ্যা যথেষ্ট নয়। অনেকের মতে, শিক্ষাব্যবস্থা আজ মিথ্যা প্রহসনে পরিণত। শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শহীনতা সর্বব্যাপ্ত। শিক্ষাকেন্দ্রগুলি মধ্যযুগে মঠ-মন্দিরে স্থান পাইয়াছিল। সেই হইতে শিক্ষাকেন্দ্রে ধর্মস্থানের মাহাত্ম্য জড়িত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা আজ দলাদলির বিষবাষ্পে আবৃত। কেহ কেহ মনে করেন, শিক্ষার অভিভাবকবৃন্দ আজ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য

সর্বস্ব খোয়াইতে রাজী। অনেকের মতে, পরীক্ষামুখী শিক্ষাব্যবস্থা আজ কর্তৃপক্ষের খেয়ালীপনার ক্রীড়নক। এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা শিক্ষাব্যবস্থার সংকটের অনিবার্য ফল হিসেবে ছাত্র-অসন্তোষকে দেখেন। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, বিদেশে শিক্ষা সংকটের অনুরূপ চিত্র নাই। তবে কেন মেলবোর্ণ বা প্যারিস, বা 'লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস'-এ ছাত্র অসন্তোষ এত বহ্নিমান? ইহার উত্তরে আবার পূর্বপক্ষীয়গণ বলিবেন সেখানে ছাত্র অসন্তোষ প্রচলিত সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সুতরাং বিশৃঙ্খলা অনিবার্য।

বিশৃঙ্খলা যে সত্য একথা অস্বীকার করা চলে না। তবে এই বিশৃঙ্খলা সর্বমুখী কল্যাণ যদি আনিতে না পারে, তবে ইহা একটি শক্তির অপচয়। সংগঠিত বিক্ষোভ যদি শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণ না আনিতে পারে, তবে বিশৃঙ্খলা ধ্বংসাত্মক হইতে বাধ্য। বিপথগামী বিক্ষোভ শিক্ষাজগতে কল্যাণ আনিতে নাও পারে। তাই অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন, প্রশাসনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সুকুমারমতি তরুণ তরুণীর পক্ষে প্রশাসনের গুরুত্ব প্রণিধান করাই দুরূহ ব্যাপার, অংশ গ্রহণ ত' পরের কথা। সুতরাং সমস্যার সমাধান আজ কোন পথে?

যে কোন অসন্তোষের বা বিক্ষোভের একটি নীতিগত দিক থাকা উচিত। ঐতিহ্য-অনুসৃত পথে বা গঠনমূলক লক্ষ্যে যে কোন অসন্তোষ সুপরিচালিত হওয়া উচিত। পুরাতনের অবসান ও নূতনের অভ্যুদয় ত জগতে চিরসত্য। কিন্তু এই পরিবর্তনকে দেশের ঐতিহ্যানুযায়ী চালনা করিলেই ত' সাফল্য আসে। শিক্ষাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে ধ্বংস নয়, সৃষ্টির মন্ত্রে উদ্দীপিত হইতে হইবে। শিক্ষা, সমাজ, জীবন—সবই আজ নূতনতর পরিবর্তনের পথে। এই পরিবর্তনের দূত ছাত্র-সমাজ। ছাত্রদের লক্ষ্য বিদ্যার্জন। সেই পথে অগ্রসর হইলে, বিদ্যার মধ্যে আনন্দ পাইলে অসন্তোষ দূর হইবে। ছাত্রজীবনের ভিত্তি শ্রদ্ধা ও বিনয়। দেশের দায়িত্বভার আগামীদিনের ছাত্র সমাজের হাতে। সুশিক্ষার পথেই কল্যাণ আসিতে পারে। নচেৎ সবই বৃথা আস্ফালন, আড়ম্বর ও শক্তির অপব্যয় হইয়া যাইবে। মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ ছাত্রসম্প্রদায় প্রগতিশীল প্রবীণকে সাহায্য করিবে, পুরাতনের রূপান্তরের সাধনায় এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

নারী-শিক্ষা

নারীশিক্ষা আধুনিক যুগের দান। আধুনিক যুগে অধিকার-বোধ জাগ্রত হওয়ায় দিকে দিকে মানুষের মুক্তির আন্দোলন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন যুগেও বিদুষী নারীর অভাব ছিল না। গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি নারীর মনীষার কথা আমরা জানি। কিন্তু একালে যে ব্যাপক নারীশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা পূর্বযুগে ছিল না।

ইহার কারণ পরিবর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তনা। নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার একটা প্রধান বিষয়। নারী এতদিন প্রভুতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন ব্যক্তিবিকাশের সুযোগ পায় নাই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান ছিল অধীনতায় আবদ্ধ। পুরুষের অধীনতা স্বীকারের ফলে পুরুষের সমযোগ্য স্থান নারী কোনদিনই পায় নাই। সংসারের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ নারীজীবন ছিল কখনও কখনও স্বৈরাচারী পুরুষের অত্যাচারে জর্জরিত। তাই পিতা, পতি ও পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে আবদ্ধ নারীজাতির কোন স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য ছিল না। এইজন্য নারীশিক্ষা এতদিন ধরিয়া অনাদৃত হইয়াছিল। শক্তিমান পুরুষ প্রাণপণ শক্তিতে স্ত্রীশিক্ষাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। কারণ এই শিক্ষা নারীজাতির উপর পুরুষের প্রভুত্বের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। তাই শিক্ষার আলোকস্পর্শে নারীজাতির জাগরণ প্রভুত্বকামী পুরুষ সমাজের পক্ষে অনাকাঙ্খিত ছিল।

ইংরেজ এদেশে আসিবার পর যে সর্বাত্মক জাগরণ সম্ভব হয়, সেই জাগরণের ফলস্বরূপ স্ত্রীশিক্ষা এদেশে আবশ্যিক ও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধির কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা সুরু হয়। বিদ্বৎ-সমাজ-প্রতিষ্ঠা, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে বুদ্ধির সচলতা দেখা দিয়াছিল। এই সময় নারীজাতির স্বাধিকার-চেতনাও আন্দোলনের অন্যতম পর্যায় হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডে গডউইন ও মেরী ওলষ্ট্যান-ক্রাফটের প্রেরণায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন মুখর হইয়া উঠিল, এদেশে তেমন বীটন (বেথুন), মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি নারী শিক্ষা ও নারীর অধিকার-অন্দোলনকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিলেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'-র অগ্রণী ভূমিকাও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। এই 'সোসাইটি' ১৭১৯ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা

বিধায়ক'-গ্রন্থ ১৮২২ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। কলিকাতা 'স্কুল বুক সোসাইটি' ১৮২২ খ্রীঃ আগস্ট মাসে ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। মিশনারীদের উৎসাহে ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে সুসম্পন্ন হইল। কলিকাতার জানবাজার, চিৎপুর ও গৌরীবেড়ে অঞ্চলে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এই বিদ্যালয়গুলির নাম সালেম স্কুল, বার্মিংহাম স্কুল ও লিভার.পুল স্কুল। ইহা ছাড়া মেরী অ্যান কুকের চেষ্টায় আটটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে যে নারীশিক্ষা প্রচার এবং প্রসার হইল, সেই নারীশিক্ষার জাগরণের ফলেই আজকের এই সর্বাঙ্গীণ স্ত্রীশিক্ষার জোয়ার সম্ভব হইয়াছে।

নারীশিক্ষার প্রবক্তারা অবশ্য নারীশিক্ষার প্রকৃতিস্বাতন্ত্র্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। নারীর শ্রেষ্ঠ বিকাশ মাতৃত্বে; তাই সমাজে জননী ও জায়া রূপের সার্থকতার উপর নারীসমাজের প্রতিষ্ঠা। শিশুর জন্ম, লালন-পালন প্রভৃতির জন্য যে গার্হস্থ-জ্ঞান প্রয়োজন, নারীশিক্ষার শিক্ষাক্রমে তাহারই প্রাধান্য থাকা বিধেয়। কারণ গৃহ-সৌন্দর্যকে সৃষ্টি করিবার জন্য নারীর যে শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষা না থাকিলে নারীর সৃষ্টিশীল ভূমিকা খর্ব হইবে। নারীর শিক্ষা সমগ্র মানবত্বের শিক্ষা, কিন্তু এই শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন না হইলে নারীশিক্ষা সমাজে কোন সুফল আনয়ন করিবে না। মায়ের কাছেই শিশু জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা অর্জন করে। এই শিক্ষা পুরুষদের শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র হইতে বাধ্য। আজ জাতীয় শিক্ষার উদ্বোধনের দিনে এই সত্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

শহরে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারিত হইবার ফলে শিক্ষা সাধারণতঃ নানামুখী ফ্যাসন বা বিলাস কলায় পরিণত হয়। প্রকৃত শিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষার আড়ম্বর প্রাধান্য পায়। শহরে শিক্ষার এই পরিণতি অবাঞ্ছনীয়। গ্রামে গ্রামে এই শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে। শহরে শিক্ষার দোষ-গুণকে স্মরণ রাখিয়া গ্রামে গ্রামে এই শিক্ষাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। গ্রামে এই শিক্ষার আলোক না পৌছাইয়া দিলে নারী শিক্ষার সামগ্রিক সুফল পাওয়া যাইবে না। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তব্য সর্বাধিক। রাষ্ট্র আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে হাত বাড়াইয়াছে। শিক্ষা আজ জীবনের প্রধান ক্ষেত্র। রাষ্ট্রের কর্তব্য নারী শিক্ষাকে তাই যথার্থ গুরুত্ব দিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা। দেশের জননীদের যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য।

পরীক্ষা-সংস্কার

সাধারণতঃ শিক্ষার বিচার হয় পরীক্ষায়, তাই শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরীক্ষার স্থান এত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে শিক্ষা পরীক্ষা-কেন্দ্রিক। পরীক্ষা-ব্যবস্থার সার্থকতার প্রয়োজনীয়তা তাই অত্যন্ত বেশী।

সারা বৎসর পাঠ ও চর্চার জন্য যে একটা 'যাচাই' চাই, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এই 'যাচাই' ছাড়া 'মানদণ্ড' নির্ণয় করা যায় না। শিক্ষার মূলকথা এই মানদণ্ড নির্ণয়। পরীক্ষা নানা শ্রেণীর, কোনটি মৌখিক, কোনটি লৈখিক, কোনটি কার্যাত্মক বা হাতে-কলমে পরীক্ষা। বিশেষ দিনে, বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে এই ধরনের পরীক্ষা উদ্‌যাপিত হয়। কয়েকটি বাঁধা প্রশ্নের উত্তর দানের সাফল্যের উপর পরীক্ষার্থীর বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিচার হয়। যদি কোন কারণে ঐ বিশেষ দিনে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা না দিতে পারে, তাহা হইলে পরীক্ষার্থী সাধারণ বা বিধিবদ্ধ যাচাইয়ের মানদণ্ডে 'ফেল' করে। এই 'ফেল' বা 'পাস'-কে সমাজ নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে। পরীক্ষার্থীর সমগ্র জীবন এই 'ফেল' বা 'পাস' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরীক্ষকের মাপকাঠিতে সর্বৈব ও সর্বোত্তম মনে করা সমাজের প্রথা। তাই এই মাপকাঠির যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার সাধারণ সমাজ করে না।

কিন্তু পরীক্ষকের পরীক্ষার কথাও আজ সমাজ ভাবিতে চলিয়াছে। অর্থাৎ যে শিক্ষাপদ্ধতির অনুমোদনক্রমে পরীক্ষার্থীর বিদ্যা-যাচাই করা হয়, সেই শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি আজ সকলের সামনে ধরা পড়িয়াছে। এই পরীক্ষা পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি এই যে, এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার পরীক্ষা হয়। তাই সারা বৎসর ফাঁকি দিয়া, বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন জ্ঞান আহরণ না করিয়া, কেবলমাত্র বৎসরান্তে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেই পরীক্ষার্থীর সাফল্য বিবেচিত হয়। এই সব পরীক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার পরবর্তী স্তরে পরীক্ষার্থীকে প্রবেশ পত্র দেওয়া যায় কিনা, অথবা পরীক্ষার্থীদের মেধা-বিচার করিয়া যথাক্রমিক স্থান নির্ণয় করা। এসব কিছুই পাঠক্রমের সন্তোষজনক উত্তর দানের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় প্রকৃত শিক্ষার তাৎপর্য ধরা পড়ে না। অনেক সময় প্রশ্নচয়ন বিশেষ বিশেষ পরীক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পরিচিত না হইলে পরীক্ষার্থী সাফল্য লাভ করিতে পারে না। মুখস্থবিদ্যাকে বৈতরণী

পারের উপায় হিসাবে দেখা এই ব্যবস্থায় প্রধানতম ত্রুটি। বিষয়-বিন্যাস অপরিকল্পিতভাবে হওয়ার ফলে পরীক্ষার্থীর উপর চাপ পড়ে, ফলে মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য ব্যাহত হয়। অনেক ক্ষেত্রে, পরীক্ষা জ্ঞানের পরীক্ষা না হইয়া কৌশলের পরীক্ষা হইয়া ওঠে। পরীক্ষা-ব্যবস্থা যুগোপযোগী না হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে সময় ও শক্তি দুইয়েরই অপচয় হয়। অর্থাৎ পুরাতন পাঠক্রমকে স্মৃতির উপর বোঝারূপে চাপাইয়া দেওয়ার উদ্যোগ এই ব্যবস্থায় প্রধান হইয়া উঠে।

কেবলমাত্র এদেশে নয়, ইউরোপেও পরীক্ষাব্যবস্থা লইয়া নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। বোঝা যায় যে পুরাতন ব্যবস্থায় নূতন মন ও মননকে আর ধরা যায় না। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশের দায়িত্ব আজ অনেকাংশে শিক্ষকের উপর পড়িয়াছে। তাই শিক্ষকরাই জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ ভাবিয়া পরীক্ষা-ব্যবস্থায় যথোচিত গুরুত্বদানের প্রয়োজন। পরীক্ষক যদি পরীক্ষার্থীকে দায়সারা ভাবে পরীক্ষা করিয়া সারা জীবনের অগ্রগতির উপর শীলমোহর ছাপ দিয়া দেন, তবে তাহা কতখানি গুরুত্বহীনের কাজ, তাহা প্রণিধান করা উচিত। শিক্ষাব্যবস্থাকে সুপরিকল্পিত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে।

পরীক্ষা-গ্রহণ যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। ইহা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের পরীক্ষা। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শিক্ষা' গ্রন্থে বার বার এই যান্ত্রিক শিক্ষার বিরোধিতা করিয়াছেন। পরীক্ষা সংস্কারের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব এখানে রাখা যায়। (ক) প্রথমতঃ অগণন সংখ্যক ছাত্রের পরীক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠু হইতে পারে না, তাই পরীক্ষা ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রিত করিতে পারিলে সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইতে পারে। 'টিউটোরিয়াল' ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া বা ক্লাস-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেওয়াই বিধেয়। (খ) পরীক্ষা শ্রুতি ও স্মৃতির পরীক্ষা না হইয়া যেন বিদ্যার পরীক্ষা হইয়া উঠে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্নপত্র নির্বাচন করা উচিত। যে পরীক্ষায় বুদ্ধির পরিচয় আছে, সেই পরীক্ষাই বাঞ্ছনীয়। (গ) পরীক্ষায় 'গ্রেড'-প্রথার প্রবর্তন করা উচিত, (ক, খ, গ), তাহাতে পরীক্ষকের অন্তর্মুখী মূল্যায়ণ-ব্যবস্থার ত্রুটি অনেকটা মুক্ত হইবে। (ঘ) সারা বৎসরের পরীক্ষা বা বিচার বৎসরান্তে একদিনে বা একাধিক দিনে না করিয়া ধীরে ধীরে পরীক্ষার্থীর সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণাকে গুরুত্ব দিলে এই ব্যবস্থার ত্রুটি অনেকাংশে অপনীত হইবে।

পরীক্ষা অপেক্ষা শিক্ষা বড়, এ-সত্যের উপলব্ধিই পরীক্ষা-সংস্কারের প্রাণের বস্তু। শিক্ষার মাহাত্ম্য নির্ভর করে জীবনধর্মিতার উপর। যে শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব দেয়, চরিত্র দেয় সেই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এই শিক্ষার গুরুত্ব কেবল স্কুলের পরীক্ষায় নয়, জীবন-পরীক্ষায়। তাই পরীক্ষাকে যেমন জীবনধর্মী করিতে হইবে, শিক্ষাকেও তেমনি জীবনধর্মী করিতে হইবে।

সামরিক শিক্ষা

সামরিক শিক্ষা ছাড়া আত্মরক্ষার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। যে কোন ব্যক্তি বা জাতিকে আত্মরক্ষা শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হয় কারণ যতদিন জাতিতে জাতিতে বৈরিতা আছে, ততদিন পর্যন্ত আক্রমণের সুযোগও প্রতি পদে পদে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে প্রতিটি জাতির সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কারণ যে জাতি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, সে জাতি স্বাধীনতার মূল্য রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। মাতৃভূমিকে রক্ষা করার মহৎ দায়িত্ব মানুষের থাকা উচিত। সামরিক শিক্ষার উদ্যোগ ও আয়োজন এই জন্যই স্বাভাবিক।

আজকের পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত। পররাজ্য আক্রমণ, বহিঃশত্রুর অভিঘাত, শক্তিমান দেশ কর্তৃক দুর্বল দেশকে শোষণ প্রভৃতির প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রপুঞ্জ আজ দিশেহারা। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য মানুষের অবাধ লোভ ও লুণ্ঠনকে প্রতিরোধ করিতে হইবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে পৃথিবী আজ আণবিক যুগে প্রবেশ করিয়াছে। এখন দেশে-দেশে যুদ্ধ 'রকেট'-নিক্ষেপী শক্তি দ্বারা পরিচালিত। মারণাস্ত্রের ভয়াবহতা আজকের যুদ্ধকে ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধে পরিণত করিতে পারে। সেই বিশ্বযুদ্ধে বিজেতা ও বিজিতের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। সমস্ত পৃথিবী হইবে ধ্বংসস্তূপ। সুতরাং বিশ্বশান্তিই পরম কাম্য বস্তু। কিন্তু যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যেক জাতিকে সামরিক শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করা উচিত।

ভারতবর্ষ একটি বড় দেশ। এই দেশে নানা সমস্যা নানা জটিলতা রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি করিবে। তাই যে কোন সময় বিদেশী রাষ্ট্র যদি ভারতবর্ষের বুকে যুদ্ধের দাবানল জ্বালাইতে সচেষ্ট হয় তবে তাহার জন্য দুর্বল জাতির ন্যায় নতজানু হইয়া থাকিলে চলিবে না। সমরোপকরণ ও

সমরায়োজন অব্যাহত থাকা চাই। সামরিক শিক্ষা যদি বাধ্যতামূলক হয়, তবেই এই দুর্দৈব রোধ করা যাইবে। তাই সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

এ যুগে যুদ্ধ উন্নত উপকরণে সমৃদ্ধ। এই সব উপকরণ বা যুদ্ধ-সম্পদ সৃষ্টির জন্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার শক্তিমত্তা প্রয়োজন। নচেৎ যুদ্ধের সময় মিত্রগোষ্ঠীর কাছ হইতে যুদ্ধাস্ত্রের ঋণগ্রহণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা না থাকিলে, যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহারে পটুত্ব না থাকিলে যুদ্ধজয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। উন্নত সমরাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও অনেক শক্তিশালী দেশ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ইহার কারণ পদাতিক বাহিনীর রণনৈপুণ্য অনেক সময় জয়-পরাজয়কে নির্ণীত করে।

এই কারণে পাশ্চাত্ত্যে স্কুল কলেজে পাঠক্রমের সঙ্গে সামরিক শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। পরে সামরিক কলেজে উন্নততর যুদ্ধবিদ্যার প্রশিক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষের আগ্রাসী নীতি নাই। ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আক্রমণের জন্য নয়, আত্মরক্ষার জন্যই ভারতবর্ষের সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে সামরিক শিক্ষার প্রসার না হইলে যুদ্ধ ও দুর্দৈবের সময় সমগ্র জাতি সামরিক প্রস্তুতিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে না, নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

সামরিক শিক্ষার মধ্যে চরিত্রনীতি বর্তমান থাকে। এই চরিত্রনীতি নিয়ম, শৃঙ্খলাবোধ, দেহগঠন ও সর্বোপরি শারীরিক-মানসিক দৃঢ়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সামরিক শিক্ষা দ্বারা এই নিয়ম ও শৃঙ্খলাবোধ অর্জন করা যায়। ভারতবর্ষের মত বিবর্ধনশীল দেশে শৃঙ্খলা, নিয়ম ও সময় নিষ্ঠার প্রয়োজন অসীম। শৃঙ্খলাবোধের অভাবে এদেশের ইতিহাসে বার বার রণনৈতিক পরাজয় ঘটিয়াছে। যদিও গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহা বিশ্বের সপ্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার দ্বারা বোঝা যায়, অতীতের পাতায় যাহাই থাক, ভারতবর্ষের সামরিক ভবিষ্যৎ সত্যই উজ্জ্বল। সামরিক শিক্ষার জন্য ১৯৬০ সালে দিল্লীতে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। দেরাদুনের সামরিক বিদ্যালয় এখন উচ্চ-প্রশংসিত সামরিক কলেজ। ভারতবর্ষের নৌবাহিনীর কৃতিত্ব গত দুই যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে। কোচিন,

বোম্বাই, বিশাখাপত্তনে নৌবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র আছে। পাঞ্জেত অঞ্চলে একটি রাষ্ট্রীয় সৈনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। পুনার নিকট ভাসলায় সামরিক শিক্ষা দেবার একটি শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এছাড়া প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী আছে। জাতির সংকটলগ্নে এই সব প্রস্তুতির শুভ ফল নিশ্চয় লাভ করা যাইবে। ভারতবর্ষ শান্তিতে বিশ্বাস করে। দেশে-দেশে মৈত্রী ও শান্তি ভারতবর্ষের পরম ইষ্ট—তবু আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করিতে না শিখিলে দেশের স্বাধীনতা ও শান্তি রক্ষা করা যাইবে না।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা

শিক্ষাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে জাতির শিক্ষা নাই, সে জাতি জগৎ-সমাজে বঞ্চিতের সারিতে ভিড় করিয়াছে। যে ব্যক্তির শিক্ষা নাই, সে ব্যক্তির বিড়ম্বিত দুর্ভাগ্য অনুকম্পার যোগ্য। কিন্তু এই শিক্ষা অর্জনের প্রথম দৌত্য যে ভাষার, সে ভাষা নিঃসন্দেহে মাতৃভাষা। কারণ মাতৃভাষাই জীবনের প্রথম প্রভাতে মানবশিশুর গৌরবময় আবিষ্কার। মাতৃভাষা মানুষের সহজাত উপার্জন। এ-ভাষার দৌত্যে জগৎ ও জীবনের বোধ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়, অন্য কোন ভাষায় তাহা হইতে পারে না। তাই মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন। বিদ্যাশিক্ষার প্রত্যাগত সূত্রপাতের আগেই শিশুর অস্পষ্ট কাকলীর মধ্যে বস্তুজ্ঞান যেভাবে হয়, তাহা অন্যভাষায় সম্ভব হয় না। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা আজকের যুগে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ কর্তৃক সর্বাপেক্ষা মানিত শিক্ষা।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলাভাষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসটি স্বতন্ত্র। অন্য দেশে স্বাভাবিক নিয়মে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এদেশে দীর্ঘকাল ইংরেজের রাজদণ্ড শাসনদণ্ডরূপে প্রচলিত ছিল, তাই ইংরেজী ভাষাই 'রাজভাষা' বা প্রধান ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজীভাষা, কারণ রাজার হাতেই প্রজার জীবনরক্ষার দায়িত্ব থাকে। এই রাজভাষাই এদেশে মানবশিশু দ্বিতীয় মাতৃভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে একটা বিরাট রদ-বদল দেখা দেয়। এই রদ-বদলকে বলা চলে আমূল পরিবর্তন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবির্ভাবে

এদেশে এক নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি হইল। এদেশে 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' বা শ্রীরামপুর মিশনারীগণের প্রচেষ্টায় যে গদ্যসাহিত্য রচনার প্রয়াস হয়, তাহা এই 'রাজভাষা'র আড়ষ্ট অনুবাদ ছাড়া কিছু নয়। এই ভাষা সহজ গদ্যে রূপান্তরণের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ প্রভুদের প্রভাবে ও পরিচালনায় এদেশের শিক্ষিত মানুষ ইংরেজীকে জীবনের ধ্যান-জ্ঞান করিয়া তুলিল। বাঙালীর জাতীয় মানসে 'ইয়ংবেঙ্গল' এই ইংরেজী-চর্চার শোচনীয় নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। 'ইয়ং বেঙ্গল'-যুগের প্রভাব স্বাধীনতার পরও দেশের মানুষ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। শতাব্দী-সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে এই পরাধীন মানসিকতা অপরিবর্তিত থাকিয়া গেল। রুজি বা চাকুরীর সঙ্গে যুক্ত বলিয়া জীবিকার সঙ্গে সংসক্ত বলিয়া রাজভাষার উপাসনা এদেশের মানুষের মনে এক পরাজিতের মনস্তত্ত্ব সৃষ্টি করিল। মাতৃভাষা-চর্চার সঙ্গে দৈন্য ও গ্লানি এমনভাবে জড়াইয়া ছিল যে, এই ভাষায় কেহ কোন সংগ্রন্থ লিখিতে ভরসা পাইত না। উনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও এই অবস্থাচক্রের উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। মধুসূদনের 'ক্যাপটিভ লেডী', 'ভিজন্স্ অব দি পাস্ট', বঙ্কিমচন্দ্রের "Rajmohan's wife', প্রভৃতি এদেশের শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানের ইংরাজী-অনুকরণের শোচনীয় ভূমিকার নিদর্শন ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত অর্থে প্রতিভাবান বলিয়া এই ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করিয়া যথার্থ পথের পথিক হইতে পারিয়াছিলেন। এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি তাই তাঁহাদের নিকট চিরঋণী। মাতৃভাষাই আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ পথ—মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত এই সত্যকে প্রমাণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতের আর একজন দিকপাল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ-সত্য প্রণিধান করিয়াছিলেন যে, শিক্ষার ভাষা মাতৃভাষাহওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রমাণ করে যে সেযুগের ইংরেজী-ঘেঁষা বা ইংরেজী-তন্ময় পরিবেশে মাতৃভাষার কার্যকারিতা বা সাফল্য কতখানি সম্ভব হইতে পারে। মেকলের চিন্তাধারা সেদিন বাংলাদেশের জনশিক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল। এই ক্ষতিকর প্রভাব হইতে বাংলাদেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, টেকচাঁদ ঠাকুর প্রভৃতির প্রভাবে বাংলাভাষার মর্যাদা ও কার্যকারিতা প্রমাণিত হইল।

দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব যে বাংলাভাষায় রচিত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাবলী। মাতৃভাষা ছাড়া জ্ঞানের সার্থকতা অচিন্তনীয়, মাতৃভাষা ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ। পরভাষা যতই চর্চা করা যাক, শেষ পর্যন্ত পরিতাপের বিষয় ছাড়া কিছুই নয়। এই চিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর স্বাজাত্যবাদী চিন্তানায়কবৃন্দের। উনবিংশ শতাব্দীর এই মহৎ উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথের কর্মে ও সাধনায়।

অনেকের ধারণা, মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে সম্পন্ন হইলেও, উচ্চতর স্তরে সম্ভব নয়। তাঁহাদের মতে, বিজ্ঞান-অর্থনীতির উচ্চতর জটিলতা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ইহার কারণ হিসাবে বলা হয় বাংলা ভাষার উপযুক্ত পরিভাষার একান্ত অভাব। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বসু বা সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরাও এ-মতের অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, উচ্চ বাংলাভাষার প্রকাশসামর্থ্যের পক্ষে উহা অন্তরায় হইতে পারে না। উচ্চতম বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা জটিলতম পরিভাষা-নির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞান বাংলায় প্রকাশ করা সম্ভব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠায় যাঁহার অবদান অসামান্য, তিনি বাঙালীর গৌরবের শিক্ষাগুরু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁহারই প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাবিভাগের উদ্বোধন ও মাতৃভাষার সমাদর বাড়িয়াছিল।

মাতৃভাষায় শিক্ষার সর্বাপেক্ষা সুবিধা এই যে ভাষা কষ্ট করিয়া শিখিতে হয় না। জ্ঞান আয়ত্ত করিতে যে পরিশ্রম লাগে: অন্যভাষা আয়ত্ত করিতে পরিশ্রম ততোধিক। তাই ভাষার ব্যবধান দুস্তর হইলে জ্ঞানার্জন দুরূহ হইয়া উঠে। এইজন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক হইতে পারে। আজকের পশ্চিম ইউরোপের উন্নতদেশে মাতৃভাষায় শিক্ষার ফলে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সর্বমুখী সমৃদ্ধি অর্জন করিয়াছে।

পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে তোমার প্রিয় একটি বিষয়

বিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য আমাকে শিক্ষাক্রমের বহু বিচিত্র বিষয় পাঠ করতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই বলা চলে, এতগুলি বিষয় কাহারও পক্ষে

সমান প্রিয় হইতে পারে না। তাই এই বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়টির প্রতি আমার অনুরাগ অকম্প, তাহার আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য।

পরীক্ষার জন্য আমাকে যে একাধিক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য পরীক্ষায় ফল লাভ করা। যেহেতু আমি পরীক্ষার্থী, সেজন্য কৃতী ছাত্র হইবার জন্য আমার লক্ষ্য অবিচল। ইংরেজী, বাংলা, ভূগোল, সংস্কৃত, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলির মধ্যে তাই আমার মনের মত বিষয় যদিও 'বাংলা', তবুও আমাকে সবদিকেই মনোযোগ দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যেমন, বিজ্ঞান বা গণিত আমার কাছে নীরস বিষয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, এই বিষয় দুইটির প্রতি আমার বৈমুখ্য আমারই পক্ষে ক্ষতিকারক হইবে। গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল বা ইতিহাস আমার কাছে কর্তব্যের সামিল, ইহাকে বলা চলে বাধ্যতামূলক সুখ বা দুঃখ।

বাংলা আমার মাতৃভাষা। চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষাতেই, জীবনের সুখদুঃখের অভিব্যক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল। এই ভাষাই জীবনের প্রথম ভাষা, জীবনের আনন্দের ভাষা, বেদনার ভাষা। তাই এই ভাষাতে আত্ম প্রকাশের তাগিদই আমার কাছে মহৎ ও পবিত্র এক তাগিদ।

বিষয় হিসেবে বাংলা আমার প্রিয় কেন? ইহার উত্তর কেবল ইহা নয়, যে বাংলা আমার মাতৃভাষা, ইহার কারণ একাধিক। প্রথমতঃ, বাঙালী হিসেবে বাঙলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বুঝিবার একটি নৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব আছে। এই অধিকার সম্পন্ন করিতে হইলে বাংলাভাষার চর্চা প্রয়োজন। আমি বাঙালী, তাই বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি আমার পক্ষে আবশ্যিক একটি বিষয়। এই জন্য বাংলাভাষার চর্চা আমার পক্ষে অপরিহার্য।

সাহিত্যপাঠে আমি অপার আনন্দ পাই। এই আনন্দলাভের উৎস ভাষা। তাই বাংলা কবিতা বা গদ্য আমার কাছে অশেষ আনন্দের বার্তা লইয়া আসে। বাংলা ভাষাকে ভাল না বাসিলে আমি এই সব কবিতার রসাস্বাদের সুযোগ পাইতাম না। কবিতাপাঠে আমার অন্তরে দোলা লাগে। আমার হৃদয় বিচলিত হয়। এই পাঠ্যাংশের কবিতা পড়িতে পড়িতে আমার হৃদয়ের স্পন্দন বাড়িয়া যায়। আমাদের পাঠ্যতালিকার 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি আমার বড় প্রিয়; এই কবিতা বার বার পড়িবার জন্য আমার লোভ হয়। এই কবিতার ভাষার মধ্য দিয়া যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই চিত্র

চিরকালের বাংলাদেশের চিত্র। মহাকবির অপূর্ব ভাব ও ভাষা আমাকে মুগ্ধ করে। মধুসূদন দত্তের 'কাশীরাম দাস' সনেটটি একটু দুরূহ—তবু কবির শব্দসৃষ্টির যাদু আমার কাছে আকর্ষণের বস্তু হইয়া ওঠে। আমি এই কবিতাটি কণ্ঠস্থ করিয়াছি, এবং বার বার আবৃত্তি করিয়া আনন্দ পাই। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' আমার আর একটি প্রিয় কবিতা; এই কবিতাটির মধ্যে যে বেদনার সংগীত ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা মনকে দোলা দেয়, হৃদয়কে বিচলিত করে। এই আনন্দ কি গণিত বা বিজ্ঞানে পাওয়া যায়? উত্তরটি আপেক্ষিক হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেই বেশী আনন্দ পাওয়া যায়।

বাংলাভাষার সঙ্গে একটি নাড়ির যোগ আছে। ইংরেজী ভাষার প্রতি আমার আকর্ষণ নাই, এমন নয়; কিন্তু ইংরেজী ভাষার কোন শব্দ আমার নাড়ির সঙ্গে যুক্ত নয়। তাই 'cloud'-শব্দটি আমার ভিতরে যে অর্থ লইয়া আসে, তাহা কৃত্রিম। কিন্তু 'মেঘ'-শব্দটি যে ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করে, তাহা আমার কাছে অকৃত্রিম। এইজন্য মাতৃভাষার কোন শব্দের আবেদন যতই সহজ ও স্বতোৎসারিত, অন্য কোন ভাষায় তত হয় না।

বাংলাসাহিত্যের প্রতি আমার কৌতূহল ও অনুরাগ আছে বলিয়াই এই ভাষা ও সাহিত্য আমার প্রিয়। আমি পাঠ্য বই অবলম্বন করিয়া যে রসের স্বাদ পাইয়াছি, সেই রসের আস্বাদের জন্য আমি অল্প-বিস্তর মূল বইয়ের প্রতি কৌতূহলী হইয়াছি। 'রাধারাণী'-র যে অংশটুকু আমার পাঠ্য, আমি তাহাতেই তৃপ্ত হই নাই। লাইব্রেরী হইতে আমি মূল বই আনিয়া উহার রসাস্বাদ করিয়াছি।

বাংলা আমার প্রিয় বিষয়, কারণ ইহা যেন আমার নিজস্ব জগৎ, আমার অনুভূতির নিজস্ব আনন্দলোক। এইজন্য বাংলাকে বিষয় হিসাবে আমি অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বেশি পছন্দ করি।

বিজ্ঞান-শিক্ষা ও সাহিত্য-শিক্ষা

সাহিত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দুটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নয়। একই সত্যের দুই দিক। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উভয়ের বিষয়ই মানুষ, উভয়ের বিষয় সত্য। কিন্তু পদ্ধতিগত পার্থক্যের জন্য একই সত্যের দুই রূপ আমাদের কাছে প্রতিভাত

হয়। পার্থক্যটা এইরকম: "মন নিয়ে এই জগৎটা কেবল আমরা জানছি। সেই জানাটা দুই রকমের। জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞান থাকে পিছনে। আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্যরূপে সামনে। ·· বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য"—এই পার্থক্যটি রবীন্দ্রনাথ চমৎকার করে দেখিয়েছেন।

বিজ্ঞানের সাধনায় নৈর্ব্যক্তিকতা প্রধান, সাহিত্যের সাধনায় ব্যক্তিত্বটাই প্রধান; সত্যকে সাহিত্যিক দেখেন ব্যক্তিগতভাবে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দেখেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে। বিজ্ঞানের পদ্ধতি বস্তুগত, সাহিত্যের পদ্ধতি ভাবগত। এই পার্থক্যের মূলে আছে একটি অখণ্ডতা। সেই অখণ্ডতার দুই রূপ বস্তু ও ভাব। বিজ্ঞান বিশ্লেষণমুখে বস্তুকে পরীক্ষা করেন ও অবশেষে সত্যে পৌছান, সাহিত্য সংশ্লেষণমুখে ভাবকে দেখেন এবং শেষে উপনীত হন সত্যে, যার স্থান হৃদয়ে। দুইয়ের লক্ষ্য সত্য—তাই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ কোথায়? রবীন্দ্রনাথ আজন্ম-আমৃত্যু কবি, কিন্তু তিনিও 'বিশ্বপরিচয়' লেখেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কৌতূহল দেখান। জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তিনিও লেখেন 'অব্যক্ত'-র মত সাহিত্য-গ্রন্থ। শেলী সম্পর্কে একজন পণ্ডিতের মত এই যে, 'শেলী যদি ল্যাবরেটারীতে থাকতেন, তবে তিনি নিউটন হ'তে পারতেন।' সুতরাং বোঝা যায়, যে বিরোধ কোথাও নেই।

সাহিত্যশিক্ষার অর্থ মানবতাধর্মী শিক্ষা। সাহিত্যবিদ্যার চর্চার ফলে মানুষের চিত্তসংস্কার হয়, চিত্তশুদ্ধি ঘটে। চিত্তশুদ্ধিই সংস্কৃতির সারার্থ। সাহিত্যে এই চিত্তশুদ্ধি হয়। এই দিক থেকে সাহিত্য অনেকটা ধর্মের নিকটবর্তী, চিত্তসংযোগ মানুষের মধ্যে ঐক্য সাধন করে। মানুষের সংকট আজ বিচ্ছিন্নতার সংকট। সাহিত্য মানুষের কাছে এই সংকটের উত্তর। সাহিত্যের প্রয়োজন জীবনে। কারণ জীবনের সুখদুঃখ, আশা-নিরাশার মধ্যে আশীর্বাদের মত সাহিত্যের অমৃত-প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তাপিত মানুষকে শান্তি দেয়, দুঃখী মানুষকে বরাভয় দান করে। সাহিত্যের এই দান অমূল্য দান। সাহিত্যশিক্ষার এই অবদান আজকের মানুষের বড় প্রয়োজন। সাহিত্য মানবমনকে নিয়ে কারবার করে। জগতের সুখদুঃখের বোধ মন থেকে উৎসারিত। তাই মনে যার প্রভাব সর্বাধিক সে বিষয়ের শিক্ষাই জীবনে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজনও অসীম। কারণ বস্তুজগতে মানুষের প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আজকের পৃথিবীর এক জলন্ত ইতিহাস। বিজ্ঞানমনস্কতা ছাড়া এই সংগ্রামে মানুষ বিজয়ী হতে পারে না। আজকের যুগে তাই সকলেই প্রতিযোগিতার সমরে উন্মত্ত। এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ, এ-যুগ কারিগরির যুগ—'It is an age of science, it is the age of technocrats', দিকে দিকে স্লোগানের মত ছড়িয়ে পড়েছে এই কথা। দেখতে দেখতে চীন জাপান জেগে উঠল। সমৃদ্ধির শিখরে উঠতে লাগল কেবল বিজ্ঞানমনস্কতার জন্য, য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দেশগুলি ধনে-বলে শক্তিমান হয়ে উঠল, বিজ্ঞান হয়ে উঠল তাদের প্রধান চালিকা শক্তি। জীবনধারণের প্রয়োজনকে মুখ্য করে, জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা দেশের সম্পদ সৃষ্টির কাজে অব্যাহত রইল। শিল্প-বিপ্লবের যুগে, প্রযুক্তি বিদ্যার সমৃদ্ধি ও বিকাশের যুগে, পার্থিব সম্পদ, সুখ ও স্বাস্থ্যের জন্য বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের দিকে উন্নত দেশগুলি ছুটে গেল। প্রযুক্তিবিদ্যায় পৃথিবীর মানুষের ভোগের জগৎকে বর্ণময় করে তুলল। মানুষের ব্যাধি, দুঃখ ও অভাবের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হবার মন্ত্রগুপ্তি আছে বৈজ্ঞানিক আর কারিগরদের হাতে। তাই মন্ত্রবাণীর মত দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল, এ-যুগ বিজ্ঞানের যুগ, এ-যুগ কারিগরদের যুগ। বিদ্যুৎশক্তি ইস্পাত-শিল্প, কয়লা ও তেল উৎপাদন প্রভৃতি মৌল বস্তু-উৎপাদনে দেশে দেশে প্রতিযোগিতার পাল্লা সুরু হল, তাই শিল্পশক্তিই শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে আজকের বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করল। ভারতবর্ষও বিশ্বের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চলতে সচেষ্ট। আজকের দুনিয়াব্যাপী শিল্পবিপ্লবের পথে ভারতবর্ষও অংশীদার। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকেই শিল্পখাতে অনেকাংশ ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল। শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষা-কমিশনেও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই শিল্পোন্নয়নের যুগে সাহিত্যশিক্ষার গুরুত্ব স্বভাবতই কমে এসেছে। মানুষের মনোযোগ আজ বিজ্ঞান-শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার দিকে কেন্দ্রিত। তাই বিজ্ঞান-শিক্ষা যুগের প্রগতির অপরিহার্য দান।

বিজ্ঞান-শিক্ষার নেতিবাচক দিকও আছে। বিজ্ঞান-শিক্ষা মানুষকে বড় বেশী পার্থিব, ভোগসুখস্পৃহ ও কর্মচঞ্চল করে তুলেছে। উপকরণ-প্রধান সভ্যতার বিলাসী রূপের কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার 'পথের সঞ্চয়', 'কালান্তর' প্রভৃতি গ্রন্থে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ কারিগরী-শিক্ষা বা দেশজ কুটীর শিল্পের চর্চাকে অস্বীকার করেন নি—তার নিদর্শন 'শ্রীনিকেতন'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের

ক্রান্তদর্শিতায় এ-সত্য ধরা পড়েছিল যে মানববিদ্যার স্থান সর্বোচ্চে। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের জাগরণ। শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মার উদ্বোধন। তাই সভ্যতার সংকটে মানববিদ্যাই মানবতার পাথেয়। ক্লাসিক্যাল সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা মানুষের মনকে সরস-সজীব ও সুন্দর করিয়া তোলে। মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে এই মানবসংস্কৃতির প্রয়োজন অসীম। তাই কারিগরি শিক্ষা মানুষের ভোগসুখ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করিতে পারে, দেশের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির স্বাদ আনিয়া দিতে পারে, কিন্তু আত্মার ক্ষুধা দূর করতে পারে না। মানুষের শ্রেষ্ঠ দুঃখ আত্মার তমসা। এই তমসাকীর্ণ পথে জ্যোতির ইসারা মানবিদ্যার চর্চা।

কোন দেশ যেমন কেবল ভাবের পাখায় ভর দিয়ে চলতে পারে না তেমনি কেবলমাত্র বাস্তবতার চর্চায় মাহাত্ম্য অর্জন করতে পারে না। তাই ভাব ও বস্তুচর্চার মিলনই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। মানববিদ্যার সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই বিজ্ঞান শিক্ষা। কারণ এক অখণ্ড সত্যের দুই দিক এই দুই বিদ্যা। যে জাত এই দুই দিকের চর্চায় অক্লান্ত, সে-জাত ততবেশি সমৃদ্ধি, সাফল্য ও সার্থকতা অর্জন করতে পারবে। জগৎ সভায় সে জাতের আসন তত উঁচুতে। তাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদর্শ মানে সাহিত্য শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার সমন্বয়। যদি কারিগরি-শিক্ষার প্রাধান্য দেশকে গ্রাস করে, তবে ইতিহাসের বিলম্বিত দিনে চিন্তাশীল জ্ঞানী-গুণীর অভাব হতে পারে। শক্তিদ্বন্দ্বে বিশ্ব আজ চঞ্চল, পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি সৃষ্টি করার জন্য আজ সকলেই ব্যস্ত। কিন্তু তবু জীবনের গভীরতর দিক, সুখদুঃখের চিরায়ত সমস্যার প্রয়োজন সাহিত্যশিক্ষাকে মানুষের কাছে অপরিহার্য করে তুলবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি মানবসৃষ্টি হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি জ্ঞান-কর্ম-প্রেমের সমন্বয় হয়, তবে সাহিত্য শিক্ষাই মানব জাতির মুক্তির দিশা। যন্ত্রের ধূম্রশিখায় নীলিমার সুষমাকে আবৃত করা চলে না। বস্তু-জগতের উন্নতি অনন্ত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে চলবে, মানুষে মানুষে বৈষম্যের প্রাচীর তুলবে, সেই অন্ধকারে আশার আলো শুধু কালিদাস, ভবভূতি, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র। পূর্ণ মানুষ সৃষ্টির জন্য চাই মানব বিদ্যার হোমানল।

বাণিজ্য-শিক্ষা

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাই বাণিজ্যের উন্নতিতে দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধি এ সত্য সকলেই স্বীকার করিবেন। শিল্প-বাণিজ্যে যেরূপ সমৃদ্ধি আনে এমন সমৃদ্ধি চাকুরী বা পরাশ্রয়ী বৃত্তিতে সম্ভব নয়। তাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত মনীষী বাঙালীকে ব্যবসায়ে উদ্যোগী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ইংরেজী শাসনের ফলে এদেশে কেরানী নামে এক শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। রাজার মহাফেজখানায় দলে দলে মধ্যবিত্ত বাঙালী কেরাণী হইবার জন্য ছুটিয়া গেল। সেই ঐতিহ্য এদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্যে প্রবল হইয়া আছে। চাকুরীর প্রতি মোহ মধ্যবিত্ত বাঙালীর মজ্জাগত। চাকুরীবৃত্তির মধ্যে পরাশ্রয়ত্ব আছে, পরনির্ভরতা আছে। তাই স্বাবলম্বনের শিক্ষা অর্জন করিতে হইলে চাকরী নয়, বাণিজ্য-সমৃদ্ধি চাই। এ সত্য কেবল ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য নয়, জাতির পক্ষেও প্রযোজ্য।

এদেশের মধ্যবিত্ত-মানস কোন ঝুঁকি গ্রহণে উৎসাহী নয়, শান্ত তৃপ্ত জীবন-যাত্রায় এই মানস অভ্যস্ত। যে মানসিকতা গড়িয়া উঠিলে মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে শ্রীবৃদ্ধি অর্জন করে সেই মানসিকতা বাঙালীর জীবনে দেখা দেয় নাই। জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে বাণিজ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ চাই, এই আশীর্বাদ লাভ করিতে হইলে যথেষ্ট বৈষয়িক শিক্ষা চাই। তাই নূতন শিক্ষাক্রমে শিল্প-বাণিজ্যক্রমের উপর গুরুত্ব স্কুল হইতেই দেওয়া হইয়াছে। ব্যবসায়ীকে তথাকথিত বিদ্যা অর্জন করিলেই চলে না, হাতে-কলমে শিক্ষাও অর্জন করিতে হয়। ভাবের ঘোরে পথ-চলিতে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে এই বাস্তবজ্ঞান আশা করা যায় না। বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি, আবেগ-প্রবণ জাতি—বাস্তব বুদ্ধির একান্ত অভাব তাহাদের মজ্জাগত। ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষ হইতে হইলে যে অধ্যবসায়, সময়নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা বা হিসাবজ্ঞান থাকা প্রয়োজন তাহার অনুশীলন কৈশোর কাল হইতেই হওয়া চাই। ছাত্র-জীবনই আদর্শ সময়। এই সময় হইতেই বাণিজ্য-শিক্ষার ভিত্তি-পত্তন করিতে হইবে।

ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট মর্যাদার স্থান লাভ করিতে পারে নাই। ইহার জন্য নানা প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। প্রধান যে

কারণটুকু এক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা হইতেছে বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ আলস্যপরায়ণ প্রকৃতি ও ভাবপ্রবণতা, অন্যান্য প্রদেশবাসীর মধ্যে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, অধ্যাবসায়শীলতা, হিসাববুদ্ধি এবং সর্বোপরি কষ্টসহিষ্ণুতা বা অসাধারণ ধৈর্যশক্তি বিদ্যমান। বাঙালীর মধ্যে এই গুণের অপ্রতুলতা নাই, তবে ভৌগোলিক কারণে এই প্রকৃতির বিকাশ হয় নাই।

ব্যবসা সাধনা, ব্যবসা হইতেছে ব্যবহারিক জীবনের তপস্যা। বাঙালীর জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাণিজ্যসাধনার পথে অগ্রসর হওয়া। আজকে দিকে দিকে বাঙালীর পরাজয়ের কাহিনী চিত্রিত। অর্থ নৈতিক পরাজয়ের তাহার মধ্যে প্রধান। সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক সংকটের হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য নিষ্ঠা ও সাধনা লইয়া বাণিজ্য-শিক্ষা করিতে পারিলে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত হইয়া ওঠে না। বাঙালীর জীবনে আজ সর্বগ্রাসী সংকট ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সংকট হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে কেবল ভাবচর্চা লইয়া থাকিলে চলিবে না, বাণিজ্যশিক্ষার চর্চাও প্রয়োজন। ইহাই বাঙালীর জীবনযুদ্ধের মন্ত্রবাণী।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা ও বাংলা ভাষা

ভাষা মানুষের বৃহত্তম সম্পদ, তার সভ্যতার গরিমা ; তার সংস্কৃতির চাবি-কাঠি। ভারতবর্ষ বহু মানুষের দেশ, বহু জাতি বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতি। ভাষাও বহু। বহুভাষিক দেশের ভাষাসমস্যাও জটিল। জাতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্য এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রভাষাসমস্যাকে জটিল করে তুলেছে।

ভাষা সমস্যার মূলে আছে আঞ্চলিক জাতির অভ্যুত্থান ও স্বাতন্ত্র্য চেতনা। আঞ্চলিক ভাষা বিকাশ ও সমৃদ্ধির যুগে ভাষা-সমস্যা আসা স্বাভাবিক। কারণ প্রত্যেক ভাষাভাষীর দাবী স্বীকার না করে উপায় নাই।

ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষার সংখ্যা ১৭৯, উপভাষা ৫৪৪। আঞ্চলিক প্রধান ভাষা অবশ্য ১৫টি। ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যার মূল সূত্র আঞ্চলিক ভাষা বা রাজ্যগুলির শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত।

রাষ্ট্রভাষা সমস্যা বহুভাষিক দেশে সত্যই জটিল। অনেকে মনে করেন একটি রাষ্ট্রভাষা না থাকলে এক জাতিত্বের বন্ধনে রাষ্ট্রের ঐকিকত্বের বন্ধনে

দেশও জাতিকে বাঁধা যাবে না। তাই রাষ্ট্রভাষার এককত্ব প্রয়োজন, অনেক চিন্তাশীলের অভিমত যে ভাষা-সাম্য ছাড়া ঐক্যের বন্ধন সম্ভব নয়।

এর ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে একাধিক রাষ্ট্র ভাষার নিদর্শন আছে। সুইজারল্যাণ্ডের উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যে বহুভাষিকতা সত্ত্বেও জাতিগত ঐক্য ক্ষুণ্ন হয় না। সুইজারল্যাণ্ডে রাষ্ট্রভাষা তিনটি, গ্রেটব্রিটেনেও ইংরেজীর সঙ্গে ওয়েলস ও গেলিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যুগোশ্লাভিয়া সার্ব, স্লোভেন ও ম্যাসিডোনীয় তিনটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ভাষা এক থাকা সত্ত্বেও দুটি পৃথক রাষ্ট্র। যেমন জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া পৃথক রাষ্ট্র। যদিও জার্মান ভাষা একটি মাত্র ভাষা বা রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদালাভ করেছে। এইসব তথ্য প্রমাণ করে ভাষাসাম্য রাষ্ট্র ঐক্যের অপরিহার্য কারণ নয়।

এখন প্রশ্ন এই যে ভারতবর্ষের মত বহুভাষাভাষী দেশে একটি রাষ্ট্র ভাষা গ্রহণ করায় যদি অধিকাংশ দেশবাসীর অসুবিধা হয় তাহলে একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার স্থানে বসানোর আপত্তি করা উচিত নয়।

ইংরেজী ভাষার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি অনেক। ইংরেজী ভাষায় যাঁরা বলেন তাদের যুক্তি এই দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক ভাবে এদেশের মানুষকে শিক্ষা করতে হয়েছে, তাই ইংরেজী ভাষা বিশুদ্ধ অর্থে বিদেশী ভাষা নয়। এদেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমলাতান্ত্রিক সংস্থার ব্যক্তিবর্গের কাছে, সরকারী বেসরকারী অফিসের কাজকর্মের ক্ষেত্রে, ইংরেজী ভাষা প্রায় মাতৃভাষার সামিল। এদেশে আঞ্চলিক ভাষার পারস্পরিক দূরত্বের মধ্যে ইংরেজী ভাষা সংযোগ সূত্র। তাই Link Language হিসাবে ইংরেজীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এছাড়া ইংরেজীর মত সমৃদ্ধ ভাষার স্পর্শে এদেশের আঞ্চলিক ভাষাও যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই। এ-ছাড়া এদেশে উচ্চতর রাজকার্যে ইংরেজী ভাষা অপরিহার্য। কারণ ভাষার প্রকাশ-শক্তি ইংরেজি ভাষায় বেশি। বিপক্ষবাদীরা স্বাজাত্যবাদী, তাঁদের মতে ঔপনিবেশিকতার দিক থেকে ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া চলে না। ইংরেজী ভাষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির চাবিকাঠি, বিশ্বের দরবারে এই ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার মহিমা অর্জন করেছে। তবে দ্বিভাষাতাত্ত্বিকরা ইংরেজী ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে রাখতে উদ্যোগী।

অনেকে সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের জন্য উৎসাহী। সংস্কৃত ভাষা হিন্দুদের দেবভাষা, কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর পক্ষে এই ভাষা সমানভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা সেটা তর্কসাপেক্ষ। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, এই ভাষা দুরূহ ভাষা, এই ভাষা রাষ্ট্রভাষার সর্বজনীনতার পক্ষে অন্তরায়।

হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্থান দেবার পক্ষে যাঁরা, তাঁরা দেশের শক্তিমান সম্প্রদায়। হিন্দী ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষা, সুতরাং জনগণমনবেদ্য ভাষা হিসেবে হিন্দীর স্থান অগ্রাহ্য করা চলে না। এর উত্তরে বলা চলে, হিন্দীভাষার অঞ্চলভেদে রূপপার্থক্য অনেক। হিন্দী ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়, নানাবিধ মিশ্রণের দ্বারা এই ভাষা ঋণী। হিন্দীভাষার পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি এই যে সর্বভারতীয় ঐক্য একমাত্র হিন্দীভাষার প্রচলনেই সম্ভব। কিন্তু এই ঐক্যের ধারণার জন্য অন্য ভাষাকে খর্ব করার আইনসঙ্গত কোন যুক্তি থাকতে পারে না। হিন্দীর অকারণ প্রাধান্যের ফলে হিন্দী-মাৎস্যন্যায় হওয়া অসম্ভব নয়। তাই হিন্দীভাষার স্বপক্ষেও বিশেষ জোরালো যুক্তি দাঁড় করানো যায় না।

বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তি এই যে এই ভাষা ভারতের এক অসামান্য শক্তিশালী ভাষা। এই ভাষার এক আন্তর্জাতিক মান আছে। এজন্য বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার পঠন-পাঠনের সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু তবু এই ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া চলে না।

ভারতের মত বিচিত্র মানুষ ও সংস্কৃতির দেশে সুইজারল্যাণ্ড বা রাশিয়ার পথে ভাষা সমস্যার সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিতে প্রত্যেকটি ভাষার বিকাশ ও বিবর্ধন সম্ভব হবে।

ছাত্র সম্প্রদায় ও সমাজ সেবা

এ-যুগ ছাত্র-জাগরণের যুগ। এ-যুগ সমাজ-চেতনার যুগ। দুইটি কথাই আজকাল পাশাপাশি শোনা যায়, দুইটি কথাই পারস্পরিক সম্পর্কে সম্বদ্ধ। পূর্বেও ছাত্র ছিল, এখনও আছে, চিরকালই থাকিবে। পূর্বেও সমাজ ছিল, এখনও আছে, চিরকালই থাকিবে। তবু বিশেষ করিয়া ছাত্র-

সমাজের সহিত সমাজ-সেবার আদর্শকে এক করিয়া দেখার অর্থ বিশিষ্ট। তাহার মূল তাৎপর্য হইতেছে কোন যুগেই ছাত্রদের এমন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। ছাত্রদের এই অধ্যয়ন-ক্ষেত্র-অতিরিক্ত ভূমিকা ইতিহাসে এক নূতন বস্তু। পূর্বে গুরুগৃহে ছাত্র সন্তানের ভূমিকা লইত, গুরু পিতার স্থান ভূষিত করিত, ছাত্র সৌম্যমূর্তিতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শেষ করিয়া যেদিন গুরুগৃহ-ত্যাগ করিত সেদিন তাহার ঋণের অন্ত থাকিত না। গুরুঋণ অপরিশোধ্য এই বোধ লইয়া ছাত্ররা গুরুর স্মৃতি শিরোধার্য করিয়া রাখিত। কিন্তু এখন শিল্পায়নের যুগ। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক পণ্যদ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে, ফলে আধুনিকতার ভূত বা দেবতা যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে জীবনকে চালিত করিতেছে, সমাজের এই ক্ষেত্রেও তেমনি তাহা মুখ্যস্থান লইয়াছে। আধুনিক যুগে ছাত্রের ভূমিকা তাই সক্রিয়তার ভূমিকা। সে ভূমিকায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সেবা যেমন আছে, তেমন আছে অধিকারবোধ বা বিদ্রোহ, আছে নূতন কালের চেতনা।

আধুনিক চেতনা বলিতে বোঝায় জনসেবার চেতনা। আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ মানববাদ। মানুষই সেব্য, মানুষই লক্ষ্য, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য-আপমানের মুক্তিই মানবতাবাদের লক্ষ্য। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—এই উক্তির সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে নবযুগের মানবতাবাদের বাণী। সমাজসেবার আদর্শ তাই চিরপুরাতন। সমাজ-বৈষম্যকে দূর করিবার জন্য মানুষের প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে অতীতকাল হইতেই। কিন্তু এ-কালের মানুষ এই সমাজ বৈষম্য দূর করিবার জন্য যে সচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন, প্রাচীযুগে তাহা ছিল না। প্রাচীনযুগে মানুষ গ্রহণশীল ও স্বীকৃতিপ্রবণ ছিল। অর্থাৎ সমাজের অন্যায়-অত্যাচারকে ঈশ্বরের দান বলিয়া মনে করিত। কিন্তু এ-যুগে মানুষ এই সব কিছুকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। ভারতবর্ষের ধর্মবোধ ও লোকশ্রেয়ের আদর্শে দান-ধ্যান, সেবা-শুশ্রূষা, দয়ামায়া প্রভৃতি গুণাবলীর বহু প্রশংসা ছিল, কিন্তু ইহার সহিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে এত উগ্র করিয়া দেখান হয় নাই। আধুনিক যুগ তাই সমাজ-পরিবর্তনের শক্তি সম্পর্কে সচেতনতার যুগ। এই আধুনিক চেতনার স্পর্শ এখানে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

ছাত্রজীবন জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় হৃদয়বৃত্তি বা অনুভূতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে। তাই ছাত্রজীবনে প্রেম-প্রীতি বা ঘৃণা-বিদ্বেষ দুই প্রবৃত্তিরই আত্যন্তিকতা থাকে। এই অতিরেক তারুণ্যের ধর্ম। তাই

অবিবেচনা-প্রসূত ভুল যেমন এই বয়সে অত্যন্ত সহজ বস্তু, তেমনি মহৎ কর্মও এই সময়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক কৃত্য। তাই এই সময়ে যেমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য হৃদয় দীপ্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি মানবতার প্রেমে হৃদয় বিগলিত হয়। এই মানসিক প্রবণতার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে সমাজ-সেবার আদর্শ।

সমাজ-সেবা পুণ্যার্থে নয়, সেবার্থেই গ্রহণ করা আধুনিক আদর্শ। আগে সমাজ-সেবাকে লোকে ধর্ম-কর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিত এখন সমাজ-সেবাকে লোকে সমাজকে রক্ষা করিবার শুভবুদ্ধি হিসাবে দেখে। ধনীর লুণ্ঠন, শক্তিমানের অত্যাচার হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, দুঃখী-দুর্গতকে বাঁচাইতে হইলে সমাজ-সেবা প্রয়োজন। সমাজ-সেবা মানবিক ধর্ম, তাই ইহার চর্চা করিতে গেলে সংগঠনের প্রয়োজন। সমাজ-সেবা তাই একালে সাংগঠনিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সমাজ-সেবার আদর্শে তাই মায়া-মমতা-বৃত্তির সহিত কর্মদক্ষতা বা সংগঠন শক্তির আদর্শও জড়িত হইয়া আছে।

সমাজ-সবার পশ্চাতে ধর্মবোধ ছাড়াও আছে, মানব-প্রেম ; মানব-প্রেম ছাড়াও আছে মানুষের সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষের ক্রোধ ও সক্রিয়তার সংগঠন। সমাজসেবা বলিতে বোঝায় মানবতাবাদ ও মানব চেতনার অভ্যুদয়।

দরিদ্রনারায়ণের সেবা, জীবে প্রেম বিতরণ—শ্রীচৈতন্যদেবের যুগ হইতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেরই কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। সমাজের সর্বাপেক্ষা বড় ব্যাধি দারিদ্র্য ও অন্যায়—এই মৌল ব্যাধির দূরীকরণ ছাড়া সমাজসেবা সার্থক হইবে না।

মানুষের দুর্দশা যদি মানুষেরই সৃষ্টি হয়, তবে সমাজ-সেবার আদর্শ বৃহত্তর তাৎপর্য-মণ্ডিত। সে তাৎপর্য মানব-মুক্তির। প্লেগে সহর আক্রান্ত, তাই হস্তে সম্মার্জনী লইয়া রাস্তা জঞ্জালমুক্ত করিতে যে যুবসম্প্রদায় বাহির হইলেন, যে ছাত্রসম্প্রদায় বন্যা-বিধ্বস্ত নরনারীকে উদ্ধার করিলেন, তাঁহারা যে মহৎ কর্মে নিয়োজিত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচুর্যের মধ্যেও মানুষের যে হাহাকার, সেই হাহাকারকে দূর করিবার জন্য যে সৌম্যসুন্দর ছাত্র-সম্প্রদায় পথে বাহির হইলেন, তাঁহারাও নমস্য।

বিতর্ক-সভার প্রয়োজনীয়তা

বিতর্ক-সভা সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে দীর্ঘকালের এক সারস্বত প্রথা। বিতর্কের প্রবণতা মানবমনে চিরন্তন। জ্ঞানের চর্চায় মানুষের উৎসাহ চিরকালীন। জ্ঞান একদিকে যেমন অনুমান-নির্ভর অন্যদিকে তেমনি প্রমাণ-নির্ভর। তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধানে প্রমাণ ও প্রয়োগের পথে জ্ঞান আহৃত হয়। বিচারশীল মন তথ্য বা তত্ত্বকে বিচার করিয়া দেখে, পরীক্ষা করিয়া দেখে তবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বিতর্ক-সভার প্রয়োজনীয়তা এই বিচারশীল মনেরই ফলশ্রুতি।

বিতর্ক সভা স্কুল ও কলেজে, ক্লাবে ও লাইব্রেরীতে প্রচলিত আছে। আলোচনার বিষয় হিসাবে কোন একটি বিশেষ চর্চাযোগ্য বিষয়কে গ্রহণ করা হয়। আলোচনার দুই পক্ষ থাকে এবং একাধিক বিচারক থাকে, একজন সভাপতি সভা পরিচালনা করেন। দুই পক্ষ নিজেদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তি-জাল বিস্তার করেন। বিচারক প্রত্যেকটি যুক্তি বিচার করিয়া মূল্যায়ন করেন। বিচারকগণের রায় এখানে শেষ কথা। সভাপতি সভাশেষে বক্তব্যের সারার্থ লিপিবদ্ধ করেন।

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রের যুগে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতার জন্য যুক্তি-তর্কের অনুশীলন প্রয়োজন। প্রত্যেকের যুক্তিকে সম্মান করাই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। এই কারণে তর্কবিদ্যার অনুশীলনের প্রয়োজন। স্কুল-কলেজে বিতর্ক-সভা সংগঠিত হইলে এই যুক্তি-তর্কের চর্চা শক্তিশালী হইয়া ওঠে। এখানে তর্ক মানে, কলহ-প্রবণতা নয়। তর্কে যুক্তির প্রবলতা স্বীকৃত, কলহের কদর্যতা অস্বীকৃত। পরস্পরের মতকে শ্রদ্ধা করিয়া তর্ক নিজের যুক্তিজাল বিস্তার করে। তর্কবিদ্যা যুক্তিশক্তিকে জাগ্রত করে, শাণিত করে।

যুক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য গণতন্ত্রে স্বীকৃত হয়, প্রতিটি ব্যক্তির মতকে মান্য করিতে হয়। স্বৈরতন্ত্রে শক্তিদ্বারা এই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়। বিপক্ষের যুক্তিকে অগ্রাহ্য করার অর্থই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অগ্রাহ্য করা। নানা মতের সংঘাতেই জ্ঞানের প্রবাহ জাগিয়া ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে এই বিতর্ক-সভার আয়োজন দেশকে বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার দিক হইতে অগ্রসর করিয়া তুলিয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বা শ্রীরামপুর মিশনারীদের যুগ হইতেই এই বিতর্ক সভার সূত্রপাত। তাহার পর রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই বিতর্কসভার অগ্রগতি শুরু হইল। ডিরোজিও পর্যন্ত যুক্তিবাদী আন্দোলনকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য ১৮২৮ খ্রীঃ 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' নামে একটি বিতর্ক-সভা স্থাপন করেন। স্বাধীন চিন্তার প্রতি আকর্ষণ ও উৎসাহ উনবিংশ শতাব্দীর মনন ও সাধনার বৈশিষ্ট্য। 'একাডেমিক এসোসিয়েশন', 'আত্মীয় সভা', 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিত সভা', 'ধর্মসভা' প্রভৃতি বিদ্বৎ-সংসদ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মানসের যুক্তি, তর্ক ও বিদ্যাচর্চার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

স্কুল-কলেজে আজকাল বিতর্ক-সভার আয়োজন করা হয়। ইহা দ্বারা যুক্তি-তর্কের অনুশীলন হয়। দেশের ভাবী চিন্তাশীল সংসদ-বিদ, তর্কবিদ প্রভৃতির উন্মেষ ও লালন-পালনের জন্য স্কুল-কলেজে এই শ্রেণীর সংসদের প্রয়োজন আছে। মানুষকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করিতে হইলে, পরমতসহিষ্ণু করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, জ্ঞানোৎসাহী বা শ্রদ্ধাশীল করিতে হইলে এই ধরনের বিতর্ক-সভার প্রয়োজন আছে। যুক্তিই জীবনের পরম বাঞ্ছনীয় সত্য। যুক্তিই জীবনের ইষ্ট। স্বাধীন-চিন্তার জাগরণের জন্য যুক্তি-উপাসনার প্রয়োজন অপরিহার্য।

জাতীয় চরিত্র ও যুবসমাজ

যুবসমাজের সামনে আজ বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য। আজকে দেশে-দেশে যুব সমাজের জাগরণের চিহ্ন চোখে পড়ে। যুব-উৎসব দেশের সর্বজনীন উৎসবের মর্যাদা গ্রহণ করিয়াছে। আজকে যুবসমাজ ক্রুদ্ধ ও হতাশ, আবার আজকের যুব-সমাজ সংগঠনশীল ও কর্মচঞ্চল। মনুষ্যত্বের অপমান, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুবসমাজের ক্রোধ ও বিদ্রোহ, নূতন শোষণ-মুক্ত সুখী সমাজ-সৃষ্টির জন্য, আজ যুবসমাজের স্বপ্ন। কিন্তু কর্ম যদি চরিত্র-ভিত্তিক না হয়, তবে সে কর্ম সাফল্য আনিতে পারে না। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় চরিত্র।

জাতীয় চরিত্র বলিতে বোঝায় কয়েকটি মূল্যবোধ, কয়েকটি গুণাবলী যাহা কেবল ব্যক্তির গুণ নয়, সমগ্র জাতির গুণ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় মনুষ্যত্ব। জীবনের উদ্দেশ্য মানুষ হওয়া। মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে জাতীয় চরিত্র যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সে জাতি সমাজ-কর্মে মঙ্গলজনক পরিণাম আনিতে পারে। জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে এই সমাজের উপর। যে সমাজের প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি নাই, স্বজনের প্রতি মমতা াই, নিজ দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ নাই, দেশপ্রেম নাই, সে সমাজ নিষ্ফল হইতে বাধ্য। যুব সমাজের কর্ম-চাঞ্চল্য থাকা স্বাভাবিক—কিন্তু এই চাঞ্চল্য যদি চরিত্র-শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে যুব-শক্তির কর্ম-চাঞ্চল্য বিফল হইতে বাধ্য। তাই জাতীয় চরিত্রের বজ্রকঠিন ভিত্তিতে যুব-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাই জীবনের প্রেয় ও শ্রেয় হইয়া দাঁড়ায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষায় এই চারিত্র-নীতির উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়-র ওপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। সংযম-শাসন, অতিথিসেবা, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য ব্রহ্মচর্য-গ্রহণ, তপস্যায় বিশ্বাস প্রভৃতি মহৎ-গুণের উপর সেকালে মূল্য দেওয়া হইত। নারীকে করা হইয়াছিল ব্রহ্মবিদুষী—গার্গী মৈত্রেয়ী তাহার উদাহরণ। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে বিদ্যার্থী সমিৎপাণি হইয়া প্রবেশ করিতেন। যজ্ঞকাষ্ঠের ভার লইয়া আচার্যের নিকট গিয়া ছাত্ররা উপস্থিত হইতেন। এই নীতি সেকালের গুরু-শিষ্য-সম্পর্ককে যেমন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, এমন আর কোন যুগে করে নাই। তাই সেকালের াবনযাত্রায় শান্তি ও মৈত্রী, মানবতা ও আধ্যাত্মভাব বর্তমান ছিল। সেকালের বৃন্দ তাঁহাদের শিক্ষায় ও চর্চায় মানব চরিত্রকে মহিমাদান করিয়াছিলেন।

কিন্তু সেকালের চিত্র একালের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক হইতে পারে, একালে তাহার পুনরাবৃত্তি ত' আশা করা যায় না। দেশ ও কাল বদলাইয়াছে, কিন্তু চরিত্রশক্তি বদলায় নাই। মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ চরিত্র, সেই চরিত্র না থাকিলে তাহার কোন কাজই সার্থক হইতে পারে না।

বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের কয়েকটি ত্রুটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জাতি হিসাবে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব ভারতবর্ষের সর্বস্বীকৃত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু গুণের সহিত ত্রুটির দিকও এখানে উল্লেখ্য। আমাদের সর্বাপেক্ষা

বড় ত্রুটি আলস্য ও জড়তা।' যে অক্লান্ত শ্রমশীলতার ফলে আজ বিশ্বসভায় অন্য জাতি স্থান পাইয়াছে, সেই শ্রমশীলতার অভাবে বাঙালী আজ তাহার কল্পিত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না।

আমাদের সম্পর্কে আর একটি পুরাপ্রচলিত অভিযোগ যে আমরা ভাববাদী জাতি, কর্মবাদী জাতি নই। বাস্তববোধের অভাবে আমরা জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারি না। আমরা আড়ম্বরপ্রিয়, বাক্যপ্রিয় জাতি, কিন্তু কর্মপ্রিয়, কর্তব্যপ্রিয় জাতি নই। আমাদের হৃদয় সুকুমার বৃত্তিতে পূর্ণ, চারিত্রিক দার্ঢ্যের কিন্তু একান্ত অভাব। আমরা হুজুগপ্রিয়, উত্তেজনাপ্রিয়, কিন্তু কর্মকাণ্ডে অবিশ্বাসী। আমাদের প্রাণশক্তির জয়গান আমাদের কাব্যে-সাহিত্যে সর্বত্র। কিন্তু এই প্রাণশক্তির দীপ্তি আমাদের বেশী দূর লইয়া যায় না।

কোন জাতিকে বিশ্বসমাজে আসন পাইতে হইলে চাই জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ, গবেষণার প্রতি উদ্যোগ, চিন্তার বিকাশ ও স্বাধীনতায় আস্থা। যে জাতির জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে নাই, যে জাতির গবেষণার প্রেরণার উদ্দাম হইয়া ওঠে নাই, সে জাতির বিশ্বসংসারে দেবার মত ধন কিছুই নাই। আমরা বৃথা গল্পে কালক্ষেপ করিতে ভালবাসি, আমরা ধর্ম-কর্ম-তন্ত্র-মন্ত্র-ঝাড়-ফুঁক লইয়া ব্যস্ত থাকিতে ভালবাসি, আমরা দারা-পুত্র-পরিবার লইয়া সংসার রসে নিমগ্ন থাকিতে ভালবাসি এবং মাঝে মাঝে "কে আমার, কে তোমার"-গোছের মায়াবাদ বর্ষণ করিতেও পছন্দ করি, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় সুদূরগামী হইতে মন চায় না, ধৈর্য থাকে না। প্রশ্ন জাগে, বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে বাঙালীর মৌলিক অবদান কী? বিজ্ঞানে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস ছাড়া আর মৌলিক অবদানের কথা ত' ভাবাই যায় না। রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দ-বিবেকানন্দ ছাড়া বিশ্বসভায় নূতন দর্শন ও বিশ্বাস কেই বা দিতে পারিয়াছে? সামগ্রিকভাবে বলিলে বলা যায় যে, এদেশের তরুণ সম্প্রদায়ও গবেষণায় সমধিক আকৃষ্ট হয় নাই।

যে জাতির অকম্প দেশপ্রেম নাই, সে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। আমাদের সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে যদি দেশপ্রেমের উদ্দেশ্য না থাকে, তাহা হইলে সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। কিভাবে দেশ বড় হইবে, কিভাবে দেশ সমৃদ্ধ হইবে, এই চিন্তা যদি আমাদের সমস্ত কর্ম ও ক্রিয়ায় সঞ্চারিত না হয়, তাহা হইলে আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারিব না।

জাতীয় চরিত্রের ভিত্তি সততা। সততা, মনুষ্যত্ব-বোধ, স্বদেশপ্রেম, বত্যাগ্রহ না থাকিলে জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় না। যুবসমাজ যদি আজ জীবনের ভিত্তি না গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। আজকের এই এত আয়োজন, এত আড়ম্বর, এত বাগ্মিতা, এত ৎসব সবই নির্ভর করে জাতীয় চরিত্রের উপর। "চালাকির দ্বারা কোন হৎ কার্য সাধিত হয় না :—" এই ঋষিবাণী যেন সতর্কবাণীর ন্যায় আমাদের রিচালিত করে।

মানব সভ্যতায় বিজ্ঞানের দান

আধুনিক সভ্যতার প্রগতির মূলে আছে বিজ্ঞান। আজ বিজ্ঞানের গ্রগতি দেখিয়া সকলেরই মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল যে এই যুগ বিজ্ঞানের যুগ। নবিংশ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্যে এই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে, আজ জ্ঞানের অত্যাশ্চর্য সুফল জীবনের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আদিম মানুষ ছিল প্রকৃতির কাছে অসহায়। প্রকৃতির রুদ্ররূপ আদিম নুষকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই সেদিন মানুষ ধর্মের কাছে আশ্রয় হিয়াছিল, কল্পিত ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ধর্মের জন্ম ভয় তে, বিজ্ঞানের জন্ম জ্ঞান হইতে। মানুষ যেদিন জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে জয় রিতে শিখিল, সেদিন সে বিজ্ঞানের পথে অগ্রযাত্রী হইল। তাই মানুষ দিন আগুন জ্বালিল, সেদিন সভ্যতার ইতিহাসের সূত্রপাত।

বিজ্ঞান মানুষের জন্য অপরিমেয় কল্যাণ আনয়ন করিয়াছে। বিজ্ঞানের ংস্পর্শে মানুষ ব্যাধিকে জয় করিতে বসিয়াছে, দূরকে নিকট করিয়াছে, হ্যতিক শক্তিকে জীবনের প্রয়োজনের কাজে লাগাইয়াছে। এইভাবে জ্ঞানের দিগ্বিজয় মানুষকে জয়যুক্ত করিয়াছে।

পূর্বে মানুষ দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করিত ধর্মের স্থানে মানৎ করিয়া। ন্তু আজ পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, ক্লোরামফেনিকল, কলেরা-বসন্তের া আবিষ্কারের পর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে অসীম। রণ্টজেনের নরশ্মি', কুরী-দম্পতির 'রেডিয়াম' আবিষ্কার দুঃসাধ্য ব্যাধির সহিত যুদ্ধের নব পদক্ষেপ। বিজ্ঞানের বিজয়-বার্তা আজ দিকে দিকে ছড়াইয়া

প্রাত্যহিক জীবনের সুখ ও সুবিধার জন্য বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি আবিষ্কার এক নব-অধ্যায় রচনা করিয়াছে। যানবাহনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। যখন ষ্টীম-ইঞ্জিনের প্রচলন ছিল না ,তখন মানুষ যে অন্ধকারে বাস করিত, আজ আর সে অন্ধকারে বাস করে না। দ্রুতগামী পরিবহনের ফলে মানুষ কেবল দূরত্বকে জয় করে নাই, সময়কেও জয় করিয়াছে। দূরতর চন্দ্রলোব আজ বৈজ্ঞানিক সাধনা ও মানুষের সাহসের ফলে এক পরিচিত জ' বিশ্বমানবকে প্রতিবেশীতে পরিণত করিবার সাধনায় বিজ্ঞান আজ সার্থক বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ বিশ্ব এক পৃথিবীতে পরিণত হইয়াছে। বিজ্ঞানে: নিকট মানুষের ঋণের আজ শেষ নাই।

প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর জীবনযাত্রা আজি বিজ্ঞানকেন্দ্রিক। জীবনে: প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞানের প্রভাব আজ উপলব্ধি করা যায়। বিজ্ঞানে: কল্যাণে বিদ্যুৎ আজ সেবাদাসী হইয়া উঠিয়াছে—তাহা শুধু জীবন যাত্রা: প্রয়োজনীয় উপকরণকে সহজ ও সমৃদ্ধ করে নাই, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অন্যা চর্চার ক্ষেত্রেও যুগান্তর আনিয়াছে। ম্যাকসওয়েল-হাউজ-মার্কনি-জগদীশচন্দ্র বসু যেমন বেতার যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া মানুষের শুভঙ্কর অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি বিদ্যুৎ-রশ্মি দ্বারা আজ কত দুরারোগ্য চিকিৎ: আরোগ্যলাভের সুযোগ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকে: হৃদরোগ বিশেষজ্ঞগণ হৃদরোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যোগে ব: রোগ নির্ণয় ও নিরাময় সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। রোগ-নির্ণয়ের পদ্ধ আজ সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-নির্ভর। ক্যানসারের মত দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ে: ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য প্রায় অপরিহার্য। রঞ্জনরশ্মির ব্যবহার রেডিয়াম-চিকিৎসা প্রভৃতি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবযুগ সৃষ্টি করিয়াছে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে প্রায় ৩৫টি ন্যাশনাল ল্যাবরেটারির প্রতিষ্ঠ এক্ষেত্রে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। জেনরে: আবিষ্কৃত 'ভ্যাকসিন', লুই পাস্তুর আবিষ্কৃত জলাতঙ্ক-রোগের 'ইনজেকশন' 'ট্রিপল্-এন্টিজেন্' প্রভৃতির আবিষ্কার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবযুগ সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রকৃতির রহস্যকে অনুধাবন করিয়া বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়। বি' তাৎপর্য কার্যকারণ সূত্র-সন্ধান বা অনুশীলন। এই অনুশীলনের ফলে মানুষে

কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। মানুষ জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া বহু অসাধ্য সাধন করিয়াছে। সভ্য মানুষ আজ আর অরণ্যচারী, গুহাবাসী মানুষ নয়। বিজ্ঞানের অবদান শক্তির উৎসকে আবিষ্কার। এই শক্তির উৎস হইতে উৎসারিত দীপ্তি মানবসভ্যতাকে দীপ্ত করিয়া তুলিবে। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও শক্তির প্রকাশে বিজ্ঞানের অবদান অসামান্য।

বিজ্ঞান মানুষকে মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমা দান করিয়াছে। আজকের সভ্যতা বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারের সুফল লাভ করিয়াছে। কিন্তু মানুষের আত্মঘাতী প্রেরণা এই বিজ্ঞানের শক্তিকে ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করিয়াছে। কিন্তু মানুষের শুভবুদ্ধি মানুষকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে আগাইয়া দিক। বিজ্ঞান-আলোকিত বিশ্বের আজ ইহাই প্রার্থনা। বিজ্ঞানের সৃষ্টিশীল দিক যেমন, ধ্বংসাত্মক দিকও তেমনি আছে। সৃষ্টিরূপা জ্ঞানকে পূজা করিয়া ধ্বংসাত্মিকা শক্তিকে পরিহার করা মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিজ্ঞান সভ্যতার হাতে জয়ের মন্ত্র দান করিয়াছে। এই দিগ্বিজয়-যাত্রা মানুষের সভ্যতার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ

এ-যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য এযুগের মানুষের কাছে জীবনকাঠি ও মরণকাঠি দুইই হইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়াছে বাঁচিবার পথ, জীবনের আলো, কল্যাণের মহাকাশ। অবার আনিয়া দিয়াছে যুদ্ধের রণহুঙ্কার, হানাহানির রক্তলেখা, জিঘাংসার কত পৈশাচিক কাহিনী। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস কত যুদ্ধ ও নাটকীয় কাহিনীর ইতিহাস, কত সৃষ্টি ও কল্যাণের ইতিহাস। বিজ্ঞানের সর্বনাশা রূপ, বিজ্ঞানের কল্যাণময়ী রূপ মানুষের কাছে দুইটিই সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে।

আজকের উন্নত দেশের অত্যুন্নতির মূলে আছে বিজ্ঞান। আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, জাপান, ও পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে আজ জীবন-যাত্রার মান অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। মানুষ বাঁচিবার প্রয়োজনেই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করিয়াছে। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে জানিয়া প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগাইয়াছে। রাশিয়ায় সাইবেরিয়ার মরুভূমি বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আজ মানুষের কাজে লাগিয়াছে, উন্নত সেচ-পরিকল্পনা,

উন্মত্ত নদীকে বাঁধ দিয়া তাহার অন্তঃস্থ শক্তিকে মানুষের প্রয়োজনে লাগাইয়া বিজ্ঞান মানুষকে এক নূতন সম্ভাবনা আনিয়া দিয়াছে। উন্নত কৃষি-বিজ্ঞান দ্বারা জাপান তাহার ঘরে শস্যের সম্পদ পূর্ণ করিয়াছে। যন্ত্রশিল্পের অত্যাশ্চর্য সাফল্য চীন, জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে এক যুগান্তর আনিয়াছে। মানুষের বাঁচিবার সংগ্রামে, উন্নতির সংগ্রামে, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের সংগ্রামে বিজ্ঞান একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে কৃষককুল আর অসহায়ের মত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা আনিয়া দিয়াছে। ভিন্ন মাটির প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রথায় নির্মিত সারের প্রয়োগে কৃষির উন্নতি আজ নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রলয়ংকরী নদীকে শাসিত করিয়া সেচব্যবস্থার কার্যে লাগাইবার দুর্লভ ক্ষমতা আছে বিজ্ঞানের হাতে। তাই উন্নত সেচব্যবস্থা দ্বারা কৃষির উন্নতি দেশের শ্রীবৃদ্ধি আনয়ন করে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। মানুষের বাঁচিবার সাধনায় বিজ্ঞান এক্ষেত্রে আশীর্বাদ হইয়া দেখা দিয়াছে।

দেশোন্নয়নের কার্যে বিজ্ঞানের শক্তি অত্যাশ্চর্য যাদু সৃষ্টি করিয়াছে। নগর-পরিকল্পনা বা রাস্তাঘাট-পরিকল্পনা বিজ্ঞানের প্রভাবে এক অসামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। দুর্গম পর্বত, দুস্তর অরণ্য, অতলস্পর্শ নদী বা সমুদ্রের অনধিগম্যতা ভেদ করিয়া বুদ্ধিমান মানুষ রাস্তা-ঘাট-শহর সৃষ্টি করিয়াছে। মানব সভ্যতায় বিজ্ঞান আলাদীনের প্রদীপ সৃষ্টি করিয়াছে।

বিদ্যুৎ-শক্তির আবিষ্কার বিজ্ঞানের যুগে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিদ্যুৎ-শক্তির দ্বারা বিজ্ঞান শুধু দুরারোগ্য রোগকে নিরাময় করিতে শেখায় নাই, মানুষের জীবনযাত্রাকে লোভনীয় ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। সমুদ্র-গর্ভ ও ভূ-গর্ভ আজ মানুষের কাছে অজানা রহস্য-জগৎ নয়। বিদ্যুতের ব্যবহারে মানুষ সেখানেও সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে। এ-যুগের বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব মহাকাশ যাত্রা।

বিজ্ঞান শুধু অজানাকে আবিষ্কার করিয়া, দূরকে নিকট করিয়া, জীবনকে সহজ ও সুন্দর করিয়া এক নবযুগ আনয়ন করে নাই, বিজ্ঞান মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এ কৃষ্ণ-অধ্যায়ও সৃষ্টি করিয়াছে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোসিমা ও নাগাসিকা এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন।

মানুষের সাধনা, জীবনের সাধনা, মরণের নয়। তবু মানুষের তামসিক প্রবৃত্তি বার বার মানুষকে অমৃতলোক হইতে দূরে সরাইয়া আনিয়াছে। মানুষের লোভ, ক্রোধ, পৈশাচিক বৃত্তি মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির মহান আদর্শকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে। মারণ-যন্ত্রের আবিষ্কারে মানুষ যখন যুদ্ধে অকুতোভয়, ধ্বংসের তাণ্ডব-লীলায় অশান্ত, তখন বিজ্ঞানই বিজ্ঞানের সৃষ্টিকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছে।

বিজ্ঞান যুদ্ধাস্ত্রের নব নব উদ্ভাবনী-শক্তি আবিষ্কার করিয়াছে। আণবিক যুগে যুদ্ধ এমন এক পর্যায়ে গিয়া পৌছিয়াছে যেখানে তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের আশঙ্কায় বিশ্ববাসী সদাসন্ত্রস্ত। বোমারু-বিমান এখন কত নূতন নূতন শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। আণবিক বোমার শক্তি আজ কত ভয়ংকর, রকেটের সর্বনাশা শক্তি আজ বিশ্ববাসীর ধ্বংসের পথে এক হেতু হইতে পারে, দেশে দেশে হিংসা ও শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভ্যতা আজ ধ্বংসের কিনারায় গিয়া পৌছিয়াছে। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আজ মানুষের কাছে অভিশাপ। লোভী মানুষ, স্বার্থান্ধ মানুষ আজ বিজ্ঞানের শক্তি দ্বারা সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করিতে চলিয়াছে। মানুষের ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি আজ মানুষকে নিত্য নূতন সমরাস্ত্র-সম্ভার সৃষ্টিতে উদ্যোগী করিয়াছে। জার্মানী ও জাপান বিশ্বের মানুষকে দেখাইয়াছে কাত্যায়নী-রূপ। বিশ্ব-সভ্যতা আজ প্রলয়ংকরী শক্তিতে উন্মত্ত। বিজ্ঞানই এই ধ্বংসের উৎস শক্তি। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞান মানব-সভ্যতার অভিশাপ।

বিজ্ঞান একদিকে আশীর্বাদ না অভিশাপ—এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে মানুষ কীভাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে তাহার উপর। মানুষের অন্ধ প্রবৃত্তি, ধ্বংসের প্রবৃত্তি যতদিন না উচ্চতর ধ্যান-ধারণা দ্বারা শাসিত হইবে, ততদিন বিজ্ঞান আশীর্বাদ বর্ষণ না করিয়া অভিশাপই সৃষ্টি করিয়া চলিবে। নিত্য-নূতন বৈজ্ঞানিক আশীর্বাদে মানুষের জীবন যতই উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধ হইবে, ততই এক অনিবার্য বিভীষিকায় মানুষ সন্ত্রস্ত হইতে থাকিবে। মহাকাশ-যাত্রার দুর্নিবার অন্বেষণে মানব-সভ্যতা যতই দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠুক, দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ে মানুষের হাতে যত অস্ত্রই আসুক, মানুষ কিন্তু 'শেষের সেদিন ভয়ংকর' ভাবিয়া শিহরিত হইবেই। বিজ্ঞান যদি উন্মত্তা নদীতে বাঁধ দিতে পারে, তবে মানুষের প্রবৃত্তিতে বাঁধ দিতেও ত পারে ; আর তাহা না হইলে নরমেধ-আয়োজনে বিজ্ঞানের অবদান শেষ পর্যন্ত মানব-সভ্যতায় এমন

অভিশাপ ডাকিয়া আনিবে, যে প্রলয়-তাণ্ডবে কোন অভিশপ্ত ব্যক্তি আর এই ভয়াল অভিশাপকে বুঝিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিবে না।

বেতার ও আধুনিক জীবন

বিজ্ঞানের নব নব উন্মেষের পথে বেতার এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। বিজ্ঞান দূরকে নিকট করিয়াছে, পরকে আপন করিয়াছে, আবার ঘরকে বাহিরে পৌঁছাইয়া দিতেও কার্পণ্য করে নাই। বেতার-বার্তা ঘরের বাণীকে বিশ্বে প্রেরণ করিয়াছে। একদিন মানুষ প্রকৃতির কাছে হার মানিয়াছিল, আজ মানুষ দুর্জয় প্রকৃতিকে পরাজয় করিয়াছে।' ঈথার'-তরঙ্গ বা 'ইলেকট্রন'-লহরীকে যে-দিন মানুষ করায়ত্ত করিতে পারিল সেদিনই মানুষের বিজয়-বৈজয়ন্তী। প্রকৃতির বাক্-শক্তিকে মানুষের বুদ্ধি বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছে। এই বাঙ্ময় যন্ত্রের নাম বেতার। বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের ইহা এক অমূল্য পদক্ষেপ। বিদ্যুৎ হইতে বেতারের জন্ম।

বেতার একটি সূক্ষ্ম ধ্বনি-যন্ত্র। প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে যে ধ্বনি প্রেরিত হয়, তাহা গ্রাহকযন্ত্রে ধৃত হয়, এবং একাধিক তারবিশিষ্ট এই যন্ত্রের দ্বারা এই 'ঈথার'-তরঙ্গ প্রেরিত হয়। বেতার নামের সার্থকতা এইখানে যে তারের কার্যকারিতাই এখানে সর্বাধিক।

প্রথমে ১৮৬৪ খ্রীঃ ক্লার্ক ম্যাকস্‌ওয়েল তড়িত-চুম্বকধর্মী তরঙ্গের প্রমাণ গাণিতিক পদ্ধতিতে লাভ করেন। দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর পর জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্তজ এই তরঙ্গ উৎপাদন করেন। এই তরঙ্গের নামান্তর বেতার-তরঙ্গ। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নিরন্তর গবেষণায় এই তরঙ্গের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে একটি নিশানা পাওয়া যায়। ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনি ১৮৯৭ খ্রীঃ এই নিশানাকে জগৎ-সমক্ষে প্রচারিত করিয়া বেতার-উদ্ভাবনের গৌরব-মাল্য লাভ করেন। আকাশের বাণী আজ আকাশবাণীর মাধ্যমে মানুষের দুয়ারে পৌঁছিয়াছে। মানুষের জীবনে সাফল্য ও পূর্ণতা আজ দ্বারপ্রান্তে।

বিজ্ঞান মানবজীবনে কল্যাণের দূত হইয়া আসিয়াছে। মানব-কল্যাণে বিজ্ঞান নিযুক্ত বলিয়া বেতারও এই কল্যাণের অংশীদার হইয়া উঠে। বেতার শিক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গ। শিক্ষা প্রচারে বেতারের অবদান অতুলনীয়।

বেতারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ঘরে বসিয়া নানা বিষয় শিক্ষালাভ করে। ইউরোপে 'ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন' এবং 'আমেরিকান রেডিও ব্রডকাষ্ট' অসংখ্য মানুষকে শিক্ষার আলো বিকীর্ণ করে। ভারতবর্ষে কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র হইতে সারা দেশে বেতার-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বেতার মানুষের ঘরে বিশ্বের সংবাদ বহন করিয়া আনে। সুসংবাদ বা দুঃসংবাদ, রাজনৈতিক তথ্য বা সমাজনৈতিক প্রশ্ন, জ্ঞানী-গুণীদের নানা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক আলোচনা নানা সম্মেলনের বিবৃতি, নেতা ও পণ্ডিতদের বক্তৃতা, সংগীত, আবৃত্তি, নাটক প্রভৃতির আয়োজনের মেলা শুরু হয়। এত বড় আয়োজন আর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। লোক-শিক্ষার এমন সুযোগ স্কুল-কলেজেও সম্ভব নয়। এই দিক হইতে বেতার মানবজীবনে এক অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। গতযুগের বাংলাদেশের গ্রামে-গ্রামে যাত্রা-কথকতা প্রভৃতির আসরে যে বিপুল লোক-শিক্ষার আয়োজন হইত, সেই আয়োজনকে বেতার অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বেতারে যে যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, সে-যজ্ঞ লোকযজ্ঞ। আবালবৃদ্ধবনিতা, সুস্থ-অসুস্থ, শহর-গ্রাম-সীমান্ত অঞ্চল, দেশের দিক-দিগন্তে বেতার-বাণী ছড়াইয়া পড়ে। আকাশবাণীর দীপ্তিতে দেশের সমগ্র সমাজ আলোকিত হয়, আনন্দিত হয়, অনুপ্রাণিত হয়।

বেতারের মাধ্যমে আমরা দুইটি বস্তু পাই—জ্ঞান ও আনন্দ। জ্ঞান বলিতে আকাশবাণী-আয়োজিত সংবাদ, সংবাদ-সমীক্ষা, নানাবিষয়ব বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিক-স্বাস্থ্যগত-কল্যাণমূলক আলোচনা। আকাশবাণীতে শিশুমহল, মহিলামহল, ও বিদ্যার্থীমণ্ডল, মজদুর-মণ্ডলী প্রভৃতি নানা বিভাগ আছে। এই সব অধিবেশনে নানা ধরনের আলোচনা হয়। শ্রোতারা ঘরে বসিয়া সেই সব আলোচনা শুনিয়া বিভিন্ন বিষয়ে নানা রকমের তথ্য সং করে, জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করে। চার-দেওয়ালের মধ্যে বসিয়া এং রকমের সংবাদ ও বিষয়-জ্ঞান একমাত্র আকাশবাণীর মাধ্যমেই শোনা হয়। তাই উন্নত দেশগুলিতে আজ ঘরে ঘরে বেতার চালু হইয়াছে টেলিভিশন আসিয়াছে। মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের এমন সুযোগ কোন ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না।

বেতার-মাধ্যমে আমরা আনন্দ লাভ করিতে পারি। বেতা

পরিবেশিত সঙ্গীত ও নাটক হইতে আমরা অফুরন্ত আনন্দ সঞ্চয় করি। সাধারণ ঘরেও তরুণ-তরুণী শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গীতাবলী শুনিয়া মুগ্ধ হয়, চর্চা করিয়া অল্পবিস্তর সংগীত আয়ত্ত করিতে পারে। ইউরোপীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সকলের ভাগ্যে উপভোগ্য হয় না। বেতারের মাধ্যমে বীটোফেন-মোজার্ট-শুবার্ট বাখ-এর স্বরমূর্চ্ছণার নন্দন স্পর্শ আমরা লাভ করি। ইউরোপীয় সঙ্গীত হইতে এদেশের লোকসঙ্গীতের নানা স্তর আমরা বেতারের মাধ্যমে লাভ করি। নাটক ও ক্রীড়া-অনুষ্ঠান বা বিদেশের শ্রেষ্ঠ নেতাদের আলাপ-আলোচনা বেতার অপেক্ষা টেলিভিশনেও বেশি প্রত্যক্ষ হয়। তাই বেতারের উন্নতরূপ টেলিভিশনের জন্য আধুনিক মানুষ ব্যাকুল।

বেতার-বাণীর দ্বারা আজ মানুষের অনিঃশেষ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমুদ্রপথের উত্তালতায়, দুর্গম স্থলপথে, দুরারোহ পার্বত্যপথে, আকাশচারী যাত্রায় সর্বত্রই বেতার বিশ্বকে নিকটে লইয়া আসিয়াছে। বেতার কেবল জনশিক্ষার এক বিরাট হাতিয়ার নয়, ইহা অসংখ্য মানুষের বুদ্ধি, রুচি. ও প্রগতিকে প্রভাবিত করিতে পারে। মানুষের প্রগতি সম্ভব হয় বেতারের কল্যাণময় প্রভাবে।

বেতার-বার্তার প্রচার-শক্তি তাই সমাজজীবনে অসাধারণ। মানব-সমাজে বেতারের দুর্বার প্রভাব স্মরণ করিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি দেশে দেশে বেতার-কেন্দ্রকে অধিকার করিতে থাকে। কারণ শুভ বুদ্ধি ছাড়া বেতার প্রচার কল্যাণময় ভাবে পরিচালিত করা সম্ভব নয়—বিশ্বের জনকল্যাণের ক্ষেত্রে বেতারের অসামান্য প্রভাব অনস্বীকার্য। কবির ভাষায় বলা যায় :—

ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো উঠিল আকাশবাণী,
অমরলোকের মহিমা দিল-যে মর্তলোকেরে আনি।
সরস্বতীর আসন পাতিল নীল গগনের মাঝে,
আলোকবীণার সভামণ্ডলে মানুষের বীণা বাজে।

টেলিভিশন

বিজ্ঞান আজ সর্বজয়ী। বিজ্ঞানের সোনার কাঠি আজ মানুষকে জীবন-মন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছে। মানুষ আজ জয়যাত্রার পথের অভিযাত্রী। প্রকৃতির দুর্জয় শক্তিকে জয় করিয়া মানুষ তাহাকে জীবনের প্রয়োজনের কাজে লাগাইয়াছে। মর্ত্যের মানুষ আজ স্বর্গ-মর্ত্য জয়ী। এই যাত্রাপথের এক আধুনিক আবিষ্কার টেলিভিশন। মানুষের সুদূরকে জয় করিবার প্রেরণা মজ্জাগত। সে সুদূরকে কেবল জয় করিতে চাহে নাই, সুদূরকে সে নিকটে আনিতে চাহিয়াছে, সুদূরকে সে দেখিতে চাহিয়াছে। কলিকাতার এক প্রান্তে বসিয়া ভারতবর্ষের যে কোন বৃহৎ শহরের ক্রীড়া-দৃশ্য বা সভা-দৃশ্য দেখিবার বাসনা হইলে, তাহা সম্ভব একমাত্র এই যন্ত্রের মাধ্যমে। মানুষের যুগ-যুগ সঞ্চিত আশা ও স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে টেলিভিশন-মাধ্যমে।

বিজ্ঞান বাণীকে ধরিয়াছে আকাশবাণীর মাধ্যমে, কিন্তু রূপকে সে দেখিতে পায় নাই। রূপ ও বাণীকে দেখিতে পাওয়া যায় যে যন্ত্র-মাধ্যমে, তাহার নাম টেলিভিশন। টেলিভিশন বেতারের উচ্চতর সংস্করণ। ইহা দূরের বস্তুকে দৃশ্য করিয়া তোলে। সহস্র মাইল দূরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা চোখের সামনে স্পষ্ট করিয়া তোলা টেলিভিশনের কার্য। টেলিভিশনে বস্তুর প্রতিকৃতি বা অবয়ব প্রেরকযন্ত্রের মধ্য দিয়া দূরে পৌছায়। আলো ও ছায়ার নীলতরঙ্গে এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে। গ্রাহকযন্ত্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গ্রহণ করে, আলোকরশ্মির সাহায্যে এই গ্রাহক যন্ত্রের রশ্মি-তরঙ্গের তারতম্য ঘটে। এইভাবে বস্তুর প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠে এবং গ্রাহকযন্ত্রে ইহা গৃহীত হইবার পর প্রেরকযন্ত্রে তাহা দূরে পাঠান হয়। ইহাই টেলিভিশন। ১৯২৮ খ্রীঃ জন বেআর্ড বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে বর্ণময় দৃশ্য প্রেরণ করার ব্যাপারে সফল হন। বেতারে টেলিভিশনের প্রথম ব্যবহার হয় ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে। পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশে ইহার সমাদর অচিরে হয়। এখন টেলিভিশনের প্রভাব দেশ হইতে দেশান্তরে, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে। মহাকাশের পথে মার্কিন অভিযাত্রী টেলিভিশন যোগে গ্রহান্তরের ছবি মর্ত্যের মানুষের জন্য আনিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্রলোকের সঙ্গে মর্ত্যলোকের সেতুবন্ধন করিয়াছে টেলিভিশন।

টেলিভিশন প্রবর্তনের উদ্যোগ ও আয়োজন ভারতবর্ষেও সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে ইহা মূল্যবান বস্তু। রেডিও-'সেট' এখন ঘরে ঘরে, টেলিভিশন-'সেট' এখন সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষমতার বাইরে। ভারতবর্ষের অগণিত মানুষ টেলিভিশন-'সেট' ব্যবহারের পক্ষে তাই আর্থিক দিক হইতে অনুপযোগী।

দূরের মানুষের কণ্ঠস্বর শোনার জন্ম মানুষের ব্যাকুলতা চিরন্তন। আবার দূরের মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার বাসনাও চিরন্তন, সেই বাসনাকে সফল করিবার জন্ম টেলিভিশন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সুরু হইয়াছে। টেলিভিশন এই জয়যাত্রার বিজয়-পতাকা। আজকে টেলিভিশন উন্নত দেশের সামগ্রী, কিন্তু অনাগত অতীতে এই অদ্ভুত যন্ত্রটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃত করিয়া তুলিবে। মানুষের আবিষ্কার ও অভিযানের অন্ত নাই। সেই দুঃসাধ্য পথে টেলিভিশন মানুষকে চিরকাল সাহায্য করিবে। সেই স্বর্ণযুগ নিশ্চয় মানুষের ঘরে দেখা দিবে। টেলিভিশন সেই স্বর্ণযুগের আশা, আনন্দ ও প্রত্যয়কে সার্থক করিয়া তুলিবে।

চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র অর্থাৎ সিনেমা এই কথাটি আজ সর্বত্র অতি পরিচিত ও সমাদৃত। আজকের দিনে চলচ্চিত্র মানুষের মনে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পূর্বে চলচ্চিত্র থাকলেও তা সবাক ও সচল ছিল না। কিন্তু দ্রুত অগ্রসরবর্তী বিজ্ঞানের দ্বারা চলচ্চিত্র আজ সবাক, সচল রূপ গ্রহণ করেছে। পরিবর্তনশীল বিশ্বসংসারে তাই চলচ্চিত্রের কথা মানুষ একদিন যা কল্পনা করিতে পারেনি, সেই চলচ্চিত্র আজ আবিষ্কৃত হল। এই নবাবিষ্কৃত নির্বাক চলচ্চিত্র বর্তমানে বহুপূর্বের কল্পনাতীত সবাক ও সচল চলচ্চিত্রে পরিণত হয়েছে। মানুষের সামাজিক জীবনে বিজ্ঞান একটি বৃহৎ স্থান অধিকার করেছে। সেই বিজ্ঞানেরই একটি অত্যাশ্চর্য দান চলচ্চিত্র। বিজ্ঞানের সাহায্যে চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পূর্বে কর্মশ্রান্ত মানুষ কবিগান, তর্জা, পাঁচালি ও যাত্রা প্রভৃতির দ্বারা অবসর সময়ে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করত। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের পক্ষেই চলচ্চিত্র

শিক্ষণীয় ও আনন্দদায়ক। অশিক্ষিত মানুষ অতি দ্রুত ও সহজে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারে। আন্তর্জাতিক ও বহির্জগতের রীতিনীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় চলচ্চিত্রের সাহায্যে মানুষ অবহিত হয়। যান্ত্রিক-শিল্পগুলির মধ্যে চলচ্চিত্র অন্যতম।

জ্ঞানলাভের প্রবণতা দুর্নিবার। চলচ্চিত্র উন্নতশীল পৃথিবীর নানাপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংগে মানুষের একটি সমন্বয় সাধন করে। বিভিন্ন দেশের খেলাধূলা, যন্ত্র-শিল্প, কুটীর-শিল্প, কৃষি-ব্যবস্থা, পোশাক-পরিচ্ছদ শিক্ষা-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, রাস্তাঘাট প্রভৃতি নানা দৃশ্য মানুষ চলচ্চিত্রের মধ্যে দেখতে পায়। ফলে মানুষ নিজস্ব বুদ্ধি ও শক্তির দ্বারা বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারার সংগে সমন্বয় সাধন করে জ্ঞানলাভের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে। একদিকে আনন্দ অপরদিকে শিক্ষা, শিল্পজগতে চলচ্চিত্র এই দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ। একই সময়ে আনন্দ এবং শিক্ষা লাভ করে এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা মানুষের মনে দ্রুত অনুপ্রেরণা জাগায়।

সকল মানুষের জ্ঞান-প্রসারের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র অনন্য। সকল বস্তু বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু চলচ্চিত্র মানুষের মনের জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হয়। অনেক সময় পাঠ্যপুস্তক অথবা অন্যান্য বই পড়ে যে বিষয় বোধগম্য হয় না চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়। বিভিন্ন দেশ বিদেশের গল্প ও বিভিন্ন দেশের বর্ণনা বই পড়ে জানা যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেশে-বিদেশের চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই কারণে শিক্ষাজগতে চলচ্চিত্র অতি মূল্যবান স্থান অধিকারে সক্ষম হয়েছে।

চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পূর্বে ছিল রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয়। নাটকে ছবি তোলা হয় না, সচল মানুষ নিজেরাই সেখানে অভিনয় করে। একই জায়গায় সমগ্র কাহিনী সমাপ্ত হয়। রঙ্গমঞ্চে তখন চতুষ্পার্শে নানা প্রকার দৃশ্যের অবতারণা হত না। চলচ্চিত্রে-র তুলনায় নাটক-এর বিষয়বস্তু বোঝা এত সহজ ছিল না। কতকটা মুখের কথায়, আবার কিছুটা আচার ব্যবহারে বিষয়বস্তু বোঝানোর চেষ্টা করা হত। একই জায়গায় নাটকের আরম্ভ এবং শেষ হত। নাটকের তুলনায় চলচ্চিত্রের স্থান অতিব্যাপক। চলচ্চিত্রে সচল মানুষের আবির্ভাব ঘটে না সত্য; কিন্তু নানাপ্রকার দৃশ্যের মাধ্যমে বিষয়বস্তু অতি সহজেই দর্শকের বোধগম্য হয়। ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলে এবং তাকে সবাক ও সচল করে দর্শকের সামনে পরিবেশন করা হয়।

সেই দিক থেকে পূর্বের রঙ্গমঞ্চের নাটকের তুলনায় চলচ্চিত্রের পার্থক্য ও সুবিধা অনেক।

চলচ্চিত্র মানবমনে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অতি উচ্চস্থান্ অধিকার করেছে। তাই চলচ্চিত্রের প্রশংসা সর্বত্র। কিন্তু চলচ্চিত্রের ত্রুটিও অনস্বীকার্য নয়। ধীরে ধীরে চলচ্চিত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচয় লাভ করেছে। ব্যবসাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বেশীর ভাগ চলচ্চিত্রে শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষা অশালীন ও স্থূল রূপচিত্র বেশী। মানুষ অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, তাই চলচ্চিত্রের চটুল, হালকা এবং আনন্দদায়ক অংশটিই মানুষের মনে অধিক আনন্দের সঞ্চার করে। মানুষের মনে আনন্দ সঞ্চারণে অধিক আগ্রহী হওয়ায় চলচ্চিত্রে অশ্লীলতার পরিমাণ বেশী দেখা যায়। চলচ্চিত্রের শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষা নানাপ্রকার অশালীন ইঙ্গিতবাহী দৃশ্য মানুষের মনকে অধিক প্রভাবান্বিত করে। ছাত্রজীবনে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণের উপযুক্ত সময়। ছাত্রদের কিশোর মনের পক্ষে উদ্দীপক চলচ্চিত্র ক্ষতিকারক। এইরূপ চলচ্চিত্র ভবিষ্যৎ সমাজের বিনষ্টসাধনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে পরিগণিত হবে। সুতরাং চলচ্চিত্রে শিক্ষণীয় বিষয় থাকলেও বর্তমানে চলচ্চিত্র ছাত্রজীবনের পক্ষে প্রতিকূল ফলসৃষ্টি করতে চলেছে। এইটেই চলচ্চিত্রের প্রভাবের নেতিবাচক দিক। বর্তমান জগতে চলচ্চিত্রের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। শিক্ষামূলক বিষয় যাতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মানুষ গ্রহণ করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া কর্তব্য। তাই বর্তমানের ব্যবসায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করে ছাত্র ও যুবসমাজের উপযোগী শিক্ষণীয় বিষয় চলচ্চিত্রে প্রকাশিত হওয়া উচিত। শিক্ষণীয় বিষয়ের সংগে আনন্দবর্ধনের ফলে চলচ্চিত্র আরও উন্নতমান লাভ করতে সক্ষম হবে। শিক্ষাব্যবস্থা ও আমোদ-প্রমোদ উভয়ের সংমিশ্রণে চলচ্চিত্রের সমাবেশে দেশের ও জাতির কল্যাণসাধন অবশ্যম্ভাবী।

সংবাদপত্র

আধুনিক মানুষের কাছে সংবাদপত্র এক অপরিহার্য সম্পদ। ইহা মানুষের নিত্যসাথী। ইহার প্রয়োজন ও প্রভাব যে কী পরিমাণে দূরপ্রসারী, তাহা ব্যাখ্যার কোন অবকাশ রাখে না। আধুনিক মানুষ সমগ্র বিশ্বের নাগরিক—

পূর্বের গোষ্ঠীবদ্ধ, যুথবদ্ধ সমাজ 'আজ আর নাই। আত্মমগ্নতার সংকীর্ণতায় মানুষকে আর বাঁধিয়া রাখা যাইবে না। এই মুক্তির বার্তা, যোগসাধনের বার্তা সংবাদপত্র মানুষের কাছে লইয়া আসে। মানুষের ক্রম-বিকাশমান সমাজ-চেতনা ও রাজনৈতিক চেতনার জন্য সংবাদপত্র অনস্বীকার্য এক হাতিয়ার। জনশিক্ষার স্তম্ভ হিসাবে সংবাদপত্রও মানবসমাজে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। বিশ্বের অসংখ্য মানুষকে সংবাদপত্র সমাজ ও সভ্যতার প্রতিবিম্ব উপহার দিয়া এক অশেষ মূল্যবান কার্যসাধন করে। বিশ্ববাসী হইয়া উঠে নিকটতর প্রতিবেশী, দূর হয় নিকট, অজানা অচেনা হইয়া উঠে পরিচিত সত্তা।

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি সংবাদপত্র হাতে না আসে তাহা হইলে মানুষ নিজেকে অসম্পূর্ণ বোধ করে। তাই প্রতিদিনের অশন-বসনের মত, প্রতি মুহূর্তের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। মানুষের কৌতূহলকে নিবৃত্ত করার জন্য সংবাদপত্র লইয়া আসে চলতি মানুষের রাশি রাশি খবর—রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ, ক্রীড়া-জগৎ, প্রমোদজগৎ, শিল্প-সমাজনীতি প্রভৃতি মানব সম্পর্কীয় যাবতীয় তথ্য সংবাদপত্রে স্থানলাভ করে। ইহা জনপ্রিয় মাধ্যমে পরিবেষণ করা হয়। সকল শ্রেণীর, সকল গোত্রের মানুষকে ইহা প্রয়োজনীয় সংবাদ তথ্যাদি পরিবেষণ করে। তাই মানুষের পক্ষে ইহা হয় অপরিহার্য সঙ্গী। নিখিল বিশ্বের মর্মস্পন্দন মানুষের করতলগত হইয়া পড়ে।

জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব নিঃসীম। কারণ জনমত গঠনের পক্ষে সংবাদপত্রের দান অমূল্য। গণতন্ত্রের জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে সংবাদ পত্রের প্রভাব বর্ধিত হইয়াছে। কারণ গণতন্ত্রে মতামতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। সংবাদপত্র এক একটি মতবাদের প্রতিভূ হিসেবে কাজ করে। কারণ সংবাদ-পত্র প্রথমতঃ রাজনীতি ও অর্থনীতিকে মুখ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করে। জনসেবার আদর্শ অবলম্বন করিয়া সংবাদপত্র অগ্রসর হইলে সত্য সত্যই সংবাদপত্র মানুষের অনেক উপকার করতে পারে। এ ছাড়া মানুষের আজকাল রাজনৈতিক চেতনা পূর্বাপেক্ষা প্রখরতর হইয়াছে, জাতীয় চেতনার ক্রম-উন্মেষের সঙ্গে সংবাদপত্রের চাহিদাও বাড়িয়া যায়। সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধি তাই গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। যদিও অনেকে মনে করেন চীনদেশেই সংবাদপত্র প্রথম উদ্ভূত হয়, ব্রিটেনে গণতন্ত্রের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

সংবাদপত্রকে চতুর্থ প্রতিষ্ঠান বা 'ফোর্থ এস্টেট' বলা হয়। সংবাদপত্রের শক্তি সত্যই প্রচণ্ড। আধুনিকতার মধ্যেই সংবাদপত্রের জন্ম, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই আধুনিকতা বলিতে যন্ত্রযুগকেই বোঝায়। মুদ্রাযন্ত্রের পত্তন ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র বিকাশ বা সমৃদ্ধি নিষ্পন্ন হইয়াছে।

আধুনিকতার অনেক কল্যাণকর দিকের মতই সংবাদপত্রের শুভশক্তি সার্বিক নয়। তাই সংবাদপত্র সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিলেও, ইহার বহু নঙর্থক দিকও আছে। সংবাদপত্র আদর্শবাদী জনসেবকগোষ্ঠীর করায়ত্ত হইয়া থাকে না। কারণ ইহা একটি ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। এই ব্যবসায়ীগোষ্ঠী নিজের নিজের স্বার্থের অনুকূলে মতামত সৃষ্টি করে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতা বা ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশ করার জন্য সংবাদপত্রের সীমানা অনেকাংশ সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তখন সংবাদপত্র মিথ্যাচারে পরিণত হয়। ভ্রান্ত তথ্যের প্রলেপে ইহা বিভ্রান্তিকর হইয়া উঠে। সং সাংবাদিকতা গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে বিরাজ করে। ন্যায় ও আদর্শ সাংবাদিকতার ইষ্ট। কিন্তু ব্যবসা-প্রবৃত্তি এই মহৎ গুণাবলীর অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সংবাদপত্রের জনসেবার বা দেশসেবার আদর্শ এইভাবে ধনীগোষ্ঠীর হাতে পড়িয়া ক্ষুণ্ণ হয়।

আদর্শ সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া কার্য করেন। জনকল্যাণই ইহার ব্রত। তাই দেশের মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে সংবাদপত্র উদ্দেশ্যহীন বাণিজ্যে পরিণত হয়। সংবাদপত্র যেন সৎ নাগরিক ও প্রবুদ্ধ বিবেককে সৃষ্টি করে। ইহাই অসংখ্য সংবাদপত্রানুরাগীর প্রার্থনা।

গ্রন্থাগার

মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জ্ঞান। জ্ঞানের হোমানলেই মানবসভ্যতার শুচি ও শুচিস্নান। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ তাই জ্ঞানকেই শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায়, যেযুগ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত, সেযুগ মানব সভ্যতার সোনার তরীতে অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে। ইতিহাসে কত সম্রাটের কত কীর্তিকাহিনী হারাইয়া গিয়াছে; কিন্তু সত্যভিক্ষু শ্রমণের আত্মার অমর বাণী

স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। মানুষের আত্মার এই সম্পদই গ্রন্থে নিহিত থাকে. গ্রন্থাগার এই সম্পদের রত্নাকর। গ্রন্থ, এক মহাকবির মতে, একটি জাতির জীবন শোণিমা। সেই গ্রন্থের কল্লোল যে মহাসমুদ্রে শোনা যায়, তাহার নাম গ্রন্থাগার।

মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিদ্যা। বিত্ত নয়, সম্পদ নয়, বিদ্যাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন। যে জাতির বিদ্যার সঞ্চয় যত বেশি, সে জাতির অমরতার দাবী তত বেশি। যে ব্যক্তি বিদ্বান, সে ব্যক্তি অমৃতের স্পর্শ পাইয়াছে। বিদ্বানই ব্রাহ্মণ। বিদ্বানই বিপ্র। জ্ঞানই মানুষের শক্তি। তাই ইংরেজি ভাষার একটি বিখ্যাত উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য: 'knowledge is power'। গ্রীক ইতিহাসে লাইকারগাসের যুগ নয়, সোলোনের যুগই ইতিহাসে অমর। স্পার্টা শক্তিতে স্বাস্থ্যে যত উন্নতিলাভ করুক, জ্ঞানে-গুণে কিন্তু এথেন্স বড়। ভারতবর্ষের গুপ্তযুগ, বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দী, ইংলণ্ডে 'এলিজাবেথান যুগ', ইউরোপে রেনেসাঁস—মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই সব যুগের পাথেয় জ্ঞানের সম্পদের জন্য, সৃষ্টির মহিমার জন্য। তাই যে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত উন্নতি, সে যুগের অমরত্বও তত তর্কাতীত।

গ্রন্থাগার যুগ যুগ আহৃত জ্ঞানের মহামিলনসত্র। এই স্থানে ভাব ও বিদ্যা, জ্ঞান ও মৈত্রী এক মহাবেণীবন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে। অতীত ও বর্তমান, ইহলোক ও পরলোক, ব্যক্তি ও সমাজ সবই এক স্বর্ণসূত্রে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। গ্রন্থাগার তাই অনন্ত জ্ঞানের সমুদ্র। পুস্তক-মেলার শ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগার যদি জ্ঞান সমুদ্র হয়, তবে নিউটনের মত মহামনীষী সারা জীবন ইহার তীরে নুড়ি কুড়াইয়া শেষ করিতে পারিবেন না। সাধারণ মানুষ ত-তুচ্ছ।

অতীতকালে লিপির আবিষ্কার হয় নাই। বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'বেদ' মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠস্থ থাকিত। এইজন্য ইহার নাম 'শ্রুতি'। পুরুষানুক্রমে ইহা প্রচলিত থাকিত। লিপি আবিষ্কারের পর গ্রন্থ-লেখার পরিকল্পনা মানুষের মস্তিষ্কে আসে। প্রাচীনকালে তালপাতা ও ভূর্জপাতায় গ্রন্থ লেখা হইত। মধ্যযুগে তুলট কাগজ আবিষ্কার হওয়ার পর গ্রন্থ লেখা সুরু হইল।

প্রাচীনকালে গ্রন্থাগার বেশী ছিল না। সে সময়ে মঠে-মন্দিরে, রাজপুরুষ ও শ্রেষ্ঠীর গৃহে বা বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে গ্রন্থ-সংগ্রহ থাকিত। এই গ্রন্থ-সংগ্রহ সাধারণের ব্যবহারের পক্ষে অনধিগম্য ছিল। মধ্যযুগে বড় বড় পণ্ডিতগণ শ্রুতিধর ছিলেন, মুখস্থশক্তিতে বিদ্যা কণ্ঠস্থ থাকিত। প্রাচীন বাংলার

বাসুদেব সার্বভৌমের খ্যাতি এইরূপ ছিল। এই সব পণ্ডিতদের অনেকে 'গ্রন্থী' বলিত। প্রাচীন জ্ঞানের সংগ্রহশালা হিসেবে বাগদাদের গ্রন্থশালা, সোমনাথ মন্দিরের গ্রন্থশালা, সেকান্দ্রার পুঁথি-সংগ্রহাগার, নালন্দা-ওদন্তপুরী, তক্ষশীলার গ্রন্থাগার প্রভৃতি ইতিহাসে স্মরণীয় জ্ঞানতীর্থ হইয়া আছে। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থশালার খ্যাতি ইতিহাস-বিশ্রুত। এই গ্রন্থশালার অপমৃত্যু মানবজাতির ইতিহাসে এক কলঙ্ক। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট গ্রন্থশালা ছিল দেশে দেশে বিখ্যাত। গুরু-পরম্পরার মধ্য দিয়া বিদ্যা কালে কালে প্রবাহিত হইত। এইজন্য ভারতবর্ষে গুরুবাদ এত প্রবল। সেকালে গুরুদের স্মৃতি ছিল জীবন্ত গ্রন্থশালা।

একালে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থশালার আকার ও প্রকারও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন পণ্ডিতব্যক্তির গৃহে গ্রন্থসংগ্রহে কোন বাধা নাই। এই অগাধ-অবাধ সঞ্চয়-তৃষ্ণা আজকাল জ্ঞানের অনুসন্ধানী মাত্রই মিটাইয়া লয়। এখন ব্যক্তিগত সংগ্রহগুলির মূল্য অসাধারণ। এখন গ্রন্থ-সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ সাধারণ শিক্ষিত সমাজেই প্রবল। আধুনিক কালে গ্রন্থাগার-সচেতনতা এত বেশী যে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বলিয়া একটি বিশেষ পাঠ-ক্রমই সর্বত্র চালু হইয়াছে। দলে দলে বিদ্যার্থীবৃন্দ এই বিষয়ে ডিগ্রী-অর্জনের জন্য সচেষ্ট হইতেছে। ফলে আধুনিক গ্রন্থাগার সুসজ্জিত, সুসংগঠিত, সুশাসিত একটি সংস্থায় পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থ-পরিসংখ্যান-জ্ঞান এখন অত্যন্ত প্রখর হওয়ায় গ্রন্থাগার ব্যবহারেও কাহারও কোন অসুবিধা হয় না। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে 'জাতীয় গ্রন্থাগার', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', 'কলিকাতা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী',' চৈতন্য লাইব্রেরী', দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী', 'কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার', 'খুদাবক্স লাইব্রেরী', 'ব্রিটিশ কাউন্সিল', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার। বিদেশে অবস্থিত 'বিবলিওথেক ন্যাশনাল,' লেনিন লাইব্রেরী', 'ব্রিটিশ মিউজিয়ম,' আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরের লাইব্রেরী প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত। দেশ বিদেশের জ্ঞান ও গবেষণার জাগরণ সম্ভব হইয়াছে এই সব গ্রন্থাগার দ্বারা। সভ্য মানুষের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসারের এমন উৎস আর কোথাও নাই। এই গ্রন্থাগারগুলিকে বলা হয় এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়। The true university of our days is a collection of books'—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কলিকাতার 'ব্রাহ্মসমাজ পাঠগৃহ', 'সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী',

'প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী', বা শ্রীরামপুরের 'শ্রীরাম মহাবিদ্যালয়ের' লাইব্রেরী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-সঞ্চয়-কেন্দ্র। সহস্র সহস্র অধ্যাপক-গবেষক ছাত্র এখানে প্রতিদিন কাজ করিতেছেন।

পশ্চাত্যে গ্রন্থাগার যত্ন, অধ্যবসায় ও বিজ্ঞান-চেতনার ফলশ্রুতি। সেগুলিকে জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া ধরা হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের স্বর্ণখনি হইতে রাশি রাশি সম্পদ আহরণের জন্য চাই নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা। বাংলাদেশে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা কোন সারস্বত-সংস্থা গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হয়, কিন্তু অযোগ্য কর্মকর্তাদের ভৈরব-চক্রে পড়িয়া তাহা অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। এখানে অনেক বই ব্রিটিশ আমল হইতে রাজরোষে পড়ায় সেগুলি জেল-লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত হইত। জেল-লাইব্রেরীগুলি দেশবিখ্যাত সংগ্রহ হিসেবে স্বীকৃত হইয়া আছে।

গ্রন্থাগার একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের কর্তব্য গ্রন্থাগারকে সুপরিচলিত করা। গ্রন্থাগার যদি রাষ্ট্রের সাহায্য পায়, তবে তাহার পক্ষে দ্রুত প্রসার বা বিস্তার সহজে সম্ভব হয়। আমাদের মত গরীব দেশে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সর্বাধিক। কারণ অধিকাংশ শিক্ষার্থী এখানে বই কিনিবার সুযোগ পায় না।

গ্রন্থ মানুষকে দেয় জ্ঞান ও আনন্দ। মানুষের জৈব-স্তর অতিক্রম করিয়া মানসলোকে উত্তীর্ণ হইবার শ্রেষ্ঠ কলাকৌশল নিহিত আছে জ্ঞান ও সংস্কৃতির মধ্যে। গ্রন্থ আত্মার জ্যোতি বিকীর্ণ করে, মানুষে মানুষে সেতুবন্ধন করে। তাই মানবসভ্যতার ইতিহাসে গ্রন্থের মূল্য অসীম। এইজন্য কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমন্ত শিশুর মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত।"

গ্রন্থ-সঙ্গ

মানুষ বড় একা। সে চায় সঙ্গ। সেই সঙ্গ সাধুও হইতে পারে, অসাধুও হইতে পারে। গ্রন্থ এমনই এক সাধুসঙ্গ। প্রাচীন ভারতবর্ষে বলা

হইত, সংসার বিষবৃক্ষ, সেই বিষবৃক্ষের দুইটি অমৃতময় ফল কাব্যামৃতস্বাদ ও সাধুজনসঙ্গম। গ্রন্থ-সঙ্গের দ্বারা আমরা অমৃতময় আস্বাদ লাভ করি। মানুষের একাকিত্বের ব্যথা ঘুচিয়া যায়, মানুষ বন্ধু ও পরিজনের মধ্যে যে সঙ্গ লাভ করেন, সে সঙ্গ হয় সীমিত। কারণ ক্ষুদ্র স্বার্থ বা আমিত্বের দ্বারা এই সঙ্গ ক্ষুণ্ণ হয়, কলুষিত হয়, তাই এই সঙ্গ শাশ্বত আনন্দের উৎস হইয়া উঠে না। গ্রন্থ-সঙ্গ এই শাশ্বত আনন্দের উৎস।

গ্রন্থের মধ্যে মানুষের আত্মার সম্পদ নিহিত থাকে। একটি মানুষের ধ্যান জ্ঞান ও উপলব্ধি ইহাতে সঞ্চিত থাকে। মানুষের হাসি-কান্নার বিচিত্র রূপ ইহাতে বন্দী থাকে। তাই গ্রন্থ মানুষের কাছে এক অপরিহার্য সম্পদ। মানুষের অনেক সম্পদ আছে—ধন, জন, মান ও নানামুখী বৈভব। গ্রন্থ এই শ্রেণীর কোন বৈভব নয়। কিন্তু গ্রন্থ এমন এক নিত্যকালীন বৈভব যে, মানুষ যদি একবার এই বৈভবের সন্ধান পায়, সবে সে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। গ্রন্থ আত্মার জ্যোতিতে দীপ্ত বলিয়া নিত্যকালীন সম্পদ। কারণ কাল ক্ষণস্থায়ী, মানুষের জীবনও ক্ষণস্থায়ী। সুদূর অতীতকে মৃতস্তূপ হইতে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এই অতীতের রত্নোদ্ধার করিতে হইলে, পুরাতন মানুষের আত্মার স্পন্দন শুনিতে হইলে, গ্রন্থ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। কারণ গ্রন্থের বুকে কান পাতিয়া অতীত আত্মার স্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের মধ্যে অতীত কথা কয়, মূক অতীত ভাষা পায়, মৃত ইতিহাস জাগিয়া ওঠে। এইজন্য গ্রন্থ-সঙ্গ মানুষের কাছে এক অপার্থিব আনন্দ আনিয়া দেয়।

গ্রন্থ দ্বারা মানুষ পায় জ্ঞান ও আনন্দ। এই জ্ঞানের আলোর জন্য মানুষ বড় তৃষিত থাকে। সামান্য আনন্দের জন্য মানুষ ছুটিয়া বেড়ায়। এই আনন্দের শেষ নাই। তাই গ্রন্থের মধ্যে এই আনন্দকে মানুষ সন্ধান করে। এই পৃথিবীতে মানুষের সব আনন্দই ক্ষণস্থায়ী। যৌবন নশ্বর, প্রেম-প্রীতি-স্নেহ সবই নশ্বর, শৈশবের বন্ধু যৌবনে থাকে না, যৌবনের বন্ধু প্রৌঢ়ত্বে হারাইয়া যায়, তখন তাহাদের স্মৃতি উদ্ধার করাই শক্ত। দারা-পুত্র-পরিজন সবই কালের নিয়মে মানুষের কাছে আসে আর যায়, সময়ের স্রোতে মানুষ পরিবর্তিত হয়, যৌবনের আনন্দের বস্তুগুলি বার্ধক্যে আসিয়া সৌখীন খেলনা মনে হয়। প্রৌঢ়ত্বের পার্থিব ভোগবৈভব তৃষ্ণা বার্ধক্যে মিলাইয়া যায়। কিন্তু সব বয়সে, সব কালে যাহার রস অম্লান থাকে তাহার নাম গ্রন্থ। এইজন্য গ্রন্থ-সঙ্গ মানুষের জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের চলার পথের বিশ্বস্ত সাথী গ্রন্থ। মানুষ মনোময় জীব। তাই কেবল দেহ লইয়া বাঁচিলে তাহার চলে না, তাহাকে মন লইয়াও বাঁচিতে হয়। তাই মনকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে গ্রন্থের সাহচর্য চাই। মানুষের যুগ-যুগ অর্জিত ভাব সম্পদকে পাইতে হইলে গ্রন্থের প্রয়োজন। যখন তোমার কাছে কেহ নাই, যখন তুমি পরিত্যক্ত বা একা, তখন তোমার যদি পাঠগৃহ থাকে, তাহা হইলে সেখানে দেখা পাওয়া যাইবে শেক্সপীয়র, মিল্টন, গ্যেটে, দান্তে, ভার্জিল, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, ভবভূতি, ব্যাস, বাল্মীকির। ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বরাভয় দান করিবেন কপিল ও শংকর প্লেটো-এরিস্টটল-কাণ্ট-হেগেল-ইরাজমুস প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ। তাঁহাদের নিঃশব্দ উপস্থিতি তোমাকে দিবে আনন্দ ও আশ্বাস। ধীরে ধীরে চোখের সামনে এক অপূর্ব জগৎ রচিত হইবে। সেই জগতের তুমিই সম্রাট। গ্রন্থ-সঙ্গ এই সাম্রাজ্যকে মানুষের কাছে অপরিহার্য করিয়া তুলিবে।

বেকার-সমস্যা

বেকার-সমস্যা সারা বিশ্বের এক অর্থনৈতিক সঙ্কট। ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে এই সঙ্কট এক রাহুগ্রাসের মত গ্রাস করিয়াছে। আজকের জাতীয় জীবনের ইহা প্রধান সঙ্কট। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য অভিশাপের মত লাগিয়া আছে। যুবশক্তি আজ কর্মাভাবে পথভ্রান্ত, কৃষি আজ মুমূর্ষু, শিল্পী আজ বেকার। সমস্ত দেশে কর্মাভাব ও খাদ্যাভাব এক প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই অমানিশা ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে এক কালরাত্রি ডাকিয়া আনিয়াছে।

ঐতিহাসিক কারণেই এই বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। আধুনিকতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবের অভ্যুত্থান একটি সহযোগী ও স্বাভাবিক ঘটনা। ইংরেজ যখন এদেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের শাসনের লক্ষ্য ছিল শোষণ। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচীন অর্থনীতিকে ভাঙিয়া বিদেশী শিল্পনীতিকে প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনা তাহার মধ্যে প্রাধান্য পাইল। পল্লী-শিল্পী বেকার হইল, কুটীরশিল্প ধ্বংস হইল। ইহাই বেকার-সমস্যার প্রথম ধাপ।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বেকার-সমস্যার বৈশিষ্ট্য একটু স্বতন্ত্র। এখানে

বঙ্গবিভাগের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অনেক উদ্বাস্তর অনুপ্রবেশে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। লোকসংখ্যার আধিক্য ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের অভাব এদেশের বেকার-সমস্যার উৎস।. বাংলাদেশে নানাদেশের মানুষ আসিয়া জীবিকা-সংগ্রহে রত। কলকাতা সর্বগ্রাহী শহর—এখানে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের জীবনযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়। তাই বাংলাদেশের চাকরী ক্ষেত্রে চাপও বেশী। ইহার ফলে চাকুরীর সুযোগ ও সংস্থান এবং চাহিদার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান গড়িয়া ওঠে। বেকার-সমস্যার ক্ষেত্রে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এছাড়া বাংলাদেশের অধিবাসীর পক্ষে আর একটি সমস্যা এই যে বাঙালীরা সাধারণতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি অনুরক্ত নন। যে-কোন অনুন্নতদেশে চাকরী সৃষ্টির সুযোগ সীমিত। এমন কি ইউরোপের উন্নত দেশেও এই সুযোগ অবাধ নয়। সেক্ষেত্রে জাপান যেমন করিয়া স্বনির্ভর হইয়াছে, ভারতবর্ষের পথও তাহাই হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষে কৃষিও যেমন যথেষ্ট অগ্রসর নয়, শিল্পায়নও তেমনি সচল নয়। এছাড়া বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকরী নির্ভর, কিন্তু চাকরীর ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা এখন তীব্র।

এদেশে বেকারের প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও বিচিত্র। এখানে কিছু লোক "Seasonal employment"-এ নিযুক্ত থাকে। ইহারা অর্ধ বেকার। কেহ কেহ অবার পূর্ণ বেকার, সুতরাং এদেশে কৃষকসম্প্রদায় বৎসরের কিছু সময় কর্মব্যস্ত থাকে, কিছু সময় বেকার থাকে। আর একভাগে বেকারদের ভাগ করা যাইতে পারে—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ ডিগ্রী লইয়া কিছু কিছু ব্যক্তি বেকার জীবন যাপন করেন।

এদেশে বেকার সমস্যা সম্পর্কে একটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রয়োজন। দেশে কলকারখানার সংখ্যাবৃদ্ধি যেমন একান্ত প্রয়োজনীয় তেমনি কৃষির উন্নতিও অপরিহার্য। কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষে কৃষির উন্নতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠা অনুন্নত দেশে সম্ভব নয়, তাই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের দিকে উদ্যোগ ও আয়োজন থাকা উচিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি উন্নয়ন করিলে কৃষক-সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে একটি সর্বাঙ্গীন সাফল্য আসা সম্ভব। শিল্পজাগরণের জন্যই শিল্পক্ষেত্রে গবেষণা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন। বৃত্তিশিক্ষামুখী শিক্ষাক্রম চালু করা উচিত। সরকারকে আর্থিক অনুদান দিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নয়ণ করিয়া তুলিতে হইবে।

বেকারত্বের সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ কর্মশক্তির অপচয়। কর্মহীনতার জন্য দেশের শ্রমশক্তি অপচিত হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাই জীবিকা-ভাতা বা বেকার-ভাতা দ্বারা কর্মহীন ব্যক্তিকে গ্রামাঞ্চলে নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু গরীব দেশের পক্ষে এত অর্থ বিনিয়োগ করা দুরূহ।

ভারতবর্ষ শিল্পযুগে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে। তাই যন্ত্রযুগের এই জাগরণের দিনে শিল্পায়নকে দ্রুত সম্ভব ও সার্থক করিতে হইবে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পক্ষে তাই বেকার-সমস্যার প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ দিতে হইবে। ভারতবর্ষের মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য তাই এই সমস্যার নিরাকরণ প্রয়োজন। জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি, উপযুক্ত কর্ম-সুযোগের প্রভাব, জাতীয় আয়ের মন্দীভবন, প্রভৃতি হেতুবিধি দ্বারা আমরা বেকার সমস্যার যত ব্যাখ্যা করি না কেন কার্যত ইহা ভারতবর্ষের জাতীয় ও সামাজিক জীবনকে যক্ষ্মাব্যাধির মত ক্ষয় করিয়া দিতেছে। এই সমস্যা সমাধান না করিতে পারিলে ভারতবর্ষে সমাজমুক্তি আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

মানুষের শ্রম এক পবিত্র বস্তু। এই শ্রমের উদ্বৃত্ত লুণ্ঠন করিয়া মুনাফার পর্বত জমা করা লোভী মানুষের যুগ-সঞ্চিত পাপ। মানুষের স্বাধীনতা সেইদিন আসিবে যেদিন সমাজে ব্যক্তির শ্রমশক্তির পরিমাপ অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহের সুবর্ণসুযোগ আসিবে। উপযুক্ত পরিকল্পনা ও সমাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গী ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। প্রকৃতি মানুষকে অফুরন্ত সম্পদ দান করিয়াছে—সেই সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে আনিবার জন্য শ্রমশক্তির ব্যবহার চাই। বেকার-সমস্যা দূর হইলে তাই অচল শ্রমশক্তি মুক্তি পাইবে। নূতন সৃষ্টির বন্যায় দেশ হইয়া উঠিবে কর্মচঞ্চল।

শ্রমের মূল্য ও মর্যাদা

শ্রম মানুষের মহৎ সম্পদ। বর্ণপরিচয়ের সুরুতেই প্রাপ্ত উক্তি শ্রমের মূল্যকে স্মরণ করিয়া দিয়াছে—'শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না।' বস্তুত, শ্রম না করিলে মানুষের জীবনই অচল হইয়া পড়ে। তাই শ্রমের মূল্য ও মর্যাদা আধুনিক সমাজে অসীম।

প্রাচীনকালে শ্রমের মূল্য এতখানি দেওয়া হয় নাই। প্রাচীন সমাজ

ছিল স্থূল ও স্থাণু। প্রাচীন সমাজের ভিতর পরিবর্তনের শক্তি বিশেষ ছিল না। কারণ তখন মানুষ কায়িক শ্রমকে সুনজরে দেখিত। সুবিধাভোগী সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমিক বিত্তাধিকারে অলস প্রমোদে কালযাপন করিত। সাধারণ মানুষ জমির কাছ হইতে নগদ পাওনার আশায় অন্য কোন পরিশ্রমের কথা ভাবিত না। এই সামাজিক পশ্চাদগামিতা এখনও গ্রামজীবনে বর্তমান। এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়।

গ্রীস দেশের সমাজ-ব্যবস্থায় ক্রীতদাস প্রথা প্রবলভাবে চালু ছিল। ক্রীতদাসগণ কায়িক শ্রম করিতে বাধ্য হইত, কারণ তাহাদের প্রভুবৃন্দ কায়িক শ্রমকে ঘৃণা করিত। গ্রীসের সুবিধাভোগী সম্প্রদায় কায়িক শ্রমকে অবজ্ঞা করিত বলিয়া কলা-বিদ্যা প্রভৃতির অলস-সম্ভোগে মত্ত থাকিত। এই ধারাটি সমগ্র ইউরোপেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইউরোপে একটি অলস প্রমোদপ্রিয় অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছিল। ইউরোপের ইতিহাসে লর্ড-ব্যারনগণ এই ঐতিহ্যকে সযত্নে পালন করিতেন।

এদেশে ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনেক কল্যাণকর স্পর্শ লাগিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরেজদের আবির্ভাবের ফলে যে সুখপ্রিয় আলস্যপ্রিয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারা 'বাবু' সমাজের মানুষ, তাহারা ভদ্রলোক। এই ভদ্রলোকদের দৃষ্টিতে শ্রমিকের কাজ হীনতা বোধক; কুলিমজুরের কাজ অবহেলার যোগ্য। ইহার ফলে শ্রমশক্তি অপমানিত হয় ও সমাজে শ্রেণীবৈষম্য তীব্রতর হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আলস্য ও শ্রমকুণ্ঠা এই কারণে সর্বস্বীকৃত হইয়া থাকে। শ্রমের মর্যাদাকে অস্বীকার করিয়া এক শ্রেণীর ভাব-বিলাসী প্রমোদবিলাসী বাবুতন্ত্রটি সৃষ্টি হইল। ফ্রান্সে এই অভিজাতদের সম্বন্ধে বড়ো গলায় বলা হইয়াছে:—France was saved by her idlers.

শ্রম দুই প্রকার দৈহিক ও মানসিক। কিন্তু দুই জাতীয় শ্রমই ওতপ্রোত-ভাবে যুক্ত। মানসিক শ্রমকে সমাজ উচ্চতর ও বিশিষ্ট শ্রম বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু মানসিক শ্রম দ্বারা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার হয়, তাহার ফলিত রূপ নির্ভর করে কায়িক শ্রমের উপর। বুদ্ধিজীবীকেও কায়িক শ্রম করিতে হয়। যে বুদ্ধিজীবী কেবল ভাবনার রাজ্যে ডুবিয়া থাকেন তিনি ভাবুক, কিন্তু বুদ্ধিজীবী নন। বুদ্ধিজীবী যদি প্রকৃত বুদ্ধিমান হন তবে তিনি কায়িক শ্রম ছাড়া বাঞ্ছিত ফললাভ করিতে পারিবেন না। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই

কায়িক শ্রমকে মান্য করা হইয়াছে। অনেক উন্নত দেশে হাতে-কলমে কাজ বা 'field work'-এর মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে।

কোন দেশকে প্রকৃতপক্ষে সমৃদ্ধ হইতে হইলে কায়িক শ্রমজীবীদের সংখ্যাবৃদ্ধি শুভ লক্ষণ। কারণ কায়িক শ্রম ছাড়া সমাজের ধনবৃদ্ধি হয় না, ইহাই দেশের শ্রীবৃদ্ধি করে। কত সাধারণ অবস্থা হইতে শ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা মানুষ বড় হইতে পারে আলামোহন দাস তাহার প্রমাণ। তাঁহার 'দাসনগর' এক বিরাট কীর্তি। শ্রমের মূল্যকে স্বীকার না করিলে এত বড় কীর্তি অর্জন করা সম্ভব নয়।

শ্রমের মর্যাদা উন্নত দেশে স্বীকৃত হইয়াছে। ম্যাক্সিমগোর্কি বলিয়াছেন, মানুষের ইতিহাস মানুষের শ্রমের ইতিহাস। তাই শ্রম পবিত্র বস্তু শ্রমকে এত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে, কারণ শ্রম সৃষ্টিশীল বস্তু। শ্রম সমাজ-জীবনে বস্তু সম্পদকে সৃষ্টি করে। এই বস্তু-সম্পদ বৈভব সৃষ্টি করে। কিন্তু অনেকে মনে করেন শ্রম একটা স্থূল ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত। মানুষের মধ্যে সূক্ষ্মের বাসনা চিরন্তন। তাই স্থূলে মানুষের আসক্তি সার্বিক নয়। কিন্তু এমতও অর্ধ-সত্য। কারণ সুন্দরকে সৃষ্টি করিতে হইলে শ্রমের প্রয়োজন। একটি গোলাপফুল প্রস্ফুটিত করিতে হইলে শ্রমের প্রয়োজন। কত পরিশ্রম, কত চেষ্টা, কত সাধনার দ্বারা ফুল ফোটে।

এ-যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান প্রয়োগবিদ্যায় বিশ্বাস করে। শ্রম এই প্রয়োগবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত। কারণ বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূলেও থাকে শ্রম। কিন্তু কলা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যও শ্রমের প্রয়োজন। শ্রম ছাড়া কলা ও শিল্পের ক্ষেত্রে সার্থক সৃষ্টি সম্ভব হয় না। একজন ঔপন্যাসিক বা চিত্রশিল্পী বা ভাস্করের পরিশ্রমের মূল্য যত মর্যাদাও তত। বিনা পরিশ্রমে পিকাসো বা মাতিস, যামিনী রায় বা নন্দলাল বসু, তারাশঙ্কর বা গোর্কির আবির্ভাব সম্ভব হয় না।

দেশের উন্নতি নির্ভর করে শ্রমের উৎপাদনের উপর, শ্রম না করিলে সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। শ্রম ছাড়া দেশের ও মানুষের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়। শ্রম ছাড়া কলা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই গঠনমূলক সমাজে শ্রমের মর্যাদা অসামান্য।

নিয়মানুবর্তিতা

নিয়মানুবর্তিতা মানবমনের শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতার ফলে মানুষের পক্ষে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করা সম্ভবপর হয়। মানবজীবনের উন্নতির মূলে রয়েছে এই সুশৃঙ্খল কর্মজীবন। সর্বজনস্বীকৃত নিয়মবিধিকে লঙ্ঘন করে জীবনের কোনো কাজেই সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা মানবসমাজে শ্রী, কল্যাণ, আনন্দ বিনষ্ট হয় এবং অতি দ্রুতই অরাজকতার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীতে উন্নতজাতির জীবনধারা সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বহুবৎসর পূর্বে বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্র ছিল বিশৃঙ্খলা। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ ছিল বর্তমান। বিশ্বপ্রকৃতিতে বিশৃঙ্খলা অধিকদিন স্থায়ী হয় না। তাই নিয়ম-নটরাজের আবির্ভাবের সংগে সংগে নিখিল বিশ্বে সুন্দরের আবির্ভাব হল। বিশ্বপ্রকৃতি সুন্দর সুষমামণ্ডিত হল। সেই সময় থেকেই বিশ্বে নিয়মের রাজত্ব আজও অক্ষত রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ তারা আজও নিয়মানুযায়ী কার্য সমাপ্ত করে। বারো মাস এবং ছয় ঋতুর নিয়মমাফিক পালা বদলের কাজটিও অতি বিচিত্র, বিশ্বব্যাপী এই নিয়মের এতটুকু বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য।

মানুষ প্রজ্ঞাশীল জীব, উন্নততর জীবনই তার কাম্য। তাই বিশ্বের নিয়মানুবর্তিতার অনুসরণেই মানব সভ্যতা উন্নত হয়ে উঠে, আদিম যুগে মানুষ ছিল বর্বর, তারা স্বেচ্ছাচারী ছিল। সেই কারণে তাদের জীবন ধারাও ছিল বিশৃঙ্খল। জীবনের নিরাপত্তাই মানুষের প্রাথমিক আকাঙ্ক্ষা। এই নিরাপত্তার জন্যই প্রয়োজন নিয়মশৃঙ্খলার। ফলে ধীরে ধীরে মানুষের গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি। মানবসমাজ সুষ্ঠুভাবে চালিত করার জন্যই প্রয়োজন নিয়মের। এই নিয়মানুবর্তিতার ফলেই মানবসভ্যতার সূত্রপাত। সভ্যতার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসরবর্তী মানুষ নানা অভিজ্ঞতার ফলে উপলব্ধি করে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ব্যক্তিগত জীবন; সর্বত্র এই নিয়মের প্রভাব অপ্রতিহত। রাষ্ট্রীয়-জীবনে মানুষ রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলে রাষ্ট্রের কার্য চালনা করা সম্ভবপর হয় না। রাষ্ট্রীয় নিয়মের মত সামাজিক নিয়মও মানুষ মেনে চলে। ব্যক্তিগত জীবনেও প্রত্যেক মানুষই কতকগুলি নিয়মের অধীন। স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে যে যে নিয়ম

পালন করা উচিত, সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। বড় রাস্তা দিয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলাফেরা করলে দুর্ঘটনা হওয়া অসম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ সর্বত্র একটা না একটা নিয়মের অধীন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিয়মানুবর্তিতা মানুষের একান্ত প্রয়োজন।

মানুষ নিজের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু মানবজীবনে নিয়মানুবর্তিতা একটি সহজাত গুণ নয়। প্রয়োজনের তাগিদে অভ্যাসবশত উহা মানবজীবনের একটি গুণ হিসেবে স্বীকৃত। সহজাত গুণের দ্বারা নিয়মানুবর্তিতাকে মানুষ আয়ত্ত করে। নিয়মানুবর্তিতার জন্য দীর্ঘ অনুশীলনের প্রয়োজন। ছাত্রজীবনই নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলনের প্রকৃত সময়। সমস্ত শিক্ষারই সূচনা এই ছাত্রজীবনে। সময়নিষ্ঠা তাই ছাত্রদের অবশ্য কর্তব্য। দৈনন্দিন জীবনে নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেকটি কাজের কর্মসূচী তৈরী করে ছাত্রজীবনেই তার সযত্ন চর্চা করা প্রয়োজন। ছাত্রগণই ভবিষ্যৎ দেশের আশা ও ভরসা। তাই তাদের জীবন সুসংহত ও নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠা সম্ভব। পরিবারে মাতাপিতা, বিদ্যালয়ে খেলার সময় দলনেতার নির্দেশ বা আদেশ মেনে চলার নিয়ম ছাত্রজীবনে থাকা উচিত, জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য ছাত্রজীবনে নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন।

নিয়মানুবর্তিতা একটি শিক্ষনীয় বিষয়। দীর্ঘকালের শিক্ষার ফলে তা মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়। এই অভ্যাস ধীরে ধীরে স্বভাবে পরিণত হয়। এইভাবে প্রত্যেকটি মানুষ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে জীবন যাপন করলে দেশের উন্নতি সম্ভব। পৃথিবীতে নিয়মানুবর্তিতার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পৃথিবীর সমগ্র উন্নতজাতির মূলেই রয়েছে সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতা। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মনই নিয়মের প্রতি অনুগত। প্রাচীন আর্যঋষিগণ ও অন্যান্য দেশের ঋষিতুল্য ব্যক্তি এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের জীবন এই নিয়মানুবর্তিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নানা কারণে উল্লেখযোগ্য হইয়া আছে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার নাগপাশে থাকিয়া ভারতবর্ষের মানুষ কি

অসহ্য অবস্থায় দিন কাটাইতেছিল. তাহার পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্ম স্বাধীনতা-বুভুক্ষু মানুষ যে সাহস, বীর্য ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই স্বাধীনতার পশ্চাতে অনেক রক্তদান, অনেক জীবনদানের কাহিনী লুকাইয়া আছে সত্য, কিন্তু তবু অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এই স্বাধীনতা আসিয়াছে 'রক্তহীন বিপ্লবে'। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম একদিকে অহিংস, অন্তদিকে সহিংস ; দুই ইতিহাসের মালায় গাঁথা, তাই বিচিত্র ও বিস্ময়কর।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়াছে কংগ্রেস। কিন্তু তাহার পূর্বেও ইতিহাস আছে। পলাশীর যুদ্ধের পর যখন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হইয়া দেখা দিল, সেইদিন হইতেই ভারতের পরাধীনতার সূত্রপাত। সেই গ্লানিময় অপমান অচিরেই ভারতবাসীর কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। ইংরাজদের শোষণে ও শাসনে সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হইয়া উঠিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িল, সাধারণ মানুষ দরিদ্র ও দুঃখী হইল। এই অবস্থার জন্ম নানা স্থানে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিল। সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, পাবনার কৃষক-আন্দোলন, মোপলা কৃষক বিদ্রোহ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভ্যুত্থান হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। এই বিদ্রোহ পরম্পরা প্রমাণ করে যে পরাধীনতার অত্যাচারে নিপীড়িত মানুষ কিভাবে জাগ্রত হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ 'সিপাহী বিদ্রোহ' ভারতের প্রথম মুক্তি সংগ্রামের জলন্ত প্রমাণ। এই বিদ্রোহ ছিল দেশাত্মবোধে দৃপ্ত এক বলিষ্ঠ অভ্যুত্থান।

এই সব অভ্যুত্থানের পটভূমিতে ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। ১৮৮৫ সালে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজী, আনন্দমোহন বসু, রাসবিহারী ঘোষ, বালগঙ্গাধর তিলক, মতিলাল নেহরুর মতন নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে। কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র দেশের চিত্তের একটি জাগৃতি ঘটিল। ইংরাজ সরকার দেশবাসীর এই প্রতিবাদ-স্পৃহা সযত্নে লক্ষ্য করিয়াছিল। বাঙালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক নির্ভীক পদক্ষেপ হিসাবে এই সংগঠনকে গ্রহণ করা চলে। বাঙালীর স্বাধীনতা-চেতনাকে হতমান করিবার জন্ম ইংরেজ সরকার বিভাজন ও শাসন-এর পদ্ধতি গ্রহণ করিলেন। লর্ড মিন্টো দমন-নীতি ও বিভেদ নীতি দ্বারা কংগ্রেসের আন্দোলন ও প্রতিরোধ প্রতিহত করিতে চাহিলেন। লর্ড

কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী সামগ্রী ব্যবহারের আন্দোলন ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এই আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাত। ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন 'বন্দে মাতরম' জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা দেশের মধ্যে তুমুল আলোড়ন ঘনাইয়া তুলিল। বিপিন পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুবোধ মল্লিক, প্রভৃতি এই আন্দোলনকে সমর্থন করিলেন। কংগ্রেসে চরম পন্থী ও নরম-পন্থী সম্প্রদায় সৃষ্টি হইল। তিলক, লাজপৎ রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, প্রভৃতি চরমপন্থী নেতা হিসেবে গণ্য হইলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে নরম-পন্থী ও চরম-পন্থীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আসিল। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'বন্দে-মাতরম' প্রভৃতি পত্রিকায় জাতীয়তাবাদের অগ্নিশিখা ছড়াইয়া দেওয়ার প্রয়াসে চরমপন্থীরা অক্লান্ত রহিলেন। সরকারের দমননীতির ফলে বাঙালী ও পাঞ্জাবী যুবশক্তি সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়াইল। ব্রিটিশ বিচারপতিগণ এই স্বদেশী সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার করিলেন। এই অধিকারের প্রতিবাদে সন্ত্রাসবাদীগণ সশস্ত্র পথ গ্রহণ করিলেন। ১৯০৮ খ্রীঃ ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে সচেষ্ট হইলে ভুলক্রমে কেনেডি নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইল। সন্ত্রাসবাদের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। ১৯০৮ সালে বারীন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইলেন। সরকার দমননীতির তীব্রতা বাড়াইলেন। তবু আন্দোলন অব্যাহত রহিল। ফলে ১৯১১ খ্রীঃ ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ-ভঙ্গ বাতিল করিয়া দিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ কংগ্রেসের জন্ম হইতে সন্ত্রাসবাদের অভ্যুদয় এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া ধরা হয়।

ভারতের জাতীয়তাবাদের শক্তিহ্রাসের জন্ম ব্রিটিশ সরকার বিভেদনীতির পথ ধরিলেন। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে মুসলিম লীগের জন্ম হইল। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের এই পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দেখা দিল, অন্যদিকে শক্তিমান ব্রিটিশ সরকারের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এক 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলনের জন্ম হইল। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচার দ্বারা ব্রিটিশ সরকার দমননীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত খিলাফৎ আন্দোলনকে যুক্ত করিয়া শাসকসম্প্রদায়কে আঘাত করিতে চাহিলেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নূতন পথে মোড় ঘুরিল। মহাত্মার আহ্বানে সমগ্র দেশে অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গ উত্তাল হইল, আলি ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার সহযোগী হইলেন। বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও সরকারের সহিত অসহযোগিতা চলিল। ব্রিটিশ সরকার অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। চৌরিচেরা (গোরক্ষপুরের) নামক স্থানে কয়েকজন পুলিস অগ্নিদাহে প্রাণ হারাইল। আন্দোলনের গতি সহিংস পথে যাইতেছে এই আশঙ্কায় মহাত্মাজী আবার নূতন পথে আন্দোলনকে চালিত করিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'স্বরাজ্য পার্টি' নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিয়া আইন সভার ভিতর হইতে ব্রিটিশ সরকারের সহিত বিরোধিতার পর্ব শেষ করিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন 'বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন'-এ ইংরেজের প্রতি ঘৃণা ও উত্তেজনা প্রকাশ পাইল।

১৯৪৩ খ্রীঃ নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি বিস্ময়কর ঘটনাকে সার্থক করিয়া তুলিল। ১৯৪৪ সালে কোহিমায় জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উহা এক নব অধ্যায় সূচিত করিল। ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ দেখিয়া ইংরাজরা বুঝিতে পারিল যে এদেশে তাহাদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তখন ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত তাহাদের মধ্যে দেখা দিল। ইহারই ফলশ্রুতি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। ভারতের স্বাধীনতা আসিল। তবে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা নয়, দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িক কলহের মূল্য দিয়া ভারত বিভাগ সম্পন্ন হইল। মহম্মদ আলি জিন্নাহর "দুই জাতি তত্ত্ব"-র ফলস্বরূপ দুই দেশের স্বাধীনতা-সূর্য দুই আকাশে উদিত হইল। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের আনন্দ ও বেদনার দুই দিকই ইহাতে ফুটিয়া উঠিল।

জাতীয় পতাকা

নূতন রাষ্ট্রের জন্ম যেমন সত্য, তেমনি তাহার প্রতীকও একটি অপরিহার্য সত্য। তাই প্রতিটি রাষ্ট্রই জাতীয় পতাকার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লয়।

জাতীয় পতাকা রাষ্ট্রের পরিচয়-চিহ্ন। রাষ্ট্রের মর্ম ও আদর্শের স্বরূপ জাতীয় পতাকায় পরিস্ফুট হয়। জাতীয় পতাকাতলে একটি সমগ্র জাতি একতায় আবদ্ধ হয়, একই সুখে-দুঃখে, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে যাত্রা শুরু করে। জাতীয় পতাকার তাই ঐক্যবিধায়ক গুরুত্ব অসামান্য। জাতীয় পতাকার গুরুত্ব তাই অনেক সময় আধ্যাত্মিক স্তরে গিয়া পৌছায়। ইহা শুধু মাননীয় নয়, অর্হনীয়ও বটে। জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার অর্থ স্বাধীনতা রক্ষা। ইহার জন্য প্রাণ তুচ্ছ, ভক্তিই সার। তাই জাতীয় পতাকার তাৎপর্য জাতীয় জীবনে এত অসাধারণ।

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পতাকা আছে। এই পতাকার শোভায় ও চিহ্নে স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে চলে না। এই লাঞ্ছন-স্বাতন্ত্র্য জাতীয় পতাকার বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা গৈরিক, শুভ্র ও সবুজ এই ত্রিবর্ণে লাঞ্ছিত, এই বর্ণবৈচিত্রের মধ্যস্তরে আছে ধর্মচক্র। এই ধর্মচক্র সারনাথ স্তম্ভের অনুকরণে অঙ্কিত। পাকিস্থানের পতাকার বর্ণ ঘন সবুজ, মধ্যে শ্বেত অর্ধচন্দ্র ও পঞ্চনক্ষত্র দ্বারা বিশেষিত; ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক, সোভিয়েত রাষ্ট্রে পতাকা রক্তিমবর্ণ, মধ্যস্থলে কাস্তে ও হাতুড়ি অঙ্কিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকায় আছে সাতটি লাল, ছয়টি সাদা রেখা ও আটচল্লিশটি নক্ষত্র। ফ্রান্সের পতাকা সাদা, কালো ও লাল রঙের, ইটালির পতাকা সবুজ, সাদা ও নীল বর্ণের। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পতাকার শোভা ও লাঞ্ছনা বিভিন্ন। ইহাদের তাৎপর্যও বিচিত্র।

ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকারও একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য আছে। এই তাৎপর্য ভারতবর্ষের জীবন-বাণী। ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার বিবর্তন লক্ষণীয়। যখন ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ তখন ভারতবর্ষের মাথায় উড়িত ইউনিয়ন জ্যাক। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে যখন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া ওঠে তখনই প্রথম জাতীয় পতাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার পরিকল্পনাও কার্যকরী হইয়া যায়। তখন এই পতাকার বর্ণ ছিল লাল, হলুদ ও সবুজ বর্ণের সমান্তরাল অবস্থান। ১৯০৬ সালের ৭ই আগষ্ট পার্শিবাগানে ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। এই পতাকাই দ্বিতীয়বার উত্তোলিত হয় ১৯০৭ সালে প্যারি শহরে। ভারতের বাহিরে বিপ্লবী দলের নেতা কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম কামা পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। ইহার লাঞ্ছন ছিল পূর্বানুরূপ কেবল

লাল অংশে ছিল সাতটি তারা। ইহার পর ১৯১৭ সালে তিলক ও বেশান্ত যখন হোমরুল আন্দোলনে ব্যাপৃত হন তখন তৃতীয়বার পতাকার প্রয়োজন দেখা দিল। এই পতাকায় একটি ছোট ইউনিয়ন জ্যাক ও অর্ধচন্দ্রাকার নক্ষত্রের চিহ্ন ছিল। বিদেশী শাসকের লাঞ্ছন থাকায় এই পতাকা জাতীয় পতাকার স্বীকৃতি পায় নাই। ইহার পর জাতীয় পতাকার বলিষ্ঠ প্রয়োজনীয়তা আসে মহাত্মা গান্ধীজীর আন্দোলন-পর্বে। এই পতাকার লাল ও সবুজ রঙ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির চিহ্ন হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। উহাতে একটি সাদা ডোরা ও চরকা-চিহ্ন ছিল। মৈত্রী ও প্রগতির স্মারক হিসাবে এই পতাকা মানিত হইয়াছিল। ১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাবিত ও গৃহীত পতাকাই জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা লাভ করিল। এই পতাকা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ছিল—গৈরিক, শুভ্র ও সবুজ। গৈরিক ছিল ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক, সবুজ বর্ণ ছিল তারুণ্য, বিশ্বাস ও শক্তির প্রতীক, শুভ্র বর্ণ শান্তির প্রতীক। ত্যাগ তারুণ্য ও শান্তির মিলনেই জাতীয় পতাকার তলেই অসংখ্য নরনারী মিলিত হইয়াছিল, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়াছিল। ১৯৪৭ সালে জাতীয় পতাকার কিছু পরিবর্তন ঘটে। অশোক-চক্রটি লাঞ্ছন হিসাবে গৃহীত হয়। প্রাচীন ভারতের জীবন সাধনার প্রতীক এই অশোক চক্র। ভারতীয় গণপরিষদের নির্দেশে এই পরিবর্তন সাধিত হয়।

জাতীয় পতাকা দেশের ও জাতির সম্মানের বস্তু। ইহার পবিত্র মূল্য সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত নাই। সরকারী অনুশাসনে তাই জাতীয় পতাকার ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশনামা আছে। বস্ত্রে এই পতাকা ব্যবহার যেন না করে, অন্যান্য পতাকার পাশে জাতীয় পতাকাকে সর্বোত্তম মর্য্যাদা দিতে হইবে। শোভাযাত্রায় জাতীয় পতাকা ব্যবহার কালে দক্ষিণ স্কন্ধে সমুচ্চ ভঙ্গীতে ইহা বহন করিতে হইবে। জাতীয় পতাকার সম্পর্কে সংযম ও নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভারতের জাতীয় পতাকা জাতির সম্মান ও মর্য্যাদার প্রতীক। এই পতাকা ভারতের প্রাণ-যজ্ঞের তাৎপর্যকে বহন করিতেছে। ইহা দেশের চিন্ময় সত্তা। প্রগতি, শান্তি ও সত্যের প্রতীক এই পতাকা। জনগণমন অধিনায়ক বিধাতা এই পতাকাকে লইয়া ইতিহাসের পথে অগ্রসর হইবেন।

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস

দীর্ঘকাল পরাধীনতার অমানিশা অপসৃত হইলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিল। দীর্ঘদিনের অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করিয়া অবশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকবৃন্দ ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা আনিয়া দিলেন। এই স্বাধীনতা ভারতবাসীকে গর্বিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন জাতির পার্শ্বে দাঁড়াইবার মত সাহস ও শক্তি ভারতবাসী লাভ করিয়াছে। ভারতবাসী আজ স্বাধীন বিশ্বের নাগরিক। এই স্বাধীনতার জন্য ভারত স্ব-শাসিত ধর্ম নিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রী সার্বভৌম এক রাষ্ট্র।

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় হইতে কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়া আসিতেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের গুরুত্ব সমধিক। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ (বিপিনপাল, অরবিন্দ, তিলক, লালা লাজপত রায়) সকলেই "পূর্ণ স্বরাজই" চাহিয়াছিলেন। এই পূর্ণ স্বারাজ্যের আদর্শে পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প আসিল গান্ধীজীর নেতৃত্বের সময়। সেই আশা সার্থক হইল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেই পূর্ণ স্বাধীনতার সুফল ঘোষণা করা হইয়াছিল. সেই স্মরণেই প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব। এই ·জাতীয় অঙ্গীকার ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী লাহোরে লাজপতনগরে গৃহীত হইয়াছিল। সেদিন নেতৃবৃন্দ বলিয়াছিলেন "জগতের সমস্ত জাতির নিকট এই পতাকা ঘোষণা করিতেছে যে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য।" পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প দিবস হিসাবে ১লা জানুয়ারীর মূল্য, ২৬শে জানুয়ারী এই সংকল্পের প্রস্তাব-পত্র-পরিবেষণ। সেই প্রস্তাবে বলা হয়, ১৯৩০ সালে ২৬শে জানুয়ারী দেশব্যাপী স্বাধীনতা-দিবসরূপে পালন করা হইবে। সেদিন গৃহে গৃহে পতাকা-উত্তোলন, বিকেলে মিছিল. সভায় সভায় ভারতের আদর্শ-প্রসঙ্গে গান্ধীজীর বিবৃতি-পাঠ প্রভৃতি কার্যক্রম স্থির করা হইল। এই অধিবেশনে ২৬শে জানুয়ারীকে স্বাধীনতা-দিবস হিসাবে ধার্য করা হইয়াছে। যেদিন সত্যই ২৬শে জানুয়ারী আসিল, সেদিন মহানন্দে ও উল্লসিত আবেগে সর্বত্র স্বাধীনতা-দিবস পালিত হইল।

১৯৩৫ সালে ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালিত হইল। কিন্তু এই·

পালনে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। কংগ্রেসের প্রস্তাবানুসারে আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত হয়, সভায় সভায় কয়েকটি প্রস্তাব হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সভায় বক্তৃতাদির কোন ব্যবস্থা থাকে না। এই প্রস্তাবে বলা হয়, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য পূর্ণ সাম্য, সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও ঐক্য, মাদকদ্রব্য-বর্জন, চরকায় সুতাকাটা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, অনাহার জর্জরিত দেশবাসীর সেবা প্রভৃতি প্রস্তাবের মধ্যে পড়ে।

এই সব প্রস্তাব-পাঠ, সঙ্কল্প ঘোষণা, গান্ধীজীর নেতৃত্বের আস্থা ও জাতীয় সংগ্রাম সবই সার্থক হইল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচনা হইবার পর ২৬শে জানুয়ারীকে আর স্বাধীনতা-দিবস হিসাবে গ্রহণ করার যৌক্তিকতা থাকিল না।

এই দিনটি তাই জাতীয় আদর্শের সঙ্কল্প ও রূপায়ণের দিন। প্রজাতান্ত্রিক ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষ সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর দিন। দেশের অগণ্য মানুষের সুখসমৃদ্ধি এই দিনের ইষ্টমন্ত্র।

স্বদেশপ্রীতি

বন্দে মাতরম্। দেশকে ভালবাসিয়া দেশকে মা বলিয়া ডাকার কথা প্রথম একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় চিন্ময়ী দেশমাতৃকার বন্দনার চিত্র প্রতিভাত ছিল। দেশ মানে ভূখণ্ড নয়, গাছপালা, পাহাড়, প্রকৃতি, নদী, অরণ্য নয়। দেশ মানে প্রাণসত্তা, চিৎসত্তা। জন্মভূমি দেশমাতৃকা। জন্মভূমিই মা। ধাত্রী দেবতা। এই জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত প্রেরণা ও প্রবণতা। জন্মভূমিকে ভালবাসা তাই মানুষের সহজাত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জন্মভূমির নাড়ীতে মানুষ বাঁধা পড়ে। জন্মভূমির সহিত মানুষের সংযোগ মর্ম-সংযোগ। পুরুষপরম্পরাবাহিত এই চৈতন্য বোধ মানুষের সহজাত বস্তু। তাই বলা হয়, 'দেশ মানুষের সৃষ্টি'। দেশ মানুষের মনের সৃষ্টি, তার প্রাণের বস্তু। স্বদেশপ্রীতি এই চেতনার উৎস হইতে উৎসারিত একটি মহৎ ভাব।

স্বদেশপ্রীতি মানে স্বদেশের প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতিকে ভালবাসা। এই ভালবাসার জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। স্বার্থপরতা প্রেমের পরিপন্থী।

স্বদেশপ্রীতি তাহারই পক্ষে সম্ভব, যে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। দেশপ্রেমিক দেশের জন্য নিয়ত শুভ চিন্তা করেন। দেশের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও তিনি প্রস্তুত, দেশের সমৃদ্ধির জন্য যিনি যে-কোন কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তিনিই দেশপ্রেমিক। লাভক্ষতি বা হিসাবনিকাশের উর্ধ্বে এই দেশপ্রেম। স্বদেশপ্রীতি বলিতে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে ব্যক্তি যে কোন ঝুঁকি নিতে পারে, সেই ব্যক্তির অনুভূতিই স্বদেশপ্রীতি। দেশের সাহিত্যকে যিনি ভালবাসেন, দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যাহার মর্ম-সংযোগ, তাঁহাকে দেশপ্রেমিক বলা চলে। স্বদেশপ্রেমের লক্ষণাবলী বিচারের সময় এই সব কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

দেশের উন্নতি মানে দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধি। দেশের শিল্পকলা, স্বাস্থ্য ও সুখ, বিত্তবাণিজ্য সকলের উন্নতিই প্রাণিধানযোগ্য। দেশপ্রেম বলিতে বোঝায় এইসব সমৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির একাগ্র সাধনা। লোকহিতৈষণার মাধ্যমেই দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে। যে মানুষ লোকবৎসল, যে মানুষ সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে উৎসাহী, যে মানুষ দেশের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য সদাই উদ্যোগী, সেই মানুষকেই বলা চলে দেশপ্রেমিক। কর্মক্ষেত্র যাহাই হউক, সমস্ত কর্মের লক্ষ্য যদি হয় দেশকে বড় করিবার সাধনা, তাহা হইলে সকলেই দেশকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে কর্মক্ষেত্রের পার্থক্য আছে, কিন্তু দুই কর্মের উদ্দেশ্যই দেশপ্রেম বা দেশকে সমৃদ্ধ করা।

দেশপ্রেমের স্বরূপ দুই প্রকার, একটি সংকীর্ণ দেশপ্রেম, অন্যটি উদার দেশপ্রেম। সংকীর্ণ দেশপ্রেম কেবল নিজের দেশকে যথাসর্বস্ব মনে করে, এই দেশপ্রেম অন্ধ জাতিপ্রেমে পরিণত হয়। অন্ধ জাতিপ্রেম জাতীয়তাবাদ সর্বস্ব হইয়া গেলে তাহা 'জিঙ্গো'-ধর্মে পরিণত হয়। উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অপর নাম 'জিঙ্গো বাদ'। রবীন্দ্রনাথ এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমের সহিত যুক্ত। এই দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমকে সার্থক করিয়া তোলে। যে জাতীয়তাবাদ বিশ্বজাতীয়তার পথে অনুকূল, সেই জাতীয়তাবাদই উদার ও সংস্কারমুক্ত। আমার দেশ সবার উপরে, কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আমার এ দেশকে চলিতে হইবে। এই দেশপ্রেমই বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়। কেবল নিজের দেশ হইতে সম্পদ লইলে চলিবে না, বিশ্ব হইতে সম্পদ আহরণ করিতে হইবে। বিশ্বমানবের বেদীতলে

দেশপ্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—ইহাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা। বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরকে ভজনা করার সংকীর্ণ দেশপ্রেম রবীন্দ্রনাথের ছিল না। 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে'—এই বাণীই যাহার মধ্যে প্রধান তাহার পক্ষে সংকীর্ণ দেশপ্রেমের প্রশ্রয় দেওয়া অসম্ভব। আন্তর্জাতিকতার সহিত দেশপ্রেমকে মিশাইতে হইলে চাই বিশ্বদৃষ্টি। তাই আধুনিক দেশপ্রেমের তাৎপর্য বোঝা যায় বিশ্ব চেতনায়। আজ অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বিশ্ব মানুষের নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে—এই দেশপ্রেমের সাধনায় বিশ্বপ্রেমের সাধনাকে ভুলিলে দেশের ক্ষতিই হইবে।

দেশ বড়, দেশকে ভালবাসা অধিকতর বড় ধর্ম। জন্মভূমি গরীয়সী। জন্মভূমিকে বিশ্বভূমির সহিত যুক্ত করিতে হইবে। দেশপ্রেমের পথে যেন অভিমান না আসে, সংকীর্ণতা না আসে, স্বার্থবোধ না আসে। রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধ্বে যদি দেশপ্রেমকে রাখা যায়, তবেই দেশের নিত্যমঙ্গল, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উর্ধ্বে যদি দেশকে রাখা যায়, তবেই দেশের শুভ। দেশপ্রেমকে হইতে হইবে নিত্যশুদ্ধ, পবিত্র ও নিষ্কলুষ এক ধর্ম।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক

স্বাধীন ভারতে নাগরিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। স্বাধীনতালাভের পর নাগরিকের কর্তব্য, অধিকার ও ভূমিকা পরিবর্তিত হয়। স্বাধীন দেশের নাগরিকের কর্তব্য বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা এই কর্তব্যের অঙ্গ। স্বাধীন দেশের নাগরিক উন্নত মহিমায় দীপ্ত হয়।

নাগরিক অর্থে নগরের অধিবাসী বোঝায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের ভূমিকা স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর হইতে প্রজাতন্ত্র দেশ। গণতন্ত্র ভারতরাষ্ট্রের ভিত্তি। সুতরাং এখানে নাগরিকের ভূমিকাও অনুরূপ হওয়া উচিত। এখানে নাগরিকের ক্ষমতার উপর রাষ্ট্রকর্তৃত্বের পালাবদল নির্ভর করে। সুতরাং গণতন্ত্রে নাগরিকের ক্ষমতা বিপুল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বা স্বাধীন দেশে প্রত্যেক নাগরিকের সুবিচার ও সমানাধিকারের দাবী আছে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোট দিবার অধিকার আছে। দেশের প্রতিনিধি নির্বাচনে নাগরিকের স্বাধীন

মতামত আছে। প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ক্ষমতা আছে। নিজ নিজ ধর্ম ও কর্মের অনুসরণে কোন বাধা নাই। বিচার বিভাগে সমান বিচার পাইবার দাবী আছে। প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা ও চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। স্বাধীনতা না পাইলে নাগরিক অধিকার ভোগ করিতে পারিত না। এই সুযোগ স্বাধীন ভারতে পূর্ণমাত্রায় আছে। কারণ স্বাধীন ভারত জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার যে-কোন নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য। কোন রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য নাগরিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। কারণ রাষ্ট্রের জীবনই নাগরিকের জীবন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যদি আক্রান্ত হয়, তবে যে কোন ভারতবাসীই বিপন্ন বোধ করিবেন। সুতরাং যে কোন নাগরিকের কর্তব্য রাষ্ট্রের শুভ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারের অর্থ হইল প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রীয় সংবিধান বা নির্দেশকে অবশ্য-মান্য মনে করিতে হইবে। এই বাধ্যতামূলক আনুগত্য রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষায় সাহায্য করে। আবার রাষ্ট্র যদি স্বৈরাচারী হয়, তবে সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সেই রাষ্ট্রকর্তৃত্ব অন্যের হস্তে অর্পণ করিতে পারে। নাগরিকতার চেতনা নির্ভর করে সততা ও আত্মজ্ঞানের উপর।

মানুষ সমাজিক জীব। এরিস্টটল বলিয়াছেন, মানুষ রাজনৈতিক জীব। সামাজিক মানুষ হিসাবে মানুষের তাহার পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে। রাষ্ট্রীয় জীব হিসাবে প্রত্যেক মানুষের রাজনৈতিক কর্তব্য আছে। যে প্রেরণায় মানুষ সমাজের অন্য ব্যক্তিকে প্রতিবেশী বা স্বজন বলিয়া মনে করে, সেই প্রেরণায় সে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করে। সামাজিক মানুষের যেমন সমাজ-অনুশাসন বা ব্যবহার-বিধি মানিয়া চলিতে হয়; রাষ্ট্রীয় মানুষ হিসাবে তেমনি রাষ্ট্রের সুখদুঃখের প্রতি অনবহিত থাকিলে চলিবে না। স্বার্থপরতা এই চেতনার পরিপন্থী। রাষ্ট্রের শুভের পক্ষে অনুকূল পথ গ্রহণে দ্বিধা করিলে চলিবে না। সমাজে মহামারী আসিলে তাহা বিশেষ ব্যক্তি বাছিয়া আক্রমণ করে না, তাই সামাজিক নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেককেই সচেষ্ট হইতে হইবে। তাই রাষ্ট্রের কর্ণধার যদি ভ্রান্তনীতি গ্রহণ করেন, তবে নাগরিকের জনমত গঠন করিয়া প্রতিনিধি পরিবর্তনের চেষ্টা করিলে তাহা নাগরিকের কর্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

পৌর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নাগরিকের কর্তব্য মূল্যবান। পুরবাসী হিসাবে

প্রত্যেক নাগরিকই দাবী করতে পারেন, শহর পরিচ্ছন্ন থাকুক, মহামারীর হাত হইতে শহরকে রক্ষা করার জন্য নাগরিকের সম্মিলিত কর্তব্য আবশ্যিক। ইহার জন্য স্বার্থ বিসর্জন করিয়া নিজ নিজ এলাকায় যথোপযুক্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পৌরপ্রশাসনের সুফল পাইতে হইলে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যকে বাড়াইতে হইবে। নাগরিককে সেবাপরায়ণতার মনোভাব লইয়া পৌরস্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইবে। পৌর-শিক্ষা, পৌর-সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রসারে সংস্কৃতিমান মানুষকে সহযোগিতা করিতে হইবে। পৌর-ব্যবস্থায় নানা দুর্নীতি বাসা বাঁধে। সেই দুর্নীতি দূর করিতে হইবে। ইহার জন্য পৌর-অধিকার সম্পর্কে সব নাগরিককে সচেতন হইতে হইবে। স্বাধীন ভারতে পৌরব্যবস্থা হইবে দুর্নীতিমুক্ত ও সেবাদর্শে পূর্ণ—প্রত্যেক নাগরিকের একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। কলিকাতার মত বৃহৎ শহরের পৌর-প্রশাসন কেন নিষ্ফল হইতেছে, কেন কলিকাতার মত বড় সহরের পথঘাট জঞ্জালস্তূপে পরিণত হইয়াছে। একথা চিন্তা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

নাগরিকের কর্তব্য হওয়া উচিত সহযোগিতা ও সমবায়ের মনোভাব দ্বারা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া। কোন নগরে নাগরিক বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। প্রতিবেশীর সুখদুঃখ স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য তাহাকে প্রভাবিত করিবেই। বস্তিবাসীর দুঃখদুর্দশা অস্বীকার করিলে চলিবে না। প্রত্যেকের স্বার্থ প্রত্যেকের সহিত যুক্ত। দাঙ্গা বা মহামারী, ধর্মঘট বা উৎসব, সর্বক্ষেত্রেই এই সমবায় মূলক ও সেবামূলক মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইলে তবেই সুখ, শান্তি ও প্রগতি সম্ভব।

স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক নাগরিকের প্রাপ্য সমানাধিকার প্রত্যেককে পাইতে হইবে। অর্থ নৈতিক সাম্য না আসিলে এই সমানাধিকার আসে না। গণতন্ত্রে এই সাম্য চেতনাই মুখ্য চেতনা। তাই প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষের পক্ষে প্রত্যেক নাগরিককে দেশের ও দশের বিকাশ ও সমৃদ্ধির কথা ভাবিতে হইবে। আধুনিক কালে রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ। নির্বাচনী-ক্ষমতা নাগরিকের হাতে থাকায় দেশের সর্বোচ্চ সংসদ-সভায় প্রতিনিধি-নির্বাচনের ক্ষমতা তাহার আছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতেই এই নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। আগে যাহা ধর্ম-বোধের সূত্রে আশা করা যাইত, এখন তাহা অধিকার ও কর্তব্য সূত্রে লাভ করা যায়। মানুষে মানুষে সহযোগিতার সম্পর্ক আগে ধর্মবোধ নিয়ন্ত্রিত

করিত, এখন অধিকার বোধ তাহা পরিচালিত করে। স্বাধীন ভারতে নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্বকে বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে আমরা আধুনিক সমাজের মানুষ। তাই উন্নয়নশীল দেশের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হইলে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিককে মানুষ হইতে হইবে। এই মানুষ আধ্যাত্মিক মানুষ নয়, কর্তব্য ও অধিকার সচেতন বা সমাজ সচেতন মানুষ। ইহাই স্বাধীন ভারতে নাগরিকের কর্তব্য ও অধিকার।

কুসংস্কার ও সমাজ

সমাজের প্রগতির পথে অন্তরায় সমাজের কুসংস্কার। কুসংস্কার সমাজ দেহকে অচল করিতে চাহে। ইহা ব্যাধির মত সমাজকে গ্রাস করিতে চাহে। যে কোন আধুনিক সমাজের চলার পথে যাহা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে, তাহাকেই কুসংস্কার বলা চলে। তাই সমাজের উন্নতি ও প্রগতির জন্য আগে কুসংস্কারকে দূর করিতে হইবে।

প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব সংস্কার থাকে। সংস্কার অর্থে ঐতিহ্যবিশেষ। দীর্ঘদিন ধরিয়া কোন প্রথা যখন সমাজে পরিচিত থাকিয়া যায়, তখন তাহার ধারাবাহিকতাই প্রধান ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এই ধারাবাহিকতা অনেক সময় অর্থহীন ও অকারণ বলিয়া মনে হয়। তাই বিকৃত ঐতিহ্যাবশেষই কুসংস্কার। কিন্তু এই ঐতিহ্যের ভগ্নাবস্তূপ দ্বারাই সমাজ-মানস পরিকীর্ণ থাকে। যুগে যুগে মানুষের জীবনযাত্রা বা রুচির পরিবর্তন হয়। কিন্তু সভ্যভব্য আধুনিকতার মধ্যেও কুসংস্কার বাসা বাঁধিয়া থাকে। কখনও তাহা প্রকাশ পায় প্রাণহীন প্রথারূপে, কখনও তাহা অশুভ আচার বা বিধিরূপে। ইহা মানুষের সামাজিক ও মানসিক সমস্যা। আধুনিক মানুষের পক্ষে ইহা এক বিরাট বিপদ স্বরূপ। কুসংস্কার প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—ধর্মীয় ও সামাজিক। ধর্মীয় কুসংস্কার অনেক সময় সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। সামাজিক কুসংস্কার যেমন জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, নারী সম্পর্কিত বিধান, স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রভৃতি ব্যাপার বোঝায়।

আধুনিক সমাজের পক্ষে কুসংস্কার একটা প্রচণ্ড প্রতিকূলতা। বিশ্বসমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে গেলে আজকের মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত হইতে হইবে।

কুসংস্কার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে বলিয়া ইহার প্রভাব নিত্যনৈমিত্তিক ও দৈনন্দিন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের মাটিতে যে কুসংস্কার দীর্ঘকাল ধরিয়া মাথা চাড়া দিয়া আছে, তাহাকে বলা চলে জাতিভেদ সম্পর্কে কুসংস্কার। জাতিভেদ-প্রথা হইতে আসে অস্পৃশ্যতা-দোষ। জাতিতে জাতিতে ভেদ আসলে বর্ণাশ্রম-ধর্মী সমাজের আর এক দিক। ভারতবর্ষ বহু বর্ণ ও বহু জাতির দেশ। জাতবর্ণ অনুযায়ী ধর্ম ও আচার নির্দিষ্ট হয়। তাই এই কুসংস্কারগুলির মূল নিহত আছে ধর্মের মধ্যে। ধর্ম যখন বিকৃত হয়, তখনই তাহা আচার হইয়া উঠে। বিকৃত ধর্ম প্রথামাত্র। তখনই সমাজপতিরা ধর্মের নানা অনুশাসন ও বিধি-বিধানকে নির্দিষ্ট করিয়া দেন। এই বিধি বিধান নমনীয় হয় না। বহু ক্ষেত্রেই ইহা বিভেদ সৃষ্টি করে। যে ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষের ঐক্যসাধন, সেই ধর্ম বিভেদের প্রাচীরে বাঁধা পড়ে। ইহা জাতিকে দুর্বল করে। এই ভেদবুদ্ধি জাতিকে বিকৃত ও বিভক্ত করে। মানুষের মানসিক বুদ্ধি কত দুর্বল ও তুচ্ছ, এই কুসংস্কারের সামনে দাঁড়াইয়া তাহা বোঝা যায়। বর্ণাশ্রম-ধর্মের ছকে হিন্দুসমাজের গঠন নির্দিষ্ট হয়। তাই জাতিতে-জাতিতে উচ্চনীচ ভেদ স্থির করিয়াছেন এদেশের শাস্ত্রকারগণ। জল-চল ভেদ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে দেখা যায়। এই বিভেদ অস্পৃশ্যতা-দোষদুষ্ট। গান্ধীজী তাঁহার হরিজন-আন্দোলনে এই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এই সামাজিক কলঙ্ক লইয়া কোন মানবীয় সমাজ বাঁচিতে পারে না। বিকৃত ধর্ম এখানে কুসংস্কারের রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই আচার-আচরণ সম্পর্কিত ভেদ এত প্রবল এই কারণে যে রক্ষণশীলরা ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় সমর্থন জানাইয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া ইহা পালন করিয়াছে।

আর এক শ্রেণীর কুসংস্কার আছে যাহাকে সামাজিক আচারধর্মী কুসংস্কার বলা চলে। হিন্দুসমাজে আচার-প্রাধান্য এত বেশী যে ইহা বিচারকে গ্রাস করিয়াছে। হিন্দুসমাজের স্মৃতিশাস্ত্র এই আচার অনুশাসনকে প্রাধান্য দিয়াছে। রঘুনন্দনী অনুশাসন যখন মধ্যযুগের বাঙালী হিন্দু সমাজে প্রবল হইয়াছিল, তখন জাতিধর্ম, বিবাহ ও শৌচাশৌচ সম্পর্কে বিধিবিধান মুখ্য স্থান লাভ করিয়াছিল। আমাদের বিবাহ প্রথায় ও মৃত্যু-পরবর্তী আচার অনুষ্ঠানে এই ধরণের অনুশাসন বেশী। ইহার পেছনে একটি জাতির অযৌক্তিক অভ্যাস বিদ্যমান। অভ্যাসের অন্ধ অনুকরণে যখন একটি জাতি আবর্তিত হয়, তখন এই ধরণের প্রবণতা বাড়িয়া যায়। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, এই ধরণের

সামাজিক কুসংস্কারের পশ্চাতে আছে অনার্য-প্রভাব। এদেশের স্ত্রী-আচার গুলির সবই প্রায় অনার্য-কোম-প্রসূত। বর্ণাশ্রম-আদর্শ আসলে আর্য-সংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস। আবার অন্যদিকে অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-কোমের মানুষেরা আহার-বিহারগত বিধিনিষেধকে সুদৃঢ়ভাবে যখন পালন করিত, তাহাকে বলা চলে অনার্য সংস্কৃতি-বিস্তারের ইতিহাস। তাই ইতিহাসের বিষয় হইলেও বলা চলে, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ও অনার্য-কোম সংস্কারগত বিরোধ এদেশে প্রচলিত ছিল। যে অহংকারে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ অন্যতম জাতির আচার-ব্যবহারকে 'ম্লেচ্ছ' 'অসুর' বলিত, সেই অহংকারের ফলে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। অন্যদিকে ভারতের লোকসমাজে এই দুই আদর্শের বিরোধ যেমন ছিল, সমন্বয়ও তেমন ছিল। এদেশের ব্রতকথা পাঁচালীতে যেমন স্ত্রী আচারের পরিচয় আছে, তেমনি গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম-নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ প্রভৃতি সংস্কারের বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে অনার্য-অনুষ্ঠানও জড়িত হইয়া আছে। ভট্ট ভবদেব, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধ ভট্ট প্রভৃতির শ্রৌত-স্মৃতি-শাস্ত্রগ্রন্থে এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত লিপিবদ্ধ আছে। এই ব্রাহ্মণ্য মতামত পরে কালক্রমে অনার্য-আচারের সহিত যুক্ত হইয়া বাঙালী-হিন্দু সমাজে একটি সংস্কার-রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

নারী ও পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে কয়েকটি অনপনেয় কুসংস্কার বিদ্যমান আছে। উপবর্ণের পক্ষে নিম্নবর্ণ হইতে স্ত্রী-গ্রহণ সমাজে নিন্দনীয় ছিল। মনু বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রাণীকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার পাইতেন না। বর এবং কন্যা সগোত্র বা সপ্রবরের হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ হইত। ইহাছাড়া বিধবা-বিবাহ বা সতীদাহ প্রথা এদেশের নরনারী-সম্পর্কে এক প্রবলতম কুসংস্কার বলিয়া গৃহীত হইত। নারীকে পণ্য হিসাবে মনে করা যে কোন সভ্য সমাজের কলঙ্কজনক কুসংস্কার। তাহা না হইলে এদেশের সতীদাহ ও গৌরীদান প্রভৃতি পৈশাচিক প্রথা এতখানি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না। সমাজের প্রগতির পক্ষে এই যুক্তিহীন কুসংস্কার একটি অভিশাপের সামিল ছিল।

আর এক শ্রেণীর কুসংস্কার আছে, যাহা বিজ্ঞান-বিরোধী। এযুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান মানুষের সামনে মুক্তির বার্তা আনিয়া দিয়াছে। এই মুক্তি-স্নানে প্রত্যেককে শুচি হইতে পারিলে সমাজের মঙ্গল। কিন্তু পথ্যবিধি ও

চিকিৎসা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির একান্ত অভাব। এদেশে গ্রাম্য কুসংস্কার এতখানি প্রবল যে ঝাড়ফুঁক-জলপড়া ও 'মানৎ' দ্বারা এখানে অনেক কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। বিজ্ঞানের প্রেরণায় যেখানে ল্যাবরেটারীতে আজ অসাধ্যসাধন হইতেছে, বহু দুরারোগ্য রোগ নিরাময় হইয়া যাইতেছে, সেখানে এই ধরণের ধর্মীয় কুসংস্কার মানুষের মৃত্যুই আনয়ন করিবে। কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা সম্পর্কে লোকের মনে একটি অকারণ আতঙ্ক বাসা বাঁধিয়া থাকে। তাহারা বিস্মৃত হয় যে, এই সব রোগ বিজ্ঞানের চোখে আজ আর দুঃসাধ্য ব্যাধি নয়। ব্যাধি ও চিকিৎসা সম্পর্কে কুসংস্কার সমাজকে দিন দিন পঙ্গু করিয়া দিতেছে সন্দেহ নাই।

আমাদের শিক্ষায় যদি বিজ্ঞান-প্রাধান্য থাকে, আমাদের চিন্তায় যদি যুক্তিবত্তা বাড়িয়া চলে, তবেই এই ধরণের কুসংস্কার দূরীভূত হইবে। বিজ্ঞান আজ জীবনকে নূতন বিকাশের পথে চালনা করিয়াছে। সামাজিক কুসংস্কার সেখানে অভিশাপের মত দাঁড়াইয়া আছে। জীবনযাত্রার উন্নয়ন ও বিজ্ঞান-চেতনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ আধুনিকতা লাভ করে। তখন কুসংস্কার কুজ্ঝটিকার মত অপনীত হয়।

ডাকটিকিট

ডাকটিকিট সংগ্রহ করা অনেকের প্রিয় খেয়াল। ডাকটিকিটের আকর্ষণ কৈশোর-মনে শুধু নয়, বয়স্ক-মনেও দুর্বার। ইহার কারণ ডাকটিকিটের মধ্যে যেমন সুদূর দেশের সূত্র পাওয়া যায়, তেমন নানারূপ রঙ-বেরঙের ছবিও পাওয়া যায়। কত ইতিহাস, কত ভূগোল, কত শিক্ষা ইহার মধ্যে সুপ্ত আছে, তাহার হদিস নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে বিরাটের ইঙ্গিত ডাকটিকিটে পাওয়া যায়। ডাকটিকিট যেন একটি প্রতীক। মানুষ প্রতীককে চিরকালই ভালবাসে। ডাকটিকিটের প্রতি অনুরাগ মানুষের প্রতীকের অনুরাগ হইতে উৎসারিত।

ডাকটিকিটের প্রথম ব্যবহারের খবর পাওয়া যায় ইংলণ্ডে। কেহ কেহ মনে করেন যে রোলাণ্ড হিল নামক একজন ব্যক্তি ইহার উদ্ভব ও প্রবর্তনার জন্য দায়ী। ১৮৪০ খৃঃ প্রথম ইহা চালু হয়। যাহারা ডাকমাশুল দিত,

তাহাদের একটি মুদ্রিত রসিদের বদলে বর্ণাঢ্য কাগজ দান করিবার রেওয়াজ দেখা যাইত। ইংলণ্ডের ঐ ডাকটিকিটে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি মুদ্রিত থাকিত। নীল ও কালরঙের ডাকটিকিটের প্রচলনই তখন ছিল। ইংলণ্ডের ডাকটিকিটের এই প্রচলন দেখিয়া অন্যান্য দেশেও ইহার প্রচলন হয়। ইউরোপ-আমেরিকার নানা দেশে ডাকটিকিট প্রবর্তিত হয়। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে ডাকটিকিটের প্রচলন হয় ১৮৪৯ খৃঃ। পরে পৃথিবীর নানা দেশেই ডাকটিকিট প্রবর্তিত হয়। ইহার জনপ্রিয়তা ও সাফল্য ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে।

ডাকটিকিটের ছবিতে রাজা-রাণীর মূর্তি থাকে। কখনও কখনও দেশের প্রাকৃতিক চিত্রাদির ছবিও মুদ্রিত থাকে। কখনও কখনও কোন দেশের জন্তু-জানোয়ার বা দেশবিখ্যাত মনীষীগণের ছবিও দেওয়া হয়। খেলাধুলার বহু চিত্রও ডাকটিকিটে দেওয়া হয়। এই দিক হইতে ডাকটিকিট নানা জ্ঞানের আকার হিসাবে ধরা হয়। ডাকটিকিট আসলে নানা দেশের মানচিত্র। কোন দেশের মানচিত্রকে বুঝিতে হইলে ডাকটিকিটের সংগ্রহকে বুঝিতে হয়।

ডাকটিকিট-সংগ্রহ মনুষের শখ। অনেকে এই শখের জন্য দেশবিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ করে। এই শখের একটি বিশুদ্ধির দিক আছে। এই শখ নির্মল ও কলুষমুক্ত। অনেক শখ আছে, যাহা ব্যয়সাধ্য ও চিত্তশুদ্ধির পক্ষে অন্তরায়। কিন্তু ডাকটিকিটের শখ এই দিক হইতে বেশ সুবিধার ও আনন্দের ব্যাপার। ডাকটিকিট-সংগ্রহের একটা শিক্ষাবিষয়ক দিকও আছে। কারণ ডাকটিকিটের মধ্য দিয়া দেশবিদেশের ইতিহাস ও কাহিনী জানা যায়। স্বল্প পরিসরে একটি দেশের বার্তা চোখের সামনে তুলিয়া ধরে বলিয়াই ডাকটিকিট-সংগ্রহ এত জনপ্রিয় খেয়াল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ডাকটিকিট-সংগ্রহের জনপ্রিয় উপেক্ষা করা যায় না। আমাদের দেশে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ডাকটিকিট-সংগ্রহের প্রচলন আছে। কেহ কেহ বলেন, বেলজিয়ামের কোন এক ভূগোল-শিক্ষক প্রথম এই অভ্যাস সুরু করেন। ভূগোলের মানচিত্রে ডাকটিকিটগুলি বসাইবার জন্য তিনি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করিতেন। যদি ইয়া গল্প-কাহিনীও হয়, তবু একটি সত্য ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। ডাক-টিকিট শিক্ষাদায়ক একটি অভ্যাস।

রাষ্ট্র বা সরকারের সমর্থনে ডাকটিকিটের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর সব

দেশের মত আমাদের দেশের মহাপুরুষদের শতবার্ষিকীতে ডাকটিকিটে মহাপুরুষদের ছবি মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা শ্রদ্ধার স্মারক চিহ্ন হিসাবে সমাজে স্বীকৃতি পাইয়া আসিয়াছে। ডাকটিকিট কেবল অবসর-যাপনের উপায় নয়, জ্ঞানেরও একটি সূত্র।

বিদ্যালয়-পত্রিকা

বিদ্যালয়ের বহুবিধ আকর্ষণের মধ্যে পত্রিকা একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। কারণ কিশোর মনের কাছে বিদ্যালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। বিদ্যালয়-পত্রিকা কিশোর মনের লালন পালনের পক্ষে এক অত্যাবশ্যক সারস্বত-প্রয়াস। বিদ্যালয়ের সারস্বত-যজ্ঞে পত্রিকা একটি সমিধ। ইহা তরুণ মনের আশা আকাঙ্ক্ষা, সৃষ্টির চাঞ্চল্য ও ব্যাকুলতাকে ধরিয়া রাখে। জীবনের যাত্রাপথে কিশলয়ের স্মৃতি চিত্র একমাত্র বিদ্যালয় পত্রিকাতেই পাওয়া যায়।

সাহিত্য সমাজে বড় বড় পত্রিকা অনেক পাওয়া যায়। লিটল ম্যাগাজিনও দেশে রাশি রাশি প্রকাশিত হইতেছে। সাহিত্যের সংসারে পত্রিকার কোন অভাব নাই। নিত্য নূতন পত্রিকার প্রকাশে সাহিত্যজগত চিরচঞ্চল হইয়া আছে। বড় বড় লোকদের লেখা এই সব পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। এই সব পত্রিকার জন্য দেশের মানুষ অপেক্ষা করে। কারণ এই সব পত্রিকাতে নামী-দামী লোকদের মেলা। সাহিত্যপতিরা এই সব পত্রিকাতে তাঁহাদের প্রতিভার পদচিহ্ন রাখিয়া যান। কিন্তু এই সব সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত পত্রিকার নেপথ্যে যে বিদ্যালয়-পত্রিকার অবদান কতখানি তাহা হিসাব করিয়া দেখে না। দেশের জ্ঞানী-গুণী ও সাহিত্যরথীদের প্রথম শিক্ষানবীশী যাহাতে সুরু হয়, সেই পত্রিকার মহিমা কে অস্বীকার করিতে পারিবে? কোন লেখক যখন দেশের সামগ্রী হইয়া যান, তখন তাঁহার জন্য বিশ্বদুয়ার উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু যখন এই সব প্রতিভার অরুণোদয় হয়, তখনকার কথা কেহ মনে রাখেন না। বিদ্যালয় পত্রিকা বা স্কুল-ম্যাগাজিন এই দিক হইতে বড় লেখকদের কিশলয়-কাল। কত কুঁড়ি মরিয়া যায়, কত মুকুল হারাইয়া যায় সেই সব অকালমৃত্যুর খবর রাখিতে গেলে স্কুল-ম্যাগাজিনের অতীত সত্তায় খুঁড়িয়া দেখিতে হইবে। আর যে সব কুঁড়ি পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা দেশ ও

জাতিকে আমোদিত ও আনন্দিত করিয়া তোলে, সেই সব কুঁড়ির ইতিহাসকে জানিবার জন্ম স্কুল-ম্যাগাজিন প্রয়োজন।

বিদ্যালয় পত্রিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের একটি অঙ্গ। বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার বাহিরে যে শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা যায়, বিদ্যালয় পত্রিকা তাহার প্রমাণ। বিদ্যালয় পত্রিকায় নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লেখা হয়। সেই সব প্রবন্ধাবলী হইতে কিশোরমন নানামুখী জ্ঞান সংগ্রহ করে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে অনেক শিশু-প্রতিভা, কিশোর-প্রতিভা এই সব পত্রিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। ছোটদের যে সব রচনাকে আমরা অবজ্ঞা করি, সেই রচনাই ভবিষ্যৎ সূর্যোদয়ের আভাস বলিয়া মনে করা যায়। সাহিত্যের অঙ্কুরোদ্গম এই সব পত্রিকাতেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটি আবশ্যিক ও আভ্যাসিক দিক আছে। সেই আবশ্যিক দিকটা অনেকের পক্ষে নীরস ও যান্ত্রিক মনে হয়। প্রতিদিনের বাঁধাবাঁধির মধ্যে যাহাদের মন বাড়িয়া উঠিতে চায় না, কেবলমাত্র পাঠ্যগ্রন্থের গতানুগতিকতায় যাহারা হাঁপাইয়া উঠে, তাহাদের পক্ষে 'স্কুল ম্যাগাজিন'-এর লেখা একটি নূতন মুক্তির স্বাদ বহিয়া আনিতে পারে। ইহা ছাত্রদের সুপ্ত সম্ভাবনাকে যেমন জাগাইয়া তোলে, অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীর মনে বাহিরের জগতের আলো-হাওয়া আনিয়া দেয়। ছাত্রদের সৃষ্টিশীল শক্তিকে জাগাইবার পক্ষে 'স্কুল ম্যাগাজিন' অপরিহার্য বস্তু।

বিদ্যালয়-জীবন মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবন, এই সময় মন সুকুমার ও সজীব থাকে। এই সময়ে যে ভাবরাজি মনে মুদ্রিত হয়, উত্তরকালে তাহাই বিকশিত হইয়া নানাভাবে সুফল দান করে। তাই দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে 'স্কুল-ম্যাগাজিন' প্রসঙ্গে অবহিত ও প্রযত্নশীল হওয়া উচিত। বিদ্যালয় পত্রিকার গুরুত্বপ্রণিধান করার অর্থ ছাত্রদের অন্তরে কেবল বহিঃপৃথিবীর স্পর্শ আনিয়া দেওয়া নয়, ছাত্রদের শক্তি ও সামর্থ্যকে জাগাইয়া স্বাধীন দেশের সৎ ও বিবেকবান নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করা। ছাত্ররা ভাবীকালের মানুষ। দেশ ও জাতি তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তবেই জাতি সমৃদ্ধ হইবে। তাই 'বিদ্যালয়ের পত্রিকা' যত উন্নতমানের ও আকর্ষণের হইয়া ওঠে, ততই সম্ভাবনাময় জীবন উজ্জ্বল হইবার উপকরণ সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষার পূর্ব রাত্রি

পরীক্ষার পূর্বের রাত্রি যেন অমানিশা, যেন দুঃস্বপ্নের রাত্রি। সারা বছরের 'যাচাই' কাল সকালে, সারা বছরের হিসাব-নিকাশ কালকের দুঃখ-নীল সকালে। সেই ভয়ঙ্করের প্রতীক্ষায় আজ শুধু নিশি-যাপন, সেই বিভীষিকার জল্পনায় আজ শুধু ক্লান্তিকর জাগরণ। সারা বৎসরের ভালো-মন্দ, খ্যাতি-অখ্যাতি সবই নির্ভর করছে কাল সকালের ফলাফলের ওপর। সুতরাং কী অস্থিরতা, কী চঞ্চলতা! এই চঞ্চলতার কোন সূত্র নেই, কোন অন্ত নেই। পরীক্ষা সব ছাত্রছাত্রীর কাছে আমার কাছেও তাই—অগ্নি-পরীক্ষা। তাই কম্পিত বক্ষে, উত্তাল হৃদয়ে আমি পরীক্ষার জন্য সকরুণ পরীক্ষায় কাতর। মনে দোদুলচলতার শেষ নেই,—to be or not to be—that is the question,—এই দ্বন্দ্বের শেষ নাই। কাল পরীক্ষা। আজ তার পূর্ব রাত্রি। ভয়ঙ্কর, শঙ্কা-উত্তাল, অস্থিরতায় চঞ্চল।

পরীক্ষার আগের রাত্রি সুধীজনের মতে বিশ্রামের রাত্রি। গুরুজন-বচন কানে ওঠে না, মনে হয়, এই শেষ সুযোগ। পুরোনো প্রশ্নগুলো শেষবারের মত ঝালিয়ে নেওয়া। কিন্তু নোট-সম্ভার ঘাঁটতে গিয়ে দেখা যাবে অনেক অদেখা প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। এ-কী বিস্ময়কর আবিষ্কার! এ-প্রশ্নগুলো এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল। গত সপ্তাহেও মনে হত সব প্রশ্নের উত্তর তৈরী হয়ে গেছে। কিন্তু কাল সকালে যার যজ্ঞের সুরু, তার পক্ষে আজ কি আর নতুন করে আরম্ভ করা সম্ভব। কোথায় বোধিনী, কোথায় সহজিয়া টীকা-গ্রন্থ, কোথায় ক্লাস-নোটস্-বাহিনী—সবই 'সমস্তের বোঝা গঙ্গা-স্রোত'— আর সেই স্রোতে আমি আত্মহারা। ব্যাকরণের 'সমাস' দেখা হয়েছে, কিন্তু 'সর্বনাম' আর 'অনুসর্গ' ত' ধরা হয় নি। 'অব্যয়'কে যতই অবজ্ঞা করি না কেন, পরীক্ষার হলে যদি 'অব্যয়' দেখা দেয়, তবে এতটুকু বিদ্যাব্যয় আমার পক্ষে অসম্ভব। এদিকে সাহিত্যের ইতিহাসও ত' আমার কাছে সন-তারিখ-কণ্টকিত, দুষ্পাচ্য বস্তু মাত্র। কয়েকটি বাঁধা প্রশ্নোত্তরে মুশকিল এই। ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে হয় নিজেকে। ভাগ্যের অসহায় শিকার আমি। হায় কি অসহায় মানবক! কী অসহায় পরীক্ষার্থী।

পরীক্ষা-ব্যবস্থার ওপর রাগ হয়, জীবনের আয়োজন ও প্রয়োজনের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলি, সব অর্থহীন, সব মায়া। কী প্রয়োজন ছিল এই

পরীক্ষার। এ ত প্রহসন! পরীক্ষা কি দেবে? জ্ঞান অর্জন না জ্ঞান বিসর্জন—পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? 'স্বাস্থ্য-অর্থ-ধৈর্য' সব কিছুর বিসর্জনের নামই পরীক্ষা! পরীক্ষকের শ্যেন-দৃষ্টিতে লালাঙ্কিত ভুলের পাহাড়। প্রশ্নপত্রের অচিন্তনীয় প্রশ্নের ইন্দ্রজাল-বিস্তার, অসহায় সুকুমার-মতির পরীক্ষার্থীর করুণ আত্মদান। এ-সবই মানুষকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মায়াবাদে বিশ্বাস এনে দেয়। সকলকে 'রাগী ছোকরার দল' করে তোলে।

হয়ত সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভুল। যে পরীক্ষা কেবল মুখস্থ-বিদ্যেকে উৎসাহিত করে, সে পরীক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। কাগজে কাগজে জ্ঞানী-গুণীর ত' এই মত। এখন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। খাপছাড়া খাপছাড়া মনে আসছে। কোন কিছুতেই মন ঠিক রাখতে পারছি না। কী অসহ্য অবস্থা!

পরীক্ষা যদি হয় মৌলিকত্বের বিচার, পরীক্ষা যদি হয় পাঠ-প্রস্তুতির বিচার তবে ত' আজকের রাত্রি এত ভয়াবহ হয়ে উঠত না। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে হত না। সব কিছুই এখন হেঁয়ালী, হিং-টিং-ছট মনে হত না। পরীক্ষার পূর্বরাত্রিকে মনে হয় শুভরাত্রি। কিন্তু কেন এই দৈহিক বিকার; কেন এই মানসিক বিকার। কারণ আমাদের পরীক্ষায় অনিশ্চয়তার ভাগ সব চাইতে বেশী। প্রশ্নকর্তার খেয়াল, পরীক্ষকের খুশীর উপর নির্ভর করতেই হয় আমাদের।

অথবা এ-সবই 'আকাশ-জুড়িয়া আমারি মনের ভুল।' আমিই হয়ত ভুল বুঝছি। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। আমি সামান্য বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উৎরে যেতে পারছি না, আমি আবার দেশ ও দশের কথা ভাবছি। এইটেই ত' প্রহসন! আমি যদি সারা বছর ক্রীড়ারসে মত্ত থাকি, আমার আকাশে যদি গাভাসকার-ওয়াড়েকার-সোলকার-বার্লো-কাউড্রে জ্বলজ্বল করে, যদি পপ্ আর জ্যাজ্, হলিউড আর টলিউড ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় তবে আর শিক্ষাব্যবস্থার দোষ কি? আমিই ত' অপরাধী, আমার এই পরিণাম স্বাভাবিক। 'স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা'—এই দুঃখ, এই যন্ত্রণা আমার প্রাপ্য।

রাত্রি এখন অনেক। সুমুখে বই, 'নোটস' খাতার স্তূপ। শরীর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। ভেতর থেকে আসছে ঝিমঝিমা। না, আর নয়। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়তে হবে। কালকের সকাল যদি সোনালি সকাল নাই হয়, তবুও আজ চাই শান্তি, স্বস্তি ও নিদ্রা।

তোমার প্রিয় গ্রন্থ

বাংলা সাহিত্যের বহু কবি, সাহিত্যিক লেখকের অনন্ত লেখনীর স্পর্শে ধন্ত হইয়াছে। নানা উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের-রত্নভাণ্ডার পূর্ণ। বাংলা সাহিত্য-সাগর-সলিলে নিমজ্জিত হইয়া একটি অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছি। রত্নটি বাঙালী সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'। 'পথের পাঁচালী' আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ।

কলিকাতা শহরের এই পঙ্কিলতা, কাঠিন্যের মধ্যে 'পথের পাঁচালী' যেন মুক্ত, সহজ সরল এক সুন্দর প্রাণ-চেতনা। গ্রামের নির্মল বাতাস, বর্ষার কালো ধূসর আকাশ, শরতের নীল আকাশ, হেমন্তের শস্য-শ্যামল-ধানদূর্বা, সবই যেন 'পথের পাঁচালী'তে মূর্ত। বিভূতিভূষণ শহরের কৃত্রিমতা-দুর্দমতার মধ্যে এই যে প্রকৃতির সহজ-সুখ স্পর্শ অনুভূত পাঁচালীটি শহরবাসীকে উপহার দিয়াছেন, তাহাতে যেন সবাই গ্রামের বংশীধ্বনি শুনিতে পাইল। প্রকৃতিকে বিভূতিভূষণ দেখিয়াছেন ছবির মতো। 'পথের পাঁচালী' যেন গ্রামের বাতাস স্পর্শ-করা এক জীবন্ত চিত্র।

'পথের পাঁচালী' গ্রন্থের ঘটনাটি গ্রামের দরিদ্র একটি সংসারকে লইয়া। গ্রামের নাম নিশ্চিন্দিপুর। তারই কোলে একটি সংসার। এই সংসারের গৃহিণী সর্বজায়া—স্নেহময়ী সর্বজায়া, সর্বজায়ার স্বামী হরিহর—সংসার ভাবনায় চিন্তিত হরিহর এবং তাহাদের দুই শিশু পুত্র কন্যা অপু ও দুর্গা—ইহাদের লইয়া কাহিনী। মূলতঃ অপুর সামগ্রিক বিকাশ লইয়াই কাহিনী চিত্রিত হইয়াছে। অপু এবং দুর্গা উভয়কেই নিশ্চিন্দিপুরের ধানক্ষেত, আমলকী বন, সুদূর নীল আকাশ, গাঙ্-চিলের সন্তরণ আকৃষ্ট করিয়াছে। দুর্গার লুব্ধ দৃষ্টি সর্বদাই মৃত্তিকার সবুজে সবুজে। অপুর দৃষ্টি আকাশে, কবিতায়, কল্পনায়। অপুর ক্রমবিকাশ লইয়াই কাহিনীটি অগ্রসর হইয়াছে।

অপুকে নিশ্চিন্দিপুর আকৃষ্ট করিয়াছিল পরমাত্মীয়ের মত। অপুকে কাশী যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু নিশ্চিন্দিপুরের সৌন্দর্য সে ভুলে নাই। অবাধ স্বাধীন নিশ্চিন্দিপুরের কাশবন, ঘেঁটুবনের সৌন্দর্য সে ভুলিতে পারে না। বাল্যকাল হইতেই অপু সুন্দরকে উপলব্ধি ও অনুভব করিয়াছে। প্রকৃতিকে লইয়া কবিতা লিখিয়াছে। অপরদিকে দুর্গা সর্বদা আম কুড়াইতে ব্যস্ত। আহার

প্রস্তুত করিয়া অপুকে তাহা আস্বাদ করিবার জন্ম বলিয়াছে। কি সুন্দর ভাই বোনের স্নেহলীলা!

সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক দুর্গার করুণ মৃত্যুটি। এক এক সময়ে দূর আকাশে হইতে সুদূরের ডাক আসে। সেই গতানুগতিক পথ ধরিয়া পৃথিবীর ছেলে-মেয়েরা নীল অনন্তের মধ্যে চলিয়া যায়। দুর্গাও বুঝি সে আহ্বানে সাড়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

অপু ও দুর্গা মুখ্য দুই চরিত্র। ইহাদেরই এই নৈসর্গিক শান্ত পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছেন 'পথের পাঁচালী'র স্রষ্টা বিভূতিভূষণ। অপূর্ব এই উপন্যাস-খানি বাংলা সাহিত্যের দুর্লভ খনি। ইন্দির ঠাকুরুণ, সর্বজায়া, হরিহর কোনো চরিত্রকেই ভোলা যায় না। প্রতিটি চরিত্র বিভূতিভূষণ অনবদ্যভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। উপন্যাসে গ্রামের সুর বাজিতেছে নিরন্তর। এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়া তিনি বাঙালী হৃদয়ে চিরন্তন হইয়া থাকিবেন। তাঁহার বর্ণনা ও উপস্থাপনা সহজ-সুন্দর! ভাষা সাবলীল। সহজ করিয়া তিনি যে কাহিনী বাঙালী পাঠককে শুনাইয়া গেলেন সে কাহিনী অনবদ্য, অদ্বিতীয়। 'পথের পাঁচালী' যেন একটি কাব্যরাজি, গদ্য কবিতা। কাশফুলের সাদা রঙ আকাশের নীল রঙ্ ও মাটির সবুজ রঙে বিভূতিভূষণ কল্পনার তুলি ডুবাইয়া অঙ্কন করিয়াছেন 'পথের পাঁচালী'—বিভূতিভূষণের সার্থক সৃষ্টি।

একটি ভ্রমণ কাহিনীর বর্ণনা

সুযোগটা ঘটে গেল হঠাৎ। এই কোলকাতার সদর দরজা পেরিয়ে মন ছুটে গেল একটু দূরে। হঠাৎ সমস্ত কিছু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেল। এই কেঠো একঘেয়ে কোলকাতাকে হারিয়ে ফেলে কয়েক বন্ধু হারিয়ে গেলাম সবুজের মধ্যে। সবুজকে আলিঙ্গন করে নিলাম। মুক্তির দুরন্ত বাতাস আমাদের ট্রেনটাকে ঠেলে নিয়ে গেল চন্দননগর—কোলকাতা থেকে মাত্র তেত্রিশ কিলোমিটার দূরে। জুন মাসের নিদাঘ দুপুরে লোকাল ট্রেনে করে ছুটে চললাম কয়েকটি ঘণ্টা কোলকাতার ঘড়ি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে। স্বচ্ছন্দ গতিবেগে হাওয়ায় ভেসে চলল বিদ্যুৎবাহী ট্রেনটা। ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল স্টেশন—লিলুয়া, বালি, বেলুড়, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর।

পথের দুধারের পটে আঁকা নৈসর্গিক ছবিটা চলন্ত বেগ নিয়ে যেন মাঠে, ঘাটে, ফ্যাক্টরীর চিমনীতে, কলা বাগানে, ধানক্ষেতে, এঁ্যাকা-ব্যাঁকা মেঠো পথে, কচুরীপানার সবুজ আস্তরণে শুষ্ক পুকুরে, মৃদু স্রোতা খালে-বিলে, তুলি রঙ্ খুঁজে নিচ্ছিল। দেখে নিচ্ছিলাম অদৃশ্য শিল্পীর অদৃশ্য তুলিকার নিপুণ কারিগরী, ট্রেনের দুরন্ত বেগ সমস্ত লাইনগুলো যেন ছিটকে দিচ্ছিল। কালো মোষগুলো মধ্যাহ্নের উষ্ণতায় ভিজিয়ে নিচ্ছিল নিজেদের শরীর গ্রাম্য পুকুরের শীতলতায়, মেঠো পথ দিয়ে যাচ্ছিল বুঝি চাষীবৌ। হঠাৎ সমস্ত ছবিটার উপস্থিতি আমার মনকে ভীষণভাবে তৃপ্তি দিল। আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে মহা-আনন্দে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম। পুরোপুরি একটি ঘণ্টা লাগল পৌঁছাতে।

টিকিটের হলুদ রঙের পাতলা চেহারাটা চেকারকে দেখিয়ে স্টেশন পেরিয়ে চন্দননগরের চন্দনময় ধূলি স্পর্শ করলাম। গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে আমার তন্ময়তা ভাঙছিল কয়েকটা পাকা বাড়ী। অনেকটা শহর ঘেঁসা হয়ে উঠেছে চন্দননগর। আমরা স্থানীয় 'হাসপাতাল মাঠ' নামক খ্যাত স্থানে পৌঁছে ওখানে জলযোগ করে বিকালে সেই মাঠে লীগ ফুটবল খেলা দেখলাম। একটু এদিক সেদিক বেড়িয়ে এলাম। কি শান্ত পরিবেশটা। গাছে দাঁড়িয়ে বুলবুলিটা কি যেন গান গাইছিল, বন পাপিয়া হঠাৎ উড়ে পালিয়ে গেল। দেখলাম কুটিরের পাশে পাকা বাড়ি, মুদিখানার পাশে মনোহারী সজ্জিত দোকান। ট্র্যানজিস্টারে বাজছে হিন্দী গানের সুর।

এই চন্দননগর। এই সেই! সেই ডুপ্লের চন্দননগর, সেই ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর। এই সেই! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখি পৌঁছেছি গঙ্গা তীরে। ডুপ্লেকে যেন দেখি গঙ্গার তীরে। গর্জে উঠছে কামানের বজ্রনিনাদ। ডুপ্লের নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে ফরাসী সৈন্যরা। হঠাৎ সব কিছু হারিয়ে গেল। দেখি সব ঠিক আছে। গঙ্গা বয়ে চলেছে কুলকুল করে স্রোত ভেঙে। অচল ও সচল নৌকা গঙ্গায়, লঞ্চের ভীড় ঘাটে, গঙ্গার ওপারে ফ্যাক্টরীর চুল্লী দিয়ে নির্গত ধূম্ররাশি আকাশটা ধূসর করছে। আরো দূরে একটা কিরকম যেন অস্পষ্টতা। এপারের ঘাটে বাসন মাজছে গ্রাম্য বধূ—গ্রামের মেয়ে। ওদেরই পাশে দাঁড়িয়ে আছে মুখে আঙুল দিয়ে উলঙ্গ একটি শিশু।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। সূর্যটা আকাশ গোলাপী রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমরা সাইকেল রিক্সায় পাঁচজোড়া পা তুলে নিলাম। গাছে গাছে মুহুর্মুহু

ঝাঁপিয়ে পড়ছিল নীড়ে ফেরা পাখির দল। স্টেশনে পৌছে টিকিট কাটতে না কাটতেই ট্রেনের দুরন্ত আগমন। পড়ি কি মরি করে ট্রেনটায় উঠে পড়লাম। ক্লান্ত মন নিয়ে ফিরে চললাম কোলকাতায়—যেখানে ভীড়—ব্যস্ততা।

ভুলব না এই ছোট্টো দৌড়মারা ভ্রমণটা। গ্রাম-বাংলার মাটিতে পায়ে পায়ে ঘোরার আনন্দ-স্মৃতি—চন্দননগরের চন্দন-বাস!

তোমার প্রিয় লেখক

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার প্রিয় লেখক। কেবল আমার নয়, আমার মত অসংখ্য বাঙ্গালীর তিনি প্রিয় লেখক। তিনি বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখের দরদী চিত্রকর। তাই তাঁর প্রতি সকলের আকর্ষণ দুর্নিবার।

বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় কথাশিল্পী। রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার পাশে তখন সকলেই ক্ষীণদ্যুতি। কিন্তু আপন প্রতিভাবলে শরৎচন্দ্র সেই সূর্য-সভায় নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার অসাধারণ জনপ্রিয়তা তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে অনন্ত স্থান দান করিয়াছিল। সত্যই সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের প্রকাশকার হিসাবে তাঁহার তুলনা নাই। এইখানেই তিনি দেশের মানুষের জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন। আমার মত সাধারণ পাঠকের বরণমাল্য ত' তাঁহার জন্য নিবেদিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা কথা-সাহিত্যের প্রধান পুরুষ। তাঁহার রাজকীয় মহিমা ও উন্নত আদর্শবাদ বাংলা সাহিত্যকে একটি সমুন্নত মহিমা দান করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা ও মহান আদর্শবাদ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাসে অতীত যুগ ও কালের চিত্র রোমান্সের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাঁহার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সাধারণ মানুষ নন, সমাজের অভিজাত স্তরের মানুষ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনার আদর্শ ও বিরাট ধ্যান-জ্ঞান সাধারণ বাঙালীর পক্ষে অনায়ত্ত ও দুর্গম ব্যাপার ছিল। রবীন্দ্রনাথ

বহুমুখী প্রতিভাধর মহাপুরুষ। কথাসাহিত্যেও তাঁহার অবদান অসীম। তিনি মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষের সুখ দুঃখকে কথা-সাহিত্যে রূপদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মনস্তত্ত্বকে সুনিপুণ হাতে আঁকিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কবিকল্পনা ও উন্নত আদর্শবাদ তাঁহাকে সাধারণ মানুষের কাছে দূরের এক মহাশিল্পী করিয়া রাখিয়াছিল।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে এই অভাবটি পূরণ হইয়াছিল। তিনি কোন উন্নত আদর্শবাদ লইয়া দূরের মানুষ হইয়া দেখা দেন নাই। তিনি ছিলেন আমাদের কাছের মানুষ। আমাদের সহযাত্রী, আমাদের সুখ-দুঃখের সমব্যথী। যে-গুণে তিনি বাঙ্গালীর হৃদয় কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাকে বলা চলে সহানুভূতি। শরৎ সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ সহানুভূতি। এই সহানুভূতির আলোকেই তিনি সাধারণ মানুষের জীবনকে উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। অবহেলিত সমাজের মানুষদের সাহিত্যের আসরে স্থান দিয়াছিলেন। তিনি অপাংক্তেয় নর-নারীকে সাহিত্যে মহিমা দান করিয়াছিলেন। নিপীড়িত মানুষের ভাষাকে রূপ দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বাঙালীর হৃদয়ের অত নিকটে স্থান পাইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি সকলের কাছে এত প্রিয়। এইজন্যই তিনি আমার নিকট বড় প্রিয়।

শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে সমাজের নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। তিনি নারীর মূল্যকে সত্যকার মানবীয় মূল্যে বিচার করিয়াছিলেন—তাই তাঁহার অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, কমললতা, অভয়া প্রত্যেকেই অসামান্যা রমণী। এই সব চরিত্রের অসামান্যতা তাঁহাদের মানবীয় মহত্ত্বে নিবদ্ধ। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে মানবতার নীতিই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

শরৎ-সাহিত্যের চিরকালীন মূল্য তাঁহার বাস্তবতায় নিহিত। শরৎচন্দ্রের বাস্তবধর্মী চরিত্র চিত্রণ তাঁহাকে বাংলাসাহিত্যে এক নূতনত্বের স্রষ্টা হিসাবে অমর করিয়া রাখিবে। শরৎচন্দ্রের বাস্তবতার মূল সূত্রটি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের রূপচিত্রে পরিচালিত। কিন্তু তাঁহার বাস্তবতা জীবনের অসুন্দর দিককেই কেবল পরিস্ফুট করে নাই, তাহা প্রেম ও অন্যায়, সুখ ও দুঃখ, সুন্দর ও অসুন্দর উভয় কোটিকেই এক মালার বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এইখানেই তাঁহার বাস্তবতার কৃতিত্ব।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার মূলে আছে তাঁহার ভাষা। তাঁহার সহজ, সরল

ও প্রসাদগুণমণ্ডিত ভাষার জন্য তাঁহার উপন্যাস-সম্ভারকে আমাদের কাছে আদরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন', 'শেষপ্রশ্ন', 'মেজদিদি' 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষণীয়া', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি উপন্যাস বাংলাসাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদ। আমার কাছে তিনি পরমপ্রিয় এক লেখক যিনি নৈকট্যে মধুর, জীবনের চলার পথের এক পরম নির্ভরযোগ্য বন্ধু। এইজন্য তাঁহার সাহিত্যে বার বার আমরা আশ্রয় খুঁজি। এইজন্য তিনি আমাদের এত প্রিয়।

রাজা রামমোহন রায়ঃ দ্বিশত জন্মবার্ষিকী

ভারত-পথিক রাজা রামমোহন যখন আবির্ভূত হন তখন এদেশে সমাজ ও ধর্মের দুর্দিন বিদ্যমান ছিল। সেই অন্ধকারের বুকে আলোকের মত আবির্ভূত হইলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনই প্রথম আধুনিক যুগের সূত্রপাত করেন। আধুনিক যুগ বলিতে বুঝায় যুক্তি ও মননের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য। যুক্তিবাদী মানসিকতাকেই আধুনিকতা বলা হয়। মধ্যযুগের মানুষ ছিল সংস্কারপ্রবণ ও আচারপ্রবণ। রামমোহন এই কুসংস্কারের ও আচারসর্বস্বতার অন্ধকার ভেদ করিয়া নবযুগের যুক্তি ও চিন্তার আলোক বিকীর্ণ করিলেন। এইজন্যই তাঁহাকে নবজাগরণের প্রধান পুরুষ বলা হয়।

এই মহাপুরুষ ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে এক অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা-প্রবণ মন লইয়া বড় হইয়াছিলেন। তাই মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পিতার বিরাগভাজন হন এবং দেশত্যাগ করিয়া সুদূর তিব্বতে গমন করেন। হিন্দু সমাজের বহুদেববাদকে অস্বীকার করার ফলে তাঁহার সঙ্গে কেবল মাতাপিতার নয়, গৃহ ও সমাজের বিচ্ছেদ ঘটে। ষোল বৎসর বয়স হইতে যে জিজ্ঞাসা তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়াছিল, তাহার প্রেরণায় রামমোহন সারা জীবন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে আঘাত দিয়া গেছেন। কুসংস্কারের মোহাবরণ ছিন্ন করিয়া রামমোহন বাঙ্গালী জাতির যে অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিলেন তাহারই জন্য তাঁহাকে ভারত-পথিক আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৭২ সালে তাঁহার

দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পালন করিয়া সমগ্র দেশ এই নবযুগের মনীষীকে বরণ করিয়াছিল। আধুনিক যুগের তিনিই প্রথম পুরোহিত। এইজন্ত তাঁহার দ্বিশত জন্মবার্ষিকী পালনের গুরুত্ব ভারতবাসীর কাছে অনেকখানি। কারণ আজ ভারতবর্ষে যে নবযুগের প্রবর্তনা দেখা দিয়াছে তাহার সূত্রধর ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এইজন্ত দেশবাসী তাঁহাকে বার বাব প্রণাম করিতেছে।

রামমোহন জ্ঞানী ও কর্মী পুরুষ ছিলেন। সারা জীবন তিনি অন্তায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। জাতিভেদ, কুসংস্কার, আত্মবিশ্বাস বা মানসিক জাড্য—সব কিছুব বিরুদ্ধেই তাঁহার যুদ্ধ। তিনি জানিতেন এই সব অপদেবতার প্রভাব জাতির মন হইতে দূব করিতে পারিলে তবেই জাতির মুক্তি। রামমোহন নাবীজাতির দুঃখদুর্দশা অন্তব দিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া এদেশে নারী মুক্তি-আন্দোলনে তিনি একজন পথিকৃৎ হইতে পারিয়াছিলেন। সহমবণ ও বহুবিবাহ এদেশে দুরপনেয় কুসংস্কাররূপে প্রতিভাত হইত। তাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থ "প্রবর্তক-'নবর্তক সম্বাদ"-এর মধ্যে বহুবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনের জন্য এদেশের সংস্কার-আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন। অবশ্য তাঁহার পূর্বে ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজরা এই প্রথা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

রামমোহন বাঙলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু। তাঁহার শিক্ষা-আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শিক্ষাকে সমাজকল্যাণ ও পার্থিব উন্নতির উপায়রূপে দেখিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের বস্তুবিদ্যার উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন এদেশের মানুষ দরিদ্র। দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য তিনি শিল্পের উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য চাই শিক্ষার উন্নতি। দেশেব শ্রীবৃদ্ধিব জন্য প্রয়োজন শিল্পের উন্নতি। রামমোহন দেশের মুক্তির জন্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। রামমোহন দেশের অগ্রগতির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

রামমোহনের চিন্তাধারায় কেবল নিজের দেশের কথাই ছিল না, ছিল আন্তর্জাতিক মুক্তির কথা। রামমোহন সারা বিশ্বের মুক্তির কথা ভাবিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিশ্ববাদী বলিয়া খ্যাত। সাম্য, মৈত্র, স্বাধীনতার বাণীতে তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। স্পেন দেশ যখন স্বাধীন হইল, তখন তিনি মুক্তির পতাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। যেখানে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়াছে,

সেখানেই রামমোহন সমর্থন-সূচক বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন। এইজন্যই আজিকার ভারতবাসীর পক্ষে তিনি নমস্য মনীষী। তাঁহার দ্বিশত-জন্মবার্ষিকী স্মরণ করা তাই আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে অপরিহার্য।

ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। ১৮৩১ খ্রীঃ রামমোহন ইওরোপে গমন করেন। সেখানে বিলাতের পার্লামেণ্টে ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেন। ১৮৩৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর এই কর্মবীর ও জ্ঞানতপস্বীর মৃত্যু হয়। তাঁহার তিরোধানে নবজাগরণের একটি অধ্যায় শেষ হইয়া গেল।

রামমোহনকে যুগযুগ ধরিয়া ভারতবাসী মাত্রই স্মরণ করিবে। তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি, মনীষার আলোক এদেশের অন্ধকারকে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইজন্য তাঁহার দ্বিশত-জন্মবার্ষিকী স্মরণ করিয়া ভারতবাসী নবজাগরণের গৌরবময় যুগের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। যে কোন জাতিকে প্রগতির পথে অগ্রগামী হইতে হইলে এই আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন। মহাপুরুষের নাম ও কীর্তি স্মরণ করিয়া আমরা আমাদের ঋণ শোধ করি। এই ঋণ শোধ কবিবার জন্য তাঁহার জন্মবার্ষিকী পালনের উৎসব আজ সারা দেশের বুকে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা না হইলে গুরুঋণ শোধ হইত না। রামমোহনকে স্মরণ না কগিলে দেশের মানুষের ললাটে অকৃতজ্ঞতার কলঙ্কচিহ্ন লিপ্ত হইত।

আমার আদর্শ মহাপুরুষ : বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মনীষী। তিনি জাতির সামনে একটা বিরাট আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শের পথে চলিবার জন্য মানুষের সামনে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার অম্লান জীবন। তিনিই বাঙ্গালাদেশের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ যাঁহার জীবনমন্ত্র ছিল, 'আমার জীবনই আমার বাণী'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কীর্তি যেমন বিরাট, জীবনও তেমনি বিরাট। তাঁহার কীর্তির চাইতেও তিনি মহৎ। তাই তিনি আমার কাছে আদর্শ মহাপুরুষ।

রামমোহন হইতে বাংলাদেশে যে-যুগের আরম্ভ, রবীন্দ্রনাথ সে-যুগের শেষ। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই যুগের মধ্যমণি। এই যুগকে বলা চলে 'বাংলার নবযুগ'। ইহাই ইংরেজীতে 'রেনেসাঁসের কাল'। এই যুগে চিন্তা ও বুদ্ধির একটি জাগরণ সম্ভব হইয়াছিল। সেই জাগরণে এদেশে যেসব মহা-মনীষীর জন্ম হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর অন্যতম। বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রতিভা-মণ্ডলীর মধ্যমণি। রামমোহন যুক্তিবাদের দ্বারা এদেশে যে আলোড়ন আনিয়াছিলেন, সেই আলোড়নের ফলে দেশের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আসিয়াছিল। এই পরিবর্তনের ফলে মানুষের মধ্যে যে গতিবেগ সঞ্চারিত হইল, সেই গতিবেগের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ সেদিন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির উচ্চ মানকে স্পর্শ করিবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে যুগে রামমোহন প্রবর্তিত আন্দোলন, হিন্দু কলেজ, ডিরোজিওর যুগ, ইয়ং বেঙ্গল প্রভৃতি এক একটি অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছিল। সমাজে তখন ঝড় বহিতেছিল। সেই ঝড়ে মানুষ তখন দিশেহারা। সেই পরিবেশে বিদ্যাসাগরের মানসিক জগত প্রস্তুত হইতেছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন সকলের কাছেই পরিচিত। ১৮২১ খ্রীঃ মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সামান্য বেতনের মানুষ। মাতা ভগবতী দেবী ছিলেন অসামান্য দয়াবতী রমণী। ভগবতী দেবী ছিলেন সর্বগুণের আধার। এই দুজনের প্রভাবে ঈশ্বরচন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার চরিত্রের দৃঢ়তা ও মহান হৃদয় তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ছাত্রজীবন তাঁহার অসামান্য কষ্টের ছিল। তিনি সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষ হইয়াছিলেন বলিয়া এমন ইস্পাত-কঠিন মন সৃষ্টি হইয়াছিল

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন ছিল অসামান্য। ১৮৪২ সালে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথমবার 'হেড পণ্ডিত' নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে বৃত হন। শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনায় সম্পাদকের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। ১৮৪৯-১৮৫০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দ্বিতীয়বার 'হেড রাইটার', 'কোষাধ্যক্ষ' হন। ১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক নির্বাচিত হন। ১৮৫২ সালে অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। ১৮৫৪ সালে অধ্যক্ষ পদের সঙ্গে স্কুল পরিদর্শকের পদ লাভ করেন। তাঁহার কর্মজীবনের প্রধান ঘটনা ছিল শিক্ষার

পুনর্গঠন। স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত এক মানুষের কর্মদীপ্ত আদর্শবাদ এই সব ক্রমে পরিস্ফুট হইয়াছিল। পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া তিনি দেশবাসীর সামনে শিক্ষা-পরিকল্পনার এক নূতন দৃষ্টান্ত রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার এক অসামান্য কীর্তি।

সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বিধবা বিবাহ প্রচলন তাঁহার সমাজসংস্কারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। একদিকে তিনি যেমন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা দেশের শিক্ষার মানকে উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি সমাজ সংস্কার দ্বারা রামমোহন প্রবর্তিত যুক্তিবাদী আন্দোলনকে আগাইয়া দিয়াছিলেন। এছাড়া সাহিত্য ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের দান অসামান্য। 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'আখ্যান মঞ্জরী', 'বাংলার ইতিহাস', 'বোধোদয়', 'জীবন চরিত', 'কথামালা' এবং 'বর্ণ পরিচয়' তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বিদ্যাসাগর ছিলেন কর্মবীর। তাঁহার চাকরী জীবন ছিল স্বাধীন চিন্তার ছাপে সুস্পষ্ট। সরকারী উচ্চ পদে থাকিয়াও তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যখনই তাঁহার মতভেদ হইয়াছে, তখন তিনি কর্মত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। চাকরী ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর স্বাধীন ব্যবসায়ে হাত দিয়াছিলেন। বাঙালী জাতির জীবনে বিদ্যাসাগর আদর্শ পুরুষ। আমরা যে কেরানি মনোবৃত্তি লইয়া বড় হইয়া স্বাধীন জীবিকার পথকে রুদ্ধ করিয়াছি ও প্রতিদিন গ্লানি ও অপমানকে সহ্য করিয়াছি, সেই জীবনের কাছে বিদ্যাসাগরের স্বাধীনচেতা চরিত্র একটি দৃষ্টান্ত।

বিদ্যাসাগর মনীষী ও কর্মী। একই মানুষের মধ্যে দুই দিকের সমন্বয় হইয়াছিল। একদিকে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ, অন্যদিকে তাঁহার কোমলতা ছিল অবর্ণনীয়। দৃঢ়তা ও কোমলতার এমন সমন্বয় বাঙালী জীবনে আগে কখনো দেখা দেয় নাই। তিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠোর, কুসুমের মত কোমল। তিনি ছিলেন মূর্তিমান দয়া। এমন তেজস্বী পুরুষের মধ্যে বাঙালী মায়ের হৃদয় লুকাইয়া ছিল। এইজন্য বিদ্যাসাগর আমার কাছে আদর্শ মহাপুরুষ। মধুসূদনকে দুর্দিনে তিনি যেভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার কোন তুলনা হয় না। তাঁহার জীবন ছিল মহত্বে উজ্জ্বল। দান-ধ্যানের কোন পরিমাপ তাঁহার ছিল না। মানুষের দুঃখে তিনি কাঁদিতেন। মানুষের জন্য বেদনায় তাঁহার প্রাণ বিচলিত হইত। তিনি ছিলেন দরদী বন্ধু ও

দুর্দিনের চলার পথের সাথী। তাঁহার মত মানুষ যে কোন জাতির পক্ষেই দুর্লভ। তিনি হৃদয়ে ও মনে ছিলেন সত্যই অসাধারণ পুরুষ।

তোমার প্রিয় কবি

আমার প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ। বাঙ্গালীর তিনি গর্বের বস্তু, জাতির তিনি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভারতবর্ষের মাহাত্ম্যকে বিশ্ববাসীর সমক্ষে তুলিয়া ধরিবার বিরল কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ছিলেন দেশের মানুষ, তারপর ছিলেন বিশ্ববাসীর মানুষ। একদিকে ছিলেন বাঙালী ও ভারতবাসী, অন্যদিকে বিশ্ববাসী। তিনি পৃথিবীর মহত্তম কবিদের মধ্যে অন্যতম। জাতির যুগ-যুগ-সঞ্চিত পুণ্যের ফলে রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের জন্ম হইয়াছিল। তিনি বিশ্বের গৌরব। যে কোন সাধারণ মানুষের কাছে তাই তিনি বিশ্বের বিস্ময়। আমার মত একজন সাধারণ মানুষের কাছে তিনি কেবল নৈসর্গিক বিস্ময় নন, পরম প্রিয়জন।

রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পরিবার ছিল শিক্ষায় দীক্ষায় সংস্কৃতিতে মহান। ঠাকুর পরিবার ছিল নবজাগরণের প্রধান ক্ষেত্র। ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ অভিজাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকেই ছিলেন অভিজাত ও সুসংস্কৃত পুরুষ। এই উচ্চস্তরের সাংস্কৃতিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের পরিবর্ধনের পক্ষে তিনটি বস্তু কার্যকরী হইয়াছিল, প্রথমটি প্রকৃতি, দ্বিতীয়টি উপনিষদ, তৃতীয়টি পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের শতমুখী দীপ্তি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঈশ্বর, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের যে প্রকাশ দেখা যায়, তাহার উৎস ছিল এই তিনটি প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একদিকে যেমন প্রকৃতির সহিত মানবমনের মৈত্রীর চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তির প্রকাশ অম্লান হইয়া আছে। তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ প্রকৃতির সহিত একাত্মতাবোধ। প্রেম তাঁহার কাব্যের এক সুগভীর বিষয়বস্তু। তাঁহার প্রকৃতি-প্রেমের সহিত মিলিত

হইয়াছে মানবপ্রেম। প্রকৃতি মানব-হৃদয়ের জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের আত্মোপলব্ধি সার্থক হয়। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য-লীলায় মানবহৃদয়ের চিরন্তন প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি, মানুষ ও ঈশ্বরের ত্রিমুখী জীবনদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে। কাব্য, উপন্তাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্প-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদানের কোন তুলনা নাই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি নবযুগ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি অভিনব মৌলিকত্বের স্রষ্টা। কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা যেমন অসাধারণ মৌলিকত্ব সৃষ্টি করিয়াছে, বঙ্কিমোত্তর উপন্তাসেও তাঁহার কৃতিত্ব তেমনি অসাধারণ। 'চোখের বালি' বাংলা উপন্তাসে মননশীলতার ধারায় যেমন নবপদক্ষেপ, 'রাজা', 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা'ও তেমনি নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবন্ধ সাহিত্য, পত্রসাহিত্য প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই তিনি নবসৃষ্টির পথিকৃৎ।

কবি রবীন্দ্রনাথ আমার প্রিয়। তাঁহার কাব্যে আমি আমার হৃদয়ানুভূতির অব্যক্ত কথাকে খুঁজিয়া পাই। তিনি আমার মনের গহন-গভীরের বহু অনির্বচনীয় অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে এক অনুপম ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া এই অনির্বচনীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-বর্ণে অনুরঞ্জিত। এইজন্ত এই কাব্যে অন্তর্মুখী গভীরতা অসাধারণ। এই অন্তর্মুখী গভীরতা ও বিশ্ব-কল্পনার ব্যাপ্তি তাঁহার কাব্যে এক অসাধারণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সর্বাপেক্ষা মহৎ বাণী তাঁহার মানবতাবাদ। রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি। অপরাজিত মানুষ তাঁহার কাব্যে ভাষা পাইয়াছে। যে মানুষ অমৃতের অধিকারী, সে মানুষ তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু। মানুষের আত্মার অমৃতজ্যোতি তিনি তাঁহার কাব্যে বিকীর্ণ করিয়াছেন। মানুষের অন্তরের এমন কোন অনুভূতি নাই, যাহা তাঁহার কাব্যে প্রকাশিত হয় নাই। মানুষের প্রেম বা সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা তাঁহার কাব্যে ভাস্বর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এইজন্ত তিনি মহাকবি।

রবীন্দ্রকাব্যের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ গভীরতা ও ব্যাপ্তি। যে কোন একটি রসের প্রকাশ যখন তাঁহার কাব্যে ঘটিয়াছে, তখন তাহার অতলস্পর্শী গভীরতাই প্রকাশ পাইয়াছে। কল্পনার ব্যাপ্তিও তাঁহার কাব্যের অন্ততম

গুণ। তাঁহার কল্পনা লোক-লোকান্তব বিকীর্ণ এক নৈসর্গিক সত্তার মধ্যে লীন হইয়াছে। সুরলোক হইতে মানবলোক পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁহাব কল্পনাব ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিব সাহায্যেই তাঁহাব কাব্য মহিমান্বিত। তাঁহার কল্পনা 'পুনশ্চ'ব যুগ হইতে যেমন তুচ্ছ ও অকিঞ্চনকে স্পর্শ কবিযাছে, তেমনি অতীতে 'সোনাব-তবী', 'চিত্রা'-ব যুগে সৌন্দর্য-লোককেও সৃষ্টি কবিয়াছে। 'গীতাঞ্জলি-গীতালি-খেয়া' পর্বে ইহা যেমন ঈশ্বব ও অতীন্দ্রিয় ভাবুকতাকে প্রকাশ কবিযাছে, 'বলাকাব'-যুগে তেমনি গতিবাদকে পবিস্ফুট কবিয়াছে। মানব-চেতনাব প্রতিটি স্তব, প্রতিটি ভাঁজ খুলিয়া খুলিযা তিনি সৌন্দর্যলোককে প্রকাশ কবিযাছেন। তাহাব কাব্য একদিকে পার্থিব, অন্যদিকে অপার্থিব। পার্থিব ও অপার্থিব দুই দিকই তাঁহাব কাব্যে ধবা পডিযাছে।

ববীন্দ্রনাথ মহাচেতনার কবি। খণ্ড চেতনা হইতে মহাচেতনাব যাত্রাপথে মানুষেব অক্লান্ত অভিযাত্রা ববীন্দ্রনাথ এই প্রতিটি স্তবকে তাঁহাব কাব্যে পবিস্ফুট করিযাছেন।

ববীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যেব কবি। এই সৌন্দর্য কেবল ভোগেব দ্বাবা লভ্য নয। অতীন্দ্রিয ধ্যান বা গভীব উপলব্ধি দ্বাবা এই সৌন্দর্য-স্পর্শ লাভ কবা যায। ববীন্দ্রকাব্যেব সৌন্দর্য তাই তাঁহাব বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত সৌন্দর্য। খণ্ড সৌন্দর্য এ কাব্যে মহা সৌন্দর্যে একাকার হইযা গিযাছে। এইজন্যই তিনি সৌন্দর্যেব মহাকবি।

সৌন্দর্য ও মাধুর্যেব মহাকবি ববীন্দ্রনাথ ভাবতীয কাব্য সাহিত্যেব ইতিহাসে এক মহাস্রষ্টা। ব্যাস-বাল্মীকি ছাডা তাঁহাব তুলনা ভাবতীয সাহিত্যে নাই এত বড একজন মহাকবি যে আমাব তরুণ মনের অকুণ্ঠ প্রণতি গ্রহণ কবিবেন ইহাতে বিস্ময়েব কিছুই নাই।

একটি বিদ্যুৎ-সংকটের রাত্রি

সারা সকাল, সাবা দুপুব বসে মনে মনে ঠিক করেছি, সন্ধ্যার পর পবীক্ষার শেষ পর্বের কাজ সমাধা কবব। কাল পবীক্ষা। বুকে দুরু-দুরু কম্পন, মনে শিহরণ, আশা-আনন্দ-ভরসা-অনিশ্চয়ের দোলা—সব নিয়ে আজকের দিনের শুরু। সারা দিনের, জল্পনা ও কল্পনা সকালে কতটুকু পড়ব, বিকেলে

কতটুকু, সন্ধ্যায় কতটুকু। সব হিসেব-নিকেশ সেরে ফেলতে হবে, সব পাঠ একবার ঝালিয়ে নিতে হবে। কালই আমার পরীক্ষা, অগ্নিপরীক্ষা।

বিকেল থেকে মনের মধ্যে ঝড় বইছে। অনেকগুলো প্রশ্ন দেখে নিতে হবে, অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর মনের মধ্যে দানা বাঁধে নি। এখন অনেক বাকী। তাই তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ করে নিতে হবে। চটপট, শীগগির। বিকেলের ছায়া মিলিয়ে এল।

সন্ধ্যা এল, আমি সারা ঘরে পায়চারি করতে করতে আমার প্রশ্নোত্তরের 'পয়েণ্টস্'-গুলো ঝালিয়ে নিচ্ছি। একবার, আর একবার। আজ একটু বেশী জাগতে হবে। কফি খেয়ে নিয়ে আবার খাতা-পত্র নিয়ে বসলুম। মনে অনেক আশা, অনেক উৎসাহ, অনেক উদ্যোগ।

এমন সময় সর্বনাশের রাত্রির মত অন্ধকার নেমে এল। হঠাৎ একটা দপ্ করে আওয়াজ হ'ল, আর সব আলো নিভে এল। ব্যস্, সব অন্ধকারে ডুবে গেল। সব কিছু ভাসিয়ে যেন ছুটে এল বন্যার ঢেউ। কালো রাত্রির বন্যা। সেই বন্যায় আমরা আত্মহারা হয়ে গেলুম। আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেললুম। আমার সামনে পরীক্ষা, আমার জীবনের এক সংকটময় লগ্ন। আর ঠিক তার আগের রাত্রিই এমন সর্বনাশের বাঁশরী বাজিয়ে আমার দিকে ছুটে এল। আমি অসহায়ের মত বিছানায় হাত-পা-ছড়িয়ে বসে পড়লুম। মনে হল আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ সর্বনাশের কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

একটু পরে বাড়ীর লোকে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়ালীর রাত্রি করে তুলল। আমার প্রয়োজন। সুতরাং এই আয়োজন। কিন্তু আমার সমস্ত মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। এই পরিবেশে কী আর পড়াশুনা করা যায়! কালকে আমায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুবাণ সহ্য করতে হবে। শেষবারের মত ভালো করে না দেখে নিলে কী আর কিছু করা যায়। সুতরাং কাল আমার অনিবার্য মৃত্যু।

এমন একটা নার্ভাস অবস্থায় আমি অন্ধকারে হাত-পা ছুঁড়ছি। পড়তে বসব বলে সমস্ত মনকে সংহত করছি। এমন সময় দমকা হাওয়ায় মোমবাতিটা নিভে গেল। ব্যস্ আবার অন্ধকার। রাস্তার লোকজন সন্ত্রস্তের মত হাঁটছে। অন্ধকারে সব মানুষই অসহায়। এ সময় অন্ধকারের জীবেরা মাথা তুলে ওঠে বেশী। সমাজের অন্ধকারের জীবের দাপটে তাই এই সময় মানুষ নিজেকে অসহায় বোধ করে। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ, সব মানুষ সতর্ক ও সাবধান।

রাহাজানি, ছিনতাই ত' লেগেই আছে। তাই ঘরে ঘরে মানুষ যেন বিবরে লুকিয়ে আছে।

আমার বই-পত্তরের উপর মোমবাতির করুণ আলো অসহায়ের মত কাঁপছে। আমি অপেক্ষা করে আছি সর্বনাশের জন্য। কাল আমার পরীক্ষা। সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যেন একাকার হয়ে গেছে।

পাশের বাড়ীতে হট্টগোল। হৈ-চৈ, কান্নাকাটি,—জানালা খুলে পাশের বাড়ীর একটা ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে অবাক হলাম। ওদের বাড়ীর কে যেন হাসপাতালে। পাশেই হাসপাতাল। কিন্তু সেখানেও বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের জন্য অপারেশন বন্ধ। সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে ওরা খুব ভেঙ্গে পড়েছে।

আমি জানালা বন্ধ করে চলে এলাম। ওদের কথা ভেবে আমার লাভ নেই। আমার নিজের বিভ্রাটের শেষ নেই। আমার নিজের বিপদের অন্ত নেই।

মোমবাতির সামনে খাতাগুলো মেলে ধরলুম। কিছুই ভাল লাগছে না। সব কিছুই অন্ধকার। আর এগোনো যাবে না। এ অন্ধকারের শেষ নেই। এ-অন্ধকার আমায় চেপে ধরেছে। কালকের পরীক্ষা আমার সামনে এক অন্তহীন অন্ধকার মেলে ধরেছে। নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিলুম দেশ ও সমাজকে দায়ী করলুম। আমার এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী মনে হল সকলে। এই সর্বগামী বিপদের জন্য দায়িত্ব সকলের। 'এ আমার, এ তোমার পাপ'। এই পাপের ফল সকলকে ভুগতে হবে। আজকের এই অন্ধকার রাত্রে আলোকের হোতাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

দ্বিতীয় পর্যায়

রচনা-সংকেত

॥ মহাকাশ-বিজয় ॥

বিজ্ঞানের অগ্রগতির এক নবযুগ-সৃষ্টি—বিজ্ঞানের সাহায্যে দুর্জয় প্রকৃতিকে জয়—বিজ্ঞানের শক্তিতে ভৌম-আকর্ষণ অতিক্রম প্রয়াস—মহাকাশ যাত্রার প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তর—মার্কিন ও রাশিয়া কর্তৃক মহাকাশ-অভিযান—সাফল্য ও বৈফল্য—প্রযুক্তি-বিদ্যার সার্থক প্রয়োগ—মহাকাশ-বিজয় ও মানব-কল্যাণ—বিজ্ঞানের সীমালঙ্ঘী যাত্রা।

॥ যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি ॥

যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল—শান্তির প্রয়োজন ও গুরুত্ব—যুদ্ধ ও মানবসভ্যতা—প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—মানবসভ্যতার সংকট—শান্তি-প্রচেষ্টা—রাষ্ট্রপুঞ্জের আবির্ভাব ও কর্মাবলী—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা—আণবিক যুগে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা ও প্রচেষ্টা।

॥ জাতীয় ঐক্য ॥

জাতীয় ঐক্যের সংজ্ঞা—জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা—জাতীয় জীবনে বিভেদের রূপ—জাতীয় ঐক্যের পথে অন্তরায়—অন্তরায় দূরীকরণের পন্থা—জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় প্রগতি—আধুনিক যুগে জাতীয় ঐক্যের উপযোগিতা।

॥ বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান ॥

বিদ্যুৎ-আবিষ্কার ও মানবপ্রগতি—বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি ও মানব-কল্যাণে বিদ্যুতের ব্যবহার—বিদ্যুতের বিস্ময়কর শক্তি—বিদ্যুতের রূপ ও ধর্ম—আধুনিক জীবনযাত্রায় বিদ্যুতের অবদান—উপসংহার।

॥ যন্ত্র-শিল্পায়ন ॥

আধুনিক যুগ শিল্পোন্নয়নের যুগ—যন্ত্রশিল্পায়ন ও দেশের আর্থিক বনিয়াদ—সারা বিশ্বে যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ ও প্রসার—ভারতবর্ষে শিল্পায়নের সুফল ও ক্রম-বর্ধমান প্রসার—শিল্পায়নে প্রাকৃতিক শক্তি ও শ্রমশক্তির ব্যবহার—উপসংহার।

॥ মুদ্রাযন্ত্র ॥

মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নব-অধ্যায়—মুদ্রাযন্ত্রের ক্রমোন্নতি—মুদ্রাযন্ত্র ও শিক্ষিত সমাজ—মুদ্রাযন্ত্রের সুফল—অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক উন্নয়নে মুদ্রাযন্ত্র—উপসংহার

॥ গ্রাম ও শহর ॥

গ্রাম ও শহরের তুলনা—গ্রামজীবনের নানা দিক—শহর-জীবনের সুবিধা ও অসুবিধা—গ্রাম ও শহরের সুযোগ ও সুবিধার পার্থক্য—শহর ও আধুনিকতা—গ্রাম ও ঐতিহ্য—গ্রাম-উন্নয়ন ও শহর-গঠনের উপকারিতা।

॥ তোমার স্কুলের যে-কোন একটি উৎসব ॥

উৎসবের দিন—স্কুলের স্মরণীয় উৎসবের বৈশিষ্ট্য—উৎসবের আয়োজন—কিশোর-কিশোরীর সমবায়-প্রয়াস ও আনন্দলাভ—পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংগঠনের শিক্ষা—উৎসবের বর্ণনা—উৎসবের প্রভাব ও ছাত্রজীবন—পরবর্তীকালে এই উৎসবের অবদান।

॥ গ্রামের হাট ॥

স্বরূপ-বিচার—হাটের বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনা—হাটের প্রয়োজনীয়তা—গ্রামের হাট ও গ্রাম-সমাজ—গ্রামের হাটের সুবিধা ও অসুবিধা।

॥ বাংলার গ্রাম ॥

বাংলার গ্রামের পরিচয়—অতীত কালের বাংলার প্রকৃতি-পরিচয়—শিল্পযুগ ও গ্রাম—গ্রামের অবক্ষয়ের কারণ ও ফলাফল—শহর ও গ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—বর্তমান বাংলার গ্রামের অবস্থা—গ্রাম-উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও সমাজসেবার আদর্শ—গ্রামই বাংলাদেশের সমৃদ্ধির উৎস—সিদ্ধান্ত।

॥ বন-মহোৎসব ॥

বনের প্রয়োজনীয়তা—জলবায়ু ও মানবসমাজে বনের অবদান—প্রাচীন ভারতে বনভূমির প্রয়োজনীয়তা-স্বীকার—আধুনিক যুগে বনভূমির প্রতি সভ্য মানুষের অবহেলা—বনের সহিত দেশের পরিবেশ ও অর্থনীতির সম্পর্ক—বনের সহিত শিল্পকলা ও হৃদয়বৃত্তির সম্পর্ক—রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থায় বন-মহোৎসবের প্রবর্তনা—ভারত-সরকার পালিত বন-মহোৎসব—উপসংহার।

॥ ছাত্রসমাজ ও সেবাদর্শ ॥

প্রাচীন কালের ছাত্রসমাজের পরিচয়—ছাত্রজীবনে আদর্শবাদের প্রয়োজনীয়তা—সেকাল ও একালে ছাত্রসমাজ—শিক্ষাক্রমে বৃত্তিশিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রাধান্য—যন্ত্রযুগের প্রভাব—ছাত্রসমাজে আদর্শহীনতা-সেবাদর্শের গুরুত্ব—গুণী শিক্ষকের প্রেরণায় সেবাদর্শের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য-সঞ্চার—সেবাদর্শ ও সমাজ—উপসংহার।

॥ ...লার জাতীয় উৎসব ॥

জাতীয়-উৎসব কি ও কেন—যে-কোন একটি জাতীয় উৎসবের উল্লেখ—জাতীয় উৎসবের সংজ্ঞা—উৎসবের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা—উৎসব-বর্ণনা—উপসংহার।

॥ শিষ্টাচার ॥

সূচনা—শিষ্টাচারের বৈশিষ্ট্য—সমাজজীবনে শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা—শিষ্টাচার শিক্ষার গুরুত্ব ও পারিবারিক শিক্ষা—শিষ্টাচারহীন ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতিকারক দিক—উপসংহার।

॥ স্বাবলম্বন ॥

স্বাবলম্বনের তাৎপর্য—স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা—স্বাবলম্বন-শিক্ষার আদর্শ সময়-জাতীয় জীবনে কৃতী ব্যক্তিদের জীবনে স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত ও আদর্শ—জাতীয় চরিত্র ও স্বাবলম্বনের মূল্য—উপসংহার।

॥ স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ভাষার স্থান ॥

স্বাধীন দেশে ইংরেজী ভাষার স্থান বিতর্কমূলক বিষয়—স্বাধীনতার চেতনা বিদেশী ভাষা চর্চার বিরোধী—ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব—শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার—ইংরেজী-বর্জন সম্ভব কিনা—দেশীভাষা ও ইংরেজী ভাষার সহ-অবস্থান—উপসংহার।

॥ বর্তমান যুগে সাহিত্য শিক্ষার গুরুত্ব ॥

বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য—যন্ত্রযুগের প্রাধান্য—সাহিত্যশিক্ষার তাৎপর্য—জীবনে ও সমাজে সাহিত্য শিক্ষার মূল্য—শিক্ষার উদ্দেশ্য—প্রযুক্তি বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—সাহিত্য-শিক্ষা ও বৃত্তি-শিক্ষার বিরোধিতা—সাহিত্যশিক্ষার চিরন্তন মূল্য ও মানবজীবন।

॥ ছাত্র ও রাজনীতি ॥

ছাত্রজীবনের আদর্শ—আধুনিক কালে ছাত্রদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি-বিস্তার—ছাত্রদের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ—ইহার সুফল ও কুফল—জীবনে সাফল্য লাভের জন্য ছাত্রদের রাজনৈতিক জীবনের প্রয়োজন—ভারতবর্ষে ছাত্র-আন্দোলন ও ছাত্রসমাজ—ইহার পরিণাম ও পরিত্রাণ।

॥ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ॥

শিক্ষার গুরুত্ব—শিক্ষাক্রমে স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—পুঁথিগত বিদ্যা ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি—বাঙলাদেশের ছাত্রসমাজের স্বাস্থ্যহানি ও জাতীয় ক্ষতি—

স্বাস্থ্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা—কলকাতার ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার প্রকল্প—ছাত্ররা জাতির সম্পদ ও স্বাস্থ্যই সম্পদ—উপসংহার।

॥ বুনিয়াদি শিক্ষা ॥

শিক্ষার উদ্দেশ্য—বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা—শিক্ষাবিদ্‌গণের মতামত—গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বুনিয়াদি শিক্ষা—বুনিয়াদি শিক্ষার নানাপ্রকার দিক—উপসংহার।

॥ রূপকথা ॥

রূপকথা-পরিচয়—রূপকথার জন্ম—রূপকথার গল্প—রূপকথা ও মানবমন—সাহিত্যে রূপকথার প্রভাব—রূপকথার সাহিত্যিক মূল্য।

॥ গণতন্ত্র ॥

গণতন্ত্রের ধারণা—গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও শ্রেণীভেদ—গণতন্ত্র ও আধুনিক সমাজ—গণতন্ত্রের সুফল ও কুফল—উপসংহার।

॥ বন্যা ও তাহার প্রতিকার ॥

বন্যা কাহাকে বলে—বন্যার কারণ ও ফলাফল—বন্যার দৃষ্টান্ত—বাংলাদেশে বাৎসরিক বন্যার চিত্র—বন্যা-প্রতিরোধ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত—বন্যা প্রতিরোধ সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ—বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির এই তাণ্ডবকে প্রতিরোধের উপায়—বিশ্বের উন্নত দেশে বন্যা-প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত—উপসংহার।

॥ কালবৈশাখী ॥

সূচনা—কালবৈশাখীর সময়—কালবৈশাখীর দৃশ্য—কাব্যে-সাহিত্যে কাল-বৈশাখীর বর্ণনা—ঝড়ের পূর্বে ও পরে—কালবৈশাখীর ফলে মানবজীবনের ক্ষতি।

॥ কলিকাতার জীবন ও সমস্যা ॥

কলিকাতার উৎপত্তি—কলিকাতার সমাজ—বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে কলিকাতা—কলিকাতার নানামুখী সমস্যা—বাসগৃহ-সমস্যা, পরিবহণ সমস্যা বেকার সমস্যা, জনসংখ্যার সমস্যা, বস্তি-উন্নয়ন সমস্যা, পানীয়জল সমস্যা। বিদ্যুৎ সমস্যা—সমস্যার নানাবিধ চিত্র—সমাধানের উপায়—সি. এম. ডি. এ. ও কলিকাতার ভবিষ্যৎ।

॥ দেওয়ালী ॥

সূচনা—উৎসব হিসাবে দেওয়ালী—দেওয়ালী উৎসবে আনন্দ—দেওয়ালী উৎসবের স্বাতন্ত্র্য—উপসংহার।

॥ একটি মেলার বর্ণনা ॥

মেলার অর্থ—মেলার প্রকার ভেদ—মেলার সার্থকতা—মেলার বৈশিষ্ট্য—মেলার নতুন নতুন রূপ—গ্রাম সমাজে মেলা—শহুরে সমাজে গ্রন্থমেলা।

॥ পল্লী উন্নয়ন ॥

সূচনা—পল্লী উন্নয়ন ও দেশীয় সমাজ—আধুনিক সমাজ ও শহুর—পল্লীই দেশের প্রাণ—পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে নানামুখী প্রকল্প—সমাজসেবার আদর্শ ও পল্লী উন্নয়ন—পল্লী উন্নয়ন প্রসঙ্গে এদেশের পণ্ডিতবর্গের মতামত—উপসংহার।

॥ সমাজ উন্নয়ন ॥

ভূমিকা—সমাজ-উন্নয়ন ও পরিকল্পনা—সমাজ-উন্নয়নের মূল্য—সমাজ-উন্নয়নের ফলাফল—উপসংহার।

॥ একটি পয়সার কথা ॥

ভূমিকা—পয়সার জন্ম—পয়সার আত্মকথা, শৈশব ও যৌবন—পয়সার চলমানতা—পয়সার মূল্য।

॥ একটি নদীর কথা ॥

ভূমিকা—নদীর উৎপত্তি—নদীর যাত্রাপথ—নদীর রূপ—নদীর দুই তীরের দৃশ্য—নদীর গতিপথে মানবসমাজের উত্থান-পতন—উপসংহার।

॥ একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের আত্মকথা ॥

বটবৃক্ষের প্রাচীনত্ব—বনভূমির অন্যান্য গাছপালার মধ্যে তাহার স্বাতন্ত্র্য—বটবৃক্ষের অভিজ্ঞতায় মানব-সমাজ ও জীবনের বিবর্তন—বটবৃক্ষ ও প্রকৃতির তাণ্ডব—বটবৃক্ষকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের মেলা ও উৎসব—মানব-সংসারের নানা চিত্র—উপসংহার।

ভূমিকা—'পঞ্চশীল' কথার তাৎপর্য—পঞ্চশীলের লক্ষ্য—মানবতার আদর্শ ও পঞ্চশীল—আন্তর্জাতিক নীতি হিসাবে পঞ্চশীল—পঞ্চশীলের রূপায়ণ—ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার নানা জাতিগোষ্ঠীর মতামত—উপসংহার।

॥ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ ॥

ব্যাঙ্ক ব্যবসা—ব্যক্তিগত অধিকার—রাষ্ট্রীয় অধিকার—ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়—যৌথ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের তাৎপর্য—ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের পথে অন্তরায়—উপসংহার।

॥ ধর্মঘট॥

সূচনা—ধর্মঘটের কারণ—গণতন্ত্রে ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা—শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নির্ণয়ে ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা—ধর্মঘটের সুফল ও কুফল—ধর্মঘটের উদ্দেশ্য।

॥ কাগজ ॥

সূচনা—কাগজ আবিষ্কারের পূর্বের অবস্থা—প্রাচীন লিখন-পত্র—কাগজ প্রস্তুত-পদ্ধতি—বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ—কাগজের প্রয়োজনীয়তা—জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাগজের দাম—উপসংহার।

॥ চা ॥

ভূমিকা—আধুনিক সমাজে চা-পানের জনপ্রিয়তা—চা-শিল্পের প্রকৃতি ও প্রসার—আধুনিককালে চা-শিল্পের গুরুত্ব—সিদ্ধান্ত।

॥ তোমাদের স্কুলের বর্ণনা ॥

সূচনা—স্কুলের বর্ণনা—স্কুলের পরিবেশ, শিক্ষক, ছাত্র ও প্রাথমিক বর্ণনা—ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক—স্কুলের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—স্কুলের ঐতিহ্য বর্ণনা ও শিক্ষাদর্শ—উপসংহার।

॥ আণবিক যুগ ॥

নামকরণের তাৎপর্য—আণবিক যুগের বৈশিষ্ট্য—বিজ্ঞানের অবদান ও আণবিক যুগ—আণবিক গবেষণার ফলাফল—শক্তির ব্যবহার ও অপব্যবহার—আণবিক শক্তি নবযুগের শক্তির উৎস।

॥ ভারতের কৃষি ও কৃষক ॥

সূচনা—কৃষি-উন্নয়নই দেশের প্রাণসম্পদ—কৃষি-উন্নয়নের সমস্যা—কৃষি-উন্নয়ন ও সমবায়-প্রথা—কৃষি উন্নয়নের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা—উপসংহার।

॥ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ॥

সূচনা—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সমাজের অবস্থা-বিপর্যয়—মানুষের আর্থিক কষ্ট—দ্রব্যমূল্য-নিরাকরণের উপায়—সরকারের নানামুখী পরিকল্পনা—উপসংহার।

॥ চন্দ্রলোকে মানুষ ॥

সূচনা—চন্দ্রলোক আবিষ্কারে বিজ্ঞানের কৃতিত্ব—চন্দ্রলোক যাত্রার জন্য পরিকল্পনা—প্রথম প্রয়াস—সোভিয়েট ও মার্কিন প্রয়াস—সাফল্য ও ব্যর্থতা—উপসংহার।

- ভাব-সম্প্রসারণ
- ভাবার্থ
- বঙ্গানুবাদ

ভাব-সম্প্রসারণের নিয়ম

কবিতা বা রচনার মধ্যে ভাবই কেন্দ্রীয়-বস্তু। ভাব কি? মূল যে বাণী বা অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাকে লইয়া রচনাটি নির্মিত হয়, তাহাই ভাব। এই মর্মগত ভাবকে সম্প্রসারিত করাই ভাব-সম্প্রসারণ। ইংরেজিতে ইহার প্রতিশব্দ Amplification of Idea। যে কোন কবিতা বা রচনা পাঠ করিলে উহার মূল ভাবকে ধরিতে পারাই মুখ্য প্রয়াস হওয়া উচিত। এই ভাবকে বিস্তারিত করাই ভাব সম্প্রসারণের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই ভাব বিস্তারিত করিবার কয়েকটি প্রণালী আছে। সেই নিয়মগুলি যথাক্রমে এইরূপ :—

(১) কবিতা ও রচনায় প্রতিভাত ভাবকে পরিস্ফুট করিতে হইবে। মূল ভাব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে একটি। সেখানে একাধিক ভাবকে সহকারী ভাব হিসাবে লক্ষ্য করা যাইবে, কিন্তু সেই অঙ্গ-ভাবকে অঙ্গী-ভাবের সহিত এক করিয়া ফেলিলে চলিবে না। এই নির্বাচন ও চয়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(২) একটি ভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া অনেক সময় লেখক প্রাসঙ্গিক উপমা বা রূপক অলংকার প্রয়োগ করেন। এই প্রাসঙ্গিক উপমা দ্বারা মূল ভাবকে পরিস্ফুট করা হয়। আলোচনার সময় এই দুই প্রসঙ্গকে বিশ্লিষ্ট করিয়া উপমেয় অংশকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করাই বিধেয়। স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ দ্বারা এই ব্যাখ্যা বা প্রসঙ্গ নির্মাণ করা হয়।

(৩) আলোচনায় সময় লেখকের পরিচয় বা কবিতার শিরোনাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

(৪) লেখার উৎকর্ষ-বৃদ্ধির জন্য পুনরাবৃত্তি বর্জনীয়। সরল সহজ রীতিতে মূল বক্তব্যকে পরিস্ফুট করাই বিধেয়। লেখার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা না থাকাই কাম্য। অনুচ্ছেদ বিভাগ দ্বারা বক্তব্যকে সুবিন্যস্ত করা প্রয়োজনীয়। সমস্ত ব্যাখ্যা বা সম্প্রসারণটি সামঞ্জস্যধর্মী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৫) মূল ভাবের সহিত অসম্পর্কিত কোন বক্তব্যের স্থান ভাব-সম্প্রসারণে নাই।

(৬) লেখা অকারণে পল্লবিত না হওয়াই ভাল। তবে ভাবকে বিশদীভূত করার জন্যও রচনা আবার অনেক সময় দীর্ঘ হইতে পারে।

ভাব-সম্প্রসারণ

১।　　মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
　　মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই পৃথিবী সুখে দুঃখে পরিপূর্ণ একটি মনোহর স্থান। মানুষ এই পৃথিবীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জীবন অতিবাহিত করে। জীবনের মমতা মানুষের এতই গভীর যে মৃত্যু তাহার কাছে ভয়াল সংকেত লইয়া আসে। দুঃখের মধ্যেও পৃথিবীকে সুন্দর বলিয়া মনে হয়। সুখের মধ্যে পৃথিবী অপরূপ হইয়া উঠে। সুখ-দুঃখ-তরঙ্গিত হাসি-কান্না-পূর্ণ এই জীবন সত্যই মনোহর। মানুষ এই পৃথিবীতে বাঁচিতে চায়, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আশ্রয় পাইতে চায়। মানুষের স্নেহ-প্রীতির আশ্রয়ই মানুষের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। এই আশ্রয় না পাইলে মানুষের সবই ব্যর্থ হইয়া যায়। এই জগতে যে মানুষের স্নেহ-প্রীতিব আস্বাদ না পাইল, সব কিছুই তাহার জীবনে মরুভূমি হইয়া দেখা দেয়। মানুষের শ্রেষ্ঠ স্থান মানুষের হৃদয়। এই সুন্দর পৃথিবীতে থাকিয়া, মানুষের ভালবাসা লাভ করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া মর্ত্ত্যপৃথিবীর জয়গান গাহিবার প্রেরণা লাভ করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের জন্য মৃত্যু নয়, জীবনের আনন্দোপলব্ধিই মানুষের কাম্য। পৃথিবী সুন্দর, এই উপলব্ধি যেমন সত্য মানুষের স্নেহ ভালবাসাও সুন্দর, এই উপলব্ধিও তেমন সত্য। তাই মৃত্যু যদি রমণীয় উপলব্ধির ছেদ টানিয়া আনে, সেইজন্য মানুষের এত মৃত্যুভয়। সৃষ্টির সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপভোগ করিবার জন্য এই পৃথিবী ও মানবহৃদয়কেই প্রয়োজন বেশী। কঠোর তপস্যায় ঈশ্বরলাভ হইতে পারে, অমৃতত্ব পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মর্ত্যমানুষের প্রীতি ও সৌন্দর্য পাওয়া যায় না। সৌন্দর্য ও প্রেম দুর্লভ বস্তু—এই দুই বস্তর আস্বাদের জন্য মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে। মানুষ এই পৃথিবী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চায় না—এই পৃথিবী ও প্রিয়জন তাহার চিরকালের আবাস হইয়া থাকে।

২।　　ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে।
　　ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে॥

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের সম্পর্ক চিরকালই অকৃতজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। উপকারীর দানকে ব্যঙ্গ করাই উপকৃতের স্বভাব। মানুষ যাহার প্রেরণায়

নির্মিত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে অস্বীকার করাই যেন তাহার লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই মানবজীবনের এক করুণ স্বতোবিরোধিতা হইয়া দেখা দেয়। মনে হয়, ইহাই সংসারের নিয়ম।

প্রতিধ্বনি ধ্বনিরই সৃষ্টি। ধ্বনি উঠিলে তবে প্রতিধ্বনি জাগে। প্রতিধ্বনি ধ্বনি-নির্ভর। ধ্বনির অস্তিত্ব ছাড়া প্রতিধ্বনি কল্পনা করা যায় না। প্রতি-ধ্বনির অস্তিত্ব তাই ধ্বনির উপর নির্ভর করে। তবু প্রতিধ্বনির আবেদন যেন স্বতন্ত্র হইয়া দেখা দেয়। সে ধ্বনিকেই ব্যঙ্গ করে। কারণ সে যে ধ্বনিরই সৃষ্টি ইহা সে মানিয়া চলিতে চায় না। ইহাতে তাহার অহমিকায় আঘাত লাগে।

মানুষের অহমিকা মানুষকে দিয়া অসাধ্যসাধন করায়। আশ্রয়দাতাকে অবলম্বন না করিলে হয়ত সে নিঃসংশয়ে পৃথিবীতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না। সেই পরম উপকারী ব্যক্তিকেও সে ভুলিয়া যায়, তাহার স্মৃতিকে বিকৃত করে।

ইহার কারণ অসহায় মানুষ তাহার দৈন্যের কথা গোপন করিতে চায়, সে যে পরাশ্রয়ে মানুষ হইয়া উঠিয়াছিল, এ-কথা তাহার অহমিকাকে আঘাত করে। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের মধ্যে সহজ-সুন্দর সম্পর্ক আর থাকে না। কারণ এই অহংকার। সে অধমর্ণ কখনও বিস্মৃত হয় না যে উত্তমর্ণ তাহাকে ঋণী করিয়াছিল। ঋণে আবদ্ধ থাকা মানুষের অহংকারের পক্ষে স্বস্তিকর ব্যাপার নয়। ইহা তাহার আত্মমর্যাদায় আঘাত দেয়। সংসার এই অদ্ভুত নিয়মের বশবর্তী। সন্তান যেমন মাতাপিতার একান্ত সৃষ্টি, শিষ্য তেমন গুরুর মানস-সৃষ্টি,—কিন্তু পরবর্তীকালে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কে সহজ সৌন্দর্য থাকে না। সৃষ্টি স্রষ্টাকে অস্বীকার করে, অমর্যাদা করে, অকৃতজ্ঞ উক্তি করিতে কৃপণতা করে না—কারণ সৃষ্টি ভুলিতে চায় যে স্রষ্টার দানে তাহার জীবন। ইহা তাহার অহমিকাকে আঘাত করে। মানুষের স্বভাবের মধ্যে এই বিরোধ লুকাইয়া আছে।

৩। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে॥

সামাজিক মানুষের কর্তব্যের সঙ্গে দায়িত্বও প্রচুর। মনুষ্যত্বের দাবী অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। যে মানুষ সৎ ও বিবেকবান, সেই মানুষ সামাজিক

অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। অন্যায়কারী যেমন পাপী, অন্যায়ের নির্লিপ্ত দ্রষ্টাও তেমনি পাপী।

মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যখন নীতি ধূলিসাৎ হয়, তখনই অন্যায়ের আবির্ভাব ঘটে। এই জগতে প্রবলের কাছে দুর্বল নিপীড়িত হয়।

দুর্বলের অসহায় ক্রন্দনে সংসার পরিপ্লুত হয়। কিন্তু এই অন্যায়ের যে কর্তা সেই শুধু অপরাধী নয়। নৈতিক দিক হইতে, যে ব্যক্তি এই অন্যায়ের প্রতি উদাসীন, কেবলমাত্র নির্লিপ্ত দ্রষ্টা, সেও অপরাধী। কারণ ঔদাসীন্য দ্বারা অন্যায়কে সে প্রশ্রয় দেয়। অন্যায় বিস্তারশীল বস্তু। ইহা সমাজের এক প্রান্তে দেখা দিলে সমগ্র সমাজ কলুষিত হইয়া যায়। সুতরাং অন্যায়ের প্রতিরোধ করা বিধেয়। মানুষ যখনই ন্যায়ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়, তখনই সে পাপী। পাপ কোনদিন গোপন থাকে না। পাপ একদিকে পাপীকে দগ্ধ করে, অন্যদিকে সমগ্র সমাজকে দগ্ধ করে। পাপ একদিকে আত্মঘাতী, অন্যদিকে বিশ্বঘাতী। এইজন্য পাপকে অপনীত করা যে কোন সৎ সামাজিকের অবশ্যকৃত্য। নচেৎ একের পাপে অনেকে ধ্বংস হইবে। অন্যায়কে প্রতিরোধ করা যে কোন কর্তব্যশীল মানুষের আবশ্যিক কর্তব্য। তাই ভগবানের চোখে বা নীতিবাদের বিচারে অন্যায়কারী এবং অন্যায়-সহিষ্ণু দুইজনেই প্রতিবাদ-যোগ্য ব্যক্তি। এই প্রতিবাদের কর্তব্য যিনি করেন না, তিনি প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন।

৪। রথযাত্রা লোকারণ্য, মহাধুমধাম,—
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথভাবে 'আমি দেব,' রথ ভাবে 'আমি'।
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী॥"

মানুষের অহংকার মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অহংকারের বশেই মানুষ নিজেকে দেবতা ভাবে, অহংকারের প্রভাবেই মানুষ নিজের জীবনের আসল উদ্দেশ্যকে ভুলিয়া যায়। এই সংসারে অহংকারই সব কিছুর অবলম্বন। অহংকারের বলেই মানুষ আদর্শভ্রষ্ট হয়, আত্মবিস্মৃত হয়। এই আত্মবিস্মৃত আদর্শহীনতার অমানিশায় মানুষের দেবতা হাসিয়া উঠেন

সংসারে অনেকক্ষেত্রেই লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ্যটা বড় হয়। আদর্শ অপেক্ষা আদর্শের ভণ্ডামি, দেবতা অপেক্ষা দেবতার উপচার, পূজা অপেক্ষা

পূজার উপকরণ বড় হইয়া দেখা দেয়। আচারের মরুপথে বিচার হারাইয়া যায়, ভক্তির আতিশয্যে ভক্তির অনুষঙ্গ প্রধান হইয়া উঠে। তখন উপলক্ষ্য নিজেকে লক্ষ্য বলিয়া ভাবে, ভগবানের অনুষঙ্গ নিজেকে দেবতা বলিয়া মনে করে। ইহার জন্য দায়ী কেবল ভক্তির আতিশয্য নয়, ইহার জন্য দায়ী প্রতিটি বস্তু বা ব্যক্তির অহংকার। প্রত্যেকে নিজের মত করিয়া ভাবে যে সেই চরম। কিন্তু সবার অন্তরালে পরম যে সে বিজ্ঞের হাসি হাসে। দেবতার অনুষঙ্গ মোহবশতঃ নিজেকে দেবতা ভাবে, কিন্তু সেই ভাবনা যে কত অলীক ও অসার তাহা বোঝা যায় দেবতার স্মিতহাস্যে।

৫৮/ উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

'সমাজে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের গ্রহণশীলতাও অসীম। কারণ তাঁহাদের চারিত্রিক শক্তির বলে তাঁহারা নির্বিঘ্ন ও নিরঙ্কুশ হইয়া পরিক্রমা করেন। ইহাতে তাঁহাদের শুচিতা ক্ষুণ্ণ হয় না, স্বভাবে মালিন্য লিপ্ত হয় না। সকলের সহিত তাল রাখিয়া চলিবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁহাদের থাকে। তাঁহারা অনায়াসে অন্ত্যজ ও ব্রাত্যের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন। উত্তম কখনও অধমকে পরিত্যাগ করেন না, কারণ এই আত্মবিশ্বাস তাঁহার আছে অধম উত্তমকে প্রভাবিত করিতে পারিবে না। শ্রেষ্ঠজন বলিয়াই তাঁহার অন্তরের উদারতা ও গ্রহণশীলতা সর্বগ্রাহী হইয়া দেখা দেয়। নিত্যশুচি বলিয়া শ্রেষ্ঠজনের কোন বিপদ নাই। কিন্তু সংসারে সমস্যা বাধে মাঝারিদের লইয়া। মাঝারি গোত্রের ব্যক্তিরা এতখানি শক্তিমান নন যে অবলীলায় সর্বগোত্রের মানুষের সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন। তাঁহাদের অন্তর এত উদার ও সহিষ্ণু নয়, যে সর্ববিধ অবস্থায় মানুষকে তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন। মধ্যমশ্রেণীর মানুষ ত্রিশঙ্কুর ন্যায়—তাঁহারা অধমকে ভয় করেন, উত্তমের প্রতি লোভও তাঁহাদের দুর্বার। অধমের প্রতি একপ্রকার মানসিক জটিলতা বা অবজ্ঞার ভাব প্রবল হওয়ার জন্য অধমকে তাঁহারা অবহেলা করেন, অধমের সংস্রব পরিহার করেন। আবার উত্তমের প্রতি লুব্ধ থাকার ফলে উত্তম গোত্রের ব্যক্তিবর্গের প্রতি আকাঙ্ক্ষার অন্ত থাকে না, অথচ মনসঙ্কোচ দূরত্বে এই উচ্চ কোটির মানুষের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে তাঁহারা উৎসুক হন। এইজন্য মধ্যমগোত্রীয়রা সমাজে স্বতন্ত্র কোটির অসহায়

জীব হইয়া দেখা দেন। উত্তমের সহিত মিশিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু লোভ আছে, অধমের সহিত সংস্রবের শক্তি নাই, কিন্তু ভীরুতা আছে। তাই দূরে দূরে চলিতে চলিতে তাঁহারা নিঃসঙ্গ হইয়া পড়েন। ইহাই মধ্যমগোত্রীয় ব্যক্তির নিয়তি।

৬। কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে
'ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি উঠে, 'এসো মোর দাদা'।

মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও সম্মানের মোহ দুর্মর। এই মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লোভ কখনও কখনও অনপনেয় ও অপরিহার্য মোহ হইয়া দাঁড়ায়। ইহা সামাজিক মানুষের চিরন্তন দুর্বলতা। পদগৌরব বা সচ্ছল অবস্থার প্রতি মোহ মানুষের স্বভাবে চিরন্তন। তুলনায় হীন অবস্থার স্বজনকে মানুষ অবজ্ঞা করে, হেয় করে। তাহাদের সঙ্গ পরিহার করে। পদগৌরব-যুক্ত মানুষের প্রতি আনুকূল্য বা ব্যাকুলতা দুর্নিবার হইয়া উঠে। এই মূঢ়তা কেরোসিন-শিখার ব্যবহারে পরিস্ফুট হইয়াছে।

কেরোসিন-শিখা মাটির প্রদীপের আত্মীয়তা সহ্য করিতে পারে না। কারণ মাটির প্রদীপ দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের প্রতীক। কেরোসিন-শিখার প্রতিষ্ঠা মাটির প্রদীপ অপেক্ষা বেশী। তাই তাহার লোভ অমেয়, সে উদ্বাহু হইয়া আছে আকাশের চাঁদের দিকে। আকাশের চাঁদকে সে আত্মীয় বলিয়া ভাবিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এই আত্মীয়তা অনেক সময় কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত হইয়া দেখা দেয়; তবু এই আত্মীয়তা তাহার মোহের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য হইয়া দেখা দেয়। কারণ দুঃস্থ আত্মীয়কে সংসারে মানুষ ব্যাধির মত ভয় করে। দুঃস্থ আত্মীয় গলগ্রহ-স্বরূপ, তাই দুঃস্থ আত্মীয়ের ছায়া ত্যাগ করাই ভাল। কিন্তু সুস্থ বা সচ্ছল আত্মীয় সম্পর্কে মোহের শেষ নাই। তাহার পরিচয় দানে নিজের মর্যাদা ও সম্ভ্রম বাড়ে, জন-সমাদর বাড়িয়া যায়। মানুষ এই প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির আত্মীয়তা কামনা করে। অনেক সময় এই আত্মীয়তার ভিত্তি অসার হইলেও ইহা গড়িয়া লওয়া হয়। অনাত্মীয় যদি ধনী হয়, তখন তাহাকে আত্মীয়-বন্ধনে বাঁধিবার জন্য মানুষের চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। ইহা সামাজিক মূঢ়তা, কিন্তু ইহাই বাস্তব। অলীক আত্মমর্যাদার প্রতি

লোভ ও মোহ মানবমনে দুর্বার। দুঃস্থের আত্মীয়তাকে যে ভীতি প্রদর্শন-পূর্বক ক্ষান্ত করিতে চায়, সেই আবার ধনীর আত্মীয়তাকে লুব্ধের মতো কামনা করে। ইহা মর্যাদালোভী মানুষের দুর্বলতার পরিচায়ক।

৭। প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম-গোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটফুল অতিশয় দীন।
ধিক ধিক বলে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তা'রে, 'ভাল আছ, ভাই'।

মহত্ত্ব সর্বগ্রাহী। সংকীর্ণমনা ব্যক্তিই মর্যাদা ও গরিমা বিচার করিয়া অগ্রসর হয়। সংকীর্ণমনা ব্যক্তিই দুঃস্থ আত্মীয়কে পরিহার করে, সচ্ছল স্বজনকে কামনা করে। ধনী অনাত্মীয়কে আত্মীয়রূপে কাছে টানিতে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেয়, কিন্তু পদমর্যাদাহীন দুঃস্থকে ধিক্কার দিতে বাধে না। মানুষের স্বভাবই এই যে, বিচারশীলতা দ্বারা সে তাহার গ্রহণ ও বর্জনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু যে মানুষ উদার ও মহৎ, তাহার ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়ম খাটে না। সে আভিজাত্যের মানদণ্ডে মানুষের বিচার করে না, হৃদয়ের আলোকেই সকলকে বিচার করে। হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শে পর আপন হয়, তুচ্ছ মহৎ হইয়া দেখা দেয়, দীন ঐশ্বর্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

প্রাচীরের রন্ধ্রপথে যে অজ্ঞাতকুলশীল পুষ্পটি ফুটিয়াছে, সেই পুষ্পের রূপও নাই, গন্ধও নাই। তাই পুষ্পসমাজে সে অনাদৃত। ক্ষুদ্র ও অবহেলার যোগ্য ফুলকে কেহ গ্রাহ্য করে না, সকলেই তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিতে চায়। পুষ্পের সমাদর সর্বত্র। দেবতার নৈবেদ্যে বা পূজার আসরে সর্বচারী পুষ্পের মহিমা। কিন্তু রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধহীন পুষ্পের মর্যাদা কিছুই নাই। তাহা কণ্টক সদৃশ। তাই অভিজাত পুষ্পগুলি এই সব নামগোত্রহীন পুষ্পের আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চায় না। সূর্য বিরাট, সূর্য মহৎ। সূর্যের চোখে উচ্চনীচ ভেদ নাই তাই সে অভিজাতকে যেমন বরণ করে, অনভিজাতকেও তেমনি অবজ্ঞা করে না। সকলের প্রতি তাহার সমদৃষ্টি। ইহাই উদারতার বৈশিষ্ট্য। উদারজনের হৃদয়ে ক্ষুদ্রতার স্থান নাই। উদারচেতা মানুষ প্রীতির মূল্যে ও মানবতার মূল্যেই মানুষকে দেখেন। স্বার্থান্ধ মানুষের মত অবস্থার বিচার করিয়া মানুষের সমাদর করে না। মহৎ মানুষ সর্বগ্রহণশীল বলিয়া তাহারও

প্রতি পক্ষপাতের দৃষ্টিক্ষেপ করে না। এইজন্য সর্বজনীন প্রীতির দ্বারা বিশ্বসংসারকে এই শ্রেণীর মানুষ আপন করিয়া তোলেন। এইখানেই মহৎ ব্যক্তিরা সমাজে সকলের জন্য উদারতার আদর্শ স্থাপন করিয়া যান। এইজন্য তাঁহারা নমস্য ও মান্য বলিয়া পরিগণিত হন।

৮। পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না।

মানুষের জীবন মহৎ কর্মেই নিবেদিত হয়। মানুষ চিরকালই মহতের পূজারী, বৃহতের অনুরাগী। পুষ্প যেমন এক বৃহত্তর উদ্দেশ্যে প্রকৃতির বুকে ফুটিয়া থাকে, মানুষও তেমনি বৃহত্তর উদ্দেশ্যেই ধরণীতলে আবির্ভূত হয়। মহত্তর উদ্দেশ্যে সমর্পিত বলিয়াই মানুষ সংসারে মহিমা অর্জন করিয়াছে।

পুষ্প তাহার বর্ণগন্ধ দিয়া মানুষকে আকর্ষণ করে। তাই পুষ্পের মর্যাদা সর্বত্র। প্রিয়জনের আসরে, প্রিয়জনের মিলনোৎসবে বা দেবতার পূজার্চনায় সর্বত্রই পুষ্পের সমাদর। পুষ্প ছাড়া কোন মঙ্গলকর্ম সম্পন্ন হয় না। কারণ পুষ্প শুধু প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্যকেই বহন করে না, ইহা প্রকৃতির রাজ্যে ঈশ্বরের বার্তা লইয়া আসে। তাই মানুষ ও দেবতা উভয়েই পুষ্পের অনুরাগী। পুষ্পের জীবন নিজের জন্য নিবেদিত হয় না। পুষ্পের জীবনের সার্থকতা অন্যকে সুখ বা আনন্দদানের উপর নির্ভর করে। মানুষের জীবনও পুষ্পের অনুরূপ। পুষ্পের মতই মানুষ বৃহৎ কর্মের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকে, মানুষ যদি ছোট সুখ বা ছোট দুঃখের দ্বারা আবৃত থাকে, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে 'ছোট আমি'-র প্রভাব সর্বব্যাপক হইয়া উঠে। কিন্তু 'ছোট আমি'-র সঙ্কীর্ণতায় মানুষ বদ্ধ থাকিলে তাহার মনুষ্যত্ব খর্ব হয়। তাই মানুষ বৃহতের সঙ্গপ্রার্থী। মানুষ তাহার নিজের স্বার্থের গণ্ডী হইতে মুক্তি পাইয়া যেদিন বৃহত্তর সমাজ ও জীবনে লীন হয়, সেই দিনই 'বড়ো আমি'-র প্রাধান্য দেখা দেয়। 'বড়ো আমি'-র প্রেরণায় মানুষ নানা সমাজকর্ম বা লোকাশ্রয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া মানুষের মঙ্গলসাধন করে। মানুষের মঙ্গলসাধনই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। যে মানুষের এই কল্যাণাদর্শ নাই, সে মানুষ ক্ষুদ্রচেতা। পুষ্পের যেমন আত্মমুখ জীবন নাই, মানুষের তেমনি আত্মমগ্ন জীবনও পূর্ণতা আনিতে পারে না। মানুষের পূর্ণতা নির্ভর করে এই সমাজকর্মের সাফল্যের উপর। মানুষ যদি মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ হয়, এবং সেই অনুযায়ী কর্ম করে, তবেই মানুষের জীবনের চরিতার্থতা।

৯। যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

সামাজিক নীতি-নিয়ম মানুষে-মানুষে বিভেদের প্রাচীর তুলিয়াছে। এই বিভেদের ফলে একদল মানুষ নিম্নগামী হইয়াছে, আর একদল মানুষ উচ্চমার্গী হইয়াছে। উচ্চমার্গী মানুষ নিম্নকোটির মানুষকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে, অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু অস্পৃশ্য বলিয়া যাহাকে দূরে সরাইয়া রাখা হয়, পতিত বলিয়া যাহাদের অবহেলা করা হয়, তাহারা ইহার প্রতিশোধ লয়। তাহারা তাহাদের সামাজিক শক্তির দ্বারা সমগ্র সমাজকে অধঃপাতিত করে।

জাতি হিসাবে আমাদের দেশকে অগ্রগতির পথে যাইতে হইলে অস্পৃশ্যতার বাধা দূর করা উচিত। মানুষ আভিজাত্য-গর্বে গর্বিত হইয়া যখন মানুষকে হেয় করে, তখন মানবতার অপমান হয়। মানুষের দেবতা মানুষের অপমানে অভিশাপ দেয়। ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রথা অনুযায়ী জাতিভেদ একটি অলঙ্ঘ্য সামাজিক ব্যাপার হইয়া দেখা দিয়াছে। জাতিভেদের বিষবাষ্পে সমাজ ও দেশ বিপর্যস্ত হইয়া যায়। ভেদবুদ্ধির কলুষ সমাজে নিত্য-অশান্তি সৃষ্টি করে। ইহার দ্বারা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখে, কুলীন-সম্ভ্রান্ত সমাজের পার্শ্বে হরিজন-সম্প্রদায় অন্ধকারে দিন কাটায়। ভারতবর্ষের অগ্রগতির পক্ষে এই অন্ধকারবাসী মানুষ অভিশাপের ন্যায় কাজ করে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ দিয়া যাহাদের দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহারা এই অপমান নীরবে সহ্য করে বটে, কিন্তু একদিন এই পুঞ্জিত অপমান সমাজের সুস্থ অংশকে অসুস্থ করিয়া তোলে। যাহাদের পশ্চাতে ফেলা যায়, তাহারাই অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দেখা দেয়। এই মনুষ্যনীতির শাসনদণ্ড অমোঘ মানবতার কোন বিচ্যুতিকেই সহ্য করিতে পারে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন সমগ্র সমাজকেই করিতে হয়। মানুষে-মানুষে বিভেদের শিক্ষা ইতিহাসে জলন্ত ভাষায় লেখা হয়। অন্যকে ছোট করিয়া কেহ কোনদিন বড় হইতে পারে না। সকলে মিলিয়া বড় হইতে পারিলেই সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হয়। ইহার কারণ প্রত্যেকটি বস্তু অখণ্ড-সূত্রে যোগবদ্ধ। সমাজের এক অংশের অন্ধকার অন্যাংশকেও গ্রাস করে। ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা।

১০। বনে কেবল উদ্ভিদ গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্য-সমাজেই গঠিত হয়।

পরিবেশ সব কিছুব নিয়ন্তা। পরিবেশ অনুযায়ী কেবল মানুষই গড়িয়া ওঠে না, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ সবই গডিযা ওঠে। মানুষের জন্য চাই সমাজ, উদ্ভিদের জন্য চাই অরণ্য-সমাজ। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি গডিয়া ওঠে। ইহাই পবিবেশ-নীতি।

মানুষের উপর সামাজিক প্রভাব অলঙ্ঘনীয় বস্তু। সামাজিক-পরিবেশেই মানুষ বর্ধিত হয়, প্রতিপালিত হয। সমাজের কাছ হইতে মানুষ তাহার সামাজিক বোধ ও বুদ্ধি অর্জন করে। পারিবারিক সূত্র হইতে যেমন মানুষ তাহার প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষা লাভ কবে, মানবশিশুব বিবর্ধনের পক্ষে যেমন মাতাপিতা ও পরিজনের স্নেহপ্রীতিব প্রয়োজন হয, তেমনি সমাজেব অন্যান্য স্বজন-বন্ধুরও প্রয়োজন হয়। মানুষ তাহার বোধ বুদ্ধি বিচাব ও মূল্যায়ণ সমাজ হইতেই লাভ করে। এই জন্য সমাজের পরিবেশ মানব শিশুর পক্ষে প্রয়োজন। সামাজিক রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, প্রথা ও শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান মানুষ সমাজ হইতেই আহরণ কবে। মানব-সমাজ হইতেই মানুষ মনুষ্যত্বের শিক্ষা গ্রহণ করে। পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গডিতে গেলে যেমন সামাজিক নীতি-নিয়ম বা আদবকায়দাব প্রয়োজন হয়, তেমনি মানসিক মূল্যবোধেবও প্রয়োজন হয়। এইজন্য সামাজিক ও মানবিক পরিবেশ না থাকিলে মানবশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। একটি উদ্ভিদেব পক্ষে যেমন অরণ্যেব প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়, তেমনি মানুষের পক্ষেও সামাজিক পরিবেশেব প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদ যেমন মাটি হইতে রস আহরণ করে, বায়ু হইতে প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করে, এবং যথানিয়মে প্রাকৃতিক-নীতিতেই পরিবর্ধিত হয়, মানুষও সেইরূপ মানব-সমাজের পরিবেশ হইতে তাহার প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। মানুষের পক্ষে আরণ্য-পরিবেশ তাই প্রতিকূল পরিবেশ। কারণ মাটির রস বা মুক্ত বায়ুর যত প্রয়োজনই থাক না কেন, মানুষের মানসিকতা ও বিবেক বুদ্ধির পক্ষে তাহা মূল্যহীন। পরিবেশের মূল্য মানবজীবনে অসীম। পরিবেশকে বাদ দিয়া কোন কিছুরই বিকাশ কল্পনা করা যায় না। অনুরূপ পরিবেশই অনুরূপ ব্যক্তি বা বিষয়কে গড়িয়া তোলে। এইজন্য পরিবেশ জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

১১। মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা
আত্মার মহত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ দেখা যায়। ভগবানেই আদর্শ রূপকল্পনা, মানুষ তাহার ছায়ামাত্র। শিবই পরম বস্তু, জীবই শিবের সৃষ্টি। শিব সিন্ধু, জীব বিন্দু। সিন্ধুতে বিন্দুদর্শনের মধ্যে জীবাত্মায় পরমাত্মার ছায়া প্রতিফলিত হয়। মানুষের মধ্যেই ভগবানের দৈবী প্রকাশ সম্ভব হয়। ঈশ্বরের অনুকরণে মানুষের মাহাত্ম্য সৃষ্টি হয়। তাই মানুষের যা কিছু মহত্ব, যা কিছু মাহাত্ম্য, সবই ঈশ্বরের অশেষ গুণের প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়।

ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ। ঈশ্বর তাঁহার নিজের প্রয়োজনেই জীবজগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবের মধ্যে ঈশ্বরের শাশ্বত লীলার প্রকাশ দেখা যায়। জীবের লীলামাধুরী আসলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। ভগবানের আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র তাই নিখিল জীবজগৎ। মানুষের মধ্যে যাহা কিছু গুণাবলী দেখা যায় তাহা ঈশ্বরের অনন্ত গুণের অভিপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। কৃতজ্ঞ মানুষ সেকথা শতমুখে বলিয়া শেষ করিতে পারে না। মানুষের দেবতার প্রতি ভক্তি আসলে এই কৃতজ্ঞ স্বীকৃতির নানামুখী প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। মানুষের মনুষ্যত্বে ঈশ্বরের রূপাদর্শের ছায়া ভাসিয়া ওঠে। মানুষের আত্মিক মহত্বে ঈশ্বরের মহিমাই পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। ভগবানের অপার কৃপা ছাড়া মানুষ এই মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারিত না। ভগবানের অশেষ দয়া ছাড়া মানুষ আত্মিক মহত্ব অর্জন করিতে পারিত না। মানুষের সমস্ত কীর্তি ও সাফল্যের জন্য তাহার নিজের কোন দায়িত্ব নাই। সবই ঈশ্বরের প্রেরণা ও দয়া। ইহার প্রধান কারণ এই যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। মানুষ নিজে অকর্তা—তাহার সর্ববিধ কার্যাবলীতে পরমেশ্বরের প্রকাশ দেখাই সত্যদর্শন।

১২। 'কে লইবে মোর কার্য?' কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল 'স্বামী।
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

অনেক সময় দেখা যায়, সামান্য মানুষ তাহার সামান্য ক্ষমতা

অসাধ্যসাধন করে। আপাতদৃষ্টিতে যাহা ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, তাহার মধ্যেই অনন্ত শক্তি লুক্কায়িত থাকে। এই অন্তর্সম্ভব শক্তি দ্বারা অনেক সময় অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠে। সামান্য প্রদীপশিখার উপরও বৃহৎ দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রাথমিক দৃষ্টিতে মনে হয়, ইহা অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু অন্তরঙ্গ শক্তির প্রকাশে দেখা যায় এই অসম্ভবও সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

পৃথিবীতে অনেক সময় দেখা যায় সাধারণ মানুষ প্রয়োজনে অশেষ শক্তিধর হইয়া উঠে। প্রকৃতির জগতেও বিরাট বিরাট শক্তিকেন্দ্র আছে—বিরাট পর্বত, বিরাট সমুদ্র, অসীম আকাশ। কিন্তু সূর্যের অমিত দীপ্তির ধারা বহন করিবার ক্ষমতা এক সামান্য দীপশিখার মধ্যে দেখা যায়। জগতের অনেক পুণ্যকর্মে রথী-মহারথীদের অবদান যখন কার্যকরী হয় না, তখন অনেক অকিঞ্চন-তুচ্ছ মানুষ আশ্চর্য ঘটনা সম্পাদন করিতে পারেন। লোকশ্রেয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া অনেক সাধারণ মানুষ সমাজ ও জীবনের মঙ্গলময় কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। দিনের সূর্য সমগ্র আকাশে কিরণ বিচ্ছুরিত করিয়া অবশেষে যখন বিদায় গ্রহণ করে, তখন বিশ্বসংসার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। এই সময় আলোক-বিন্দু বিতরণের দায়িত্ব পড়ে সামান্য প্রদীপশিখার উপর। নগণ্যের মহিমা প্রয়োজনের সময় কত বিরাট হইয়া দেখা দেয়, এই ঘটনা তাহার প্রমাণ। দীন মানুষ, সাধারণ মানুষও এমনভাবে অনেক সময় দীপ্তি বিকিরণ করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করেন। তখন মনে হয়, এই নিয়ম কেবল প্রকৃতি জগতের পক্ষে সত্য নয়, মানব জগতের পক্ষেও সত্য।

১৩। পেঁচা রাষ্ট্র করে দেয় পেলে কোন ছুতা
জান না আমার সংগে পূর্বের শত্রুতা?

নিকৃষ্ট চিরকালই উৎকৃষ্টকে সমালোচনা করে। নিন্দা করার অধিকার এবং যোগ্যতা একমাত্র নিকৃষ্টেরই থাকে। অধম আসিয়া উত্তমের বিচার করিতে চায়। উত্তমকে হেয় না করিতে পারিলে অধমের কোন শান্তি বা স্বস্তি নাই। কারণ নিকৃষ্ট বা অধম সব সময় ঈর্ষা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কাজ করে। মূর্খতার বশে অধম নিজেকে উত্তম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে। মূঢ় আত্মপ্রসাদ এইভাবে মানুষের সমাজেও অনেক বিভ্রান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করে।

রাত্রের অন্ধকারে পেচক অজ্ঞাতবাস করে। পেচকের সঙ্গে অন্ধকারের

সম্পর্কই বেশী। সে প্রকৃতির কুৎসিত ও কদর্য দিকের সহিত যুক্ত। পেচকের আর্তনাদ তাই মানুষের শ্রবণের পক্ষে অত্যাচার হইয়া দেখা দেয়। সেই পেচক কল্পনা করে দিনের আলোকবন্যাকে। দিনপতির সঙ্গে মনে মনে সে কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা সে প্রমাণ করিতে চায় সেও পূর্বের মত অমিততেজা ও বিরাট শক্তি। এইভাবে নীচমনা উচ্চমনাকে আঘাত করে। কিন্তু নীচাশয়ের পক্ষে উচ্চকোটির মানুষকে স্পর্শ করাও সাধ্যাতীত। অথচ কাল্পনিক শত্রুতা বা সমালোচনা দ্বারা সে সমাজকে কলুষিত করে, আত্মশক্তি ক্ষয় করে। হীনমনার কদর্য মনোবৃত্তি এইভাবে সমাজ ও সংসারে কলুষ-বাষ্প সৃষ্টি করে। ইহাতে বিরাটের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রের অনেক ক্ষতি হয়। বিরাট বিরাটত্ব লইয়া অম্লান থাকে, ক্ষুদ্র তাহার ক্ষুদ্রত্ব লইয়া বিবরবাসী হইয়া থাকে।

১৪। অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকিলেও অনায়াসেই পরিষ্কার হয়।

শক্তি কখনও আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে না। শক্তি মাত্রই স্বয়ম্প্রকাশ। হয়ত কখনও কখনও ঘটনাচক্রে শক্তির প্রকাশ বিলম্বিত হয়, অথবা বিঘ্নিত হয়। কিন্তু শক্তি মানেই আত্মপ্রকাশশীল। তাহার নিজস্ব ধর্ম কোন না কোন ভাবেই দেখা দিতে বাধ্য। প্রতিটি বস্তুই নিজস্ব গুণসম্পন্ন। অগ্নিও প্রকৃতি-জগতে নিজস্ব ধর্ম-বিশিষ্ট বস্তু। অগ্নির যেমন দাহিকশক্তি আছে, তেমনি দীপ্তিগুণও আছে। ইহা একদিকে যেমন পাচক, অন্যদিকে তেমনি আলোক। একদিকে ইহা যেমন যাবতীয় বস্তুকে দাহ করে, অন্যদিকে ইহা তাপ ও দীপ্তি বিকিরণ করে।

প্রকৃতি জগতে অগ্নির প্রকাশ সম্পর্কে যেমন এই কথা সত্য, তেমনি মানবজগতেও মানুষের প্রতিভা সম্পর্কে এই কথা চিরসত্য। মানুষের প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য। কখনও কখনও দেখা যায়, ঘটনাচক্রে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনেক বাধা আসিয়া প্রতিভাকে সাময়িক কালের জন্য আবৃত করিয়া রাখিতে পারে। কিন্তু চিরকালের জন্য তাহাতে প্রতিরোধ করিতে পারে না। প্রতিভার দীপ্তি স্বয়ম্প্রভ—একদিন না একদিন তাহার প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। দুর্ভাগ্য অনেক সময় অনেক প্রতিভাকে প্রকাশের সৌভাগ্য হইতে রক্ষিত রাখে। হয়ত দীর্ঘকালীন প্রচ্ছন্নতায় প্রতিভা গোপন থাকে।

কিন্তু কালান্তরে বা ভাবান্তরে এই প্রতিভার আত্মপ্রকাশ বা প্রচার হইতে বাধ্য। কারণ প্রতিভার ধর্মই নিজেকে প্রকাশিত করা। এই ধর্ম হইতে ইহা কখনও ভ্রষ্ট হইতে পারে না। প্রকৃতির জগতে যে নিয়ম স্বাভাবিক, সে নিয়মের কখনও ব্যত্যয় ঘটে না। এই প্রাকৃতিক সত্যকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

১৫। মানী ব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য।

মৃত্যুর চিত্র জীবিত মানুষের পক্ষে অজানা বস্তু। কিন্তু মৃত্যুর কল্পনা জীবিত মানুষের পক্ষে চিরসত্য। মৃত্যুর সঙ্গে ভয়াবহ যন্ত্রণা, দৈহিক কষ্ট ও মর্ত্যবন্ধনক্ষয় জড়িত থাকে। সেইজন্যই মৃত্যু ভয়ঙ্কর। মৃত্যুকে মানুষ পরিহার করে, জীবনকে ভালবাসে। কিন্তু কখনও কখনও জীবনেও মৃত্যুর আস্বাদ পাওয়া যায়। জীবিত অবস্থায় যন্ত্রণাভোগ এইরূপ মৃত্যুতুল্য একটি ব্যাপার। তখন এই অবস্থাকে জীবন্মৃতের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এইরকম অবস্থার সঙ্গে সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানহানির তুলনা করা হয়। সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানহানি মৃত্যুযন্ত্রণার সামিল।

যে ব্যক্তি মান-সম্মান পান, তিনি অর্থ-বৈভব অপেক্ষাও বড় বস্তু লাভ করেন। এজগতে মানুষ মানের কাঙাল। এই মান সকলকে অর্পণ করা যায় না। ধনীকে লোকে হয়ত প্রয়োজনে ডাকে, ধনীর দুয়ারে হয়ত অবস্থাবিপাকে গিয়ে অনেকে হাজির হয়; কিন্তু গুণীর কাছে মানুষের চিরকালীন শ্রদ্ধা অর্পিত হয়। গুণীই সমাজের চিরস্থায়ী সম্পদ। "বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।" এ কথা চিরসত্য। বিদ্বান বা গুণীর পূজা দেশে-দেশে, কালে-কালে চিরন্তন মহিমা অর্জন করিয়া থাকে। এ বিদ্বানের কাছে তাই অর্থ বা বস্তুজগতের মূল্যই বড় নয়, মহিমাই বড়। মহিমাই বিদ্বানের সম্পদ। তাই যদি কোন কারণে এই মহিমা অপহৃত হয় বা অপনীত হয়, তাহা হইলে তাহা মৃত্যুর তুলনীয় এক যন্ত্রণা। এইজন্য বলা হয় সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানহানি সংসারে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা। মানের দাম প্রাণ অপেক্ষাও বেশী। তাই মানের হানি যদি কোথাও ঘটে, তবে তাহা প্রাণহানির তুল্য হইয়া দেখা দেয়।

১৬। এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

মানুষের লোভ সীমাহীন, আকাঙ্ক্ষাও অন্তহীন। এই অশ্রান্ত তৃষ্ণা

মানুষকে গভীরতর অতৃপ্তির মধ্যে লইয়া যায়। মানুষ যদি প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইত, তাহা হইলে জগতে কোন অশান্তি থাকিত না। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে যত যুদ্ধ বা বিরোধ, সব কিছুর মূলে থাকে অপরিমিত লোভ। লোভ যখন সীমা ছাড়াইয়া যায় তখন দেশে দেশে যুদ্ধ হয়, মানুষে মানুষে বিরোধ আসে। ইহাই জগতের নিয়ম।

রাজার বিত্ত-বৈভবের শেষ নাই। রাজার অভাববোধেরও কোন শেষ নাই। রাজার আকাঙ্ক্ষারও কোন শেষ নাই। তাই অন্তহীন বাসনার প্ররোচনায় রাজা প্রজার সম্পদ লুণ্ঠন করে। দরিদ্রকে শোষণ করে নির্মম ভাবে। রাজার প্রচুর আছে, দরিদ্র প্রজা নিঃস্ব। কিন্তু রাজা দরিদ্র প্রজাকে শোষণ করিতে দ্বিধা করে না। এই ব্যাপারে তাহার অন্তর নিরঙ্কুশ। উদগ্র আকাঙ্ক্ষা লোলুপ হস্তে সব কিছু গ্রাস করিতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষা অন্যায় ও অপবিত্র। তবু এই লালসা কাঙালকে পর্যন্ত ছাড়িয়া দেয় না। এই অন্যায় লোভ তাহাকে অতলে তলাইয়া দেয়, তবু এই লোভের হাত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। ইহা মানবমনের একটি কুপ্রবৃত্তি। এই কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যে কোন অন্যায় করিতে পারে। রাজা প্রজার রক্ষক, কিন্তু কোন নীতিবোধের দ্বারা তাড়িত না হইয়া রাজা প্রজার সত্তাকে গ্রাস করে। এত বড় অন্যায় নিষ্পন্ন হয় কেবল প্রবলের শোষণ-লালসার প্ররোচনায়। ইহা এক দুর্ভাগ্যজনক সত্য। কারণ যাহার প্রচুর আছে, তাহার প্রচুর অতৃপ্তিও আছে। এই অতৃপ্তি মানুষের সংসারে সর্বনাশ ডাকিয়া আনে।

১৭। ঊর্ধ্ব শির যদি তুমি কুল-মান-ধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে।

মানুষকে কোন অবস্থাতেই অবহেলা করা উচিত নয়। মানুষে মানুষে ভেদ হইতে বিদ্বেষ জন্ম লয়। বিদ্বেষ হইতে ব্যবধান জাগে। ইহা মানব-ধর্মের বিরোধী। এ-পৃথিবীতে মানুষের অহংকারের বিষয় অনেক। কুলগর্ব, ধনগর্ব, মানগর্বের প্রেরণায় মানুষ যখন সমাজে বিশিষ্ট হয়, তখন মানুষ হয়ত অহংকারে আত্মবিস্মৃত হয়। এই আত্মবিস্মৃতির ফলে মানুষ অন্যকে ছোট করে, অন্যকে অপমান করে।

যখন মানুষ জন্মায় তখন কোন ভেদাভেদ থাকে না। বর্ণভেদ, সমাজ-বৈষম্য, জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ কোন কিছুই মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না।

ছোট বড় ভেদ কিছুই থাকে না। কিন্তু সমাজের মধ্যে মানুষ বড হয়। এই বিকাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে সামাজিক গুণ বা ত্রুটি দেখা দেয়। সামাজিক শ্রেণীভেদ বা জাতিভেদ আসিযা মানবমনকে কলুষিত করে, মনুষ্যত্বকে অপমান করে। কিন্তু অহংকাব পাপ। দর্পের উচ্চশির হতমান হইতে বিলম্ব হয় না। মানুষেব ধনজন জীবনযৌবন সবই ক্ষণিকেব। যে কোন আকস্মিক আঘাতেই এই সব অভিমান চূর্ণ হইয়া যাইতে পাবে। মানুষে-মানুষে ভেদও কৃত্রিম। এই ভেদ মানুষকে ছোট কবে, মনুষ্যত্বকে অপমানিত কবে। ইহা সমাজের পক্ষে সর্বনাশা এক প্রভাব। আকাশস্পর্শী বনস্পতিও কালবৈশাখীব আঘাতে ভূপতিত হয। তাই কৃত্রিম গর্বে স্ফীত হইয়া কাহাকেও ছোট কবা পাপ। কুলমান ধনেব গর্বে আত্ম'বস্মৃত হইয়া মানুষেব মনুষ্যত্বকে অপমান কবা এক বিবাট অন্যায। অহংকাব মানুষের ধ্বংসেব মূল। তাই আকস্মিক কোন উন্নতি যেন মানুষকে বিভ্রান্ত না করে, পথভ্রষ্ট না করে।

১৮। "অদৃষ্টের শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম আমি
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি॥"

মানুষের সমস্ত কর্মশক্তি বা কীর্তিকাহিনীর সাফল্য বা ব্যর্থতার পশ্চাতে থাকে অদৃষ্ট। এই অদৃষ্ট মানুষ দেখিতে পায় না, কিন্তু এই অদৃষ্টকে অতিক্রম কেহ করিতে পারে না। মানুষের অদৃষ্ট দুর্লঙ্ঘ্য ও অনিবার্য। মানুষ সমস্ত ফলাফলের পশ্চাতেই প্রাক্তনেব প্রভাব দেখে। প্রাক্তনকে ভারতবাসী বড় বেশী স্বীকার করে। প্রাক্তন অর্থে পূর্বজন্মেব কর্মফল। মানুষেব জীবনের ক র্মাকর্ম তাহার মধ্যেই শেষ হয় না, উত্তরপুরুষেব মধ্যেও তাহা ছড়াইয়া যায়। ইহাই মানুষের নিয়তি। কালে-কালে এই নিয়তির শক্তি প্রবাহিত হয়। পুরুষ-পরম্পরার মধ্য দিয়া ইহা কার্যকবী হয় বলিয়া ইহার নাম অদৃষ্ট।

মানুষের জীবনে সংগ্রাম অন্তহীন। ইহাতে সফলতাও থাকে, ব্যর্থতাও থাকে। আমরা ইহার ব্যাখ্যা কিভাবে করিব ভাবিয়া পাই না। সবই রহস্যময়ী নিয়তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হয়, যে ইহার কার্যকারণ-সম্বন্ধ নিহিত আছে। এই ব্যক্তির জীবনে যে

প্রচেষ্টা আন্তরিক, তাহা যদি ব্যর্থ হয়, তবে বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তির পশ্চাতে যাহারা ছিল, তাহাদের কর্মের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল। একজন ব্যক্তির গুণাগুণ বা ফলাফল নির্ভর করে তাহার যুগ ও পরিবেশের উপর। যুগ ও পরিবেশটি কি রকম, তাহার বিচার করিলে ব্যক্তির সাধনার স্বরূপ ধরা পড়ে। নিখিল যুগ বা পরিবেশকে অগ্রাহ্য করা কোন শক্তিমান ব্যক্তির পক্ষেই অসম্ভব। তাই এই যুগের সীমার মধ্যেই অদৃষ্টের সীমাকে ধরিয়া রাখা উচিত। এই কার্যকারণ-পরম্পরাই মানুষের "পশ্চাতের আমি"; ইহাই মানুষের প্রাক্তন, ইহার প্রভাব কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ইহার শক্তি অমোঘ, এই অনিবার্য নিয়তির কাছে মানুষ বড় অসহায়। মানুষের এই অসহায়তায় আপাতত কোন ব্যাখ্যা না থাকিতে পারে, আপাত দৃষ্টিতে ইহা অদৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ইহা আসলে কর্মাকর্মের কার্যকারণশক্তির প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সমগ্র-ভাবে বিচার করিলে এই অদৃষ্টকে চিনিতে পারা যায়। ইহার প্রভাবকে মানুষ অস্বীকার করিতে পারে না, ইহাই মনুষ্যের প্রধানতম দুর্দৈব।

১৯। নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে॥

সব মানুষই সুখের সন্ধানী। কিন্তু সুখ সে কোথাও খুঁজিয়া পায় না। যতই ভাবে সে সুখের নিকটবর্তী হইয়াছে, ততই সুখের মরীচিকা মানুষকে তাড়িত করে। সুখের স্বপ্নে মানুষ দিন কাটায়, কিন্তু সুখ মানুষকে ছলনা করে। তখন মানুষ ভাবে সে নিজেই দুঃখী, সুখ অন্যত্র অধিষ্ঠিত। এইভাবে নদীর এক তটরেখা অন্য তটের দিকে সুখের অবস্থিতি কল্পনা করে। হয়ত সুখ শুধুই কল্পনা, শুধুই স্বপ্ন বলিয়া মানুষের কাছে প্রতীয়মান হয়।

মানুষের দুই জগৎ—স্বপ্নের জগৎ ও বাস্তব জগৎ। স্বপ্নের জগতে মানুষের কল্পনা পক্ষ বিস্তার করিয়া ছোটে, বাস্তব জগতে তাহা আহত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। মানুষ কল্পনায় যাহা পায়, বাস্তবে তাহা পায় না। তাই বাস্তবের অপূর্ণতাকে মানুষ কল্পনায় খুঁজিয়া পায়। নদীর এপার হইতেছে বাস্তব, ওপার হইতেছে কল্পনা। বাস্তবের আঘাতে সব কিছুই চূর্ণ-বিচূর্ণ

হইয়া যায়। বাস্তবের কাছে সবই অসম্পূর্ণ মনে হয়। কিন্তু কল্পনার দৃষ্টিতে কোন কিছুই অসম্পূর্ণ নয়। মানুষের সমস্ত প্রয়োজনের পশ্চাতে আছে এই দ্বন্দ্ব, এই ছলনা। মানুষের জীবনভরা সুখ-দুঃখের সংগ্রামে ইহাই নিয়তি। বাস্তবে যাহা ব্যর্থ হয়, কল্পনায় তাহা সার্থক হইয়া উঠে। সুতরাং মানুষ সুখের কল্পনা করে, সুখলাভের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস করে, কিন্তু শেষে দেখা যায় আশার ছলনায় তাহার দিন কাটিয়াছে।

২০। মুকুট পরা শক্ত : কিন্তু মুকুটত্যাগ আরও কঠিন।

অনেক দুঃখকষ্ট, অনেক প্রয়াস ও সাধনার ফলে মানুষ প্রতিষ্ঠা পায়। রাজা হইবার জন্য অনেক ঝড়জল মানুষকে সহ্য করিতে হয়, কিন্তু সেই রাজ্যত্যাগ আরো দুরূহ কৃত্য। সংসারে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ দুরূহ, প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠার পরিহার আরো কঠিন।

রাজা হইতে গেলে মানুষকে অনেক কষ্ট করিতে হয়। অনেক চক্রান্ত ভেদ করিয়া তবে রাজসিংহাসনে উঠিতে হয়। অনেক রক্তপাত, অনেক দুঃখকষ্টের শেষে রাজত্বলাভ করা যায়। কিন্তু রাজত্বলাভ-সুখ নিষ্কণ্টক নয়। ইহা কণ্টক-মুকুট। এই কণ্টক-মুকুট পরিধান করিয়া সুখ ও দুঃখ দুই-ই সমানভাবে অর্জিত হয়। রাজ্যলাভের মধ্যে যে পরম ভোগের আনন্দ আছে, ত্যাগের মধ্যে তাহা অপেক্ষা মহিমা বেশী। ভোগ অপেক্ষা ত্যাগ কঠিন। তাই রাজর্ষি হওয়া রাজার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় অগ্নিপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ সার্থক হইতে পারে না।

২১। সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার ;
অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাপার।

মাতৃস্নেহ এ-পৃথিবীতে এক অনুপম সম্পদ। ধরনীর পাত্রে ইহা এক অসামান্য অমৃত-আয়োজন। এই অমৃতস্বাদে মানুষ অমর হয়। মাতৃস্নেহের কোন সীমানির্দেশ করা যায় না। সব কিছুরই শেষ আছে, কিন্তু মাতৃস্নেহের শেষ নাই। মাতৃস্নেহ সমুদ্রাধিক গভীর। ইহার কোন পরিমাপ করিতে যাওয়া বৃথা।

শৈশবে মাতা না থাকিলে মানবশিশু বাঁচিতে পারে না। অসহায় মানবশিশুকে মাতা লালন-পালন করিয়া একটি পূর্ণ মানবে পরিণত করেন। বক্ষে স্থান দিয়া মাতা শিশুকে জগৎ সংসারের করাল গ্রাস হইতে মুক্তি

দিয়াছেন। মাতার পীযূষধারায় শিশু বিশ্বে বাঁচিবার আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। এই মাতৃস্নেহ কোন প্রতিদান আশা করে না। মাতার স্নেহ সত্যই অতুলনীয়। এই সংসারে মাতৃস্নেহ এক অপার্থিব বস্তু। যাহা কিছু অসীম ও অনন্ত তাহার সহিত আমরা সমুদ্রের তুলনা করি। সমুদ্র মানুষের আছে অসীমের উপমা। মাতৃস্নেহের সঙ্গে যদি কাহারও তুলনা করা যায়, তাহা সমুদ্র। কিন্তু সমুদ্রেরও শেষ আছে, সীমা আছে। কিন্তু মাতৃস্নেহের শেষ নাই। এইজন্য মাতৃস্নেহকে সমুদ্রাধিক গভীর বলা হয়। মাতৃস্নেহ অতলস্পর্শ। যে মাতা শিশুকে জীবনের আলোদান করেন, তাহার দানের কোন তুলনা নাই।

২২। জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?

মানবজীবন নশ্বর। এই পৃথিবীতে কেহই অমর নয়। মানুষের জন্ম যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি অনিবার্য সত্য। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর চিহ্ন ললাটে অংকিত থাকে। এই নিয়তির হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। জগতের সব পার্থিব বস্তুই এই জন্ম-মৃত্যুর নিয়তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। মানুষমাত্রই মরণশীল, সংসারে সব পার্থিব বস্তুই মরণশীল। এই সংসারে মানুষ ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত হয়। মানুষ সংসারলীলা সমাধা করিয়া আবার মৃত্যুলোকে পাড়ি দেয়। এইজন্য মানুষের প্রসঙ্গে স্থায়ী বা ধ্রুব বলিয়া কিছু নাই।

ক্ষণনির্ভর মানবজীবনকে নদীর সহিত তুলনা করা হয়। নদী ঊর্মিচপল ও অস্থির, জীবননদীও তেমনি তরঙ্গময় ও অস্থির। পদ্মপত্রে জলের মত ক্ষণস্থায়ী। জীবনের চঞ্চলতা ও অস্থিরতার সঙ্গে তাই নদীর তুলনা করা হয়। নদী যেমন সাগরের অভিমুখে ছুটিয়া যায়, জীবনও তেমনি মৃত্যুর মধ্যে লীন হয়। নদীর পরিণাম সাগর, জীবনের পরিণাম মৃত্যু। প্রকৃতির জগতে যাহা চিরসত্য, মানবজীবনের পক্ষেও তাহা চিরসত্য। প্রকৃতির নিয়ম হইতে মানবজীবনেরও রেহাই নাই। প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়মের প্রয়োগ এখানে করা হয়। মানুষের ক্ষণিক জীবনে স্থায়ী কোন কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না। পুষ্পের মত তারা সকালে ফুটিয়া, সন্ধ্যায় ঝরিয়া পড়ে। পুষ্পের

মতই সারাজীবন ক্ষণ-সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া শেষে ঝরিয়া পড়ে। এই অনিবার্য নিয়তিকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

২৩। শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির—
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

অকৃতজ্ঞতা পৃথিবীতে নিত্যসত্য। মূঢ় অহংকার মহৎ সত্যের অবমাননা করে। এই অভিজ্ঞতা মানুষের সংসারে অনিবার্য বস্তু। মানুষেব কৃতঘ্নতার শেষ নাই, অকৃতজ্ঞতারও অন্ত নাই। যে মানুষ যত বেশী পায়, সে মানুষ তত বেশী ঋণ স্বীকারের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে প্রতিদান দেয়। সংসারে মাতা-পিতা বা গুরু শিষ্য সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রেই এই একই নীতিব পুনরাবৃত্তি ঘটে।

দীঘির বুকে শৈবালের চিরকালীন আশ্রয়। দীঘির বুকে জন্মিয়া, দীঘির জলে তাহা পরিবর্ধিত হয়। যেখান হইতে জীবনের রস শৈবাল গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, সেইখানেই সে অকৃতজ্ঞতার প্রতিদান দেয়। শৈবালের মর্মাভ্যন্তরে একটি মূঢ় ধারণা এই যে সে আকাশের শিশির দীঘিকে উপহার দিতেছে। যে নিজেই ঋণী, সে অন্যকে ঋণী বলিয়া সোচ্চারে প্রচার করিতেছে। ইহা দম্ভোক্তি। যে সামান্য শৈবাল দীঘির জলের বুকে জীবনের আয়ু বাড়াইয়া তোলে, তাহারও ধারণা যে তাহার কিছু দিবার মত ধন আছে। আকাশের শিশির সর্বগামী। প্রকৃতির দানের কোন বাছবিচার নাই। আকাশের শিশির বিন্দু যেমন দীঘির বুকে পড়ে তেমনি শৈবালের মাথায় জমিয়া থাকে। সহজেই শৈবালশীর্ষ হইতে দীঘির বুকে গড়াইয়া পড়ে। কিন্তু এই সহজ ঘটনাকে মূঢ়তার অহংকারে মানুষ একটা বিরাট অবদান বলিয়া মনে করে। ইহা সুস্থ মানসিকতার চিহ্ন নয়। তেমনি অহংকারে আত্মবিস্মৃত মানুষ ভাবে যে সমাজকে সে যাহা দিয়াছে, তাহা মহৎ এবং বিরাট। এইটুকু আত্মবোধ তাহার নাই যাহাতে মনে হয় যে ইহা অবদান নয়। ইহা স্বাভাবিকভাবেই সমাজের প্রাপ্য। এই হাস্যকর অহংকার মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সমাজের কাছে, পৃথিবীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা অপেক্ষা সে নিজে মন করে তাহার প্রতি সমাজের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এই অকৃতজ্ঞতা মানুষের অভিজ্ঞতায় নিত্যসত্য। মানুষ সমাজের কাছ হইতে যাহা পায়, তাহার দ্বারা মানুষের ঋণের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়।

কিন্তু এই সহজ বোধটুকু মানুষের থাকে না যে ইহা প্রকৃতপক্ষে অমোঘ সত্য। ইহার যথাযোগ্য স্বীকৃতিই মানুষের সুস্থ চেতনার ফল।

২৪। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হ'তে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

মানুষ স্বার্থের দ্বারাই আবদ্ধ। মানুষের সর্বসময়ের চিন্তা এই যে সে তাহার নিজের দায় ও দাবী মিটাইবার জন্য সদাব্যাকুল। জৈব প্রাণের ধর্ম আত্মরক্ষা। আত্মরক্ষার অর্থই স্বার্থরক্ষা। প্রকৃতির প্রেরণায় প্রতিটি মানুষ নিজেকে বাঁচাইবার কাজে ব্যস্ত। সংসার জীবন-সংগ্রাম। এই জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামশীল। ইহা বাঁচিবার তাগিদ, পৃথিবীর বুকে টিকিয়া থাকিবার জৈব প্রয়াস ও প্রস্তুতি। কিন্তু এই জৈব প্রয়োজন অপেক্ষাও মানুষের বৃহত্তর প্রয়োজন আছে। সেই বৃহত্তর প্রয়োজন সমাজ ও সংসারের প্রতি দায়িত্বের দ্বারা নির্ণীত হয়। যে মানুষ কেবল আত্মমুখ; সে মানুষ সীমিত। যে মানুষ সংসারের প্রতি কর্তব্যশীল, সেই মানুষই সার্থক মানুষ। বৃহত্তব কর্তব্যেই মানুষের চরিতার্থতা। স্বার্থমগ্ন মানুষ বাঁচার সুখ বা আনন্দ কিছুই ভোগ করিতে পারে না। কারণ মানুষ যদি বৃহত্তর স্বার্থে নিবেদিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক।

মানুষের জীবনে দুইটি দিক আছে একটি তাহার নিজের দিক, আর একটি বিশ্বের দিক। নিজের দিকে যখন মানুষ তাকায়, তখন মানুষ হয় স্বার্থমগ্ন, বিশ্বের দিকে যখন সে তাকায়, তখন মানুষ অর্থবান। জীবনের তাৎপর্যই এই কর্তব্যচেতনা ও সমগ্র চেতনা। প্রতিটি মানুষ সমাজে একা নয়। সমাজ অসংখ্য মানুষের দ্বারা যুক্ত। অসংখ্য মানুষের স্বার্থাস্বার্থে মানুষ ব্যাপৃত ও নির্ভরশীল। একজনের সাহায্য ছাড়া অন্যে কখনও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজের মধ্যে এই পারস্পরিকতা না থাকিলে সমাজ সার্থক হইয়া ওঠে না। এইজন্য প্রতিটি ব্যক্তির সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকা উচিত। কারণ সমাজের সামগ্রিক অবদানে ব্যক্তি সার্থক হইয়া উঠে। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে বিশ্বের চেতনায় উপনীত করিতে না পারিলে মানুষের চরিতার্থতা হয় না। মানুষ ত' নিঃসঙ্গ একাকী অবস্থায় দিন কাটাইতে পারে না। অন্যকে তাহার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই অপরিহার্য প্রয়োজনকে সার্থক করিতে হইলে দান-প্রতিদান দুইই প্রয়োজন হয়। অন্যকে প্রেম

কর্তব্য দান করিলেই, প্রতিদানের সম্ভাবনা থাকে। ইহাতেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা ও চরিতার্থতা। স্বার্থমগ্ন হইয়া যে মানুষ বাঁচে সে মানুষ এই বৃহত্তর সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে না। বাঁচার আনন্দ এই সমগ্রানুভূতি বা নিখিল বিশ্বের সঙ্গে মর্মসংযোগের উপর নির্ভর করে। এই মর্মসংযোগ না হইলে জীবন ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

২৫। কারে যে কখন হয় প্রয়োজন বলিতে কে তাহা পারে?
অবহেলা ঘৃণা করি বলো তবে কারে।

পৃথিবীতে কাহাকেও অবহেলা করিতে নাই। অবহেলার দ্বারা, অনাদর দ্বারা মানুষকে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া সহজ। ঘৃণা দ্বারা মানুষকে কাছে টানা যায় না। তাই সমাজ-জীবনের পক্ষে ইহা বর্জনীয় বস্তু। প্রেম ও স্নেহ-মমতা দ্বারা মানুষকে কাছে টানা যায় মানুষের মানুষকে প্রয়োজন হয় সব সময়। কখন যে কাহাকে মানুষের প্রয়োজন হয়, তাহা বলা যায় না। সমাজ-জীবনের যৌথ-সম্বন্ধে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। এই জন্য কাহাকেও অবহেলা করা উচিত নয়। অবহেলা কেবল মানুষকে দূরে সরাইয়া দেয়। কাছে টানিতে পারে না। এইজন্য মানবপ্রীতির স্নিগ্ধ বন্ধনে মানুষকে বাঁধাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সমাজজীবন অনেকের সমবায় ও সাহায্যে গঠিত হয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। যৌথ-চেতনা না থাকিলে এই সমবায় সম্ভব হয় না। প্রত্যেকের প্রত্যেককেই সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দিনে প্রয়োজন। মানুষের জীবন অনিশ্চিত। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্য সংসারে কাহাকেও অবহেলা করা উচিত নয়। কাহাকেও বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। বিদ্বেষদৃষ্টি মানুষের মধ্যে ব্যবধান লইয়া আসে। মানুষের মধ্যে দুস্তর ভেদ লইয়া আসে। সমাজে এই দুস্তর ভেদ অশেষ ক্ষতিসাধন করে। মানুষকে অবহেলা করা মানবতার অপমান। মানুষকে মানুষের সব সময়ই প্রয়োজন হইতে পারে। এইজন্য মানুষকে কখনও আঘাত দিতে নাই।

২৬। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না পৃথিবীকে বশ
করিয়া রাজা হইতে হয়।

রাজ্যলাভের জন্য প্রয়োজন হিংসা নয়, প্রেম। কারণ প্রকৃত

রাজত্ব বাহিরে নয়, ভিতরে। মানুষের অন্তরকে জয় করিতে না পারিলে রাজ্যলাভ সম্ভব হয় না। রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনলাভ হয়। ইহাই ইতিহাসের দৃষ্টান্ত। সিংহাসন লাভের জন্য কত রাজা কত রক্তপাত ঘটায়। রক্তের কলঙ্করেখা কিছুতেই মোছা যায় না। রক্তলেখার মধ্যে পৈশাচিক হিংসার চিহ্ন অংকিত থাকে। এইজন্য রাজার রাজত্বলাভ ইতিহাসে একটি রক্তকলঙ্কিত অধ্যায় সূচিত করে। অথচ এই রাজত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী স্থায়ী রাজত্ব হৃদয়ের রাজত্ব। হৃদয়কে জয় করিয়া সত্যকার রাজা হওয়া যায়। রাজ্যজয়ের মানচিত্রে দেশের পর দেশ যুক্ত হইলেও তাহা অসার ও অলীক হইয়া যায়, যদি না রাজা মানুষের হৃদয়কে জয় করিতে পারেন। প্রজাদের বশীভূত করিয়া মানুষের জন্য সত্যকার কল্যাণসাধন করিতে পারিলেই রাজার সাফল্য অর্জিত হয়। সেই রাজাই সার্থক রাজা যিনি প্রজাদের মনপ্রাণ জয় করিতে পারেন। লোককল্যাণে নিযুক্ত রাজাই শ্রেষ্ঠ রাজা। হিংসা নয়, প্রেমই রাজ্যজয়ের মূলমন্ত্র।

২৭। মিত্রত্ব সর্বত্রই সুলভ, মিত্রত্ব রক্ষা করাই কঠিন।

বন্ধুত্ব জীবনে পরম সম্পদ। সেই বন্ধুত্বকে লাভ করা যায় সহজে, কিন্তু এই বন্ধুত্বকে বাঁচাইয়া রাখা দুরূহ। কারণ বন্ধুত্বকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। পৃথিবীতে অনেক বস্তু সহজেই লাভ করা যায়। কিন্তু এই সহজলভ্য বস্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া রাখা যায় না। কারণ অর্জিত বস্তুকে রক্ষা করিতে হইলে মানুষকে প্রচুর পরিমাণে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। অনেক সাধনা ও সংযম দ্বারা বন্ধুত্বের ন্যায় সম্পদকে রক্ষা করিতে হয়। যাহা পাওয়া সহজ, তাহা হারাইয়া ফেলা আরো সহজ।

মনুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধুত্ব ঘটে কখনও কখনও আকস্মিক সূত্রে। হয়ত কোন স্থূল প্রয়োজন বা ঘটনাচক্রে একজনের সংগে দেখা হয়। এই পারস্পরিক দেখাসাক্ষাৎ মিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে প্রয়োজন সহমর্মিতা। কিন্তু প্রকৃত বন্ধুত্ব হৃদয়ের উপর নির্ভরশীল। হৃদয়ের দান-প্রতিদানেই প্রকৃত বন্ধুত্ব সার্থক হয়। প্রকৃত বন্ধুত্ব তাই প্রয়োজননির্ভর বা স্বার্থনির্ভর নয়। স্বার্থের বন্ধন ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃত বন্ধুত্ব এই ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কের ঊর্ধ্বে। সত্যকার বন্ধুত্বের জন্য প্রয়োজন স্বার্থত্যাগ। সুদিনে-দুর্দিনে যে বন্ধুকে পার্শ্বে পাওয়া যায়, সেই বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। স্বার্থপরতা দ্বারা এই প্রকৃত বন্ধুত্ব রক্ষা

করা যায় না। বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে হইলে এই স্বার্থহীনতার প্রয়োজন হয় ইহা এক দুঃসাধ্য ব্রত।

২৮। আশার আশ্বাসিনী শক্তির ইয়ত্তা নাই।

আশাই মানবজীবনের সম্বল। আশাব মত আশ্বাসেব শক্তি কাহাবও নাই। মানুষ যখন জীবন-সংগ্রামে হতাশ হইযা পডে, মানুষের সামনে যখন কিছুই প্রাপ্তি থাকে না, তখনই আশাব-সঞ্জীবনী শক্তি মানুষকে নতুন কবিযা বাঁচিতে সাহায্য কবে। যে শক্তি মানুষকে বাঁচিতে সাহায্য কবে, সেই শক্তিই সঞ্জীবনী শক্তি। আশা এইরূপ এক মহাশক্তি। মানুষেব জীবন সংগ্রাম-মুখব। সংগ্রামেব ক্ষেত্রে জয-পবাজয দুইই আছে। পবাজিত মানুষ দুর্ভাগ্যেব দ্বাবা অভিশপ্ত। এই দুর্ভাগ্যেব অন্ধকাবে মানুষ যখন পথ হাবাইযা ফেলে, তখন মানুষেব সামনে বাঁচিবাব কোন ভবসা থাকে না। অশাই মানুষকে উজ্জীবিত করে। আশাই মানুষকে জীবনেব পথে ভবসা দেয। এই আশা বুকে লালন কবিযা মানুষ মুমূর্ষু সন্তানেব মুখেব দিকে তাকাইযা থাকে, প্রিযবিবহী মানুষ মিলনেব স্বপ্ন দেখে ব্যাধিজীর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তি নবজীবনেব স্বপ্ন দেখে। আশা মানুষেব দুঃখবাত্রিব শেষে এক সুন্দব প্রভাতেব প্রতিশ্রুতি আনিযা দেয। এই জন্য আশাব শক্তি অতুলনীয। অসংখ্য প্রতিকূলতাব মধ্যেও মানুষ যে সম্মুখেব দিকে অগ্রসর হইয়া যায়, তাহাব জন্য আশাই দাযী। তাই মানুষেব দুর্যোগের দিনে একমাত্র ভরসাই আশা। আশাই মানুষেব বন্ধু। আশাই মানুষকে নব পদক্ষেপে উৎসাহিত কবে। আশাব প্রলোভনে মানুষ বাঁচিয়া থাকে। তাই একথা সর্বস্বীকৃত আশা জীবন-মরুভূমিব মরুদ্যান।

২৯। যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয প্রাণ
কেহ কভু তাহাদের করে কি সম্মান।

মৃত্যু মানুষেব অনিবার্য পরিণাম। জন্মের সঙ্গে মৃত্যু অমোঘ হইয়া আছে। প্রতিদিন কত অসংখ্য প্রাণী এ-জগতে আসিতেছে, আবার লীন হইতেছে। ইহাই জীবনের স্বাভাবিক লীলা। ইহা জৈব নিয়তি। ইহার হাত হইতে মানুষেব পরিত্রাণ নাই। কিন্তু সংসারে প্রাণীজগতের পক্ষে যাহা সত্য, মানুষের পক্ষে তাহা অধিকতর সত্য। পৃথিবীতে সর্বপ্রকারের জীব মরে, কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র মরে না। মানুষ বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য

প্রাণদান করিতে পারে। ইহা আদর্শ-উদ্বুদ্ধ আত্মদান। মৃত্যুর সঙ্গে ইহার তুলনা চলে না। মৃত্যু জীবধর্ম। কিন্তু প্রাণদান মানবধর্ম। মানুষের মাহাত্ম্য এই অবদানের উপরই নির্ভর করে।

জীবজগতে বহু প্রাণী আছে, উদ্ভিদ আছে; যাহারা মানুষের মত মরে না। প্রকৃতির নিয়মে কেবল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহা জৈব ধর্ম। মানুষ কিন্তু উচ্চতর জীব। বৃহত্তর উদ্দেশ্যে মানুষ নিজেকে বিতরণ করিয়া দেয়। ইহারাই সমাজ-সংসারে আদর্শ মানুষ। এই সব মানুষদের জন্য মানবসংসার ধন্য হয়। যিনি সকলের জন্য আত্মদান করেন, দেশের জন্য আত্মবলি দেন, তিনিই বরেণ্য মানুষ। এই সব বরেণ্য মানুষদের আত্মদানে মানবতার গৌরব বাড়িয়া যায়। মানুষেয় মনুষ্যত্বের মহিমা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে। জীবজগতের অন্য প্রাণী অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল জীবনে নয়, মৃত্যুতেও প্রমাণিত হয়।

৩০। সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ কর'নি।

স্নেহান্ধ মাতাপিতা অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের মনুষ্যত্বলাভের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান। স্নেহ মানবজীবনে প্রয়োজনীয় বস্তু সন্দেহ নাই। স্নেহ ছাড়া মানবশিশু বর্ধিত হয় না। কিন্তু সেই স্নেহ যদি কোন শিশুকে পূর্ণ মানুষ হইতে বাধা দেয়, তবে সেই স্নেহ বিপথগামী হইতে বাধ্য। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে মানুষকে কষ্টসহিষ্ণু হইতে হয়। অনেক সাধনা ও সংগ্রাম, অনেক তপস্যা ও সংযম না থাকিলে কোন মানুষ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। হৃদয়ের দিক হইতে বাঙালী কোমল ও স্নেহপ্রবণ বলিয়া জীবন সংগ্রামের দুরূহ পথে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যত্বের জাগরণের পথে ইহা এক অন্তরায়। মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে জীবনের কঠিন পথে অগ্রসর হইতে হয়। সেই কাঠিন্যের সাধনা যদি না থাকে তাহা হইলে কেহই জীবনে সার্থক হইতে পারে না। স্নেহান্ধ মাতাপিতা এই দুর্গম পথের দিকে সন্তানকে চালিত না করিতে পারিলে সন্তান কখন মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। বাঙালী জাতি হিসাবে এই দিক হইতে ব্যর্থ। ইহার কারণ দুর-দুর্গমে বাঙালী তরুণের অভিযাত্রা নাই। জীবন-সংগ্রামের পথে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শৈশবকাল হইতেই মাতাপিতার যে শিক্ষাদান প্রয়োজন, তাহা

আমাদের স্নেহচঞ্চল পরিবেশে পাওয়া যায় না। এইজন্ত বাঙালী এখনও পরিপূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহাই কবির অভিমত।

৩১। সেদিন বর্ষা ; বসন্ত নহে
বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে না।

শীতের শেষে বসন্তের আবির্ভাব ঘটে। শীতের রূঢ়-রিক্ত বনভূমি বসন্তে সৃষ্টির মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়। সমস্ত প্রকৃতি শোভা ও সৌন্দর্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। কোকিল এই সৌন্দর্যের দূত হইয়া আসে। কোকিল বসন্তের আগমন-বার্তা আনিয়া দেয়। বসন্তের আনন্দশিহরণ, প্রকৃতির নবীন আনন্দ কোকিল তাহার কূজনের মধ্যে প্রকাশ করে। তাই এ বসন্ত সুখের দিনের প্রতীক, শীত দুঃখদিনের প্রতীক। কোকিল বসন্তের দূত। কোকিল সুদিনের বার্তা লইয়া আসে।

মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ দুই আছে। সুখ এবং দুঃখ চক্রের মত পরিবর্তিত হয়। সুখের পশ্চাতে দুঃখ, দুঃখের পশ্চাতে সুখ আসিয়া দেখা দেয়। মানুষের মধ্যেও কোকিলের স্বভাবযুক্ত অনেক লোক আছেন। তাঁহারা সুখের দিনের সহচর। সুদিন আসিলে তাহারা আসেন। দুর্দিনে তাঁহাদের দেখা যায় না। সুখান্বেষী, ভাগ্যান্বেষী মানুষ সম্পন্ন আত্মীয়-স্বজনের কাছে সুদিনে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তোষামোদ ও প্রশংসা দ্বারা ধনী আত্মীয়কে তাহারা মদগর্বিত করিয়া তোলেন। সুখের দিনে, আনন্দের দিনে, ঐশ্বর্যের দিনে এই সব ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি হঠাৎ স্বজন ও বন্ধু হইয়া যান। কিন্তু দুর্দিনে আর তাঁহাদের দেখা পাওয়া যায় না। দুর্দিনের অন্ধকারে এই সব ব্যক্তি কোথায় মিলাইয়া যান। তখন আর তাঁহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাই জীবনের নিয়ম, ইহাই সমাজের নীতি। সুদিনের দোসর এমন বন্ধু অনেক আছেন যাঁহারা দুর্দিনে আসিয়া পাশে দাঁড়ান না। দুঃখের শীতঋতুতে এই শ্রেণীর মানুষের দেখা পাওয়া যায় না। বসন্তের মধু-উৎসবে তাঁহাদের সান্নিধ্য কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত মাত্রায় পাওয়া যায়।

৩২। বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর।

মানুষ সীমার আয়তনে বন্দী। ক্ষুদ্র সুখ ও ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বারা মানুষ সীমাবদ্ধ। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের স্নেহ-মায়া-মমতা ঘেরা সংসারে সংসারী

মানুষের যাতায়াত নির্দিষ্ট থাকে। ইহার বাহিরে বিশাল পৃথিবী তাহার কাছে অপরিচিত হইয়া যায়। বৃহতের সান্নিধ্য ছাড়া মানুষের অসীমের তৃষ্ণা মেটে না। কিন্তু স্বার্থমগ্ন মানুষ সেই বৃহতের সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হয়। ক্ষুদ্র সীমার বন্ধনে সে বাঁধা পড়িয়া থাকে।

মানুষের মধ্যে দুইটি দিক আছে, একটি দিক তাহার সীমার দিক, অন্যটি তাহার অসীমতার দিক। সীমানির্দিষ্ট মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ ও দুঃখের আকর্ষণে বা বিকর্ষণে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। স্বল্প প্রাপ্তির জন্য পার্থিব মানুষ অনেক কিছুকে ত্যাগ করিতে পারে। সংসারের মানুষ এই ছোট ছোট প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির জন্য উৎফুল্ল ও ম্রিয়মাণ। কিন্তু এই ক্ষুদ্রদৃষ্টিকে যদি বৃহতের দিকে প্রসারিত করিয়া দেওয়া যায় তবেই জীবনের সার্থকতা। মানুষের সত্য পরিচয় তাহার অসীমানুভবে। মানুষের অন্তরের যে দিকটি অসীমের অভিমুখে সম্প্রসারিত সেই দিকটির বিকাশ সাধন করিলে তবে মনুষ্যত্বের যথার্থ শিক্ষা সমাধা হয়। ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ মানুষ বৃহতের স্পর্শ লাভ করিতে পারিলেই সার্থক ভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে। স্বল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ—এই সত্য মানুষের জীবনে চিরসত্য। এইজন্য অসীমের স্পর্শলাভ করিতে হইলে মানুষকে কেবল ক্ষুদ্র স্বার্থ-লাভ-ক্ষতির মধ্যে বদ্ধ থাকিলে চলিবে না। নিজের চিত্তকে অসীমের দিকে প্রসারিত করিতে হইবে।

ভাবার্থ

ভাবার্থ লিখনের নিয়ম

ভাবার্থ লিখন-পদ্ধতি ভাবসম্প্রসারণ শৈলীর বিপরীত। ভাবসম্প্রসারণে মূল ভাবের সম্প্রসারণ বোঝায়, ভাবার্থ লিখনে সংকোচন ও সংহতি বোঝায়। ভাবার্থ লিখনের ক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে :—

(১) মূল ভাবটিকে প্রণিধান করিয়া তাহা প্রতিভাত করিয়া তুলিতে হইবে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে গৌণ করিয়া মূল ভাবার্থকে পরিস্ফুট করাই ভাবার্থ লিখনের উদ্দেশ্য।

(২) প্রধান ভাবের চুম্বকটুকু তুলিয়া ধরিতে হইবে। অপ্রধান ভাব পরিস্ফুট করা বাঞ্ছনীয় নয়।

(৩) উপমা-অলঙ্কার বা গল্প কাহিনী যাহা প্রাসঙ্গিকভাবে আছে, তাহার মূল্য ও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

(৪) পুনরাবৃত্তি বর্জনীয়। সহজ, সরল, প্রসাদগুণান্বিত রীতিতে সমগ্র বক্তব্যকে গুছাইয়া লিখিতে হইবে। যে অংশের ভাবার্থ করিতে হইবে, সেই অংশাপেক্ষা ভাবার্থ যেন হ্রস্ব হয়।

(৫) ভাবার্থের মূল কথাকে পরিস্ফুট করিয়া নামকরণ করিতে পারিলে সুষ্ঠু হয়। ইহা বাধ্যতামূলক নয়, তবে অঙ্গ হিসাবে ইহার প্রয়োজন আছে।

(৬) ভাব-সংহতিই ভাবার্থ-লিখনের বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য অল্প কথায় ভাবকে ফুটাইয়া তোলা ভাবার্থ-লিখনের উদ্দেশ্য।

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ-চণ্ডাল.
প্রভু ক্রীতদাস !
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু
সমগ্রে প্রকাশ।
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি তক্ষণ
কর্ম-চর্মকার

অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি অগোচরে
বহু অদ্রিভার !
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয় ।
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয় ।

জড় হইতে জীব সবই পরম একের বিভায় বিভাসিত। এই পরমস্রষ্টা বিশ্বসংসারকে নীরবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল, প্রভু বা ক্রীতদাস সকলের অন্তরে ব্রহ্মস্বরূপের অধিষ্ঠান। এই পরম এক প্রিয় ও পূজনীয়, প্রণম্য ও বন্দনীয়। তিনি পূজনীয় ও আত্মীয়।

……ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ঃ স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহে চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে-স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে,—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনই সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।

দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার ;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।'......

যাহারা যুগ যুগ ধরিয়া অন্যায়-অত্যাচারকে বরণ করিয়া লয়, তাহাদের মূক কণ্ঠকে মুখর করিতে হইবে। নিপীড়িত মানুষকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই জনশক্তি অপরাজেয় শক্তির অধিকারী। ইহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে অত্যাচারী ও অন্যায়কারী ভয়ে বা ত্রাসে পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে। শোষক শ্রেণীর নিঃস্বতা উদ্ঘাটিত হইবে। বিধাতার রুদ্ররোষে এই অত্যাচারের বিভীষিকা শেষ হইবে।

৩। এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণযন্ত্রণা ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বার বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে, উন্মুক্ত বাতাসে।

মানুষের অপমান যেন শেষ হয়, ইহাই কবির প্রার্থনা। এই দুর্ভাগা দেশের মানুষ তাহার মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। মানুষের মর্যাদা যেখানে ধূলিসাৎ, সেখানে মানুষের বিধাতার অপমান অসহ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উদার-উন্মুক্ত দৃষ্টিতে সেই সমুচ্চ মানুষকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

৪। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাহি গ্রাসি—
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত ॥

ভারতবর্ষের জন্য এমনই এক স্বর্গ প্রয়োজন যেখানে মানুষ সমুচ্চ মহিমায় ও মুক্ত প্রজ্ঞায় বিরাট, বিশাল। যেখানে মানুষ আচারবদ্ধ নয়, যেখানে মানুষ পৌরুষকে হারাইয়া ফেলে নাই, যেখানে মানুষ সর্বকর্মযজ্ঞের পুরোহিত। ঈশ্বর যেন ভারতবাসীর অসম্পূর্ণতাকে আঘাত করিয়া সেই পরিপূর্ণতার স্বর্গে ভারতবর্ষের মানুষকে পৌঁছাইয়া দেন।

৫। তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব, সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে, তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে ॥

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়্গসম

তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান॥
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে॥

ঈশ্বর রাজার ন্যায় প্রত্যেকটি মানুষের উপর বিচারের ভার দিয়াছেন। প্রত্যেককেই শাসনভার দিয়া যে দায়িত্ব ঈশ্বর দিয়াছেন, তাহা পালন করিবার জন্য যেন কোন হৃদয় দৌর্বল্য না দেখা দেয়। সত্যবাক্য ও সত্যকর্মের জন্য নির্মম হইতে পারাই ঈশ্বরদত্ত গুরুদায়িত্বের যোগ্য পরিচয়। ঈশ্বর যেমন নিরঙ্কুশ ও নিরপেক্ষ বিচারক, ঈশ্বরদত্ত উত্তরাধিকারী মানুষকেও তেমনি হইতে হইবে। অন্যায়কারী ও অন্যায়ের পক্ষপাতী—উভয়েই বিচারকের চোখে অপরাধী।

৬। আঘাত-সংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠি অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুমি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে॥
করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন॥

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা যেন মানুষ জীবন-সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত বীর হইয়া গড়িয়া উঠে। জীবনের রণক্ষেত্রে নানা আঘাত ও দুঃখের মধ্যে আসিয়া যেন মানুষ অসহায় হইয়া না পড়ে। ভাবের ক্রোড়ে লালিত না হইয়া যদি কর্মক্ষেত্রে, দুরূহ কর্তব্যের পথে স্বাধীন বীরের মত অগ্রসর হইতে পারা যায়, তবে বীরত্বের সার্থকতা।

৬। তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অংগ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা,
ব্যাঘাত আসুক নব নব আঘাত খেয়ে অচল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডংক.
দেবো সকল শক্তি, লবো অভয় তব শংখ।

ঈশ্বরের কাছে সুখ প্রার্থনীয় নয়। জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে ঈশ্বর যেন মানুষকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তোলেন। দুঃখের দিনে বক্ষে জয়ধ্বনি করিতে হইবে। সকল শক্তি দিয়া ঈশ্বরের অভয়পথকে মর্য্যাদা দেওয়াই মানুষের প্রকৃত কাজ হওয়া উচিত। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও যে অগ্রগামী হয়, সেই বীর।

৮। 'বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্য কণা।
দিতে যদি হয় দে মা প্রসন্ন সহাস,
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস?
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি?'
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী:
'আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।

মানুষ পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করে। ফসলের স্বপ্নের জন্য মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়। এই পরিশ্রমই মানুষের প্রকৃত গৌরব। ঈশ্বর মানুষকে পরিশ্রম করিবার অধিকার দিয়া ঐ গৌরবের অধিকারী করিয়াছেন। বিনা পরিশ্রমে শস্য সম্পদ অর্জিত হইলে ঈশ্বরের মহিমা বাড়িত না, মানুষের গৌরবও খর্ব হইত। এই জন্য ধরিত্রী এত কৃপণা।

৯। দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশী ভালবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশী ভাল লাগে,
বেদনা-কাতর মুখে সকরুণ হাসি
দেখে মোর মর্ম মাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।
আপনার বক্ষ হতে রসরক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস সন্তানের দেহে,

অহর্নিশি মুখে তার আছিস তাকিয়ে
অমৃত নারিস দিতে প্রাণপণ স্নেহে।
কত যুগ হতে তুই বর্ণ-গন্ধ-গীতে
সৃজন করিতেছিস আনন্দ আবাস,
আজো শেষ নাহি হল দিবসে নিশীথে,—
স্বর্গ নাই রচেছিস স্বর্গের আভাস।
তাই তোর মুখখানি বিষাদ-কোমল,
সকল সৌন্দর্যে তোর ভরা অশ্রুজল।

মাতা ধরিত্রী দীনা ও স্নেহময়ী। কোন ঐশ্বর্যের প্রলোভনে মানুষের হৃদয়কে লুব্ধ করিয়া রাখে নাই। ধরিত্রী তাঁহার সন্তানকে প্রাণের অমৃতধারা দান করিয়া রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ দ্বারাই পৃথিবীর মানুষকে সঞ্জীবিত করিয়া এই মর্ত্য পৃথিবীকে দ্বিতীয় স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছে। তবু এই পৃথিবী সুন্দর। বেদনাভরা ইহার সৌন্দর্য সত্যই অনুপম।

১০। দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর।
হে নবসভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন, পুণ্যচ্ছায়া রাশি।
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান।
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল-বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন।
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ-পিঞ্জরে তব,
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব।
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার—
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন,
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন।

নাগরিক পরিবেশের কঠিন বন্ধনে কবির আত্মা অবরুদ্ধ, ইহা কবির মানসিক মৃত্যু ঘটাইয়াছে। তাই কবি গ্রাম-জীবনে ফিরিয়া যাইতে চান।

প্রকৃতির শান্ত-সুন্দর পরিবেশে মন মুক্তি পায়। হৃদয় উজ্জীবিত হইয়া উঠে। নাগরিক সভ্যতার কঠিন ও হৃদয়হীন পরিবেশে মানুষ অসহায় বোধ করে। তাই বন্ধন ছেদন করিয়া প্রকৃতির উদার-উন্মুক্ত রাজ্যে কবি মুক্তি পাইতে চান।

১১। পরের মুখে শেখা-বুলি পাখীর মত কেন বলিস ?
পরের ভংগী নকল করে নটের মত কেন চলিস ?
তোর নিজস্ব সর্বাংগে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কি বাড়ল তাতে ?
আপনারে যে ভেঙে চুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে,
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন, নামটা তার কদিন বাঁচে ?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যারে।
খাঁটি ধন যা সেথায় পাবি, আর কোথাও পাবি না রে।

প্রত্যেক মানুষের বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। সেই স্বাতন্ত্র্যেই তাহার পরিচয়। বিধাতা প্রতিটি ব্যক্তিকে সেই স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন। কিন্তু কেহ যদি সেই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া অন্যের বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করিতে চাহে তবে তাহা কৃত্রিম ও হাস্যকর হইয়া উঠে। অন্ধ পরানুকরণ সর্বদা পরিত্যাজ্য। ইহা মানুষের জীবনে সার্থকতা আনয়ন করে না।

১২। বন্ধন ? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন—
স্নেহ-প্রেম সুখতৃষ্ণা ; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি মন
সদা করাইছে পান। স্তন্যের পিপাসা
কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশুমুখে।
তেমনি সহজ তৃষ্ণা-আশা-ভালোবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস কত মুখে মুখে
করিতেছে আকর্ষণ। জনমে জনমে
প্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে ক্রমে
দুর্লভ জীবন ; পলে পলে নব আশ
নিয়ে যায় নব নব আস্বাদে আশ্রমে।

স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবক্ষ পান'
ছিন্ন করিবারে চাস কোন্ মুক্তিভ্রমে ?

জীবনের বন্ধনের মাধুর্য যাহারা ছিন্ন করিতে চান, তাঁহারা বিভ্রান্ত। বন্ধনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ লাভ করিবার মধ্যেই সত্যকার জীবনাস্বাদ নিহিত থাকে। স্নেহ-প্রেম-তৃষ্ণা এ পৃথিবীতে মানুষের নিত্য আকর্ষণের উৎস। ইহাই বিশ্বের রস ও প্রাণ। জন্ম-জন্ম এই রসধারা পান করিবার জন্য মানুষ বার বার পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। এই স্নেহপ্রীতির বন্ধন অতিক্রম করার চেষ্টা অপচেষ্টা মাত্র।

১৩। কোরো না কোরো না লজ্জা হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।
শুনো না কি বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক তাহা ঘরে।
থাক তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের পরে।
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা বড়
চক্ষে তাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়,
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে—
লুটায়ো না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বণিকরূপের বিলাস-বিভ্রমের কাছে ভারতীয় জীবনাচারের সৌম্য-শান্ত রূপটি পরম গর্বের বস্তু। প্রাচ্য জীবনদর্শন ভারতবাসীর ললাটে যে অদৃশ্য জয়টীকা আঁকিয়া দিয়াছে তাহার গৌরব অসামান্য। আত্মা যেখানে স্বাধীন ও মহিমাময়, সেখানে দারিদ্র্য ভূষণ। রিক্ততা ভারতীয় আত্মাবানের কাছে ঐশ্বর্য।

১৪। প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী—
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল প্রভাতে দেয় দেখা,

আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুকরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।
অসংখ্য দণ্ডপল নিমেষের জটিল মলিন জালে বিজড়িত—
দেহটাকে সরিয়ে ফেলি মনের থেকে,—
যেখানে সরে যায় অন্ধকার রাতের
নানা ব্যর্থ ভাবনায় অত্যুক্তি,
যার বিস্মৃত দিনের সমাধানে পুঞ্জিত লেখন যত—
সেই সব নিমন্ত্রণ-লিপি নীরব যার আহ্বান,
নিঃশেষিত যার প্রত্যুত্তর।
তখন মনে পড়ে, সবিতা।
তোমার কাছে ঋষি কবির প্রার্থনা মন্ত্র—
যে-মন্ত্রে বলেছিলেন : হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।

প্রতি প্রভাতে কবি আত্মানুসন্ধান করেন। এই আত্মানুসন্ধান আসলে সত্যানুসন্ধান। দেহরূপের অতীত জ্যোতির্ময় আত্মা অতীতের পুঞ্জিত ইতিহাসের গ্লানি অতিক্রম করে এক মহৎ উপলব্ধি অর্জন করে। সূর্যের হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ ভঙ্গ করে যেমন সত্য প্রকাশিত হয়, জীবনের অনেক দেহভাবনার বস্তুপুঞ্জ অতিক্রম করে আত্মা স্বয়ম্প্রভ হয়।

১৬। পুণ্যে পাপে দুঃখে-সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।

শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া ক'রে
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি ॥

জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্র। পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর-পথ অতিক্রম করিয়া মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। বহু দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ-স্বীকারের সঙ্গে এই সংগ্রাম জড়িত থাকে। কিন্তু এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। বঙ্গসন্তানকে সংগ্রামশীল ও কর্মিষ্ঠ করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য কবির প্রার্থনা। জীবনের সুখদুঃখকে পৌরুষের সঙ্গে যেন গ্রহণ করা যায়। ইহাই সংগ্রামের পথে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা। এই কঠিন শিক্ষায় বাঙালী সন্তানের মানুষ হওয়া উচিত।

১৭। একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি পরে বসে আছে পাতুখানি মেলে।
ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে
অদূরে কোমললোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল সেই নদীতীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলি ছুটে চলে আসে।
এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্যে কক্ষে ছাগ,
দুজনের বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে ॥

মানুষ ও জীবের মধ্যে পরস্পরের আত্মিক সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। হঠাৎ মনে হইতে পারে এই দুই প্রাণের মধ্যে নৈকট্য নাই, ব্যবধানই বেশী। কিন্তু স্নেহপ্রীতির বন্ধনে দুইরূপ প্রাণসত্তাই বাঁধা পড়িতে পারে।

১৮। নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমি মজুর। তাহাদেরি ছোটো মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা, কত ঘষা মাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেকবার পিত্তলকঙ্কন
পিতলের থালি—' পরে বাজে ঝন্ ঝন্।
বড়ো ব্যস্ত সারাদিন। তারি ছোটো ভাই,
নেড়ামাথা, কাদামাখা গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা পাখিটির মত পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
স্থিরধৈর্যভাবে। ভরাঘট লয়ে মাথে,
বামকক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর। জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি॥

দিদির মধ্যে মাতৃত্বের প্রতিনিধিত্ব বর্তমান থাকে। দিদি কর্মব্যস্ত, সুবাধ্য ভাইটি নদীতীরে একটি পাড়ে বসিয়া থাকে—এই দৃশ্যের মধ্যে স্নেহ-প্রীতির মহিমময় ভাবটি বর্তমান। অনুগত ভ্রাতা দিদির জন্য প্রতীক্ষা করে। ইহা স্নেহেরই এক পবিত্র শাসন।

১৯। খেয়া নৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হ'তে।
দুই তীরে দুই গ্রামে আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব; কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস—
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া ওঠে,
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নবনব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা—
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!

শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে—
কেহ যায় ঘরে কেহ আসে ঘর হ'তে॥

মানুষের সংসারের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন একই ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। নদীর খেয়াঘাটে এই চঞ্চল সংসারের পার্শ্বে এক অচঞ্চল সত্যের সাক্ষ্য ফুটিয়া উঠে। ঘর ও বাহিরের আসাযাওয়ার নিত্যসাক্ষ্য খেয়া মানব-সংসারের চঞ্চলতার পার্শ্বে এক ধ্রুবসত্য।

২০। তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
দৃঢ় বলে অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর। বীর্য দেহো দুখে
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্রজনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহো চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি॥
বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির॥

কবি ঈশ্বরের নিকট শক্তি ও বীর্য প্রার্থনা করেন। সুখে ও দুঃখে ভক্তি ও ভাবে বীর্যই কবির উপাস্য। সামান্য তুচ্ছতার অতীত এক মহিমময় স্তরে জীবনকে উন্নীত করাই জীবনের সাধনা। ঈশ্বর এই সাধনায় যেন কবিকে প্রস্তুত করিয়া তোলেন, ইহাই প্রার্থনা।

২১। অনন্তর ঘোর তিমিরাবৃত রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণ সকলকে নিদ্রিত ও অসন্দিগ্ধ জানিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। ভীম নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে পূর্বপরামর্শ অনুসারে অগ্রে পুরোচন অধিকৃত আয়ুধাগারে,

পরে জতুগৃহের দ্বারে এবং চতুর্দিকে প্রাচীরে দ্রুত অগ্নি প্রদান করিলে সকলে মিলিয়া বহু কষ্টে সুড়ঙ্গপথ অবলম্বনে নির্জন বনমধ্যে নিক্রান্ত হইলেন। অগ্নির উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিলে জাগ্রত পুরবাসি সকল চতুর্দিক হইতে ধাবমান হইল। পাণ্ডবদিগের জলন্ত আবাসস্থানকে সুস্পষ্টরূপে আগ্নেয় দ্রব্য নির্মিত বুঝিতে পারিয়া তাহারা বিস্তর বিলাপ পরিতাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "অহো, ইহা নিশ্চয়ই কুরুকুল কলঙ্ক দুর্যোধনের কার্য। তাহারই আদেশে পুরোচন এই গৃহ নির্মাণ করাইয়া তাহার অসদভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ধর্মের কী অনির্বচনীয় মহিমা। দেখো সে নরাধমের গৃহেও অগ্নি লাগিয়া সে দগ্ধ হইতেছে।" দহ্যমান জতুগৃহের চতুর্দিকে পৌর-জন সমস্ত রাত্রি এরূপ বিলাপ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মাতাকে লইয়া পঞ্চপাণ্ডব, দ্রুত গমনে নিরাপদ স্থানে উত্তীর্ণ হইবার বিশেষ যত্ন করিলেন। কিন্তু রাত্রি জাগরণ ও দাহভয়ে পরিশ্রান্ত হইয়া সকলেই পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিলেন। তখন একাকী ভীমসেন কাহাকেও স্কন্ধে, কাহাকেও ক্রোড়ে লইয়া এবং কাহারও হস্তধারণ পূর্বক নির্ভর দান করিয়া চলিলেন।

জতুগৃহদাহ ও পঞ্চপাণ্ডব

গভীর রাত্রে ভীম জতুগৃহ ও পুরোচনের গৃহে অগ্নিক্ষেপ করিলেন; পাণ্ডবেরা মাতাকে লইয়া নির্জন বনানীর দিকে পলায়ন করিলেন। জলন্ত জতুগৃহের দিকে তাকাইয়া নগরবাসীগণ পাণ্ডবদের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন ইহা দুর্যোধনের দুষ্কৃত্য। ইতিমধ্যে ভীমের সাহায্যে পঞ্চপাণ্ডব নিরাপদ স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন।

২২। একদা রাজা দুর্যোধন শকুনির সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে যুধিষ্ঠিরের ময়দানব নির্মিত সভার সৌন্দর্য্য সকল পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে যে সকল অত্যাশ্চর্য নির্মাণছন্দ দেখিতে পাইলেন, তাহা তৎপূর্বে কখনও দৃষ্টিগোচর করেন নাই। একগৃহে স্ফটিকময় কুট্টিমে স্ফটিকদলশালিনী প্রফুল্লনলিনী দেখিয়া জলভ্রমে তথায় সন্তর্পণে পদবিক্ষেপ করিতে গিয়া সহসা ভূপতিত হইলেন। ইহাতে ভীম ও তাহার অনুচরবর্গ হাস্য করিলেন। আর এক সময়ে স্ফটিকময় ভিত্তিতে দ্বার ভ্রম করিয়া তথা

হইতে বহির্গমনের চেষ্টা করায় মস্তকে কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইলে সহদেব দ্রুতগমনে আসিয়া তাহাকে ধারণ করিলেন। পরে কৃত্রিম সরোবরের স্বচ্ছ জলকে স্ফটিক ভাবিয়া সবস্ত্রে তাহাতে পতিত হইলেন। তখন ভীমার্জুন বা নকুল সহদেব কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। সে সময় যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় কিঙ্করজন সত্বর উত্তোমোত্তম বস্ত্র আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। ইহার পর দুর্যোধন আর বুদ্ধিস্থির রাখিতে না পারিয়া সর্বত্রই জলভাগে স্থলের এবং স্থলভাগে জলের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন এবং স্থানে স্থানে স্ফটিকভিত্তিজ্ঞানে হস্তসর বিঘটিত করিতে গিয়া পতনোন্মখ হইলেন। এই সকল দুরবস্থা দেখিয়া পাণ্ডবগণ অনেক প্রকার উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

কোপনস্বভাব দুর্যোধন তাহা যেন শুনিয়াও শুনিলেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা মর্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া তাহার মনোমধ্যে অনেক প্রকার দুর্মতির উদ্রেক করিতে লাগিল। অনন্তর বিবিধ অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন ষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া দুর্যোধন হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

দুর্যোধনের বুদ্ধিভ্রম

ময়দানব কৃত স্ফটিকপ্রাসাদ দেখিয়া দুর্যোধন মুগ্ধ হইলেন। তিনি স্ফটিকের মেঝেকে জল ভাবিলেন, দেওয়ালকে শূন্য স্থান চিন্তা করিয়া অগ্রসর হইলেন। এইভাবে ভ্রমমদে মত্ত হইলেন। পাণ্ডবরা দুর্যোধনের মতিভ্রম দেখিয়া হাসাহাসি করিলেন, ইহাতে দুর্যোধন ক্ষুব্ধ হইয়া নানারূপ অশুভ পরিকল্পনা করিয়া অবশেষে হস্তিনাপুর চলিয়া গেলেন।

২৩। তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা অতি মনোহর প্রভাত। বৃষ্টি শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকে মেঘ নাই। সূর্যকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টি বিন্দু ও সূর্যকিরণে দশদিক ঝলমল করিতেছে। শুভ্র আনন্দ প্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেতশতদলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে চিল ভাসিয়া যাইতেছে—ইন্দ্রধনুর তোরণের নীচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিতেছে।

কাঠবেড়ালিরা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিতেছে। দুই একটি অতি ভীরু খরগোস সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার

আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি দুর্গম পাহাড়ে উঠিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে, কলসকক্ষে মায়ের আঁচল ধরিয়া ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, কলকল স্বরে তাহারা গল্প করিতেছে নদীর কলধ্বনির বিরাম নাই। আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

মনোহর প্রভাতে জয়সিংহ

বৃষ্টিশেষের স্নিগ্ধতায় প্রভাতকাল উজ্জ্বল ও সুন্দর। আকাশে ইন্দ্রধনু, বক ও চিল উড্ডীয়মান। পৃথিবী আনন্দরূপে দীপ্ত। নদীর ঘাটে ঘাটে স্নানার্থীরা উৎফুল্ল। সমস্ত পরিবেশ আনন্দময়। জয়সিংহের অন্তরে বেদনার দীর্ঘশ্বাস। তাঁহার কর্তব্যের সহিত এই উৎফুল্ল পরিবেশের সামঞ্জস্য নাই। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

২৪। সেই দেখেছি সেবার গঙ্গার রূপ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বসন্ত কোন ঋতুই বাদ দিইনি, সব ঋতুতেই মা গঙ্গাকে দেখেছি। এই বর্ষাকালে দুকুল ছাপিয়ে জল উঠেছে গঙ্গার, লাল টক টক করছে জলের রূপ, তার উপর গোলাপী পাল তোলা ইলিশ মাছের নৌকা এদিকে ওদিকে দুলে দুলে বেড়াচ্ছে, সে কি সুন্দর! তারপর শীতকালে বসে আছি 'ডেকে' গরম চাদর জড়িয়ে, উত্তরে হাওয়া মুখের উপর দিয়ে কানের পাশ ঘেঁষে চলেছে হু হু করে। সামনে কিছু দেখা যায় না। মনে হ'তে যেন পুরাকালের ভিতর দিয়ে নতুন যুগ চ'লেছে কোন রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে। থেকে থেকে হঠাৎ দু'টি একটি নৌকা সেই ঘন কুয়াশার ভিতর থেকে স্বপ্নের মতো বেরিয়ে আসত।

গঙ্গার রূপ

সকল ঋতুতেই গঙ্গার রূপ ছিল। বর্ষায় ভরা-নদীতে গৈরিক বর্ণের জল, ইলিশ মাছের নৌকোর দৃশ্য। আবার শীতের দৃশ্য অন্যরূপ। কুয়াশাকীর্ণ, হিমার্ত বাতাস, স্টীমারের যাতায়াত। কুয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া কখনও কখনও স্বপ্নের মত এক একটি নৌকা ভাসিয়া যায়।

২৫। মানুষের কতকগুলি এমন বিপদ আছে, যাহা হইতে সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না—মৃত্যু, শোক, নানাপ্রকার নৈরাশ্য ও ব্যাধি চিরদিন তাহাকে প্রপীড়িত করিতেছে। এই সমস্ত স্বাভাবিক দুঃখ ও বিপদ মনুষ্য-জীবনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, অথচ আমাদের আধুনিক সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা এরূপ যে, তাহাতে আমাদিগকে বিপদে বিমুখ করিতে সর্বদাই অভ্যস্ত করিতেছে। কল্য যাহার একটি পদ ডাক্তার ছেদন করিয়া দিবে, তাহাকে কুশকণ্টকের আশঙ্কায় আতঙ্কিত করিয়া বহুদর্শী বলিয়া যিনি পরিচিত হইতে চান, তাঁহার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় তাহাতে প্রকট হইয়া উঠে। এ-দেশে সাবধানতার প্রতি দৃষ্টির মাত্রা বড় বৃদ্ধি পাইতেছে। হয়ত কোন নিগূঢ় শুভ অভিপ্রায়ে বিশ্বের মহাভিষক্ রাজা আমাদের স্বর্ণ-পাত্রকে মৃৎপাত্রে পরিণত করিবেন, ময়ূরের পাখা হইতে হয়ত একটি একটি করিয়া পালক তুলিয়া লইবেন। যাহা একান্ত যত্নে রক্ষা করিতেছি, তাহাকেই হয়ত নিতান্তই নিষ্ঠুরভাবে হরণ করিবেন; সুতরাং এই সম্পূর্ণ অনায়ত্ত অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যাহা কর্তব্য, যাহা শ্রেয় কেবল তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দুঃখকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে। এইরূপে স্বেচ্ছাকৃত দুঃখেই মানুষের মহত্ত্ব।

মানুষের দুঃখ ও ঈশ্বরের অভিপ্রায়

মানুষ সুখ চায়। কিন্তু সুখের পথে প্রতিকূলতা অনেক। মানুষের চারিদিকে ঈশ্বরের অমোঘ বিধান। জন্ম-মৃত্যু-ব্যাধির দ্বারা মানুষ আক্রান্ত। সব দুঃখ ঈশ্বরের দান। মানুষের মনুষ্যত্ব ঈশ্বরের বিধানকে মানিয়া লওয়ার ওপর নির্ভর করে। ইহাই মঙ্গলময়ের অভিপ্রায়।

২৬। মানুষ অতি দুর্বল জীব; সবল শত্রুর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে আর একটি কৌশল আশ্রয় করিয়াছে। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে; সেই দলের নাম 'সমাজ'। দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে, স্বাধীনতাকে ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙিয়া যায়। যে পাশব প্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দলের কল্যাণার্থে মানুষ সেই পাশব প্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। এইজন্য যে বুদ্ধি আবশ্যক

তাহার নাম 'ধর্মবুদ্ধি'; ইহা বিশিষ্টরূপে মানবধর্ম। ইহা সমাজরক্ষার অনুকূল—ইহা লোকস্থিতির সহায়। মানুষের পশুজীবনই ত' দুই টানাটানির ব্যাপার, উহার উপর এই সামাজিক জীবন আর একটা নূতন টানাটানির সৃষ্টি করে। আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার অভিমুখে যে সকল প্রবৃত্তি তাহা মানুষকে এক পথে প্রেরণ করে, আর মানুষের ধর্মবুদ্ধি যাহা মূলতঃ সমাজ রক্ষার অর্থাৎ লোকস্থিতির অনুকূল মাত্র, তাহা মানুষকে অন্য দিকে প্রেরণ করে, সামাজিক মানুষকে এক টানাটানির মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কেবলই চেষ্টা করিতে হয়। এই সমাঞ্জস্য স্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের 'নৈতিক জীবন'। প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতন্ত্রের দিকে ঠেলে, আর ধর্মবুদ্ধি তাহার অন্তরের অন্তর হইতে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে চালাইতে চেষ্টা করে, এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য কৃপার পাত্র। মনুষ্যের হৃদয় সেই জীবনব্যাপী মহাভারতের কুরুক্ষেত্র—ধর্মের সহিত অধর্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে।

মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্য

মানুষ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সমাজ বাঁধিয়াছে। মানুষ পাশববৃত্তিকে সংযমের দ্বারা শাসন করিয়াছে সমাজ-কল্যাণের জন্য। ইহার নাম ধর্মবুদ্ধি। একদিকে জৈববৃত্তি, অন্যদিকে ধর্মবৃত্তি এই দুইয়ের প্রেরণায় মানুষকে সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়। ইহাই নৈতিক জীবন। ধর্ম ও অধর্মের দ্বন্দ্ব ও সামঞ্জস্য স্থাপনই এই জীবনের উদ্দেশ্য।

২৭। আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদ শীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণথালে উপাদেয় আহার করিতেছেন। আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্য, বনবাসের দুঃখ, সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদায়ক—লক্ষ্মণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিয়া ভুলিয়া যাইতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল, মহর্ষি বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন—চিত্র হিসাবে নহে—হিন্দুর গৃহদেবতা স্বরূপ তুমি এপর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে। আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া আইস,—সেই শতপ্রিয় প্রদক্ষমুখরিত একগৃহে একত্র বসিয়া আহার করি, স্বর্গ হইতে আমাদের

মাতারা সেই দৃশ্য দেখিয়া আশীষ বর্ষণ করিবেন, আমাদের দক্ষিণ বাহু অভিনব বলদৃপ্ত হইয়া উঠিবে—আমরা এ দুর্দিনের অন্ত দেখিতে পাইব।

আদর্শ ভ্রাতৃস্নেহ

রাম ও লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ বাল্মীকির অপূর্ব দৃষ্টি। রামায়ণের এই আদর্শ ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত আজ হিন্দুসমাজে কোথাও নাই। এই আদর্শ অনুসরণ করিলে হিন্দুগৃহ শান্তিপূর্ণ হইত। এই দৃশ্য ফিরিয়া আসিলে স্বর্গ হইতে মাতৃবৃন্দ আশীর্বাদ করতেন, দুর্দিন শেষ হইত।

২৮। যে সকল যুক্তির দ্বারা তুমি আত্মপীড়ন করিতেছ তাহা প্রথম দৃষ্টিতে সুসম্বদ্ধ বটে, কিন্তু তুমি ধীরভাবে বিবেচনা করিলে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিবে। ক্ষুদ্র মানবীয় সুখদুঃখের উপর কর্তব্যাকর্তব্য নির্ভর করে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি অনুসারে ফলাফল বিচার করিতে গেলে সংশয়শূন্য ও স্থিরসংকল্প হইয়া কোনো কার্যই করা যায় না। সেই নিমিত্ত ফলাফল ও স্বীয় সুখদুঃখ নগণ্য করিয়া স্বশ্রেণীর নির্দিষ্ট ধর্মানুসারে কর্তব্য পালন করিতে হয়। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ তুমি হৃদয় দৃঢ় করিয়া মাত্র ধর্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে তোমাকে কিছুমাত্র পাপ স্পর্শ করিবে না। হে পার্থ, যে চিরন্তন ঘটনা পরম্পরার ফলে এই সুমহান্ কুলক্ষয় আজি উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তোমার বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রভুত্ব বা দায়িত্ব নাই। অতএব হে স্বজন-বৎসল তুমি এই সান্ত্বনা লাভ করো যে, তুমি কাহারও মৃত্যুর কারণ স্বরূপ হইতে পারো না। কার্যকারণ-প্রবাহে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে। তন্মধ্যে তুমি স্বীয় কর্তব্য অকাতরে পালন করিলে তোমার ধর্মরক্ষা ও পরিণামে শাশ্বত মঙ্গল লাভ হইবে।

কর্তব্য পালন

কার্যকারণ প্রবাহে যাহা অনিবার্য, তাহাই ঘটিয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রত্যেককে নিজ কর্তব্য পালন করাইতে হয়। নিষ্ফল কর্মে আস্থা রাখিয়া কর্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হয়। কার্যকারণ পরম্পরা মানুষের অধীন নয়। কর্তব্যকর্ম করিলে মঙ্গললাভ হইবে।

২৯। হে মধুসূদন, এই সমস্ত আত্মীয়গণ যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন ও চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে, গাণ্ডীব আমার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। যাহাদের নিমিত্ত লোকে রাজ্য কামনা করিয়া থাকে, সেই আত্মীয় ও পরম দয়িত ব্যক্তি সকলকে বিনাশ করিয়া আমারা রাজ্যলাভ করিতে উদ্যত হইয়াছি। কিন্তু পৃথিবীর কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্য লাভার্থেও আমি ইহাদিগকে বধ করিতে বাসনা করি না। ইহারা লোভে অন্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছেন ; কিন্তু হায়, আমরা সমস্ত বুঝিয়াও এই মহাপাপের অনুষ্ঠানে অধ্যবসায়রত হইয়াছি। আমাকে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ইহারা বিনাশ করেন সেও ভালো, কিন্তু আমি যুদ্ধ করিব না।

ফলাফলযুক্ত কর্ম ও ফল

মানুষ অকর্তা। ঈশ্বরের বিধান ও অভিপ্রায় মানুষ বহন করিয়া ফিরিতেছে। মানুষ যদি ফলাফলের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কর্ম করে তবে মানুষ সুখ বা দুঃখের ফলশ্রুতি লাভ করে। ইহাতে মন ও প্রাণ বিকারগ্রস্ত হয়। কর্তব্যকর্মে দ্বিধা আসে। আত্মীয়পালনই রাজ্যলাভের উদ্দেশ্য। আত্মীয় বিনাশে অর্জুন যুদ্ধ করিতে উৎসাহী হন নাই। পাপের ভয়ে মানুষ এইভাবে কর্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হয়।

৩০। রাজা বলিলেন, 'কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট, ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত জান? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া মনে করো। সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো।—এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক আর রাজ প্রাসাদেই থাক। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু—সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত

হইতেছে, সেই অভিশাপ ধারা হইতে কোন রাজছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে। অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলংকার করিয়া পরে। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হইতে হয়।

রাজার আদর্শ

রাজার সিংহাসন নিষ্কণ্টক নয়। রাজার মাথায় প্রজাদের অসংখ্য চিন্তার গুরুভার থাকে। এই দুঃসমাধেয় দায়িত্বভারে রাজার মাথায় যে মুকুট শোভা পায় তাহা আসলে কণ্টকমুকুট। কারণ প্রজাদের সুখদুঃখের সহিত একাত্ম হইয়াই রাজা পৃথিবীর রাজা হইয়া উঠেন। মানুষের দুঃখ দূর না করিতে পারিলে রাজা হওয়া যায় না। রাজা হওয়ার অর্থ অবাধলুণ্ঠন নয়, অপার কল্যাণ সাধনের প্রেরণা।

৩১। গোবিন্দ মানিক্য অতিশয় বিষণ্ণ মুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মতো লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না, আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষ মানুষকেও ভয় করিবে, ভাইও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে বসিতে পাইবে না! এ সংসারে হিংসা লোভই এত বড় হইয়া উঠিল, আর স্নেহ প্রেম কোথাও স্থান পাইল না। এই আমার ভাই, ইহার সহিত প্রতিদিন এক গৃহে বাস করি, একমনে বসিয়া থাকি, হাসি মুখে কথা কই—এও আমার পাশে বসিয়া মনের ছুরি সানাইতেছে। গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তু পূর্ণ অরণ্যের মতো বোধ হইতে লাগিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ মনে করিলেন, এই স্নেহ প্রেমহীন হানাহানির রাজ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া আমি আমার স্বজাতির, আমার ভাইদের মনে কেবলই হিংসা লোভ ও দ্বেষের অনল জ্বালাইতেছি। ইহা অপেক্ষা ইহাদের খরনখরাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাদের রক্তের তৃষ্ণা মিটাইয়া এখান হইতে অপসৃত হওয়াই ভাল।

হিংসার কারণ ও অবসান

হিংসা কেবল পশুর ধর্ম নয়, মানুষের পবিত্র জীবনে ও সমাজেও তাহা প্রবেশ করিয়া দাবানল সৃষ্টি করিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার ভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের রাজ্যলালসার কথা বুঝিয়া—ভাবিলেন যে পৃথিবীতে বাঁচিয়া তিনি কেবল হিংসাকে প্রণোদিত করিয়াছেন। অন্যের হিংসার কারণ হওয়া অপেক্ষা হিংসার শহীদ হওয়া অনেক ভাল। রক্ত দ্বারা বিদ্বেষ-লোভ মুছিয়া যায়। হিংসার পরিণাম যদি হিংসা হয়, তবে জীবন দিয়া তাহা প্রতিরোধ করা উচিত।

৩২। আষাঢ় মাস। সকাল হইতে ঘন মেঘ করিয়া রহিয়াছে। এখনও বৃষ্টি পড়ে নাই, কিন্তু বাদলা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। দূরদেশের বৃষ্টির কণা বহিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। গোমতী নদীর জলে এবং গোমতী নদীর উভয় পারের অরণ্যে অন্ধকার আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে অমাবস্যা ছিল, কাল ভুবনেশ্বরী পূজা হইয়া গিয়াছে।

যথা সময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেত প্রস্তরের ঘাটের সোপান বহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে এক শত এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত।

হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা একপ্রকার সংকোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের দাগ বাবা ?" রাজা বলিলেন, "রক্তের দাগ মা।" সে কহিল, "এতরক্ত কেন ?"

এমন এক প্রকার কাতর স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, 'এত রক্ত কেন ?' যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—'এত রক্ত কেন'। তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। বহুদিন ধরিয়া প্রতিবৎসর রক্তের স্রোত দেখিয়া আসিতেছেন, একটি ছোট মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল। "এত রক্ত কেন!" তিনি উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। অন্যমনে স্নান করিতে করিতে ঐ প্রশ্নই ভাবিতে লাগিলেন।

রক্তের দাগ

অমাবস্যার রাত্রে ভুবনেশ্বরী মন্দিরে একশত মহিষ বলি হইয়াছে। রাজা হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া মন্দিরের ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া রক্তরেখা

দেখিয়া শিহরিত হইলেন। বালকের কণ্ঠেও বেদনা ও বিস্ময়। হাসির প্রশ্ন 'এত রক্ত কেন', রাজাকে পর্যন্ত আকাশ পাতাল ভাবাইতে উদ্রিক্ত করে। বহুদিন ধরিয়া রাজা যাহা দেখিয়া আসিতেছেন, একটি বালিকার প্রশ্নে তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

৩৩ রাজা কহিলেন, "আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি। তাহারই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেইজন্য আমার প্রতি প্রজার বিশ্বাস নাই, সেই জন্যেই দুর্ভিক্ষের সূচনা, সেই জন্যই এই যুদ্ধ। রাজ্য পরিত্যাগের জন্য এ সকল ভগবানের আদেশ।"

বিল্বন কহিলেন, "এ কখন ভগবানের আদেশ নহে। ঈশ্বর আপনার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন; যতদিন রাজকার্য নিঃসংকট ছিল, ততদিন আপনার সহজ কর্তব্য অনায়াসে পালন করিয়াছেন, যখনই রাজ্যভার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, তখনই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনি স্বাধীন হইতে চাহিয়াছেন। এবং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আপনাকে ফাঁকি দিয়া সুখী করিতে চাহিতেছেন।"

কথাটা গোবিন্দমানিক্যের মনে লাগিল। তিনি নিরুত্তর হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলেন, "মনে করো না ঠাকুর, আমার পরাজয় হইয়াছে; নক্ষত্র আমাকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছে।"

বিল্বন কহিলেন, "যদি সত্য তাহাই ঘটে, তাহা হইলে আমি মহারাজের জন্য শোক করিব না। কিন্তু মহারাজ যদি কর্তব্যে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন, তবেই আমাদের শোকের কারণ ঘটিবে।"

রাজা কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলেন, "আপন ভাইএর রক্তপাত করিব।" বিল্বন কহিলেন, "কর্তব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহই নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কী উপদেশ দিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুন।"

কর্তব্য সর্বোত্তম

রাজ্যে দুর্ভিক্ষ মহামারী, শত্রুর আক্রমণের অর্থ রাজা এই রাজত্বের উপযুক্ত নন। রাজা রাজত্ব ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বিল্বন

শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার জন্য রাজাকে প্রণোদিত করিলেন। কিন্তু রাজার শত্রু যে স্বয়ং তাঁহার সহোদর ভ্রাতা। বিদুর গীতার উক্তি উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে কর্তব্যের কাছে ভাই বন্ধু কেহই নাই। কর্তব্য সর্বোচ্চ বস্তু।

৩৪। রাত্রির যে একটা রূপ আছে তাহাকে পৃথিবীর গাছ পালা, পাহাড় পর্বত, জলমাটি, বনজঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আজ সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে। এই যে আকাশ বাতাস স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি, মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি। এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন তাহা তো ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধিটি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ; আঁধার সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনেব জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষ ও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার। কিন্তু সেকি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন। তাই রাধার দুই চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম। কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই, কোনদিন এ পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকীত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে তো কোনদিন জানি নাই। তবে হয়তো মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিৎ নয়। একদিন যখন সে আমাকে

দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এমনি অফুরন্ত সুন্দর রূপে আমার দুই চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্ব-দুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জন মৃত্যু মন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই তো। তাহার ওই নির্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন আস্তোবাসীর মত বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য? একেবারে ভিতরে মাঝখানে গিয়ে বসি না কেন!

রাত্রির রূপ

প্রকৃতির অন্যান্য দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপাবলী হইতে স্বতন্ত্র রাত্রির রূপ। আলোর রূপ আছে, অন্ধকারের রূপ নাই, একথা সত্য নয়। অন্ধকারের রূপের মধ্যে গভীরতা আছে, নিবিড়তা আছে। রাত্রির রূপ দেখিয়া লেখকের মনে হয়, পৃথিবীতে যাহা নিবিড়, যাহা গভীর, তাহার রূপই কৃষ্ণবর্ণ। সৌন্দর্য্যের আত্মা এই কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে নিহিত আছে। অব্যক্ত ও অচেনাই এই কৃষ্ণবর্ণ। মৃত্যুর বর্ণও কৃষ্ণ, রাধার অশ্রুর বর্ণও ঘনশ্যাম। এই রহস্যময় অন্ধকারের রূপের অন্তরে লেখক অনন্তের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছেন।

৩৫। মানুষের অন্তর জিনিসটাকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, একাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে কাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না—আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না। আবার শুধু নিজের মনটাই নয়, পরের সম্বন্ধেও দেখি তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলা পড়িয়া দেখ—হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহার কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়। জোর করিয়া বলে, এ চরিত্র কোনো মতেই ওরূপ হইতে পারে না, সে চরিত্র কখনও

সেরূপ করিতে পারে না—এমনি কত কথা। লোকে বাহবা দিয়া বলে, বাঃ রে বাঃ! এই তো ক্রিটিসিজম্! একেই তো বলে চরিত্র সমালোচনা! সত্যই তো। অমুক সমালোচক বর্তমান থাকিতে ছাই-পাশ যা তা লিখিলেই কি চলিবে? এই দেখ বইখানার যত ভুলভ্রান্তি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া ধরিয়া দিয়াছে! তা দিক ত্রুটি আর কিসে না থাকে! কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া এই সব পড়িয়া তাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না। মনে মনে বলি হায়রে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা! দম্ভ প্রকাশের বেলায় কি তাহার কানাকড়ির মূল্য নাই! তোমার কোটি কোটি জন্মের কত অসংখ্য কোটি অদ্ভুত ব্যাপারে যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু এক মুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ-কথাটা কি একটিবারও মনে পড়ে না! এও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন!

মানুষের অন্তরের পরিচয়

মানুষের পরিচয় অন্তহীন। মানুষের আত্মার রহস্য কোন কিছুতেই অনুধাবন করা যায় না। কোন সমালোচনার মানদণ্ডেই মানুষের এই অন্তর্পরিচয়ের মূল্যায়ণ হয় না। মানুষের অহংকার কিন্তু এই সত্য প্রণিধান করে না। মানুষের বুদ্ধি অহংকারমত্ত হইয়া যখন মানবপরিচয়ের ব্যাখ্যা করে তখন মনে হয়, মানুষের বুদ্ধি সর্বজ্ঞ। কিন্তু ইহার কাছে অন্তর্যামীর রহস্য অজানা ও অনন্ত।

৩৬। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া কোন সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক-একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল এগুলো যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে যাহার আসন গ্রহণ করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ সংখ্যাতীত গ্রহ-তারকাও

আগহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভেতরটা ছাড়া যতদূর দেখা যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখীটা একবার বাপ বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না। পশ্চিম মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম—এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমূলগাছগুলো দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছুদূর আসিতেই তাহাদের কালো কালো ডাল-পালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল। ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অস্ফুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম; কিন্তু তাহা আহ্লাদ করিবার মত নয়। আরও একটু অগ্রসর হইতে তাহা পরিস্ফুট হইল। এক একটা মা 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষকালে নির্জীব হইয়া যে প্রকারে রহিয়া রহিয়া কাঁদে, ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না এবং পূর্বে শুনে নাই—সে যে গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয়। শকুন শিশু—অন্ধকারে মাকে দেখিতে পাইয়া কাঁদিতেছে—না জানিলে কাহারও সাধ্য নাই একথা ঠাহর করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে দেখিলাম—ঠিক তাই বটে। কালো ঝুড়ির মত শিমূলের ডালে ডালে অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে এবং তাহাদেরই কোন একটা দুষ্ট ছেলে অমন করিয়া আর্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

প্রান্তরের প্রান্তে শ্মশানের রূপ

প্রান্তরের তীরে অন্ধকারের শ্মশানের রূপ অতি ভয়ংকর। কাশের ঝোপকে মনে হয় এক একটি মানুষ। এর অমানিশায় প্রেতাত্মারা নৃত্য করিতেছে। প্রাণহীন, অনুভূতিহীন এক অদ্ভুত রাজ্য এই শ্মশান। শিমূল-গাছগুলোকে মনে হয় শ্মশানের দ্বারপাল। শকুন শিশুর কান্না এই পরিবেশকে আরো বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে। শিমূলের ডালে ডালে অসংখ্য শকুনশিশু শ্মশানের পরিবেশকে কি ভয়ংকরতা দান করিয়াছে।

৩৭। বাংলা দেশের কৃষ্ণাভ কোমল উর্বর ভূমি-প্রকৃতি বর্তমান বিহারের প্রান্তভাগে বীরভূমে আসিয়া অকস্মাৎ রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা ষড়ৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া যেন ভৈরবীবেশে তপশ্চর্যায় মগ্ন। অসমতল গৈরিকবর্ণের প্রান্তর তরঙ্গায়িত ভঙ্গীতে দিগন্তের নীলের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে বনফুল আর খৈরিকাঁটার গুল্ম; বড় গাছের মধ্যে দীর্ঘ তালগাছ তপস্বিনীর শীর্ণ বাহুর মত উর্ধ্বলোকে প্রসারিত। বীরভূমের দক্ষিণাংশে বক্রেশ্বর ও কোপাই—দুইটি নদী মিলিত হইয়া কুয়ে নাম লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

রূপান্তর

বাংলাদেশের উর্বর ও শ্যামল প্রকৃতি বিহারে আসিয়া রুক্ষ ও কঠিন রূপ ধারণ করিয়াছে। বাংলা মাতার ষড়ৈশ্বর্যময়ী রূপ গৈরিকবর্ণ ধারণ করিয়া তপস্বিনীর মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে। বনফুল ও কণ্টকগুল্মে প্রকৃতি এখানে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বক্রেশ্বর ও কোপাই নদী কুয়ে নাম লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়াছে ও ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

৩৮। "পাখীটা মরিল—কোন্ কালে যে, কেউ ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখী মরিয়াছে।'

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, একটি কথা শুনি।'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ পাখীটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ওকি আর লাফায়?'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'

—'আর কি ওড়ে?'

'না।'

'আর কি গান গায়?'

'না।'

—'দানা পাইলে আর কি চেঁচায়?'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখীটাকে আনো তো দেখি।'

পাখী আসিল। সংগে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়-সওয়ার আসিল। রাজা পাখীটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না; হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে শুকনো পাতা খসখস গজগজ করিতে লাগিল।"

ব্যর্থ পুঁথি

পাখির মৃত্যুতে রাজার ভাগ্নের ধারণা যে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। পাখিটা নড়ে না, গান গায় না—কোতোয়াল, পাইক, ঘোড়-সওয়ার আসার পর পাখিটাকে পরীক্ষা করা হইল। পাখিটা সত্যই মৃত। তাহার পেটে শুষ্ক পুঁথি সশব্দে বিরাজ করিতেছে। জীবন্ত পাখি মরিয়া যাবার পরও পুঁথিগত বিদ্যা মরিয়া যায় না।

বঙ্গানুবাদ

অনুবাদ করিবার নিয়ম

ভাষা-শিক্ষার অন্যতম দিক অনুবাদ শিক্ষা। অন্য ভাষা হইতে অনুবাদ করিতে না শিখিলে ভাষা-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। অনুবাদের জন্য প্রয়োজন ভাষাজ্ঞান। কারণ প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব ধর্ম আছে। প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গী আছে। এই নিজস্ব রীতি-বৈশিষ্ট্য বা বাগ্‌ধারা প্রত্যেক ভাষার স্বাতন্ত্র্য-চিহ্ন। বাংলা ভাষার এই নিজস্ব সম্পদ অফুরন্ত। শিক্ষার্থীকে ভাষার এই নিজস্ব গুণ প্রণিধান করিতে হইবে। এই স্বাতন্ত্র্যের পরীক্ষা অনুবাদশিক্ষা। কারণ বিদেশী ভাষা হইতে অনুবাদ করিবার সময় মাতৃভাষার প্রয়োগ পদ্ধতির জ্ঞান চাই। এইজন্য ছাত্র জীবনে অনুবাদ শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ভাষার নমনীয়তার গুণ অনুবাদের মাধ্যমে বোঝা যায়। কারণ ইংরাজী ভাষার কয়েকটি নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আছে, যাহা আমাদের মাতৃভাষায় সুলভ নয়। ইহার কারণ ভাষার বিশিষ্ট ধর্ম। ইংরাজী হইতে অনুবাদের মাধ্যমে এই ভাষান্তরের শক্তি পরীক্ষা হয়। ইংরাজী ভাষার প্রকাশরীতিকে বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করিতে হইলে যে কৌশল, দক্ষতা বা বিচক্ষণতার প্রয়োজন তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অনুবাদ-শিক্ষায়। অনুবাদ-শিক্ষার কয়েকটি সূত্র এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল :—

(১) অনুবাদ সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইবে। অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ হইবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে নিশ্চয়, তবে এই স্বাধীনতা অবাধ নয়।

(২) বিদেশী ভাষার বাগ্‌ধারাকে দেশী ভাষার বাগ্‌ধারায় রূপান্তরিত করিতে হইবে। বিদেশী ভাষার উল্লেখ ও প্রসঙ্গকে মাতৃভাষায় রূপান্তরের সময় যথেষ্ট বিবেচনার প্রমাণ দিতে হইবে। ধরা যাক, নেপোলিয়ানের যুদ্ধের কোন অংশ বর্ণিত হইয়াছে অনুবাদ্য অংশে, সেখানে ভাষান্তরের প্রশ্ন আসে না, কারণ ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। সুতরাং ভাষান্তরণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ না হওয়াই স্বাভাবিক।

(৩) কখনও কখনও অনুবাদ ভাবানুবাদ হইয়া উঠে। ভাষান্তর না করিয়া মূল ভাবকে প্রযুক্ত করিতে হইলে যে বোধ প্রয়োজন, অনুবাদের ক্ষেত্রে তাহা মূল্যবান।

(৪) অনুবাদ আড়ষ্ট হইলে চলে না। অনুবাদকে যদি কৃত্রিম বা অসহজ বলিয়া মনে হয়, তবে অনুবাদ হিসাবে তাহা ব্যর্থ বলিয়া গণ্য হইবে। এই জন্য অনুবাদের ক্ষেত্রে সহজ ভাব থাকা বাঞ্ছনীয়। দুই ভাষার বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে ধারণা থাকিলেই ইহা সম্ভব হয়।

(৫) ইংরেজী ও বাংলা ভাষার বাক্যগঠনের প্রকৃতি বিভিন্ন। অনুবাদের সময় এই প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সম্পর্কে সজাগ থাকা বিধেয়। বাংলা ভাষার নিজস্ব ভঙ্গীটুকু অনুবাদের মধ্যে পরিস্ফুট করিতে হইবে। উদাহরণ দ্বারা বলা যায়। প্রত্যক্ষ উক্তি বা পরোক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে দুই ভাষার প্রকৃতিগত পার্থক্য বোঝা যায়। যেমন, ইংরাজিতে একটি প্রত্যক্ষ উক্তি উল্লেখ করা যায়, He said, 'Ram is ill', ইহা পরোক্ষরূপে 'He said that Ram was ill'; বাঙলায়, ইহার অনুবাদ "তিনি বলিলেন যে রাম ছিলেন অসুস্থ" অচল, হওয়া উচিত 'তিনি বলিলেন যে রাম অসুস্থ।' ইহার কারণ ইংরাজী কালক্রম (Sequence of Tenses) বাঙলা অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বাক্য-গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। ইংরাজী ও বাংলার বাক্যগঠনের এই বৈশিষ্ট্যটি সম্বন্ধে সদাসতর্ক থাকা প্রয়োজন। 'I love you', এখানে কর্তা প্রথমে, পরে ক্রিয়া, শেষে কর্ম। কিন্তু বাঙলা অনুবাদের ক্ষেত্রে 'আমি তোমাকে ভালবাসি', আগে কর্তা, পরে কর্ম, শেষে ক্রিয়া। পদবিন্যাসের এই পার্থক্যটুকু প্রথমেই প্রণিধান করিতে হইবে।

॥ বাক্যভিত্তিক অনুবাদ ॥

সরল বাক্য ঃ 'যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাহাকে **সরল বাক্য** বলে।' বাক্য বিশ্লেষণের সময় ক্রিয়াকে প্রশ্ন করিয়া কর্তা ও কর্ম বুঝিয়া লওয়া যায়। সরল বাক্যে কখনও কখনও প্রসারক থাকিতে পারে, যেমন, অর্জুন কর্ণকে বধ করিলেন; **তৃতীয় পাণ্ডব** অর্জুন **মহাবীর** কর্ণকে বধ করিলেন। এখানে প্রথমেই ক্রিয়াকে প্রশ্ন করা যাক, কে বধ করিলেন? অর্জুন। কাহাকে বধ করিলেন? কর্ণকে। অর্জুন এই বাক্যে কর্তা, কর্ণ কর্ম। এখন প্রশ্ন করা যায়, কে এই অর্জুন? তৃতীয় পাণ্ডব, ইহা কর্তার প্রসারক; কে এই কর্ণ? মহাবীর কর্ণ? 'মহাবীর' কর্ণের প্রসারক। এই ভাবে বাক্যবিশ্লেষণ করিয়া অনুবাদ করিতে হইবে।

অনুশীলনী

. Mother loves her children. এখানে finite Verb 'loves' ক্রিয়াকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কে ভালবাসে? উত্তরে বলা হয়, 'Mother'। কাহাকে ভালবাসে? children। ইহা কর্ম।

অনূদিত বাক্য: 'মা তাঁর সন্তানদের ভালবাসেন'।

The Japanese live in simple and beautiful house.

এখানে 'Japanese' কর্তা, 'house' কর্ম, simple and beautiful house, কর্মের সম্প্রসারক।

অনু: জাপানীরা সাধাসিধে এবং সুন্দর বাড়ীতে বাস করে। এখানে simple-এর আক্ষরিক অনুবাদ 'সরল' বেমানান।

There is a forest in England named Sherwood forest.

অনু: ইংলণ্ডে সেরউড নামে এক অরণ্য আছে।

Robinhood was the most well-known robber in history.

অনু: রবিনহুড ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত দস্যু ছিলেন।

Every house has a little garden.

অনু: প্রত্যেক বাড়ীতে একটি ছোট বাগান আছে।

The wise man checks all bad habits.

অনু: বিজ্ঞ ব্যাক্ত সব বদ অভ্যাস সংযত করেন।

॥ মিশ্র বা জটিল বাক্য ॥

জটিল বাক্যে মূল বাক্যের অধীন এক কিংবা একাধিক খণ্ড বাক্য অথবা বাক্যাংশ থাকিতে পারে। একটি উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেয় থাকিলেই খণ্ড বাক্য হয়।

অনুশীলনী

যে মিথ্যাবাদী কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না।

এখানে প্রধান খণ্ডবাক্য 'কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না।' উদ্দেশ্য 'কেহ', উদ্দেশ্যের প্রসারক 'যে মিথ্যাবাদী'। বিধেয় 'বিশ্বাস করে না', বিধেয়ের প্রসারক 'তাহাকে'।

অনু: Nobody believes him who is a liar.

One day, when I was walking on the street, I saw a strange man.

এখানে Principal clause 'One day I saw a strange man' Subordinate clause—'when I......street'.

অনু: একদিন যখন আমি রাস্তা দিয়া হাঁটিতেছিলাম, তখন আমি একটি অদ্ভুত লোককে দেখিয়াছিলাম।

Vidyasagar was a man who was kind to the core of his heart.

অনু: বিদ্যাসাগর মনেপ্রাণে দয়ালু ছিলেন। এই অনুবাদ বাংলা ভাষার রীতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সার্থক, কিন্তু 'বিদ্যাসাগর অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দয়ালু ছিলেন' একটু আড়ষ্ট অনুবাদ।

The most important thing is that we should have freedom of thought.

অনু: সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় এই যে আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা থাকা উচিত।

I am glad to think that they do not know what they have missed.

অনু: আমি ভাবিয়া আনন্দ পাই যে তাহারা জানেনা যে কি তাহারা হারাইতেছে।

॥ যৌগিক বাক্য ॥

পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক বাক্য যখন সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন যৌগিক বাক্য গঠিত হয়।

অনুশীলনী

Gora went there in search of Sucharita, but she was not there.

অনু: গোরা সুচরিতার সন্ধানে সেখানে গেল কিন্তু সুচরিতা সেখানে ছিল না।

এখানে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া আছে। একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ আছে, সংযোজক অব্যয় 'কিন্তু'ও আছে, তাই ইহা যৌগিক বাক্য।

They used to wander round the high wall when their lessons were over, and talk about the beautiful garden inside.

ইহা একটি যৌগিক বাক্য। বিশ্লেষণ করিলে ইহার যে রূপ পাওয়া যায় তাহাতে **'They used to wander round the high wall'**-কে **Principal clause** বা প্রধান খণ্ডবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে। **When their...were over**-কে অপ্রধান খণ্ডবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে। **'(they used to) talk about the beautiful garden inside'**-কে প্রধান খণ্ড বলিয়া গ্রহণ করা চলে। ইহাদের সংযোজক **'and'.**

অনু: পাঠ শেষ হইয়া গেলে তাহারা উঁচু দেওয়ালের বা প্রাচীরের চারিদিকে বেড়াইত এবং ভিতরে সুন্দর বাগানের কথা আলোচনা করিত।

Helen saw at once who he was and realized the danger he was in.

অনু: হেলেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিল এবং নিজেকে বিপন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিল।

All day he sang and passed his time cheerfully, while his rich neighbours were busy and anxious about their riches.

অনু: সারাদিন সে গান গেয়ে তার সময় আনন্দে কাটিয়ে দিত, যদিও তার ধনী প্রতিবেশীবৃন্দ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাত।

There are some very clever boys and girls who do very well in examinations and always come out at the top.

অনু: কিছু চতুর বালক-বালিকা আছে যারা পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল করে এবং সর্বদা শীর্ষস্থান অধিকার করে।

বঙ্গানুবাদ

1

The crowning glory of the reign of Shahjahan is the Taj Mahal at Agra. It is looked upon as one of the seven wonders of the world. Every one who has looked at it, whether in day time or on a moon-lit night when its beauty is enhanced, has marvelled at it. One cannot but be struck with the vision of the man who conceived it, the taste of the man who provided the material and the skill of the workmen who built it. It combines delicacy with beauty, grandeur with nobility, and its white marble, its fine domes and minares, its screen and inlay work,—all fill one with wonder. It moves the heart, delights the eye, stirs up the imagination, and fills the soul with peace.

আগ্রার তাজমহল শাহজাহানের রাজত্বকালের গৌরব-মুকুট। ইহা পৃথিবীর সপ্তম বিস্ময়ের অন্যতম বলিয়া গণ্য হয়। কী দিবালোকে, কী জ্যোৎস্নালোকে যখন ইহার সৌন্দর্য গভীরতর হয়, ইহার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ মাত্রেই প্রতিটি মানুষ বিস্ময়াবিষ্ট হয়। যে মানুষ ইহা পরিকল্পনা করিয়াছে তাহার অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না, যে মানুষ ইহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহার রুচিবোধ বা যে কারুকার ইহা নির্মাণ করিয়াছে তাহার শক্তিমত্তার প্রশংসা না করিয়া কেহ পারিবে না। ইহা সৌন্দর্যের সহিত সুকুমার কলা, বিলাস-গাম্ভীর্যের সহিত মহত্ত্বের মিশ্রণ ঘটাইয়াছে। ইহার শুভ্র মর্মর, সুন্দর গম্বুজ বা মিনার, ইহার যবনী বা কারুকার্য—সবই মনকে বিস্ময়ে পূর্ণ করিয়া তোলে। ইহা হৃদয়কে দোলা দেয়, কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং অন্তরকে শান্তিপূর্ণ করিয়া তোলে।

2

The winds were high, and the rain and storm increase when the old man sailed forth to combat with the elements. For many miles about, there was scarce a bush, and there upon a heath, exposed to the fury of the storm in a dark night, did

king Lear wander out, defy the winds and thunder; and he bid the winds to blow the earth into the sea, or swell the waves of the sea, till they drowned the earth, that no token might remain of such ungrateful animal as man. The old king was now left with no other companion than the poor fool, who still abided with him.

বাতাস সবেগে বহিতেছিল, ঝড় ও বৃষ্টি বাড়িয়া চলিতেছিল—ইহার মধ্যে বৃদ্ধ ব্যক্তিটি হয়ত প্রকৃতির দুর্যোগের সহিত মোকাবিলা করিবার জন্য বাহির হইয়াছিল। কয়েক মাইল ধরিয়া কদাচিৎ একটি ঝোপের দেখা পাওয়া যাইত। অন্ধকার রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডবের মুখে ছিল একটি ঝোপঝাড়-বিশিষ্ট মাঠ। রাজা লিয়র এই ঝড় ও বজ্র উপেক্ষা করিয়া এই গুল্মাচ্ছন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি বাতাসকে আদেশ করিলেন সমুদ্রগর্ভে যেন পৃথিবীকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, অথবা সমুদ্র তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করিয়া পৃথিবীকে ডুবাইয়া দেয়—যাহাতে মানুষ নামক কৃতঘ্ন প্রাণীর কোন চিহ্ন থাকে না। একমাত্র দুর্ভাগা বিদূষক ছাড়া বৃদ্ধ রাজার আজ কোন সহচর নাই। সেই শুধু তার পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

When Mahatma Gandhi became a world-figure, Rabindranath Tagore spoke of him in the following words; "The secret of Gandhi's success lies in his dynamic spiritual strength and incessant self-sacrifice. He covets no power, no position, no wealth, no name, and no fame. Offer him the throne of all India, he will refuse to sit on it, but will sell the jewells and distribute the money among the needy. He is a liberated soul. If Gandhi was strangled, I am sure he would not cry. He may laugh at his strangler; and if he has to die, he will die smiling. His simplicity of life is childlike, his adherence to truth unfinching, his love for mankind is positive and aggressive."

মহাত্মা গান্ধী যখন বিশ্ববিদিত ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি করিয়াছিলেন: গান্ধীর সাফল্যের গোপন কথা লুকাইয়া আছে তাঁহার আত্মিক শক্তি ও অক্লান্ত আত্মত্যাগের মধ্যে। তিনি কোন ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, সম্পদ, খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহাকে ভারতের সিংহাসন দান করিলেও তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিবেন, বরঞ্চ উহার রত্নমালা বিক্রয় করিয়া গরীবদের মধ্যে ঐ অর্থ বিতরণ করিবেন। তিনি একজন মুক্তাত্মা পুরুষ। গান্ধীকে যদি গলা টিপিয়া মারা হইত, তিনি হয়ত এতটুকু কাঁদিয়া উঠিবেন না। তিনি তাঁহার কণ্ঠরোধকারীর দিকে উপেক্ষার হাসি হাসিবেন, এবং যদি মরিতে হয়, তিনি হাসিতে হাসিতে মৃত্যুবরণ করিবেন। তাঁহার সারল্য ছিল শিশু সুলভ, তাঁহার সত্যাগ্রহ অনমনীয়, মানবপ্রীতি ধ্রুব ও বিস্তারশীল।

It was a sunny morning, that of July the first, 1916. As the world soon knew the music of that sunny morning was the guns, they had never spoken before with so huge a voice. Their sound crossed the sea. In our southern villages, the school-children sat wondering at that incessant drumming and rattling of the windows. That night an even greater anxiety than usual forbade wives and mothers to sleep. The Battle of the Somme had begun. The armies of the three nations most prominently concerned in the battle were great organisations of athletes, willing to attempt any test that might be ordered.

সেদিন ছিল ১৯১৬ সালের ১লা জুলাইয়ের এক রৌদ্রদীপ্ত প্রভাত। সমস্ত পৃথিবী শীঘ্র জানিতে পারিল যে সেই রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতের সংগীত ছিল কামানের ধ্বনি। এতখানি প্রবল কণ্ঠে পূর্বে কোনদিন ইহা ধ্বনিত হয় নাই। এই ধ্বনি সমুদ্র অতিক্রম করিল। আমাদের দক্ষিণদিকের গ্রামগুলিতে বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েরা সেই অবিরল তোপধ্বনি ও জানলার ঝনঝন শব্দ শুনিল। সেই রাত্রে অন্য দিনাপেক্ষা এক গভীরতর উদ্বেগ স্ত্রী ও মাতাদের নিদ্রাহরণ করিল। সোমের যুদ্ধ শুরু হইয়াছে। যে তিনটি জাতির সৈন্যদল ঐ যুদ্ধে জড়িত ছিল, তাহারা ছিল ব্যায়ামদক্ষ দল। আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই যে-কোন পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতে তাহারা ছিল উৎসুক।

5

The problem of keeping people healthy is usually considered from two aspects; how the individual can keep healthy and how the community keep healthy. It may be healthy for the individual to drink plenty of water, but in a town at least it is the duty of the rulers to provide pure water. The individual can keep himself fit and try to avoid getting dangerous germs into his system, but the rulers should see that there are not too many dangerous germs about. The citizens should eat only good food, the rulers should see that bad food is not allowed to be sold. And so on with every problem.

জনগণের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সমস্যাটি দুই দিক হইতে বিচার করা যায়—কেমন ভাবে কোন একদল ব্যক্তি সুস্থ থাকিতে পারে এবং কিভাবে একটি সমাজ বা সম্প্রদায়কে সুস্থ সবল রাখা যায়। প্রচুর পরিমাণে জলপান করা বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে স্বাস্থ্যজনক হইতে পারে, কিন্তু শহর এলাকায় বিশুদ্ধ জল পরিবেশন করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কোন একজন ব্যক্তি নিজেকে সুস্থ রাখিতে সচেষ্ট হইতে পারে এবং দেহের ভিতরে মারাত্মক বীজাণুর প্রবেশ প্রতিরোধে প্রয়াসী হইতে পারে। কিন্তু ইহা শাসকগোষ্ঠীকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে মারাত্মক বীজাণু

না ছড়াইয়া পড়ে। নাগরিকগণের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া উচিত, কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত যাহাতে কুখাদ্য বিক্রয়ে অনুমতি না দেওয়া হয়। এইভাবে সব সমস্যাই দেখা উচিত।

In village India this is a time of expectancy. Will the monsoon keep its appointment on the normal date ? Will it bring plentiful rain properly spread over the season ? How will rivers behave ? These are questions momentous for the countryside and any one gifted with the eye of imagination can see thirsty fields watching the heavens for the answer, the last forth-night before monsoon is a testing time for living creatures. The ploughman goes more slowly to the field, the village artificer prolong his midday rest taken on the floor of his place of work or under a V-shaped roof of straw. Tanks have dwindled, wells give water reluctantly, crops look pitifully at their possessors, and there is in village lanes a fiercer glare from the sunshine and a heat that strikes harder while sounds, even birds' songs see my harshly metallic. It is not the nicest time of the year, but it holds the promise of a cooler season.

গ্রাম বাংলার এইটাই প্রত্যাশার কাল। মৌসুমীবায়ু কি যথাবিধি দেখা দিবে ? ইহা কি সারা ঋতু ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে, নদীগুলোর অবস্থা কেমন হইবে ? গ্রামের পক্ষে এই সমস্যাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ দেখিতে পাইবে কিভাবে তৃষ্ণার্ত মাটি আকাশের দিকে তাকাইয়া আছে। মৌসুমীর মরশুমের এক পক্ষকাল পূর্বে সকল প্রাণীরই পরীক্ষার কাল। কৃষকেরা মন্থর পদক্ষেপে মাঠে যায়। গ্রামের কারিগররা কর্মক্ষেত্রের মেঝের উপর মধ্যাহ্নের বিশ্রাম বিলম্বিত করে বা খড়ের দো-চালা চালের নীচে দিবা-বিশ্রামকে দীর্ঘতর করে। পুকুরগুলি অবসিত, কুয়া হইতে সহজে জল পাওয়া যায় না। খেতের ফসল তাহার মালিকদের দিকে করুণ নয়নে তাকাইয়া থাকে। গ্রামের পথে-ঘাটে সূর্যের তেজ প্রবলতর হয়, উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়। এমন কি পাখীর সংগীতও ধাতব-নিনাদ মনে হয়। এই সময়টি বৎসরের সেরা সময় নয়। ইহা শুধু স্নিগ্ধ ঋতুর প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা বহন করে।

We all love the country so much that we desire to live in it, if only during the night, when we are not at work. We build cottages, buy season tickets and bicycles to take us to the station. And meanwhile the country perishes. The Surrey I knew as a boy was full of wilderness. To day it is hardly distinguishable from the outskirts of the city. There is no more country, at any rate within fifty miles of London. Our

love has killed it. Except in summer, when it is too hot to stay in town, the French, and still more, the Italians, do not like the country.

আমরা গ্রামকে এত ভালবাসি যে আমরা এখানে থাকতে চাই। বিশেষ করে রাত্রে যখন কোন কাজ থাকে না, তখন আমরা কুটীর নির্মাণ করি। ষ্টেশনে যাবার জন্য মাসিক টিকিট ও সাইকেল ক্রয় করি। ইতিমধ্যে গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়। যে 'সারে'কে বাল্যকাল থেকে আমি জানতাম তা ছিল বিজনভূমি। এখন শহরতলীর থেকে তার পার্থক্য টানা শক্ত। লণ্ডনের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে আর কোন গ্রাম নেই। আমাদের শহরপ্রীতি গ্রামকে শেষ করেছে। ফরাসীরা ও বেশী করে ইটালীয়ানরা গ্রীষ্মকাল ছাড়া গ্রামে থাকতে চায় না। কারণ গ্রীষ্মকালে শহরগুলি এত গরম থাকে যে টেঁকা যায় না।

To-morrow as Yesterday, the fittest will survive in the struggle for existence. But whereas in the past selfishness was the measure of fitness, in the future survival value will be determined by breath and depth of love. Modern science is teaching, at it never was taught before, that no one lives to himself alone. Co-operation between individuals, and then between familes, was essential to the life of man when he competed with the brutes of fields and forests. Still greater co-operation between clans and nations is now essential to his continued life on the earth. Now, as always individuals and people who are not in line with the great forward movements in the evolutionary trend are doomed to die.

অতীতের মত আগামীকালেও জীবন যুদ্ধে যোগ্যতমরা টিঁকিয়া থাকিবে। কিন্তু অতীতে স্বার্থপরতা যখন যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল, ভবিষ্যৎ উর্দ্ধতনে প্রীতির গভীরতার দ্বারাই মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছে যে কোন ব্যক্তি কেবল নিজের জন্য বাঁচে না। এইরূপ শিক্ষা পূর্বে দেওয়া হয় নাই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সহযোগিতা অপরিহার্য্য, পরে পরিবারের মধ্যেও এই সহযোগিতা প্রসারিত করা চাই। অরণ্য বা মাঠের জানোয়ারের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য মানুষের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার জন্য গোষ্ঠী ও জাতিসমূহের মধ্যে গভীরতর সহযোগিতার প্রয়োজন। যাহারা বিবর্তনের সম্মুখবর্তী যাত্রার তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে না সেই সব ব্যক্তি বা জনসমাজ সর্বকালের মত লুপ্ত হইতে বাধ্য।

9

Bankimchandra took Bengali readers by surprise by revealing to them the romance of life and the hidden treasures of emotional joy with which, it is said they had not previously

been familiar, The classical poem of Bengal being mostly translations from Sanskrit, and written in the stereotyped form approved by the canons of Sanskrit Poeties, often lack in freshness and animation. Bankim drew his romantic ideals from the British Lake-Poets and other western writers. It can not, however, be said that such romance was altogether unknown in Bengal before his time. The Vaisnava poem had an exuberance of it in the sixteenth and seventeenth centuries, though they were often mystical and their beauty was concealed from lay readers in the symbols of allegory.

জীবনের যে কল্পনাময় দিক বা গোপন আবেগ-ঐশ্বর্যের দিক বাঙালী পাঠকের অজানা ছিল, তাহাকে বঙ্কিমচন্দ্র আবিষ্কার করিয়া সকলকে বিস্ময়-চকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার রোমান্টিক আদর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজ 'লেক' কবি বা পাশ্চাত্য লেখকদের কাছ হইতে পাইয়াছিলেন, কারণ বাংলা ধ্রুপদী সাহিত্য আসলে সংস্কৃতের অনুবাদ এবং সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের অনুশাসন কর্তৃক নির্ধারিত বলিয়া উহার মধ্যে সজীবতা ও প্রাণস্পর্শের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে একথাও সত্য নয় যে, এই রোমান্স-ভাবনা পূর্বকালের বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাত ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবকাব্যে এই ভাবধারার প্রাচুর্য বর্তমান ছিল, যদিও তাহাদের রহস্যময়তা ও রূপক সাংকেতিকতার গভীর সৌন্দর্য সাধারণ পাঠককে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল।

10

Richard Cobden has a great liking for travel, but not by any means as the ordinary tourist travels. The interest of Cobden was not in scenery, or in ruins but in men. He studied the condition of countries with a view to the manner in which it affected the men and the women of the present, and through them was likely to affect the future. He saw for himself and thought for himself. Wherever he went he wanted to learn something. Cobden could learn something from every body. He travelld very widely, for a time when travelling was a more difficult work than it is at present.

রিচার্ড কবডেনের ভ্রমণের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত, কিন্তু ইহা সাধারণ ভ্রমণকারীর মত ছিল না। কবডেনের উৎসাহ দৃশ্য বা শিল্পকলা বা ধ্বংসাবশেষে নিবদ্ধ ছিল না। তাহার কৌতূহলের বিষয় ছিল মানুষ। তিনি দেশের পরিস্থিতি বিচার করিতেন যেভাবে ইহা বর্তমান কালের নরনারীকে প্রভাবিত করিত সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া; এইভাবে ইহা ভবিষ্যতের মানুষকেও প্রভাবিত করিবার সম্ভাবনা বহন করিত। তিনি নিজস্ব ভাবে দেখিতেন ও ভাবিতেন।

যেখানেই তিনি গিয়াছিলেন, কিছু শিখিতে চাহিয়াছিলেন। কবডেন প্রত্যেকের কাছে কিছু শিখিতে চাহিতেন। তিনি ব্যাপক ভাবে ভ্রমণ করিয়াছিলেন সেই সময় যখন ভ্রমণ ছিল আজিকার অপেক্ষাও এক কঠিন কাজ।

11

A village school-master did something to displease the parents of one of his pupils. On the following morning the angry mother of the lad entered the school-room during lesson-time and began to scold. The teacher knew what was coming, and called out in a tone of command, 'children, the multiplication table.' At once the whole class began to repeat the table in chorus. The woman stormed and raved, whilst the scholars only shouted the harder, and the master quietly laughed to himself. Utterly speechless with anger, the woman at last went away.

একটি গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক তাঁহার কোন এক ছাত্রের মাতাপিতাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। পরদিন সকালে রুষ্টা জননী ক্লাশে পাঠকালে প্রবেশ করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে তিরস্কার করিলেন। অবস্থা বুঝিয়া শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের আদেশ করিলেন 'বালকগণ নামতা পড়', তৎক্ষণাৎ সমস্ত শ্রেণীর ছেলেরা সমবেত কণ্ঠে নামতা আবৃত্তি সুরু করিল। ভদ্রমহিলা রাগে ঝড় তুলিলেন এবং চীৎকার করিতে লাগিলেন। ছেলেরা উচ্চৈঃস্বরে নামতা আবৃত্তি করিয়া চলিল এবং শিক্ষক মহাশয় আপন মনে হাসিতে লাগিলেন। ক্রোধে বাক্যহারা হইয়া মহিলা অবশেষে চলিয়া গেলেন।

12

People think of poverty as a great evil, and it seems to be an accepted belief that if people had plenty of money they would be happy and useful, and get more out of life. As a rule, there is more genuine satisfaction in life, and more obtained from life, in the humble cottages of the poor men than in the palaces of the rich. I always pity the sons and daughters of rich men, who are attended by servants, and have governesses at a later stage; at the same time, I am glad to think that they do not know what they have missed.

জনসাধারণ দারিদ্র্যকে অভিশাপ বলিয়া মনে করে এবং ইহা বিশ্বাস করা হয় যে প্রচুর অর্থ থাকিলেই জনসাধারণ সুখী ও (সমাজের) উপযোগী হইয়া জীবন হইতে প্রচুর শক্তি আহরণ করিবে। কার্যক্ষেত্রে ধনীদের প্রাসাদ অপেক্ষা দরিদ্রের কুটীর হইতে অনেক বেশী তৃপ্তি লাভ করা যায় এবং অনেক বেশী জীবনের স্পর্শ পাওয়া যায়। আমি সর্বদাই ধনীদের পুত্র কন্যাগণ যাহারা

ভৃত্যদের পরিচর্যায় ও পরবর্তীকালে গৃহশিক্ষক বা শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয় তাহাদের করুণা করি। এই সঙ্গেই আমি ভাবিয়া আনন্দ পাই যে তাহারা জানেনা যে কি তাহারা হারাইতেছে।

13

"The best part of every man's education," said Sir Walter Scott, "is that which he gives to himself." The education received at shool or college is but a beginning, and is valuable chiefly because it trains the mind, makes it accustomed to continuous application and study. That which is put into us by others is always far less ours than that which we acquire by our own efforts. Knowledge, conquered by labour, becomes a possession—a property entirely our own. Our own active effort is the essential thing; and no facilities, no books, no teachers no amount of lessons learnt by rote, will enable us to do:without it.

স্যর ওয়ালটার স্কটের মতেই "তাহাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ অংশ যাহা ব্যক্তিবিশেষ স্বয়ং অর্জন করে।" বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের একান্ত শিক্ষা আরম্ভমাত্র এবং ইহা মূল্যবান প্রধানত এই কারণে যে ইহা মনকে গঠন করে এবং নিয়ত প্রয়োগ ও বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে। আমাদের প্রচেষ্টায় যাহা অর্জন করি তাহা অপেক্ষা অন্যে যাহা আমাদের শেখায় তাহা অনেক কম আমাদের নিজস্ব হইয়া উঠে। পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আমাদের অধিকারে আসে ও আমাদের সম্পদে পরিণত হয়। আমাদের সক্রিয় প্রচেষ্টাই হইতেছে সার বস্তু; ইহা ব্যতীত সুযোগ সুবিধা, বই, শিক্ষক বা মুখস্থ বিদ্যা কোন কিছুই আমাদের এই বিষয় সক্ষম করিয়া তোলে না।

14

Trees give shade for the benefit of others, and while they themselves stand in the sun and endure scorching heat, they produce the fruit by which others profit. The character of good men is like that of trees. What benefit of mankind? Sandalwood—the more it is rubbed, the more scent does it yield. Sugarcane—the more it is pressed the more juice does it produce. The men who are noble at heart do not lose their qualities even in losing their lives. What matters it whether men praise them or not. To live for the sake of living one's

life is to live of dogs or cows. Those who lay down their lives for the sake of others will surely dwell for ever in a world of bliss.

গাছ অপরকে ছায়া দেয় এবং নিজেরা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া প্রচণ্ড গরম সহ্য করে। তাহারা ফল উৎপাদন করে যাহার দ্বারা অপরে লাভবান হয়। সৎ লোকের চরিত্র গাছের মত। ইহা মানব জাতীর কোন কল্যাণে আসিবে? চন্দন কাঠ যত ঘষা যায় ততই ইহা হইতে নির্যাস বাহির হয়। আখ যতই নিংড়ানো যায় ততই রস উৎপন্ন করে। যে সকল মানুষের হৃদয় মহান, মৃত্যুর পরেও তাঁহাদের সুনাম নষ্ট হয় না। মানুষ প্রশংসা করিল বা না করিল তাহাতে কিছু যায় আসে না। নিজের জন্য জীবন যাপন করা কুকুর বা গরুর মত জীবনধারণ করার তুল্য। যাঁহারা অপরের জন্য জীবনপাত করিয়াছেন তাঁহারা শান্তির জগতে চিরকাল বাস করিবেন।

15

We cannot doubt that if men lived the kind of life which all great religious teachers urged them to live, the world would be much better and happier, and at least, a more civilized place than it is or ever has been. Unforfunately, their teachings have usually found to be too difficult for people to follow, though that is no reason why they should not try to follow them.

All the great religious teacher have insisted on this : that men ought not to live for themselves alone....It is by serving something greater that men will forget themselves, and so achieve happiness. This or something like this is what the great religions have taught, and it is one of the most important of the things that civilization means.

আমাদের সন্দেহ নাই যে বিখ্যাত ধর্মপ্রচারকগণ যে ভাবে জীবন যাপন করিতে বলিয়াছিলেন মানুষ সেভাবে জীবনধারণ করিলে পৃথিবীটি অনেক সুন্দর ও সুখী হইত, অন্ততঃ আজকের অপেক্ষায় অনেক সুসভ্য স্থান হইয়া উঠিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের শিক্ষা জনসাধারণের পক্ষে অনুসরণ করা কঠিন মনে হয় যদিও তাঁহাদের মতানুসরণ না করার কোন কারণ নাই।

সকল প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারকগণ এই বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন : মানুষের কেবলমাত্র নিজের জন্য বাঁচিয়া থাকা উচিত নয়। বৃহত্তর কোন কিছুকে সেবার মাধ্যমে মানুষ নিজের সম্পর্কে ভুলিয়া গিয়া সুখ লাভ করিতে পারে। ইহা কিংবা এইরূপ কিছু বিখ্যাত ধর্মসমূহ শিক্ষা দিয়াছে, এবং সভ্যতা বলিতে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ কোন বস্তু বুঝায়।

16

A certain Jew was travlling from Jerusalem to Jericho. He fell among thieves, who robbed him of his money and left him half-dead on the road. Then came other Jews, including a priest, but they hastily moved away from the wounded man. Then a Samaritan, who was hated by Jews, came and took pity on the wounded man. He bound up his wounds, brought him to an inn and took care of him. When the hated Samaritan departed, the wounded Jew was in tears.

একজন ইহুদী জেরুজালেম হইতে জেরিকোতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি পথে তস্করের কবলে পড়িয়াছিলেন। তস্করবৃন্দ তাঁহার টাকাকড়ি হরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে রাস্তার মধ্যে অর্ধ-মৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পর পুরোহিতসহ অন্য ইহুদীরা সেখানে আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহারা দ্রুত আহত ব্যক্তির কাছ হইতে চলিয়া গেলেন। তাহার পর একজন সামারিটান সেখানে আসিলেন। ইহুদিরা সামারিটানকে ঘৃণা করিত। তিনি আহত লোকটির প্রতি দয়াপরবশ হইলেন। তিনি তাঁহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহাকে একটি সরাইখানায় আনিয়া যত্নাদি করিলেন। যখন সেই ঘৃণ্য সামারিটান চলিয়া গেলেন, আহত ইহুদীর চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

17

There is nothing like a book. Nothing has been able to stop the man who write books. Books have been burnt, and writers have been tortured ; but books have spread themselves through out the world so that there is no country on earth without them now. They are the only things that live for ever, for now copies are made, as old ones pass away, and so through all the ages of time a book carries down the thoughts of man. A thought put into a book is stronger than a statue made of marbles and in the day of mankind the book has been the mightiest and noblest invention made by the human mind.

একটি বইয়ের মত কিছুই নয়। গ্রন্থকারকে কেউই কখনও স্তব্ধ করতে পারে নি। গ্রন্থ পোড়ানো হয়েছে, গ্রন্থকার নিপীড়িত হয়েছেন—কিন্তু গ্রন্থ সারা পৃথিবীতে এতই ছড়িয়ে পড়েছে যে পৃথিবীতে কোন দেশই আজ গ্রন্থহীন নয়। গ্রন্থই একমাত্র চিরজীবী। কারণ পুরাতন সংস্করণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সংস্করণ হচ্ছে, এবং যুগ যুগ ধরে মানুষের চিন্তাকে তা বহন করছে। প্রস্তর নির্মিত মূর্তি অপেক্ষা গ্রন্থধৃত চিন্তা, অনেক দৃঢ় এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে গ্রন্থ মানব মনের মহত্তম ও শক্তিমান আবিষ্কার।

18

The most important thing is that we should have freedom of thought. This is not as easy as it sounds, for every one likes to have this freedom for himself, but is not ready to give it to others when they express different opinions. This is particularly the case when the differences of opinion arise on such important matters as religion or politics. But if we refuse to let other people hold their opinions on these matters, and specially if we try to force them to accept our own, progress is impossible. If everyone went on thinking the same thing as his ancestors thought, progress would come to an end, because, as the Buddha said, "What a man thinks he becomes." So if

we think exactly what our forefathers thought, we shall remain in the condition in which they were.

সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় এই যে আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা চাই। এটা যত সহজ শোনায়, জিনিসটা তত সহজ নয়। কারণ প্রত্যেকেই নিজের জন্য স্বাধীনতা চায়। কিন্তু মতান্তরের সময় অন্যকে এই স্বাধীনতা কেউ দিতে চায় না। বিশেষ করে ধর্ম বা রাজনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতান্তরের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা বেশী প্রযোজ্য। কিন্তু যদি আমরা অন্যকে নিজের মত প্রকাশ করতে নিবৃত্ত করি বা যা নিজেদের মত গ্রহণ করতে বাধ্য করি, প্রগতি তাহলে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যদি সকলেই তাদের পূর্বপুরুষের মত চিন্তা করে প্রগতির তাহলে শেষ হবে। কারণ বুদ্ধদেব বলতেন, 'মানুষ যা ভাবে, তাই সে হয়।' পূর্বপুরুষেরা যা ভাবতেন আমরা যদি তাইই ভাবি, তাহলে তাদের অবস্থাতেই আমরা থাকব।

19

The noblest deeds which have been done on earth have not been done for gold. It was not for the sake of gold that Jesus suffered. The Spartans looked for no reward in money when they fought and died at Thermopylae, and Socrates who received nothing from his countrymen lived in poverty, trying to make men good. There are heroes in our days who do noble deeds, but not for gold. There is a better thing on earth than wealth. This is doing something for which good men may honour you and God may bless you.

পৃথিবীতে মহত্তম কাজ কখনও স্বর্ণ বা সম্পদের জন্য করা হয় নি। সম্পদের জন্য কেবলমাত্র যীশু কষ্ট স্বীকার করেন নি। থার্মোপাইলের জন্য স্পার্টার মানুষ যে সংগ্রাম ও জীবন দান করেছিলেন, তাও কেবলমাত্র সম্পদের জন্য নয়। যে সক্রেটিস দেশের কাছ থেকে কিছু না পেয়েও তাদের ভাল করতে চেয়েছিলেন, সেই সক্রেটিস কিন্তু দারিদ্র্যেই কাটিয়েছেন। আমাদের দেশে অনেক বীরপুরুষ আছেন যাঁরা কেবল সম্পদের জন্য মহৎ কাজ করেন না।

সম্পদের চেয়ে ভাল জিনিস পৃথিবীতে আছে। এসব করা হচ্ছে যার ফলে ভাল লোক তোমায় সম্মান করে এবং ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করে।

20

To control or check fighting is perhaps the greatest problem in our society. Our savage ancestors had so much fighting to do. They had to fiight with wild animals which tried to kill them. They had to kill wild animals for food. They had to fight other tribes. They did this for half a million years. Is it surprising that many men still enjoy fighting ? Thousands will attend a boxing match or a wrestling match. Thousands will even now enjoy a war although its means misery for countless people. Here is a great danger.

আমাদের সমাজে যুদ্ধবিগ্রহ রোধ করা বা নিবৃত্ত করাই প্রধানতম সমস্যা। আমাদের বর্বর পূর্বপুরুষদের অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। তাদের বন্য পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। কারণ পশুরা তাদের হত্যা করতে চেয়েছে। খাদ্যের জন্য তাদের বন্য পশু হত্যা করতে হয়েছে। তাদের অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়েছে। অর্ধলক্ষ বৎসর ধরে তাদের এ-কাজ করতে হয়েছে। এটা কি আশ্চর্যের ব্যাপার যে এখনও অনেক লোক যুদ্ধবিগ্রহ পছন্দ করে। সহস্র সহস্র লোক কুস্তী বা মুষ্টিযুদ্ধ পছন্দ করে। সহস্র সহস্র লোক এখনও যুদ্ধ পছন্দ করে যদিও তা অসংখ্য মানুষের জন্য দুঃখই নিয়ে আসে। এইটেই এক মস্ত বিপদ।

21

King Midas did some service to a God who asked him to choose him reward. Midas then prayed that what ever he touched might be turned into gold, and his prayer was granted. In joy and excitement Midas touched all that he saw in his room, and everything was turned into gold. He was very hungry but as soon as he touched his food, it became hard

gold ; even the water in the golden cup became hard gold. Midas was very unhappy. Then his little daughter whom he loved very much rushed into his room. But as she touched her father, the poor child became a statue of gold. Then Midas knew that the magic touch was a curse.

রাজা মিডাস ঈশ্বরের কোন সেবা করেছিলেন এবং বিনিময়ে তিনি রাজাকে কোন পুরস্কার চাইতে বলেছিলেন। মিডাস প্রার্থনা করেছিলেন যে তিনি যা স্পর্শ করবেন তাই যেন স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়। প্রার্থনা মঞ্জুর হল। আনন্দে ও উত্তেজনায় মিডাস ঘরের যা কিছু দেখলেন স্পর্শ করলেন, এবং সব কিছুই স্বর্ণে রূপান্তরিত হল। মিডাস খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন, এবং যক্ষনি তিনি তাঁর খাদ্য স্পর্শ করলেন, তা স্বর্ণে রূপান্তরিত হল। এমনকি সোনার পেয়ালার জলও সোনায় রূপান্তরিত হল। মিডাস অত্যন্ত অসুখী বোধ করলেন। তখন তাঁর ছোট মেয়ে যাকে তিনি খুবই ভালবাসতেন তাঁর ঘরে সবেগে প্রবেশ করল। কিন্তু যেইমাত্র সে তার বাবাকে স্পর্শ করেছে, অভাগা মেয়ে সোনার মূর্তিতে পরিণত হল। তখন মিডাস বুঝলেন যে এই স্পর্শমণি তাঁর কাছে এক অভিশাপ।

22

It is very easy to acquire bad habits. The more we do a thing, the more we like doing it, and if we do not continue to do it, we feel unhappy. This is called the force of habit, and we should fight against it. Things, which may be very good when only done from time to time, become very harmful when done too often and in excess. Some people form a bad habit of working too much, and others of idling too much. The wise man checks all bad habits ; he never allows them to grow. We must keep all bad habits under our control.

খারাপ অভ্যাস অর্জন করা সহজ। যতই আমরা একটা কাজ করি ততই আমরা সেই কাজ করতে আসক্ত হই। এবং করতে না পারলে. অসুখী বোধ করি। একে বলে অভ্যাসের শক্তি, এবং আমাদের এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

করা উচিত। যে কাজ কালভদ্রে বা কখনও কখনও সম্পন্ন করা হয়, তা শুভ হতে পারে। কিন্তু যে অভ্যাস প্রায়শই এবং অতিরিক্ত পরিমাণে নিষ্পন্ন হয় তা অনেক সময় অশুভ হয়। কারো কারো বেশী কাজ করার অভ্যাস আছে। কারোর বেশী আলস্যের দোষ আছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিসকল খারাপ অভ্যাস সংযত করেন। তিনি তাদের বাড়তে দেন না। আমাদের উচিত সব খারাপ অভ্যাস আয়ত্তের মধ্যে রাখা।

23

There are some very clever boys and girls who do very well in examinations and always come out at the top. When the people praise and admire them, you possibly look on them with envy. How you wish you were as clever as they. But you need not be sorry for yourselves, for although you may not be clever, nothing can prevent you from being good. And remember, goodness is a much better and noble thing than mere cleverness. Besides a good and kind man has his reward too. It may not be fame that he wins or wealth that he acquires, but the best of gifts will be his, namely the gladness of spirit. The smile that he helps to bring back to a sad face is the richest of rewards. It gladdens his heart like the warm rays of the sun on a cold winter morning.

কিছু কিছু চতুর বালক-বালিকা আছে যারা পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল করে এবং সর্বদা শীর্ষস্থান অধিকার করে। যখন লোকে তাদের প্রশংসা করে, তুমি তখন নিশ্চয় ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকাও। তুমি হয়ত ভাব যদি তুমি তাদের মত চালাক হতে। কিন্তু তোমার নিজের জন্য দুঃখিত হওয়ার দরকার নেই। কারণ যদিও তুমি চতুর নও, কিছুই তোমাকে ভাল হতে বাধা দেবে না। মনে রেখো, সততা চতুরতার চেয়ে অনেক ভাল ও মহৎ গুণ। এছাড়া একজন সৎ ও দয়ালু লোকের পুরস্কার আছেই। এটা খ্যাতি বা সম্পদ নাও হতে পারে। সবচেয়ে বড় দান হচ্ছে তার চিত্তের আনন্দ বিষণ্ণমুখে সে যে হাসি ফোটাতে পারে, তাই তার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এটা তার হৃদয়কে আলোকিত করে শীতের সকালে সূর্যের উষ্ণ আলোর রেখার মত।

24

A poor man just earned a bare living for himself and his family. All day he sang and passed his time cheerfully, while his rich neighbours were busy and anxious about their riches. They wondered at the poor man's joy. At last a wealthy man went to the poor man's house while he was away and threw bag of money into his room. When the poor man came home, he was very happy at first and carefully hid the bag of money. Soon, however, he began to fear it might be stolen or that he might be accused of having stolen it and he ceased to be cheerful. After a time the rich man asked him what made him so sad and this. At first he did not dare to say ; but when the rich man told him that he knew his secret, he cried out, "Take back your money. Then I shall be happy and free from care and sing as I used to !" So saying he flug the treasure back to the rich man.

একজন গরীব লোক তার পরিবারের জন্য এবং নিজের জন্য কোনরকমে জীবিকা সংগ্রহ করত। সারাদিন সে গান গেয়ে তার সময় আনন্দে কাটিয়ে দিত, যদিও তার ধনী প্রতিবেশীবৃন্দ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাত। তারা গরীব মানুষটির আনন্দে বিস্ময় প্রকাশ করত। অবশেষে একদিন ধনী ব্যক্তিটি গরীব মানুষটির গৃহে গিয়ে একটি টাকার থলি ফেলে দিয়ে আসে। যখন গরীব মানুষটি বাড়ী ফিরে এল, প্রথমে সে বেশ উৎফুল্ল হল এবং সযত্নে টাকার থলিটি লুকিয়ে রাখল। শীঘ্র সে এই ভেবে ভয় করতে শুরু করল যে হয়ত এটা কোন চৌর্যলব্ধ সম্পদ অথবা কেউ তাকে চুরির অপরাধে অপরাধীও করতে পারে। তখন থেকেই সে আর উৎফুল্ল রইল না। কিছু দিন বাদে ধনী ব্যক্তিটি তাকে জিজ্ঞাসা করল কেন সে আজকাল বিষণ্ণ বোধ করছে। প্রথমে সে কিছু বলতে সাহস করত না, কিন্তু যখন ধনী ব্যক্তিটি তাকে বলল যে সে গোপন ব্যাপারটা জানে, তখন সে চীৎকার করে উঠল, "তোমার টাকা ফিরিয়ে নাও। তাহলে আমি বেশ সুখী হব এবং দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে আবার গান গাইতে পারব।" এই কথা বলে সে টাকার থলিটা ধনী ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

A student should learn to think and act for himself. No man has ever been great by imitation. In fact, it is much easier to copy the defects of a great man than to imitate his good qualities. Alexander who was taught to admire Achilles imitated some of his cruel deeds. He dragged the governor of a town through the streets after his chariot. It is easy to imitate manner and matter. But by imitation alone you will never rise to eminence and become great.

প্রত্যেক ছাত্রের নিজের মত করে চিন্তা ও কাজ করা উচিত। অনুকরণ দ্বারা কোন ব্যক্তিই কখনও মহৎ হইতে পারে না। বস্তুতঃ মহাপুরুষের সদগুণ অপেক্ষা ত্রুটিবিচ্যুতি অনুকরণ করা সহজতর। যে আলেকজাণ্ডার একিলিসকে আদর্শ মনে করিতেন, তিনিও তাঁহার অনেক নিষ্ঠুর কার্যাবলীর অনুকরণ করিতেন, তিনি শহরপালকে তাঁহার রথে বাঁধিয়া রাস্তায় টানিয়া আনিতেন। আচার-আচরণ অনুকরণ করা সহজ। কিন্তু কেবলমাত্র অনুকরণ দ্বারা তুমি কিছুতেই খ্যাতিমান ও মহৎ হইবে না।

অনুশীলনী

বঙ্গানুবাদ কর:

1

If we would profit by our reading, we must be careful not only to select proper books but also to peruse them right. The same book will affect its readers differently according to the purpose with which they read it. The butterfly flies over the flower-bed, gathering nothing; the spider collects poison from it; but the bee finds and stores up honey; and so the object for which you go to a book will determine the kind of fruit it will yield you. The child takes off the lid of a tea-kettle for sport, the housewife for use—but James Watt for science, which resulted in the improvement of the steam-engine.

The great bulk of our town-dwellers are poor—terribly poor. They live huddled together in dismal, dark and smelly slums, sleeping four and five or even ten in a small dark, smoky room, eating of the barest, their children denied of education beyond what are called, 'the three R's,' which once they leave school. they soon forget. The lot of our common people is dreadful. The workers in the mills and factories of our towns, whom we—because we live in towns—are accustomed to think of as the poorest people, earn anything from fifteen to fifty rupees a month, with which to maintain a whole family. But the workers' wage is almost princely compared with earnings of those crores and crores of our country men who live in villages and cultivate the land producing food for us to eat and the cotton from which is made the cloth we wear.

3

Descending from the tree I hastily collected what remained of my provisions and set off as fast as I could towards it. As I drew near, it seemed to me to be a white ball of immense size and height and when I could touch it, I found it mervellously smooth and soft. As it was impossible to climb it—for it presented no foothold—I walked round about it, I counted that it was at best fifty paces round. By this time, the sun was near setting ; but quite suddenly it fell dark, something like a black cloud came swiftly over me, and I saw with amazement that it was a bird of extraordinary size which was hovering near.

4

England's chief glory is her Navy. This praise has, since the defect of the Spanish Armada, been a article of faith with every

true Briton. The mighty empires of Greece and Rome were each in its day invincible on land, and therefore, arbiters of the world or rather of those portions of Europe, Asia and Africa which constituted it in their eyes, though Alexander was inconsistent enough to weep for words to conquer ; while the mutinous state of his army prevented his marching across the setlej to overthrow the great king who ruled over all that portion of India to the south of this river.

5

It is impossible to describe beauty of the Taj in words. It has been called 'a dream in marble' and a tear-drop on the cheeks of time' but the fairest phrases fail to do justice to the surpassing creation of art. The Taj is best seen by moonlight when the dazzling white of the marble is mellowed into a dreamy softness. The most charming view, parhaps, is obtained from the palace on the opposite bank of the river when the plinth is not visible and the building looks a fairy castle in the air, hung among the cloud.

6

It is small wonder, then, that the Bible has always been the worlds best seller ! No other book can touch its profound wisdom, its poetic beauty, or the accuracy of its history and prophecy. Its critics, who claimed it to be filled with forgery, fiction and unfilled promises, are finding that the difficulties lie with themselves, and not the Bible. Greater and more careful scholarship has shown that apparent contradictions were caused by incorrect translation rather than divine inconsistencies. It was man and not the Bible that needed correcting.

7

It was a fine morning—so fine that you would scarcely have belived that the few months of an English summer had yet flawn by. Hedges, fields, trees, hill and moorland presented to the eye their ever-varying shades of deep rich green, scarce a leaf had fallen ; scarce a sprinkle of yellow, mingled with the hues of summer, warned you that autumn had begun. The sky was cloudless, the sun shone out bright and worm ; the songs of birds and the hum of myriads of summer insects filled the air ; and the cottage gardens, crowded with flowers of very rich and beautiful tint, sparkled in the heavy dew like beds of glittering jewels.

8

To live for others means to love others : and only those can rightly do this, so I believe, who dwell near to God. It is the divine light, the divine love, the divine gentleness which makes men true gentlemen. If we love Him, if He lives in our hearts, we shall love our brethren too. This is the noblest life of man, though it is not mentioned in books on political economy. But there are things, the good of which and the use of which are beyond calculation of 'worldly goods' and 'earthly uses' , things such as Love and Honour and soul of man, which cannot be bought with a price and which do not die with death. And we, who hope to live beyond this world, must not leave these things out of the lessons of our lives.

A well-known journalist wrote an article recently in which he described how, as he lay ill of influenza, all this wasted years passed before his imagination so that he was filled with a deter-mination to become a better man. I envied him as I read, for I

too, was ill at the time and should have liked to think that my sufferings were doing me some good. But, alas, when I am ill, it is not so much my past as my present that troubles me. I repent of my sins most easily when I am feeling fairly well. When I am ill I am far more interested in what the doctors hears through the stethoscope than in the flutterings of my conscience.

10

The great advantage of early rising is the good start it gives to our day's work. The early riser can fiinish a large part of his hard work before other men get up from their beds. In the early morning the mind is fresh and there are few sound another disturbances so that work done at this time is generally well done. The early riser, again, finds time to take some exercise in the fresh morning air, and this exercise gives him energy that lasts untill the evening. He knows that he has plenty of time to do thoroughly all the work he is expected to do and therefore he is not tempted to hurry over any part of it.

11

Old people say the childhood is the best part of life. But perhaps they forget many things that were not pleasant in their childhood. There is a good story which you should know. A boy was crying because he had to go back to school after his holidays. His father scolded him and said, "I wish I could be a boy and go to school again. I shall be very happy indeed." A fairy turned the father into a child and he had to go to school. He did not like this at all. A child's troubles may seem unreal to grown-up people, but they are very real to the child.

12

In every coutry people imagine that they are the best. The Englishman thinks that he and his country are the best, the French man is very proud of France and every thing French ; the Germans and the Italians think no end of their countries. This is all conceit. Really there is no person who has not got some good in him and some bad. And in the same. Why there is no country which is not partly good and partly bad. We must take the good wherever we find it, and try to remove the bad, wherever it may be. We are, of course, most concerned with our own country India. We have to see what is good in us and try to keep it, and whatever is bad we have to throw away. If we find anything good in other countries we should certainly take it.

13

Patriotism is love for our country. It is a powerful sentiment and is wholly unselfish and noble. A patriot puts his country first ; he can sacrifice even his own life for the good of his country. His idealism gives him courage and strength. But false patriotism is dangerous. It makes a man narrow-minded and selfish. It may teach him to hate men who do not belong to his country. He becomes blind to the virtues of other countries, while even the vices of his own country he tries to praise. Such false patriotism leads to war and much suffering.

14

The results of agriculture were many and of various kinds. It seemed as if man had at last solved the problem of food

supply. He now imitated ants who collect food to meet future needs. Similarly, men started storing their food and preserved seeds for future use. Also man ceased to be a wandering animal. Between the sowing of the seed and harvesting there is a long period of waiting. There is a further waiting before the whole process can be completed. Then there is preparation for the next year's work. Then there are so many problems connected with agriculture. Man was now tied down to the land. He no longer lived in caves or under trees like a hunter. He built sheds and cottages and dug canals. Agriculture led to the beginning of architecture and irrigation.

15

There is a forest in England named Sherwood Forest. It was the home of Robin Hood and his followers. Robin Hood was the most well-known robber in history. He was not an ordinary dacoit. His very name was a terror to all rich men, particularly those who made themselves rich with money that should have gone to the poor. What he thus got from the rich, he gave away to the poor. So the poor people knew and loved him dearly. Whenever the police officers came to search for him, not a word would they so about where Robin Hood was hiding himself. He was so fearless that he sometime came out and talked to a police officer who did not know him by appearance.

16

The Japanese live in simple and beautiful house. Every house has a little garden. The garden has lovely flowers. The

boys and girls love flowers The Japanese have great taste for blue colour. In a city street you see blue every where. Houses have blue roofs, shop fronts are hung with blue The people have more blue in their dresses than any one colour. The Japanese are very happy people. There is real home life among them. Mother love their children dearly. Children are tended by their mothers and are never given to the care of the servants. As a child grows older, it learns to love and obey its father and mother.